চক্র



অনিরুদ্ধ বসু

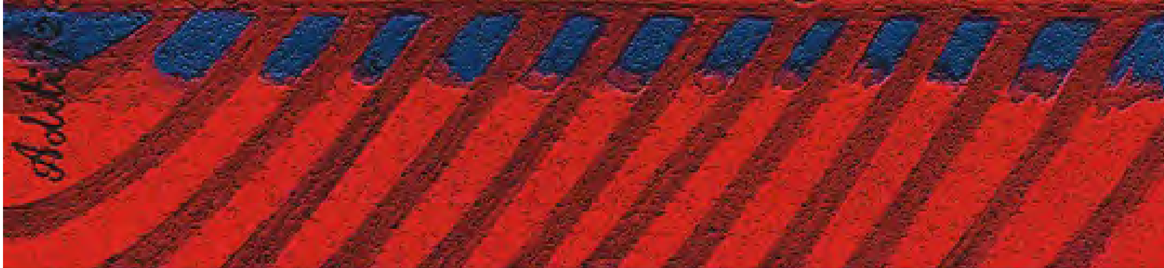


চক্র



অনিরুদ্ধ বসু





চক্র

অনিরুদ্ধ বসু



স্মৃতি পাবলিশার্স

CHAKRA

A Bengali Crime Thriller by ANIRUDDHA BOSE

Published by **SMRITI PUBLISHERS**
Website: www.smritipublishers.com

প্রথম প্রকাশঃ সেপ্টেম্বর ২০১০
প্রথম ই-বুক প্রকাশঃ জানুয়ারি ২০১৩
দ্বিতীয় প্রকাশঃ ডিসেম্বর ২০১৬
দ্বিতীয় ই-বুক প্রকাশঃ ডিসেম্বর ২০১৬

প্রকাশকঃ
স্মৃতি পাবলিশার্স
'ওয়েসিস' সি এফ - ৪১ সেক্টার ১
সল্ট লেক সিটি
কলকাতা ৭০০০৬৪

প্রচ্ছদপটঃ অদিতি চক্রবর্তী
অলংকরণঃ স্বপন দত্ত

ISBN No : 978-93-82303-78-7

বন্ধু ও সহকর্মী

তপন বসু

কে...

সূচি

পনেরো

ষোলো

সতেরো

আঠেরো

উনিশ

কুড়ি

একুশ

বাইশ

তেইশ

চব্বিশ

পঁচিশ

ছাব্বিশ

সাতাশ

আঠাশ

ঊনত্রিশ

ত্রিশ

একত্রিশ

বত্রিশ

তেত্রিশ

চৌত্রিশ

পঁয়ত্রিশ

ছত্রিশ

সাঁইত্রিশ

আটত্রিশ

ঊনচল্লিশ

চল্লিশ

যাদের সহায়তা লেখাকে সমৃদ্ধ করেছেঃ

স্মৃতি বসু
ডাঃ দেবাশিস রায়
অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়
ডাঃ অনির্বাণ দত্ত
শিবরঞ্জনী দত্ত
ডাঃ তপন বসু
দেবাশিস গৌতম
ডাঃ আশিস সিনহা
দেবাশিস দে
ডাঃ দীপঙ্কর হোম

প্রথম প্রকাশের ভূমিকা

খুনের উপন্যাসের এক চিরাচরিত গত আছে। বিদেশি সাহিত্য থেকে বাংলা সাহিত্য সেই একই গত ধরে এতকাল এগিয়েছে। প্রাইভেট ডিটেকটিভ খুনের কিনারা করছে। কিন্তু বাস্তবে ক'জন যায় প্রাইভেট ডিটেকটিভের কাছে খুনের কিনারা খুঁজতে? বাস্তবে তো কোনও অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনসপেক্টর অফ পুলিস কিংবা কোনও জার্নালিস্টই এর তদন্ত করে। কল্পনার ডিটেকটিভকে পেছনে ফেলে একবিংশ শতাব্দীর বাস্তবতার কথা মাথায় রেখে এমনও তো হতে পারে, যে খুনের তদন্ত করছে, সে তো খুনের সলিউশন নাও করতে পারে? পাঠক যেমন খুনি ও খুনের মোটিভকে সর্বক্ষণ খুঁজছে, যদি পাঠক ডিটেকটিভকেও খোঁজে? যে তদন্তকারীদের মধ্যে একজন নাও হতে পারে? এইসব নানান চিন্তাকে একত্রিত করে প্রচলিত দেশি ও বিদেশি প্রথার বেড়া ভেঙে অনিরুদ্ধ বসুর নতুন চাঞ্চল্যকর খুনের উপন্যাস "চক্র"। এটা কোনও সাবেকি ঘরানার রহস্য কাহিনি নয়। প্রথাগত হত্যাকাণ্ডের উপন্যাসে পরিবর্তন এনেছে অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধ বসু বিজ্ঞানের ছাত্র এবং একজন নামী প্লাস্টিক সার্জেন। যুক্তিবিদ্যা এবং আধুনিক প্রযুক্তি বিজ্ঞান তার চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছে। খুন এবং খুনিরও বিবর্তন ঘটিয়েছে উপন্যাসটিতে। এই নতুন করে ভাবনাটাই হয়ত এই বইটির আসল বৈশিষ্ট্য। মন্ত্রমুগ্ধের মতো একনাগাড়ে বইটি শেষ করার পর শেষ পঙক্তিটি পড়ে বুঝতে পারলাম খুনের এক নতুন দর্শন।

রত্নাবলি দে চ্যাটার্জি

দ্বিতীয় প্রকাশের ভূমিকা

খুনের ও ভূতের বইয়ের বাজারে ভালো কাটতি বলে প্রকাশিকার কাছ থেকে যখন অনুরোধ আসে, তখন কতগুলো চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল।

প্রাইভেট ডিটেকটিভকে কেন্দ্র করে গল্প লেখার ট্র্যাডিশনটা কেমন যেন একঘেয়ে। ১৮৩৩ সালে এক ফ্রেঞ্চ সৈনিক, অপরাধী ইউগিন ফ্র্যাঙ্কয়েস ভিডক, কয়েকজনকে নিয়ে 'লে ব্যুরো ডেস রিসেইনমেন্টস ইউনিভারসেলস পউর লে কমার্স এট ল্য ইন্ডাস্ট্রি' নামে প্রথম ডিটেকটিভ এজেন্সি স্থাপন করেন। ১৮৪২ সালে পুলিস ওনাকে জালিয়াতির অপরাধে অ্যারেস্ট করে। ভিডক ও চার্লস ফেড্রিক এই দুজনের হাত ধরেই প্রাইভেট ডিটেকটিভ কনসেপ্টটা সাহিত্যে স্থান করে নেয়, যার ভিত্তিতে এডগার অ্যালেন পোর সি আগস্টা ডুপিন ১৮৪০ সালে প্রথম প্রাইভেট ডিটেকটিভ হিসেবে সাহিত্যে আসে। তারই ভিত্তিতে বহুজন ডিটেকটিভ সাহিত্যে স্থান করে নেয়।

কতগুলো চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে।

- মৃত্যুর সময় পুলিস না ডিটেকটিভ, কে ইনভেস্টিগেশন করতে যায়?
- খুনের কিনারার জন্য বর্তমান যুগে ক'জন ডিটেকটিভের শরণাপন্ন হয়?
- ডিটেকটিভদের কী পুলিস রিপোর্ট, ফরেনসিক রিপোর্ট জানার অধিকার আছে?
- তারা কী টেলিফোন কিংবা ইন্টারনেট ট্যাপ করতে পারে?
- তারা কী ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, ইন্সিওরেন্স ও অন্যান্য ব্যক্তিগত তথ্য কারও সম্মতি ছাড়া জানতে পারে?

উত্তর একটাই - না। তাহলে প্রাইভেট ডিটেকটিভ একটি আজগুবি কনসেপ্ট, যা একবিংশ শতাব্দীতে ভিত্তিহীন। আজকের বাস্তবতা মাথায় রেখেই এধরনের উপন্যাস লেখা বাঞ্ছনীয়। এমনও তো হতে পারে, খুনের ইনভেস্টিগেশন প্রথাগত ভাবেই হচ্ছে, অথচ তার সলিউশন একাধিক ব্যক্তির যুগ্ম প্রয়াসে এগিয়ে গিয়ে তাদের মধ্যেই একজন শেষ করে। উপন্যাসে তাই শুধু খুনিকেই নয়, ফাইন্যালি জ্যাকপট জেতা মানুষটিরও সন্ধান পাঠক করতে পারে। যে হয়ত তদন্তকারীদের মধ্যে নয়।

ছুরি, পিস্তল এসবের বদলে অন্যভাবেও তো খুন করা যায়। সেই সব অজানা খুনের অস্ত্র কিছুটা আমার ডাক্তারি জ্ঞান, কিছুটা অন্যান্য ডাক্তার ও সায়েন্সের বন্ধুদের সাহায্য নিয়ে, নতুন আঙ্গিকে প্রকাশিত হয় সেপ্টেম্বর ২০১০-এ। কল্পনার ডিটেকটিভকে পেছনে ফেলে, একবিংশ শতাব্দীর বাস্তবতা মাথায় রেখে, প্রচলিত দেশি ও বিদেশি প্রথার গণ্ডি ভেঙে, নতুন দৃষ্টিকোণে বৈজ্ঞানিক খুনের তথ্য দিয়ে নতুন ছাঁচে একটা রহস্য উপন্যাস লেখার চেষ্টা।

ভারতের বিভিন্ন শহরে অসংখ্য মৃত্যুর জাল ফাঁদা। কে নেই সেই চক্রে? সিনেমা, মডেল, ধর্মগুরু ভণ্ড বাবা, সো-বিজ দুনিয়ার ডন, প্রগতিশীল ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, মেধাবী ছাত্র, প্লাস্টিক সার্জেন, সাবেকি পুলিস - সব্বাই। ডবল হেলিক্সের মতো অসংখ্য খুনের মধ্যে রহস্য পেঁচানো হলেও পাঠক উদগ্রীব হয়ে থাকবে গল্প শেষ না হওয়া পর্যন্ত। খুন আর খুনির বিবর্তন আনতে সক্ষম হই। শেষ হয় খুনের নতুন দর্শনে।

উপন্যাসটি বারবার বেস্টসেলারের তালিকায় পৌঁছয়। পরে এর ইংরেজি ভাবানুবাদ আমার দাদা পার্থ প্রতিম রায় **"ফালক্রাম"** নাম দিয়ে করেন, যা প্রকাশিত হয় জানুয়ারি ২০১৩-তে। ভাবানুবাদ করার সময় কতগুলো চরিত্রের ও ঘটনার বিশদ উপস্থাপনা করেন, যা এই উপন্যাসে অবশ্যম্ভাবী হলেও, প্রথম

প্রকাশনায় সেভাবে বর্ণিত হয়নি। তাঁর সেই উল্লেখিত অংশগুলো, দ্বিতীয় সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত হল, যা এই উপন্যাসেকে অন্য মাত্রা দিয়েছে। আমি তাঁর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

পরিবর্ধিত **"চক্র"** উপন্যাস দ্বিতীয় সংস্করণ আপনাদের হাতে তুলে দেওয়ার আগে অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাই। উনি এই উপন্যাসে নানা সংযোজনে বিশেষ সহায়তা করেছেন।

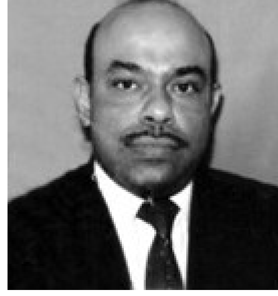
আশা করি এই লেখা আগামীকে রহস্য উপন্যাস সাহিত্যে নতুন দিশা দেখাবে।

সল্ট লেক

অনিরুদ্ধ বসু

নভেম্বর ২০১৬

অনিরুদ্ধ বসু সম্বন্ধে কিছু কথা...



অনিরুদ্ধ বসুর জন্ম ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৫৫, কলকাতায়। পেশায় প্রখ্যাত প্লাস্টিক সার্জন। লেখাটা তার নেশা। ২০০৬ সাল থেকে উপন্যাস লিখতে শুরু করেন।

প্রথম উপন্যাস **'অন্বেষণ'** আলোড়ন সৃষ্টি করে বাংলা সাহিত্য মহলে। ছুঁয়ে যায় আপামর বাঙালি মন। তথাকথিত উচ্চবিত্ত সমাজের পঙ্কিলতা ঘেঁটে আসল ঘরের অমোঘ সত্যটা গণিতের Venn Diagram Theory – র ওপর ভিত্তি করে মানুষের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়। পরে তার ইংরেজি ভাবান্তর 'Quest' নামক উপন্যাসে প্রকাশিত হয়।

তার দ্বিতীয় উপন্যাস **'নিঃশব্দে'** বর্তমান সমাজের বিরাট ক্যানভাসে আঁকা, আজকের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দোদুল্যমান খণ্ডিত সময়, পূর্ণতার আস্বাদ নিয়ে, এক সাধারণ মানুষের অসাধারণ জীবনদর্শনের উপাখ্যান। শুধু বহুদিন ধরে বেস্টসেলারই হয়নি, লন্ডন বুক ফেয়ারে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন হিসেবে বিশেষ সাক্ষর রাখে।

তৃতীয় লিরিক্যাল উপন্যাস **'দেখা'** তার পৃথিবী পরিক্রমা ও জীবন দর্শনের এক নিভৃত আরাধনা। পশ্চিম দেখছে পুবের জাগতিক দৈন্যের পিছনের এক বিশাল ঐতিহ্যকে। নাকি পুব দেখছে পশ্চিমের বৈভবের আড়ালে এক অনন্ত হাহাকারকে? কী ভাবে দেখছে? অণুবীক্ষণে না দূরবীক্ষণে? না কী, বিহঙ্গ দৃষ্টিতে! এই উপন্যাসও বেস্টসেলারের খাতায় নাম লেখায়। উপন্যাসটি ইংরেজিতে প্রকাশিত হয় 'The Vision' নাম নিয়ে।

সে বারবার তার রচনাশৈলী ও চিন্তাধারাকে সাজাতে চায় নতুন আঙ্গিকে, নতুন দর্শনের বিন্যাসে।

যার ফলস্বরূপ তার চতুর্থ চাঞ্চল্যকর রহস্য উপন্যাস **'চক্র'** প্রচলিত দেশি ও বিদেশি প্রথার বেড়া ভেঙে পরিবর্তন এনেছে মৌলিক চিন্তাধারায়। যুক্তি বিদ্যা ও আধুনিক প্রযুক্তি বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এক নতুন আঙ্গিকের রহস্য কাহিনি, যা খুন এবং খুনির বিবর্তন ঘটিয়েছে এই উপন্যাসটিতে। এটিও বেস্টসেলারের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যা পরে ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়েছে 'Fulcrum' নাম নিয়ে।

পঞ্চম উপন্যাস **'তোমাকে...'** - তে একটি গূঢ় বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে উপস্থাপনা করেছে প্রেমের ছন্দোময় পত্র-উপন্যাসে। নামহীন দুজন মানব মানবী, আধুনিক জীবনের গোলোকধাঁধায় কানামাছি খেলতে খেলতে কখন পৌঁছে যায় সময়ের অন্দরমহলে, যেখানে সময় হয়ে ওঠে উল্লম্ব, নিয়ে যায় তাদের তুরীয় লোকে। আগের মতোই বেস্টসেলারের তালিকায় এটিও অন্তর্ভুক্ত হয়। পরে প্রকাশিত হয় ইংরেজি উপন্যাস 'The Moment' নামে।

ষষ্ঠ বাংলা উপন্যাস **'ক্যানভাসে'** মানব চরিত্রের রং-এর খেলা। প্রিজমের মধ্য দিয়ে চলা সাদা আলোর রঙিন বর্ণালীর মতো প্রতিটি মানুষের চরিত্রই নানা রং-এর। কখনো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে একটি বিশেষ রং, আর কখনো বা ঝলসে ওঠে অন্য কোন রং, আসলে সবই তো সেই জীবন নামক প্রিজমের খেলা। একই জন, বিভিন্ন প্রকাশ। কেন্দ্রীয় চরিত্র নন্দিনী জীবনকে প্রীজম দিয়ে নানা রঙে ভেঙে অবশেষে পৌঁছে যায় রঙের ওপারে ... এটিও বেস্টসেলারের তালিকায় নাম লেখায়। এটিও পরে ইংরেজিতে **'Canvas'** নামে প্রকাশিত হয়ে পোস্ট মডার্ন সাহিত্য হিসেবে আলোড়ন তোলে সাহিত্য জগতে।

সপ্তম বাংলা উপন্যাস **'স্ফুলিঙ্গ'** তে সর্বক্ষেত্রে বাঙালির পিছিয়ে পড়ার উন্নাসিক কূপমণ্ডুকত্বকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে, ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন শ্মশানভূমি থেকে আলোর পাখি ফিনিক্সের উঠে আসার মতো উপন্যাসের প্রটাগনিস্টের লড়াই করে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার গল্প।

তার প্রথম স্বরচিত ইংরেজি ইন্টারন্যাশনল অ্যাড্রিনালিন চার্জড থ্রিলার **'Pursuit'** এক অনন্য চিন্তাশৈলীর উদাহরণ। অনেক রহস্যময় মৃত্যুর ফাঁকে উঠে আসে বর্তমান জগতের কঠিন জিও-ইকনমিক্স। আর নিভৃতে ফল্গুধারার মতো ব্যাকগ্রাউন্ড মিউসিকের মতো বেজে চলে বিশ্বশান্তির অমৃতবাণী। উঠে আসে মানুষের উত্তরণের অমোঘ মন্ত্র, যা পরিণতি পায় তার আগামী ইংরেজি উপন্যাসে।

দ্বিতীয় স্বরচিত ইংরেজি টেস্টস্টেরোন রেজার "Eternal Mayhem' বিশ্ব জুড়ে বৈজ্ঞানিক খুনের প্রতিলিপি। বিশ্বব্যাপী বৈজ্ঞানিক খুনের ব্যাপ্তি প্রসারিত বালি, ফিজি, হাওয়াই, পুনটা ক্যানা থেকে জামাইকা, পিউয়ারটো রিকো ও ভারতে। সুন্দরী, শিক্ষিত, সায়েন্টিস্ট, সবাই মাকড়সার জালে জড়িয়ে পড়ে, এই দ্রুতগতি ইন্টারন্যাশনল থ্রিলারে। চলে যায় জেনেটিক ক্লোনিং রিসার্চের গভীর থেকে সভ্যতার বুৎপত্তিতে। উন্মোচিত হয় বহু আজানা সত্য, আগামী মানব সভ্যতার কল্যাণের জন্য।

প্রতিটা লেখায় সে নিজেকে ভেঙে, নতুন ছাঁচে সাজাবার চেষ্টা করে। নিজেকে নতুন নতুন ভাবে প্রকাশ করার মধ্যেই তার সৃষ্টির তৃপ্তি। জীবনের শান্তি খুঁজে পায় স্ত্রী স্মৃতি বসুর মধ্যে।

লেখকের বাংলা উপন্যাস

অন্বেষণ

অনিরুদ্ধ বসু

নিঃশব্দে

অনিরুদ্ধ বসু

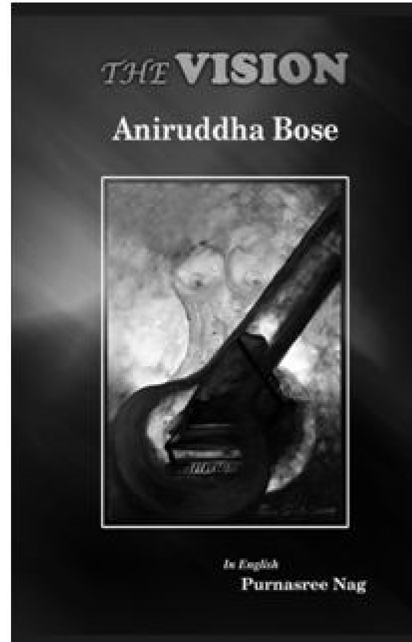

দেখা
অনিরুদ্ধ বসু

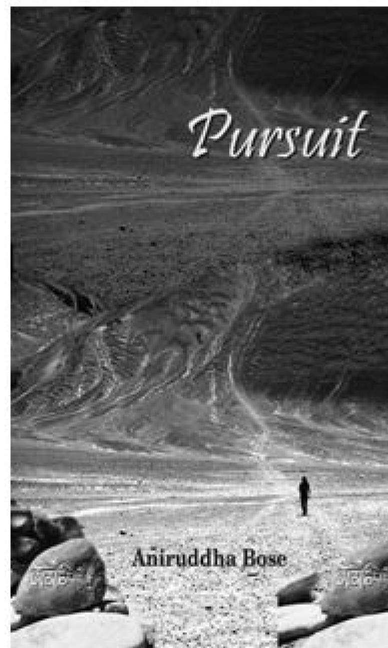

তোমাকে....
অনিরুদ্ধ বসু


ক্যানভাসে
অনিরুদ্ধ বসু

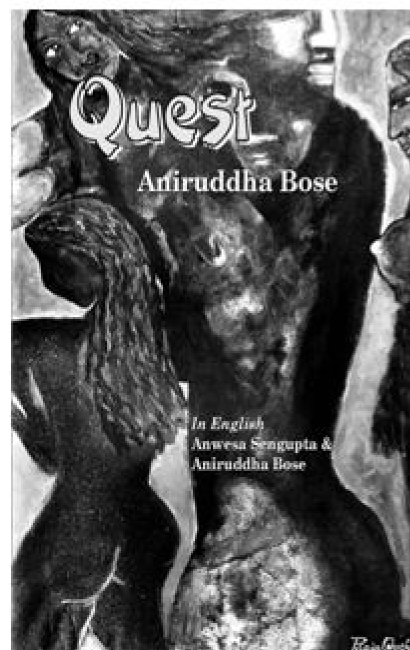

স্ফুলিঙ্গ
অনিরুদ্ধ বসু

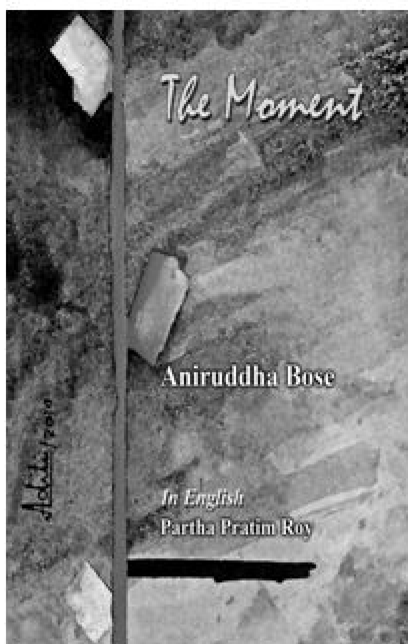
লেখকের ইংরেজি উপন্যাস



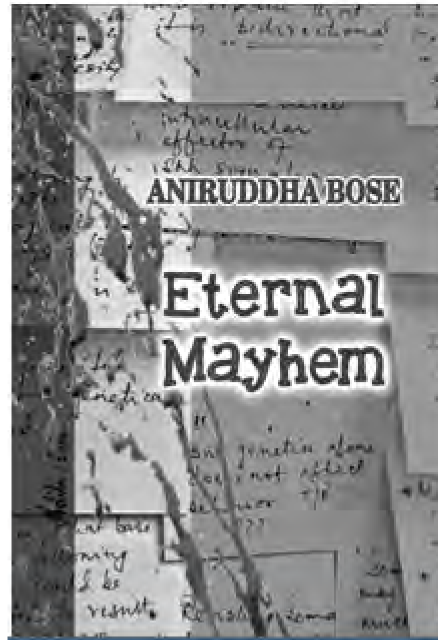



FULCRUM
Aniruddha Bose
In English Partha Pratim Roy


Quest
Aniruddha Bose
In English
Anwesa Sengupta &
Aniruddha Bose


The Moment
Aniruddha Bose
In English
Partha Pratim Roy


CANVAS
Aniruddha Bose
In English
Purnasree Nag


ANIRUDDHA BOSE
Eternal
Mayhem

প্রাক কথন

ঝিমলি আপ্রাণ জোরে জোরে শ্বাস নিয়ে বাঁচার চেষ্টা করল। দুর্গা প্রসাদের সুদৃঢ় মরণ থাবা, পাইথনের মধ্যাংশ যেন, অনায়াসে তার গলা জড়িয়ে কাবু করে ফেলেছে। দুর্গা প্রসাদকে যে খুনের নেশায় পেয়েছে। যত দৃঢ় হচ্ছে ক্রমশ তাঁর বেষ্টনী, ভয়াবহ আতঙ্কে গোঙাচ্ছে ঝিমলি। ওর মরতে এত সময় লাগছে কেন? অনেক ঝামেলা পাকিয়েছে। মৃত্যুই একমাত্র দাওয়াই। ওর কবল থেকে বাঁচবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে ঝিমলি।

"ছোড় দে মুঝে" কান্না মেশানো গোঙানি।

"কৈসে ছোড় দু তুঝে? ম্যায় নে কহা থা না" লকলকিয়ে উঠল ওর কণ্ঠস্বর।

বীভৎস দৃশ্যের সাক্ষী শুধু ট্যান্ডা ফলস ডাকবাংলোর পাশে গাছের ওপরে বসা কিছু পায়রা। স্থানীয় লোকেরা বলে ভূত বাংলা। নামেই ওটা ডাকবাংলো। ব্রিটিশ আমলে তৈরি বাংলো কোনওদিনই বাসের উপযোগী ছিল না। এখন তো ভগ্নদশা।

সন্ধ্যার অন্ধকারে টিপ টিপ বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। মুষলধারে নামার আগেই ওকে খতম করে ফেলতে হবে। নেতিয়ে পড়া ঝিমলির কাঁপা দেহটা, পাশবিক শক্তির কাছে ক্রমশ হার মানছে। এক সময় নিস্পৃহ হয়ে চোখদুটো ঠিকরে বেরিয়ে এল। ধূসর মিশে গেল অন্ধকারে। পায়ারাগুলোর ওড়া বুঝিয়ে দিল এই বীভৎস দৃশ্যের সাক্ষী হতে চায় না।

মরার আগের মুহূর্তে, ঝিমলির চোখে ভেসে উঠেছিল, তার ভূমিষ্ঠ না হওয়া জারজের স্বপ্নটুকু...

দক্ষিণ মির্জাপুরের এক চিলতে পাহাড়ের গা ঘেঁষে ট্যান্ডা ফলস। নির্জন। উইন্ডহ্যাম ফলসের মতো উইকেন্ডে টুরিস্টের ভিড়ে পুষ্ট নয়। এই ফলসের ঢোকার পথটাই দুর্গম। মির্জাপুর থেকে ন্যাশনাল হাইওয়ে ৭ ধরে রেওয়ার দক্ষিণে ১২ কি মি ড্রাইভ করলে ভোরসার গ্রাম। তার বাঁ দিকের রুক্ষ পাথর বেয়ে উঠলেই যে বেলাভূমি, তারই পাশে ফলস। গাড়িতে পথ শুধু দুর্গম-ই নয়, ভয়াবহও বটে। তাই টুরিস্টদের এদিকে আসার কোনও স্পৃহাই নেই। বরং উইন্ডহ্যামে যাওয়া অনেক সহজ। স্থানীয়রা সাইকেল কিংবা পায় হেঁটে কোনও সময় এলেও, খুব ভালোই জানে, এটা উত্তর প্রদেশের দুর্গম অঞ্চল। তবু কারও যদি ট্যান্ডা দেখার জেদ চাপে, নির্ভেজাল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সাক্ষী থাকতে পারে। প্রায় একশো বছর আগে, মাটির ড্যাম তৈরির পরে একটা ছোট্ট লেক থেকে আশেপাশের গ্রামে জলের জোগান দিত। বাড়তি জল ২০০ মিটারের মতো দূরে তীব্র গতিতে গিয়ে আছড়ে পড়ে ১০০০ ফিট নীচের খাদে। যার নাম ট্যান্ডা ফলস। বর্ষাকালের তীব্রতার বাইরে, অন্যান্য সময় প্রায় জলশূন্য। খাদের ধারে পরিত্যক্ত ট্যান্ডা ফলস ডাকবাংলো থেকে মনোরম প্রকৃতি।

প্রায় পঁচিশ বছর আগে, এই ডাকবাংলোতেই দুর্গা প্রসাদ ও ঝিমলি তাদের ভালোবাসার নীড় গড়ে তুলছিল। তাদের ভিটে লহংপুর আর রাজপুর থেকে সুদীর্ঘ পথ হেঁটে এই ফলসে আসার দরকার হত না। শর্টকাট পথে মেন রোডের ধারের গ্রাম থেকে অনায়াসেই ফলসে আসা যায়। লোকচক্ষুর আড়ালে, এখানেই ছিল ওদের লীলার বৃন্দাবন। ঝিমলির তখন কতই বা বয়স? ষোলো হবে। মাজা রঙের এই গ্রাম্য তরুণী লাবণ্যে ভরপুর। তন্বী ঝিমলির মধ্যে অফুরন্ত প্রাণ, ঠিকরানো যৌবন। লম্বা, সুপেশি দুর্গা সেই আকর্ষণ থেকে পালায় কোথায়? দুর্গা তখন গ্রামের ললনাদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। তাদের মধ্যে ঝিমলির দিকে যে ওর চোখ পড়বে, ভাবতেও পারেনি। সবাইকে বাদ দিয়ে দুর্গার প্রতি আকর্ষণ। এতো তার পরম সৌভাগ্য।

ছোটবেলায় বাবা-মার মৃত্যুর পর, অনিচ্ছাকৃত মামা দুর্গার ভরণপোষণ নিয়ে ফুঁসছিল। আরেকটা মুখের অন্ন সংস্থান! যার প্রকোপ দুর্গার প্রতি অহরহ। ফলে ক্রমশ জন্ম নিল এক বিদ্রোহী দুর্গা। সবসময় কোনও না

কোনও ঝামেলায় জড়িয়ে। মুক্তি শুধু, ডাকবাংলোর পাশে, গাছের নীচে, ঝিমলির সঙ্গে প্রেমের স্বর্গে। দেহের মিলনে। যৌবনের তৃপ্তির দীপ্তিতে। একদিন হঠাৎ স্বপ্ন আছড়ে পড়ল রূঢ় বাস্তবে।

"তোহার বাচ্চা হমারে পেট মা পল রহা হ্যাঁয়" ঝিমলির আনন্দ, মাথায় বজ্রাঘাত।

"গিরা দে" চেঁচিয়ে উঠল দুর্গা।

"কটেই নাহি। সামঝে কা?" ঝিমলির সরব প্রতিবাদ।

রাগে মাথাটা ঝিমঝিম করছে দুর্গার "সোচ লে ঝিমলি" কথার মধ্যে স্পষ্ট হুংকার।

"ইস মা সোচন কী কা বাত হ্যাঁয়?" ঝিমলি রেগে চলে গেল। যদি সময়ের সঙ্গে দুর্গার মন বদলায়। জানাজানি হলে সামাজিক বহিষ্কার থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র পথ, তাড়াতাড়ি বিয়ে। খসানো গেলেও, মন সায় দেয় না। হাজার হোক নিজের সন্তান তো। সময়ের সঙ্গে দুর্গাও ঠান্ডা হবে, এই আশা। চিনতে পারেনি দুর্গার অন্ধকার দিক। ভেতরে জমা সীমাহীন রাগ।

দুর্গা ঝিমলির অগোছালো নিথর দেহের দিকে তাকিয়ে ঘনঘন শ্বাস ফেলে। অন্ধকারে বর্ষার জলপ্রপাতে এদিকওদিক তাকাল। কেউ নেই। টানতে টানতে ঝিমলির দেহটাকে ফলসের ধারে নিয়ে গেল। নীচে গভীর খাদের দিকে তাকাল। নীচে তীব্র স্রোতে আছড়ে পড়ছে ঝর্নার। ধাক্কা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল ঝিমলির লাশ। চেয়ে রইল নিষ্পলক। যতক্ষণ না দৃষ্টির বাইরে হারিয়ে যায়। বর্ষার জলছবি নিমেষে মুছে দিল নৃশংস মৃত্যুর শেষ চিহ্নটুকু। বুঝতে পারছে স্বাভাবিক জীবনটা ওলটপালট হয়ে গেছে। অন্ধকারের বুক চিরে ন্যাশনাল হাইওয়ে ৭-এর দিকে দ্রুত বেগে ছুটছে।

করণপুর পুলিস চৌকির হেড কনস্টেবল ছোটে লাল দিনের শেষে সবে বিড়ি জ্বালিয়ে সোয়াস্তির সুখটান দিয়েছে। নির্বিঘ্নে দিনটা কেটেছে। রাতের খাওয়া শেষ করে যখন সুখের ঘুমে মগ্ন, জানেও না, দুর্গা তখন পালাচ্ছে। বর্ষা রাতের আমেজে, লহংপুর আর রাজপুর গভীর ঘুমে মগ্ন।

আচমকা ভোর রাতের সুখনিদ্রা ভাঙিয়ে দিল রাজপুরের কিছু বাসিন্দা। ঝিমলি রাতভর গ্রামে ফেরেনি। করণপুর পুলিস চৌকি বলতে কুঁড়েঘর। পাশে একটা চায়ের দোকান। এ অঞ্চলে এরকম অসংখ্য ছোটখাটো পুলিস চৌকি গ্রামগুলোর কুঁড়ের পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কদাচিৎ কোনও অভিযোগ আসে। ক্রাইমও সময় বিশেষে কয়েকটা ছাড়া বড় একটা হয় না। এর জন্য তাই ছোটে প্রস্তুত ছিল না।

প্রথমেই ভাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা "লৌট আয়েগা"

কিন্তু গ্রামবাসীদের পিড়াপিড়িতে শেষমেশ কেস লিখতে বাধ্য হল। দিন দুয়েক পরেও যখন ঝিমলি ফিরল না, ছোটে লালের চিন্তার পারদ চড়তে শুরু করল। গ্রামবাসীদের চেষ্টা সত্ত্বেও যখন সুরাহা হল না, বাধ্য হয়েই মির্জাপুর সিভিল লাইন্সের এস পি-র কাছে রিপোর্ট করল। তৃতীয় দিনে, ঝাপসা আকাশে ট্যান্ডা ফলসের ওপর শকুনের চক্রাকার বিচরণ দেখে, গণ্ডগোলের আঁচ পেল। ক্ষতবিক্ষত গলা পচা ঝিমলির দেহটা অবশেষে খুঁজে পাওয়া গেল। পেয়ারের লোকেরা জানত, ঝিমলি প্রায়শই ওদিকে ঘুরতে যায়। আচমকা খাদে পড়ে মৃত্যু অস্বাভাবিক নয়। গ্রামবাসীরা অন্ত্যেষ্টির সঙ্গে দু-ফোঁটা চোখের জলও ফেলল। হারিয়ে গেল ঝিমলি। মুছে গেল করণপুর পুলিস চৌকি আর এস পি সাহেবের কাছে ছোটে লালের রিপোর্ট।

কয়েকদিন মির্জাপুর শহরের আলিতে গলিতে দুর্গা প্রসাদকে দেখা গেলেও, হঠাত কর্পূরের মতো উবে গেল। কেউ জানতে পারল না, কোথায়? মামা আর পাড়াপড়শিদেরও গরজ নেই। দুর্গার মতো বদরাগী, ঝগড়ুটে, থাকা আর না-থাকা সমান। নতুন নয়। আগেও বহুবার এরকম হারিয়ে গিয়ে, পয়সা ফুরলে, আবার ফিরে এসেছে। ভালোই তো। আপদ বিদায় হয়েছে।

দুর্গাকে ভুলতে লহংপুরের বেশিদিন লাগল না।

এক

সুইমিং পুল থেকে সুন্দরীর বিবস্ত্র দেহ তুলতে দেখে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে অসিত। সুন্দরী অনেক দেখেছে। কিন্তু বিবস্ত্র দেখার সুযোগ বড় একটা হয়নি। এর আগে তো কোনও যুবতীকে এভাবে নগ্ন অবস্থায় দেখেনি। এই পনেরো বছরের জীবনে কত বাবু-মেমসাহেবেদের জন্য চা এনে দিয়েছে, ফাই-ফরমাশও খেটে দিয়েছে। তার জন্য ভালো বকশিশও পেয়েছে।

ছেলেবেলায় ড্যাবড্যাব করে টেপ স্কার্ট পরা পুটিকে কলতলায় বালতি দিয়ে স্নান করা দেখতে গিয়ে, পুটির মায়ের মুখ-ঝামটা খেয়েছিল, সে কথা এখনও ভোলেনি। তারপর আর সাহস পায়নি। তাই ওই দূর থেকে মেমসাহেবদের জন্য চা, বরফ, ভডকা, সিগারেট এনে দেওয়ার ফাঁকে যেটুকু। একটু নেশাগ্রস্ত থাকলে, শিথিল হয়ে যাওয়া নাইটির ফাঁক দিয়ে, এক ঝলক...

ব্যস। তারপর বকসিশ নিয়ে খালাস।

সকালের সোনালি রোদের ঝলকানি উপেক্ষা করে, সাদা কাপড়ে ঢাকা নিথর দেহটা কোন এক বেসুরো রাগ বাজাচ্ছে। ছুটে এসেছে পুলিস। ছুটে এসেছে রিসর্টের বাসিন্দা, কর্মী, কিছু অবস্থাপন্ন কপোত-কপোতী।

হাজার হোক, নামকরা সুন্দরী মডেল বলে কথা। মৃত্যুটা যতই দুঃখদায়ক হোক না কেন, তার খবরটা, জীবিত মানুষের থেকেও অনেক বেশি চনমনে। আর ৫' ৮" তন্বী বস্ত্রহীন হোর্ডিংয়ে দেখা সুন্দরীকে যদি সুইমিং পুল থেকে বিবস্ত্র অবস্থায় বার করে আনা হয়, তার চেয়ে বেশি রোমহর্ষক আর কী থাকতে পারে?

স্নেহাশিস চ্যাটার্জি দেহটাকে সাদা কাপড়ে ঢাকার ইঙ্গিত দিয়ে সহকারী শুভাশিসের দিকে তাকিয়ে বলল "ইট লুকস লাইক হোমিসাইড"

মাথা নাড়ল শুভাশিস "স্যার এ তো মুম্বাইয়ের নামকরা মডেল মেহুলি"

"মুম্বাইয়ের মডেল আমাদের মেদিনীপুরের রিসর্টে কী করতে এসেছিল?"

কাপড় দিয়ে দেহটাকে ঢেকে শুভাশিস বলল "দৃষ্টিলোকে ওর অনেক ছবি বেরয়। শাড়ির অ্যাডগুলো দেখেছেন না, ওগুলোতে তো ওরই মুখ"

মুখটা কেমন যেন চেনা চেনা লাগছে স্নেহাশিসের। নামকরা মডেল। এখানে-ওখানে দেখে থাকতেই পারে। কাজের মাঝে এসব স্বপ্নসুন্দরীদের পেছনে নষ্ট করার সময় খুব একটা মেলে না। ক্লান্ত দেহে যখন বাড়ি ফেরে, তখন বাচ্চাকে পড়াতে গিয়ে খাওয়ার সময় হয়ে যায়। তারপর রাতে বিছানায় গিন্নির আক্ষেপ।

"তোমার মতো হনেস্ট অফিসার, এই ধ্যাড়ধেড়ে গোবিন্দপুরেই পড়ে থাকবে। তোমার আর কলকাতায় পোস্টিং হবে না। ঋজুরও আর ভালো স্কুলে পড়া হবে না। দেখ না, এখন কথায় কেমন উড়িয়া টান এসে যাচ্ছে"

কোথায় বউ জড়িয়ে ধরে একটু আদর-আহ্লাদ করবে, তা না, নিত্যনৈমিত্তিক প্যানপ্যানানি। কেন ঘুষ খায় না? কেন আমলাদের তেল দেয় না? একটা বৈচিত্রহীন পুরনো প্যানাসোনিক টিভির দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখন যে চোখদুটো বুজে যায়, বুঝতে পারে না।

মেয়েটি বেঁচে থাকলে, দু-বার ফিরে তাকাবার স্পৃহা একটু-বা থাকত, কিন্তু এখন মৃত মেয়েটিকে নিয়ে আরেক সমস্যা। তদন্ত কর, কেস রুজু কর, পোস্ট-মর্টেম কর। আর শুভাশিসের কথা যদি ঠিক হয়, ফোনে ফোনে ছয়লাপ হয়ে যাবে। মাইনে তো একটুও বাড়বে না, উলটে একগাদা ঝক্কি।

রথী-মহারথীদের ফোন আসবে। কেউ জানতে চাইবে, কেউ চাইবে ধামাচাপা দিতে। আর মিডিয়ারা তো বেলা গড়াতেই ছেঁকে ধরবে। এখন এতগুলো সারাদিনের চ্যানেল। একে অপরের সঙ্গে প্রতিনিয়ত টেক্কা

দিচ্ছে। কোনও খবর নেই, তবুও সারাদিন ধরে খবর তৈরি করে যেতে হবে। অগত্যা... বন্ধের দিনে কোনও সুন্দরীকে দিয়ে দেশের ইকনমিক্স সম্বন্ধে আলোচনার আসর বসিয়ে দেওয়া... পেটে বিদ্যে যাই থাক না কেন? তাতে কী? খায় তো। কে একজন কিংবদন্তি বুড়োর ইকনমিক কচকচানি শুনতে চায়? তার থেকে একটা সুন্দরীকে টিভির সামনে বসিয়ে দিলে, টি আর পি তো বাড়বে। অ্যাড আসবে। ব্যবসা রমরম করে চলবে।

খবর না থাকতেও যখন খবর তৈরি করে ফেলা যায়, সেখানে মুম্বাইয়ের নামকরা সুন্দরী মডেলের মৃতদেহ নিয়ে যে ছোটপর্দা ব্রেক করে ফেলা যায়, সেটা মিডিয়ার থেকে আর কে ভালো জানে? তাও আবার বিবস্ত্র অবস্থায়, সুইমিং পুল থেকে দেহ উদ্ধার। সেও আবার মুম্বাই থেকে বহুদূরে। মেদিনীপুরের রিসর্টে। রমরম করে চলবে। যে যত বেশি খবর বার করতে পারবে, তার তত। ফ্যাসাদ শুধু স্নেহাশিস চ্যাটার্জির। হিসেব করে, মেপে কথা বলতে হবে। পান থেকে চুন খসলেই কেলেঙ্কারি। একটা ছোটখাটো বিপ্লব হয়ে যেতে পারে...

আজকাল তো আন্দোলনের হাত ধরে বিপ্লব আসে না। সংজ্ঞাটাই পালটে গেছে। কে কী বলল, কী ভাবে কার কী বলা উচিত ছিল, কোনটা ঠিক, কোনটা বেঠিক, এসবই এখন মিডিয়া-বিপ্লবের মাপকাঠি। মরালিটির ঠিকেদার প্রচুর। জ্ঞান দেওয়ার লোকের অভাব নেই। সবাই কিছু বলতে চায়। কেউ শুনতে চায় না। যেন সবাই দেশ ও সমাজের ত্রাণকর্তা, ঠিকাদারি নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছে। ত্রাণের ব্যাপারে কারও আগ্রহ নেই। শুধু ফ্রি জ্ঞানের ব্যাপারে সবাই যেন একটু বেশি রকমের তৎপর।

স্নেহাশিস কারও ঠিকাদার নয়। সে কর্তব্যের দাস। তার এখন মেহুলিকে নিয়ে ভাবার সময় নেই। অনেক কাজ।

সেও তো শাহরুখ বা অমিতাভ হতে পারত। চেহারাটা তো নেহাৎ খারাপ ছিল না। স্কুলে সবাই তাকে উত্তমকুমারের সঙ্গে তুলনা করত। কলেজ জীবনেও সুপুরুষ এই বলিষ্ঠ ছ-ফিট দেহটা অনেক যুবতীর হৃদয়ে আলোড়ন তুলেছিল। প্রেম না চাইতেও দোরগোড়ায় বারবার এসে ধাক্কা মেরেছে। সাহানা তো তাকে না পেয়ে হাতের শিরা কেটে আত্মহত্যা করতেও চেয়েছিল। সে তো সব পুরনো দিনের কথা। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস না দিয়ে, আইপিএস না হলে, হয়ত দু-পয়সা রোজগারের তাগিদে মুম্বাই পাড়ি দিত। নাম, গ্ল্যামার, টাকা - ওসব তার কপালে লেখা ছিল কি না, সেটা পরের ব্যাপার। এখন মাস-মাইনেতে চোর-গুন্ডা-খুনি-বদমাশদের নিয়ে কারবার। দিনান্তে মফসসলের ছোট্ট বাংলোয় শুয়ে কলকাতায় ফেরার স্বপ্ন দেখা ছাড়া আর কিছুই করার নেই।

শুভাশিসের দিকে তাকিয়ে বলল "এসওসিকে কর্ডন করে ফেল। স্নিফার ডগ আনাও। ফিঙ্গার-প্রিন্ট এক্সপার্টকে খবর দাও। পোস্ট মর্টেমের বন্দোবস্ত কর। কোনও ক্যাচ পড়ার আগেই যাতে জেনুইন পোস্ট মর্টেম রিপোর্টটা চলে আসে। না হলে, এ কেসটাও আবার ধামাচাপা পড়ে যাবে। আমাকে একটু একা থাকতে দাও তো"

চলে গেল মেহুলি রায়ের দেহ ছাড়িয়ে, সুইমিং পুলের ও-প্রান্তে। একদৃষ্টে চেয়ে রইল পুলের নীলাভ জলরাশির দিকে। কিছুটা অন্যমনস্কভাবে শিথিল পায়ে গিয়ে দাঁড়াল জলে নামার রডটার পাশে।

রিসর্টের বিশাল পাথরবাটির অখণ্ড নীল। সত্যি মধুময়। চারদিক ঘিরে রেখেছে নানা ফুলগাছের সমারোহ। ডালিয়া, ক্রিস্যানথিমাম, জুঁই, চাপা। কী নেই সেখানে? ওপাশে কোনও ঘেরা বেড়া নেই। হারিয়ে গেছে অখণ্ডবিস্তৃত সবুজ মাঠে। আম-জাম-কাঁঠাল গাছের ওপারে। দূরে বট, অশ্বত্থ, দেবদারুর ভিড়।

শুনেছে, এই পুরো এলাকাটা এক-সময় রায়বাহাদুর কৃষ্ণকিশোর মুখোপাধ্যায়ের ছিল। দাপট যেরকম ছিল, ইংরেজ শাসকদের সঙ্গেও তেমনি গলায় গলায় বন্ধুত্ব। পার্টি, বাইজি নাচানো থেকে সাহেবদের আদর-আপ্যায়নে কোনও ত্রুটি ছিল না। তাই রায়বাহাদুর খেতাব পেতে অসুবিধাই হয়নি। দেহাবসানের সঙ্গে বাইজিও গেল, রাজকোষেও টান পড়ল। ছেলেগুলো কেউ তেমন কিছু হতে পারেনি। বাবার টাকা ভাগাভাগি

করে ভোগ করে সারা জীবন দিব্যি চলে যেত। তাতে কী আর জমিদার বাপের-ব্যাটাদের মন ভরে? নিজেদের মধ্যে সম্পত্তি নিয়ে গোলযোগ পাকিয়ে শেষমেশ প্রোমোটারের হাতে জমিদারি বিক্রি করে, ভাগের টাকা পকেটে গুনে হারিয়ে গেল।

গড়ে উঠল রিসর্ট। গড়ে উঠল উঠতি বাবুদের আমোদ আহ্লাদ করার নতুন এক মজলিশ 'দ্য হেভেন'

সত্যি স্বর্গই বটে!

এখানে কৃষ্ণকিশোর মুখোপাধ্যায়ের বাইজি নেই। বিদেশি সাহেবদের রং-বিলাসের ফুলঝুরি নেই। এখানে বাগান আছে, সে যুগের পুকুর আজকের আধুনিক সুসজ্জিত সুইমিং পুল। আর সেই যুগের মতো পুকুরে অর্ধ বিবস্ত্র জলসিক্ত শাড়ি পরা নারীদেহ শোভা না পেলেও, সুইমিং পুলের পাশের লাউঞ্জারের সারিতে রং-বেরঙের বিকিনির ঝলসানির ফাঁকে, বিভিন্ন আকারের দেহসৌষ্ঠব। এখন সম্ভোগের পীঠস্থান। বাসনার খিদে মেটাবার দ্য হেভেন। প্রাকৃতিক পরিবেশে বাধা-বন্ধনহীন রিপুতাড়না নিরসনের জন্য গ্রাম বাংলায় মোহময় সুসজ্জিত আয়োজন।

কিন্তু সুদূর মুম্বাই থেকে মেহুলি রায় এখানে কেন?

শুভাশিসের গলা পেছন থেকে শুনতে পেল "স্যার খবর দেওয়া হয়ে গেছে। বলল এখনই আসছে। স্যার, এই কাগজের টুকরোটা পেলাম, আমাদের লোকাল বাসের টিকিট। এটা কি কোনও কাজের?"

হাত বাড়িয়ে স্নেহাশিস বলল "কই? দাও দেখি"

এসপ্ল্যানেড-মেদিনীপুরের দূরপাল্লার সাধারণ বাসের টিকিট। উলটে পালটে দেখল। খুব চলতি হরফে লেখা মোবাইল নম্বর ৯৪৩২২ ৫১২৬০। বিএসএনএল-এর মানিকজোড় স্কিমের নম্বর। ডেফিনিটলি গুরুত্বপূর্ণ। এর সঙ্গে একটা ল্যান্ডলাইনের হদিসও পাওয়া যাবে। কিন্তু হাতের লেখাটা কেমন খসখসে, যেন চলন্ত বাসে কেউ নম্বরটা লিখেছে।

"কোথায় পেলে?"

"সুইমিং পুলের ওধারে। ঘাসের ওপর পড়ে ছিল"

এতক্ষণ সব কিছু ধোঁয়াশায় ভরা ছিল। তবু তো একটা ট্র্যাক পাওয়া গেল। দেখা যাক, এর মধ্যে থেকে কিছু পাওয়া যায় কি না?

"খোঁজো, আরও খোঁজো। যদি কিছু পাওয়া যায়"

শুভাশিস চলে যেতেই ঘুরতে গিয়ে নীচের দিকে চোখ পড়ল। সুইমিং পুলের রডের পাশে একটা গ্লাস আর গোলাপি নাইটি। নাইটিটার দিকে এক পলক তাকিয়ে হাঁটু গেড়ে নিচু হয়ে বসল। শূন্য গ্লাসের মধ্যে হলুদ তরল কিছুটা। শুঁকতেই বুঝতে পারল, যা ভেবেছিল, তাই। হোয়াইট ওয়াইন। গ্লাসে হাত দিল না। আগে ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট আসুক। তারপর...

প্রথম যখন চাকরিতে এসেছিল, তখন এরকম অনেক ক্লুতে দুমদাম হাত দিয়ে ফেলত। এখন বুঝেছে, তাড়াহুড়োর কিছু নেই। শুধু দেখে যাও। অবজার্ভেশন ইস দ্য ফার্স্ট এসেন্স অফ ইনভেস্টিগেশন। প্রত্যেকটা ক্লু কথা বলে। শুধু ভাবতে হবে। ভাবতে হবে, কেন এই সুন্দরী সুদূর মুম্বাই থেকে এই রিসর্টে এসেছিল? কার সঙ্গে এসেছিল?

এই সাত-আট বছরে কত কিছু পালটে গেছে। আগেকার বাবা-মায়েরা ছেলে-মেয়েদের ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার-চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট করতে চাইত। এখন মিডিয়ার ঝলকানিতে তাদের চিন্তাধারা বদলেছে। এখনকার লক্ষ্য মডেলিং, ফ্যাশন দুনিয়া, হোটেল ম্যানেজমেন্ট, এয়ার হস্টেস। সবের মধ্যেই একটা এলিমেন্ট অফ গ্ল্যামার আছে। গ্ল্যামারেই টাকা। শিক্ষায় ভিক্ষা। যুগের মন্ত্রটা এক অনির্দিষ্ট নতুন আকার নিচ্ছে। যা কিছু করে নাও, আজকের জন্য। কালকের কথা ভাবার প্রয়োজন নেই। এই মন্ত্রের দীক্ষায় মেহুলির মতো দু-একটা প্রাণ যে বলি হবে, এ আর এমন আশ্চর্য কী?

যৌবন তো বরাবরই আকর্ষণীয়। রামায়ণ-মহাভারত থেকে স্নেহাশিসের সময়ও ছিল। কিন্তু এই ক'বছরে তার মাদকতার বহিঃপ্রকাশ নানা আকারে ফুটে উঠেছে। আগের যুগে প্রেমে ব্যর্থ হলে দেবদাস হয়ে যেত। দু-একটা কীটনাশক খাওয়াও আশ্চর্য কিছু ছিল না। কিন্তু এখন ওসব ব্যর্থ প্রেমের প্যানপ্যানানি নয়। হয় খুন, নয় মারামারি, নয়তো একজনকে ছেড়ে আরেকজনকে নিয়ে ভেগে যাওয়া। এমনকী গুন্ডা লাগিয়ে খুন করতেও আজকের যুগ পিছপা নয়। মানুষের সহ্যক্ষমতা যেন কেমন কমে যাচ্ছে।

মোবাইল বেজে উঠল "চিনতে পারছ স্নেহাশিস?"

অনেক চিন্তার গোলকধাঁধায় ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি। বলল "না, ঠিক চিনতে পারছি না। কে?"

"আমি শিরিন। মুম্বাই থেকে বলছি। আমায় ভুলে গেলে?"

শিরিন! সেই কলেজের শিরিন।

শুনেছিল মুম্বাইতে কিছু একটা করে। অনেকদিন যোগাযোগ নেই। শেষবার কলেজের রিউনিয়নে দেখা। তাও বছর চারেক আগে। তখন জানতে পেরেছিল শিরিন মুম্বাইয়ের প্রখ্যাত মডেল। ফোন নম্বরটা শিরিন তার মোবাইলে ঢুকিয়ে নিয়েছিল। নম্বরটা তাহলে এখনও ভোলেনি। কিন্তু চার বছর বাদে, হঠাৎ কেন?

শিরিন একসময় স্নেহাশিসের প্রেমে পাগল ছিল। স্নেহাশিসকে বিছানায় পাওয়ার জন্য যে কত বিনিদ্র রাত তার যৌবনের উচ্ছ্বাস দিয়ে বিছানা ভিজিয়ে দিয়েছে, সে একমাত্র শিরিন-ই জানে। দেখতে নেহাৎ খারাপ ছিল না শিরিন। তন্বী, স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী। পার্ক সার্কাসের গোঁড়া মুসলিম পরিবারের। দাদুর রক্ষণশীলতার মধ্যে নিজের যৌবনকে প্রকাশ করার তেমন অবকাশ পায়নি। তাই খুঁজেছিল সুপুরুষ স্বাস্থ্যবান স্নেহাশিসের মধ্যে। বিবস্ত্র শিরিনকে সেদিন ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল স্নেহাশিস। শুধুমাত্র অভ্রদিতার কথা ভেবে। তার স্ত্রী অভ্রদিতা। তাকে হারাতে চায়নি। তাই শিরিনকে আবার পোশাক পরিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিতে একটুও দ্বিধা করেনি। সেই শিরিন এতদিন পর!

"ভুলব কেন? কী ব্যাপার শিরিন? কেমন আছ?"

"চলছে। একরকম। তুমি কেমন? অভ্রদিতা ভালো আছে?"

"ওই আর কী। চলে যাচ্ছে। তুমি?"

"আছি স্নেহাশিস..." শিরিনের কথায় একটা দীর্ঘশ্বাস। স্নেহাশিসের মনে হল, এই দীর্ঘশ্বাস অনেক কিছু বলছে। সে যাক। শিরিন অতীত। অভ্রদিতা বর্তমান। ঋজু বর্তমান। ওর শ্বাস-প্রশ্বাসের অনুভূতি বুঝতে পারলেও, এখন আর বিশেষ কিছু আসে যায় না।

"কী ব্যাপার? এতদিন পর? এত সকালে?"

"তুমি ভুলে গেছ। সেবার রিউনিয়নে বলেছিলাম, আমি মুম্বাইতে মডেলিং করছি"

স্নেহাশিস নির্বিকার, "তখনই তো বলেছিলে। কেমন আছ?"

"ওই আর কি। চলে যাচ্ছে"

"সেদিন বললাম তো। চোর, খুনি, বদমাশ নিয়ে আমার কারবার। সুন্দরী মডেলদের দেখার সময় কোথায়?"

"তবু ভালো। এতদিন পরে অন্তত সুন্দরী বললে। মনটা জুড়োল"

স্নেহাশিস বুঝতে পারছে, বহুদিনের আগের স্মৃতি ফিরে এসেছে। সেই স্মৃতির ডালি নিয়ে শিরিন আবার ফিরে গেছে তাদের কলেজ জীবনে। চাওয়া, পাওয়া, হারানো, ব্যথা সব মিশিয়ে।

"হঠাৎ কী মনে করে?"

"তোমায় একটু বিরক্ত করলাম। মেহুলি নামে আমাদের জুনিয়ার এক মডেলের অনেকদিন থেকে খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। শুনেছিলাম কলকাতায় গেছে। তুমি কী ওর কোনও খোঁজ করে দিতে পারবে?"

ঠিক এই মুহূর্তে এই ফোনটাই কী আসার দরকার ছিল? শুভাশিস বলছিল, এই মৃত মেয়েটার নাম মেহুলি। কী বলবে শিরিনকে? মেহুলি আর নেই? সে ওর ডেডবডির পাশে দাঁড়িয়ে আছে?

শিরিনের কাছ থেকে কোনও সূত্র পাওয়া যেতে পারে। শিরিনের কথা টেনে নিয়ে বলল “তুমি কদ্দিন থেকে মেহুলিকে চেন?”

"বেশ কিছুদিন। আমরা তো ইন্ডাস্ট্রিতেই অনেকদিন। যদিও মেয়েটা আমার পরে এসেছে। আমার মতোই কলকাতার মেয়ে। রিসেন্টলি খুব নাম করেছে”

“কবে থেকে ওর খোঁজ নেই?”

“থ্রি উইক্স হবে। বলেছিল কয়েকদিনের অ্যাসাইনমেন্টে কলকাতা যাচ্ছে। ওর এজেন্সিও ওর সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করতে পারছে না”

স্নেহাশিস গম্ভীর গলায় বলল “মেহুলি আর নেই। সি ইজ ডেড। আমি ওর ডেডবডির সামনেই দাঁড়িয়ে আছি”

ওপাশ থেকে আঁতকে ওঠার মতো একটা গোঙানির শব্দ শোনা গেল “হোয়াট! কী বলছ?”

“আমি এখন ইনভেস্টিগেশন করছি। পরে ফোন করব। এটাই তো তোমার মোবাইল?”

“হ্যাঁ” ওপাশ থেকে ভেসে এল শিরিনের কিংকর্তব্যবিমূঢ় অস্পষ্ট সম্মতি। ফোনটা ডিসকানেক্ট করে দিল।

একটু উজ্জীবিত বোধ করছে। তবু তো একটা সূত্র পাওয়া গেল। কিছুক্ষণ আগে যতটা ধোঁয়াশা ভাবছিল, এখন ততটা মন হচ্ছে না। শিরিনের কথায় কলেজ জীবনের ভালোবাসার স্পর্শ, ফেলে আসা ছন্দ অনুভব করেছে। সেই আবেগে যতটা জানতে পারবে, অন্য কোনও ইনভেস্টিগেটিং অফিসারের তার ধারে-কাছে পৌঁছতে অনেক সময় পার হয়ে যাবে।

হাঁটতে হাঁটতে সুইমিং পুলের ওধারে চলে এসেছে। ওপাশে কয়েকটা লাউঞ্জার। এক কোণে, ছোট্ট একটা ইট আর টালির সাজানো বার। দ্য হ্যাভেনের মালিক বোধহয় বিদেশে ঘুরেছে। রিসর্টটা বিদেশি ধাঁচে। লাউঞ্জারগুলোর মাঝখান দিয়ে আবার জলে নামার একটা রড। বার কাউন্টার এখন বন্ধ। নিশ্চয়ই লোকজন থাকলে ভালো চলে। আধা জলে দেহটাকে ডুবিয়ে কিংবা লাউঞ্জারে শুয়ে, মদ্যপান করা যায়। নীচে চোখ পড়তেই দেখল এক টুকরো কাগজ। লোকাল ট্রেনের টিকিট। তুলে পকেটে রেখে দিল। আরও কিছুক্ষণ ঘুরে বেশি কিছু পেল না।

আবার ফিরে এল মেহুলির সাদা কাপড়ে ঢাকা দেহটার পাশে। মনে হল, এটা মেহুলি না হয়ে শিরিনও তো হতে পারত? এই ছুটে চলা গ্ল্যামারের মোহে এভাবে কত প্রাণ প্রতিনিয়ত বলি হচ্ছে। তবুও এই ছুটে চলার নেশা, এর মাদকতা এখনও তরুণীদের টানে।

শুভাশিসকে বলল “স্নিফার ডগ আসতে কতক্ষণ লাগবে?”

“বলল তো স্যার এক্ষুণি পাঠাচ্ছে”

"তুমি তা হলে এদিকটা দেখ, আমি ওপরে ওর ঘরটা ঘুরে আসি”

ম্যানেজার সত্যসুন্দর মাইতিকে বলল “কত নম্বর ঘরে উঠেছিল?”

“১০২। সব থেকে দামি ঘর স্যার। একেবারে কর্নারের শেষ সুইট”

“চাবিটা?”

"ওনারটা কোথায় বলতে পারব না। তবে ডুপ্লিকেট চাবিটা আছে। আসুন স্যার, আমার সঙ্গে আসুন"

ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে ১০২ সুইট খুলে, ঘরে ঢুকে পড়ল স্নেহাশিস। সত্যি বিলাসবহুল সুইট। সত্যসুন্দরের দিকে ফিরে বলল “ভাড়া কত?”

"চার হাজার। এখানে এর বেশি আর কে দিতে পারবে স্যার?"

চার হাজার টাকা দিনে। মুম্বাইয়ের মডেলের কাছে হয়ত এটা এমন কিছু নয়। শিরিনও কী এত টাকা রোজগার করে? জীবনের ঝুকি নিয়ে প্রতিনিয়ত পাশা খেলে যায়, আলো-ঝলমলে উঠতি মাদকতার দরবারে? এর আরেক নামই বোধহয় জীবন। স্বার্থকভাবে বাঁচা। সাকসেস। জীবনে কিছু করা। দশজনের

একজন হওয়া। খালি বুঝতে পারে না, জীবন যদি না থাকল, সাকসেস দিয়েই বা কী হবে? তবু কে কার কথা শোনে? যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। মেটাবার নেশায় ছুটে চলেছে এক দিকহীন সভ্যতা।

প্রথমেই একটা মাঝারি লাউঞ্জ। ঘরের মাঝে সোফা, একটা সেন্টার, দুটো সাইড টেবল। ওদিকের কোণে টিভি, স্যাটেলাইট বক্স। অন্যদিকে মাঝারি ফ্রিজ। ফ্রিজটা খুলে দেখল। দু-একটা বিয়ারের বোতল, মিনারেল ওয়াটারের বোতল, কোক, পেপসি। সবই রাখা আছে। কর্নার টেবলের ওপর একটা অ্যাস্ট্রেতে আধপোড়া সিগারেট। অ্যাস্ট্রের পাশে একটা রিসিট। খাবার বিল। শের-ই-পাঞ্জাবের। ১০ নভেম্বর, মানে চারদিন আগের।

সত্যসুন্দরকে জিজ্ঞেস করল "উনি এখানে কবে এসেছিলেন?"

"পরশু। আজ নিয়ে টু নাইটস"

"শিওর পরশু এসছিল?"

"হ্যাঁ স্যার"

"বুকিং করে?"

"হ্যাঁ। ফোনে বুকিং করেছিলেন"

"কবে?"

"আসার দিন সকালে"

তার মানে, এখানে আসার কোনও প্ল্যান ছিল না। হুট করে ঠিক করেছে। কোলাঘাটের শের-ই-পাঞ্জাবের রিসিট দেখে মনে হচ্ছে, মেহুলির মেদিনীপুরে প্রবেশ, চারদিন আগে। বাকি দুদিন কোথায় ছিল? ধাবার রিসিটটা পকেটে পুরে নিল।

ড্রয়িং রুম ছাড়িয়ে বেডরুম। ডবল-বেডেড খাট। বিছানার চাদর অগোছালো। বালিশের পাশে একটা গোলাপি প্যান্টি। সেটা দেখে শিরিনের কথা মনে পড়ে গেল। শিরিনও সেদিন গোলাপি প্যান্টি পরেছিল। যেদিন স্নেহাশিস ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিল। সব মডেলরাই কি গোলাপি প্যান্টি পরে? যদিও মডেলদের প্যান্টি নিয়ে বিশ্লেষণের সময় এটা নয়।

সাদা অগোছালো বিছানার এককোণে দুমড়ে থাকা চাদরটা সরাতেই চমকে উঠল! একটা ছেঁড়া ছবি। পুরুষের। একটা চোখ আর নাক দেখা যাচ্ছে। চাদরটা সরিয়ে খুঁজতে লাগল। বাকি ছবির অংশটা কোথায়? সারা বিছানা তন্ন-তন্ন করে খুঁজল। কোথাও নেই। ছবিটা পকেটে রেখে দিল। বাঁ দিকে বেডসাইড টেবলের পাশে গোলাপি ব্রা। বিদেশি কোম্পানির। এখানে এরকম লেসের কাজ করা আন্ডারওয়ারড্ ব্রা পাওয়া যায় না।

অভ্রদিতা বেশ কয়েকবার চেয়েছিল। দোকান ঘুরেও পায়নি। শেষমেশ সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল 'তোমার যখন এত শখ, বাইরে থেকে আনিয়ে দেব'। আর হয়ে ওঠেনি। টেবল ল্যাম্পের আলোটা তখনও জ্বলছে। সুইচটা নিভিয়ে দিল। বিছানার ডান দিকে সুটকেশ রাখার জায়গা। তার পাশে ওয়ার্ডরোব। বিছানার পায়ের দিকে ড্রেসিং-টেবল। তার ওপর পড়ে আছে একটা বড় সাইজের লেডিস হ্যান্ড-ব্যাগ। চেনটা খোলা। তার থেকে উঁকি মারছে একটা ইন্ডিয়া কিংসের প্যাকেট।

সত্যসুন্দরকে বলল "উনি সিগারেট খেতেন?"

"আমি বলতে পারব না স্যার। অসিত পারবে"

"কে অসিত?"

"যে ছেলেটি এখানে কাজ করে স্যার। ওই ওনার দেখাশোনা করত"

বাথরুমে ঢুকে পড়ল স্নেহাশিস। হোটেলের বেডরুমটার তুলনায় বাথরুমটা বেশ বড়-ই। এক কোণে কর্নার বাথটব। চারিদিকে ছোট ছোট স্টিলের নজেল দেখে বুঝতে অসুবিধা হয় না বাথটবের সঙ্গে জ্যাকুজিও। টবের পাশে টাওয়েল রেলে ভেজা তোয়ালে। পাশের হুকে কালো জিনস্। পাশে গোলাপি টপস।

মেয়েটি জামাকাপড় খুলে বাথটবে স্নান করেছিল। জামাকাপড় ছাড়া, শুধু প্যান্টি আর ব্রা পরেই শুতে চলে গেছে। মাথায় ঢুকছে না, খাটে শুয়ে প্যান্টি আর ব্রাটা খুলে ফেলল কেন? অনেক সময় বিবস্ত্র হয়ে শুতে ভালোবাসে। মহিলাদের কখন যে কী করার ইচ্ছে হয়। কোনও এক সময় শুধু নাইটি জড়িয়েই সুইমিং পুলে গেছিল। কিন্তু কেন?

সত্যসুন্দরকে জিজ্ঞেস করল "আপনাদের রিসর্টে বার আছে?"

"আছে বৈকি স্যার। না হলে লোকে এখানে আসবে কেন? লাইসেন্সও আছে স্যার। দেখবেন?"

বাধা দিল "নাঃ। দরকার নেই"

লেডিস ব্যাগটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। কতদিন ধরে অভ্রদিতা একটা ভালো লেডিস হ্যান্ডব্যাগ কিনে দিতে বলছে। কথা দিয়েছিল, কলকাতায় গেলে নিউ-মার্কেট থেকে কিনে আনবে। এর মধ্যে কলকাতায় অনেকবার গেছে। কিন্তু নিউ-মার্কেটে গিয়ে কেনার সময় করে উঠতে পারেনি। ব্যাগটার ভেতরে মহিলাদের সাজ সরঞ্জাম। পাউডার, মেক-আপ কিট, রুমাল, মোবাইল ফোন। চেন খুলতেই একটা প্যাকেটে হাত ঠেকল। কন্ডোম। সে যুগের মেয়েদের সঙ্গে এযুগের মেয়েদের এখানেই তফাত। এখন এরা শুধু প্রসাধনই রাখে না, কন্ডোমও। অন্য দিকের চেন খুলে হাতে এল একটা চিরকুট। এটিএম-এর ক্যাশ রিসিট। থিয়েটার রোডের অ্যাক্সিস এটিএম থেকে ১০,০০০ টাকা তোলা। ৯ নভেম্বর। মেদিনীপুরে ঢোকার আগের দিন।

হায় রে পোড়া আইপিএস। এরকম হুট করে ১০,০০০ টাকা তোলার ক্ষমতা কজন সৎ অফিসারের আছে? আছে এই দশজনের একজন হওয়া সেলিব্রিটিদের। তাই তো ছেলে মেয়েরা আজকাল আর কেউ ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হতে চায় না। উকিল, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টটেন্টও নয়। অ্যাডমিন্সস্ট্রেটিভ ক্যাডারে পরীক্ষা দিতে চায় না। লেখাপড়া করে কী হবে? সেই মাস-মাইনের চাকরি। তার থেকে মডেল হও, হিরোইন হও, ফ্যাশন ডিজাইনিং কর। টাকা, গ্ল্যামার, নাম।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে খাটের পাশ দিয়ে এসে দাঁড়াল ব্যালকনিতে। দুটো সোফা পাতা। বাইরের দৃশ্য সত্যি সুন্দর। দূরে দিগন্তবিস্তৃত সবুজ মাঠ। চারদিকে বট, দেবদারু, অশথের সারি। পাতার ফাঁকে সকালের সূর্য লুকোচুরি খেলে যাচ্ছে। দক্ষিণের এই বারন্দা দিয়ে সবুজের সমারোহ দেখার মতো। ওপাশের আমবাগান পার হয়ে যতদূর চোখ চলে যায় - শুধু সবুজ আর সবুজ। সারাদিন একদৃষ্টে চেয়ে থাকলে অনায়াসে সময় কেটে যায়। মনটা তাতেই জুড়িয়ে যাবার কথা। বরং ডান দিকে রিসর্টের দৃশ্যটা অনেক বেশি কৃত্রিম। চার হাজার টাকা এই ঘরের জন্য দেবে না তো কি বিলাসবহুল পাঁচতারা জঙ্গলের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখবে?

স্নেহাশিস বুঝতে পারছে, কেন মেহুলি কলকাতা ছেড়ে মেদিনীপুরের দ্য হেভেনে চলে এসেছিল। প্রকৃতিকে নিবিড় করে পাওয়ার এই অখণ্ড সবুজের স্বর্গ আর কোথায় পাবে?

সত্যসুন্দরকে বলল "আমরা এই ঘরটা সিল করে দিচ্ছি। আপনার রিসেপশনের রস্টারটা দেখব"

আমতা করে সত্যসুন্দর বলল "নিশ্চয়ই স্যার। একটা অনুরোধ করব?"

"কী?"

"স্যার একটু পরেই তো মিডিয়া ছেঁকে ফেলবে। আমাদের রিসর্টের নামটা একটু উহ্য রাখবেন। না হলে বিজনেসের বড্ড ক্ষতি হবে"

মাথা নাড়ল স্নেহাশিস "আমি উহ্য রাখলেও কিছু হবে না। মিডিয়া ঠিক খবর বার করে দেবে। তবুও... চেষ্টা করব। পরে আমি এই ঘরটা আবার ইনস্পেক্ট করতে আসব। আগে পোস্ট মর্টেমের বন্দোবস্ত করি। বাড়ির লোককে খবর দিতে হবে"

সত্যসুন্দর ঘরটা লক করতেই স্নেহাশিস হাত বাড়িয়ে বলল "চাবিটা আমায় দিন"

স্নেহাশিসের কড়া দৃষ্টি দেখ অমায়িক ভাবে বলল "আসুন স্যার। আমাদের রিসেপশন লাউঞ্জে"

মেহুলি রায় চেক ইন করেছে নিজের নামেই। সঙ্গে মুম্বাইয়ের ম্যাগনাম টাওয়ার্স কমপ্লেক্সের ঠিকানা। আনম্যারেড, সিঙ্গল। আরও পাঁচজনের নাম রস্টারে আছে। ওই নামগুলোয় আঙুল বুলিয়ে জিজ্ঞেস করল "এরা কী এখনও আছে?"

"হ্যাঁ স্যার"

"ওদের সঙ্গে কথা বলব"

"নিশ্চয়ই। তবে স্যার, বেশি চাপাচাপি যদি না করেন... হাজার হোক ওরাও তো আমাদের কাস্টমার। আমাদের ব্যবসার কথাটা একটু মাথায় রাখবেন"

সব কিছুই হিসেবমতো। পরিচয় লুকনো বা বেনামি কোনও ব্যাপার নেই। এখানে হয়ত এই মেয়েটি সত্যি-সত্যিই প্রকৃতিকে উপভোগ করতে এসেছিল। নির্মল আনন্দ। কিন্তু সেই নির্মল আনন্দের মধ্যে নগ্নতা, সুইমিং পুল, মৃত্যু এল কী করে? সত্যি কি খুন হয়েছে? বেশি মাল খেয়ে নেশার ঘোরে জলে ডুবে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। বিশেষ করে যখন সে নগ্ন অবস্থাতেই শুধু নাইটি পরে সুইমিং পুলে গেছিল। মেহুলি কী সাঁতার জানত?

স্নেহাশিসের মাথায় নানা চিন্তা উঁকিঝুকি মারছে। সে সব নিয়ে পরে ভাবা যাবে। আগে তো পোস্ট মর্টেম। না হলে পুরো কেসটাই ঘুরে যেতে পারে।

রিসেপশনের থেকে বেরিয়ে শুভাশিসের কর্ডন করা দেহটার দিকে গিয়ে বলল "অনেকক্ষণ তো হল। স্নিফার ডগ আসতে আর কতক্ষণ?"

"এই তো এল বলে"

দুই

"দেশলাই হবে?"

সোহম ফিরে তাকাল। একজন স্বাস্থ্যবান যুবকের ঠোঁটে সিগারেট। অপেক্ষায়। রোজকার মতো মিলনের বাড়ি থেকে পিএইচডি-র কাজ করে মানিকতলা খালের ধার ঘেঁষে ফিরছিল। রাত বারোটা বেজে গেছে। সোহমের ভ্রুক্ষেপ নেই। মাঝরাতে একা হাঁটার মধ্যে অন্য মজা। গাড়ির আওয়াজ নেই। লোকের চিৎকার নেই। ভিড় নেই। রাতের অন্ধকারে নির্ভেজাল হাওয়ায় চিন্তার কোষগুলো সজাগ। খালের কালো জলের ওপর স্বল্প আলোর সোডিয়াম ভেপারগুলো চিকচিক করছে।

লোকটি পাশে হাঁটছে, কথা বলার চেষ্টা করছে। ধুস শালা। নিকুচি করেছে। সোহম পিএইচডি থিসিস নিয়ে ভাবছে। কথা বলার একটুও ইচ্ছে নেই।

"সিগারেট খাই না"

সোহম আড়চোখে দেখল, অন্ধকারের বুক চিরে স্বল্প আলোয় ঝলসে উঠেছে স্টিলের ছোরা। হিস শব্দ করে গলায় ঠেকল। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। তীব্র যন্ত্রণায় কয়েক ন্যানোসেকেন্ড। সমস্ত শরীরটাকে ভেদ করে পরাস্ত করে ফেলেছে। তারপর সব অন্ধকার। লুটিয়ে পড়ল রাস্তায়। লোকটি তার রক্তাক্ত দেহের কাটা গলা থেকে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসা রক্তের দিকে তাকিয়ে রইল। পাক্কা প্রফেশনাল কাজ। বিনা কষ্টে মৃত্যু। ছেলেটিকে চেনেও না। পকেট থেকে ছেলেটির মোবাইল বার করে খালের জলে ছুড়ে ফেলে দিল। সঙ্গে রক্তমাখা ছুরিটাও। ভালোভাবেই জানে পুলিস এগুলো দিয়েই তদন্ত শুরু করে। পারফেক্ট সুপারি কিলারের কাজ।

মানিকতলার খালের পাশে পড়ে আছে একটা লাশ। বেওয়ারিশ নিশ্চয়ই নয়। সাধারণ সাদা সার্ট, সুতির খয়রি প্যান্ট পরা। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চেহারা দেখে মনে হয় মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে।

পরিতোষ সেন, এএসআই মানিকতলা বডিটার দিকে আরেকবার দেখল। স্বভাববশত মৃতর পকেটে হাত দিল। যদি কোনও হদিস মেলে। মানিব্যাগের মধ্যে একটা আইডেন্টিটি কার্ড। সায়েন্স কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের পিএইচডি স্টুডেন্ট। বেওয়ারিশ নয়। রীতিমতো শিক্ষিত তরুণ। কিন্তু খুন করল কে?

কলকাতায় প্রতিনিয়ত যে এতগুলো খুন হচ্ছে, তার বেশিরভাগই পলিটিক্যাল। কিছু প্রোমোটারি সংক্রান্ত। কিছু আবার প্রেমঘটিত। পরিতোষ সেন মাঝের কারণটা মন থেকে সরিয়ে দিল। নির্ঘাৎ কোনও পলিটিক্যাল বা প্রেমঘটিত হোমিসাইড। এভাবে শিক্ষিত ছেলেরা যদি খুন হতে থাকে, দেশের ভবিষ্যৎ কোথায় যাবে? তারও তো, এর মতোই ছেলে আছে। ছেলের মুখটা ভেসে উঠতেই মৃতর প্রতি অনুকম্পা হল। তার ছেলের বয়সি হবে। মধ্যবিত্ত ঘরের মেধাবী ছেলে। আইডেন্টিটি কার্ডে নাম সোহম সান্যাল।

তার ছেলে সুরজিতের বয়স সোহমের মতোই। একবার এক হতচ্ছাড়া মেয়ের পাল্লায় পড়েছিল। প্রাণের টুকরো সুরজিৎকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিল পাড়ার রকবাজ ডানপিটে মেয়ে অহনা। সুরজিৎ পড়াশোনায় ভালো। সে জন্যেই ওর প্রতি ছিল অহনার অমোঘ আকর্ষণ। অহনার হাত থেকে ছেলেকে বাঁচাতে, শেষমেশ ধার দেনা করে, ছেলেকে ব্যাঙ্গালুরুতে ভর্তি করে, তবেই মুক্তি। শুধু ছেলে কেন, এই মেয়ে, ছেলের বাপকেও ঘোল খাইয়ে ছেড়ে দিতে পারত। যে মেয়ে পাড়ার রকে বসে বিড়ি খায়, সে কি না হবে তার পুত্রবধূ? এত পাপ করেনি। নয় নগণ্য পুলিসের চাকরি করে। তা বলে এখনও মান ইজ্জত খুইয়ে ফেলেনি।

ছেলেটা নয় ব্যাঙ্গালুরু গিয়ে বিড়ি-ফোঁকা অহনার হাত থেকে বেঁচেছে। কিন্তু এই তরতাজা প্রাণ কার হাতে বলি হল?

গলার বাঁ দিকে কাটা দাগ। কাটার পেছনের দিকের অংশ একটু বেশি গভীর। মনে হয়, পেছন থেকে কেউ অ্যাটাক করেছে। ছেলেটির মুখের দিকে চেয়ে বড্ড মায়া হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই এনআরএস মর্গে পাঠাতে হবে পোস্ট-মর্টেমের জন্য। তার আগে বাড়ির লোককে একটা খবর দিতে হবে। সোহম সান্যালের আই ডি কার্ডে কোনও ফোন নম্বর নেই। ঠিকানা আছে। পাইকপাড়ার ইন্দ্রবিশ্বাস রোডের। কাগজে কনস্টেবলকে ঠিকানাটা লিখে, প্রসেসে দিতে বলল।

আশপাশে ঘুরে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু পাওয়া গেল না। মানিব্যাগে ন্যাশেনাল লাইব্রেরির কার্ড, ৩০০ টাকা আর চিরকুটে লেখা একটা ফোন নম্বর। নম্বরটা ডায়রি বার করে নোট করল। কার? কে জানে? পকেট ঘাঁটল, যদি মোবাইলটা পাওয়া যায়? নেই। আজকালকার ছেলের পকেটে মোবাইল ফোন নেই, ভাবতে পারে না পরিতোষ। মোবাইলের সূত্র ধরে কেস শুরু করার একটা দিশা মিলত।

আর একটু এগিয়ে গেল, ঝুপড়ির গা ঘেঁসে খালের পার ধরে। যদি কোথাও মোবাইল ফোনের কোনও হদিস পাওয়া যায়। নাঃ... বৃথা। এক যদি খালের মধ্যে ফেলে দিয়ে থাকে। সে তো আর সোহম ফেলবে না। নিশ্চয়ই আততায়ী ইচ্ছাকৃত ফেলেছে প্রমাণ লোপের চেষ্টায়। পরিতোষ ভাবল, কে ওই ময়লা খালে গিয়ে খুঁজবে? তার থেকে বডিটাকে মর্গে পাঠানো জরুরি।

হাবিলদার সুকল্যাণ ভট্টাচার্যকে বলল "বডিটা মর্গে পাঠাবার বন্দোবস্ত কর"

সুকল্যাণ জিজ্ঞেস করল "কী মনে হচ্ছে স্যার? পলিটিক্যাল?"

হঠাৎ অহনার মুখটা ভেসে উঠতেই সুকল্যাণকে বলল "মেয়ে সংক্রান্তও হতে পারে"

সোহম সান্যালের গতিবিধি ছানবিন করতে হবে। তার সূত্র সায়েন্স কলেজ আর পাইকপাড়া। তারপর কেস রুজু কর। সেই কেস চলতেই থাকবে। যেমন আরও হাজারটা কেস চলতে থাকে। বছরের পর বছর যার কোনও কিনারা হয় না। সোহমের পরিবার, বিচারের আশায় আদালত চত্বর ঘুরে ঘুরে, একদিন হতাশ হয়ে, আশা ছেড়ে, বীতশ্রদ্ধ হয়ে আবার ফিরে যাবে, তাদের পরিবর্তিত জীবনে। সোহম স্মৃতি হয়ে থেকে যাবে। যার ছবিতে, প্রতি বছর জন্ম বা মৃত্যুদিনে হতভাগ্য বাবা-মা চোখের জল মুছে মালা দেবে। সোহম কিন্তু ফিরে আসবে না।

পাইকপাড়ার ইন্দ্র বিশ্বাস রোডের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে দরজার বাইরের লেটার বক্সটা দেখল পরিতোষ সেন। শ্রী রজত স্যান্যাল ডব্লিউবিসিএস (রিটায়ার্ড)। নিশ্চয়ই সোহমের বাবা।

কড়া নাড়তেই দরজা খুললেন এক বয়স্ক ভদ্রলোক। পরণে ধুতি। খালি গা। মাথা ভর্তি টাক। পরিতোষ সেনকে দেখে চমকে উঠল। জিজ্ঞাসু চাহনি।

পরিতোষ বলল "আপনি সোহম সান্যালের..."

"বাবা। কী ব্যাপার?"

"ভেতরে আসতে পারি?"

একটু লজ্জিত হয়ে বলল "হ্যাঁ... হ্যাঁ... আসুন"

মধ্যবিত্ত পরিবেশ। সরকারি চাকরিজীবীর রিটায়ারমেন্টের পর অনাড়ম্বর গন্তব্য। কোনও এসি নেই। পাখাটা চালিয়ে বেতের সোফাটার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন "বসুন"

সোফায় বসে পরিতোষ বলল "সোহমের কোনও খোঁজ রাখেন?"

"কাল রাতে তো এখানেই ছিল। খেয়ে বলল রাতে ফিরবে না। বন্ধু মিলনের বাড়িতে থেকে রাতে থিসিসের কাজ অনেকটা এগিয়ে আনবে। প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তো। তাই খাটাখাটনি বেড়েছে। আমিও

রিটায়ার করেছি। বলল, তাড়াতাড়ি শেষ করে আমার বোঝা একটু হাল্কা করতে চায়” উদগ্রীব হয়ে বলল “কী হয়েছে?”

পরিতোষ সেন ওনার কথা যেন শোনেনি। ঘরের অন্য দিকে তাকিয়ে বলল “বাড়িতে আর কে কে আছে?”

“ওর মা। আর বোন প্রিয়ানা। কিন্তু প্রিয়া তো এখন বাড়ি নেই। ও তো কলেজে গেছে”

পরিতোষ সেন অস্বস্তিতে বলল “ওর মা আছেন?”

মাথা নাড়ল বৃদ্ধ। উঠে রান্নাঘরে উঁকি মেরে বলল “এখানে একবার এস তো। পুলিস এসেছে। সোহমের ব্যাপারে কিছু বলতে। তোমাকে ডাকছে”

সবুজ পাড়ের সাদা শাড়িতে হাত মুছতে মুছতে বেরিয়ে এলেন বৃদ্ধা। এক পলক তাকিয়ে কেঁপে উঠল পরিতোষ সেনের বুক। আহা, তার নিজের স্ত্রীকে যদি একথা বলতে হত।

“কী হয়েছে সোহমের?”

পরিতোষ সেন এবার আরও অস্বস্তিতে উশখুশ করতে লাগল। আর তো হেঁয়ালি করা যায় না। কথাটা এবার পাড়তে হবে। উলটো দিকের সোফার দিকে ইঙ্গিত করল “আপনারা বসুন”

ভয় মেশানো আশঙ্কা দুজনের। শান্ত স্বরে বলল “আপনাদের জন্য একটা খারাপ খবর আছে”

মা উদ্বিগ্ন “কেন? কী হয়েছে সোহমের?”

পরিতোষ সেন মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে বলল “সোহম আর নেই”

“মানে?” চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন বৃদ্ধ।

“আজ সকালে মানিকতলা খালের পাশে ওর বডি পাওয়া গেছে। ইট ইস প্রব্যাবলি হোমিসাইড”

“খুন হয়ছে?”

বৃদ্ধের কথা বেশিদূর গড়াবার আগেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন সোহমের মা। পুত্রহারা মায়ের বুকফাটা কান্না। হাহাকার। সব হারিয়ে যাওয়ার আর্তনাদ। সোহম আর নেই। আর ফিরে আসবে না। কাল রাতে খাওয়ার পর তো শেষ দেখেছিল সোহমকে। আর দেখা হবে না? নির্বাক দুটো প্রাণ একে অপরকে নিঃশব্দে সান্ত্বনা জানাচ্ছে। জীবনের বেঁচে থাকার শেষ আলোটা দমকা হাওয়ার ঝাপটে, নিস্তব্ধ সীমাহীন অন্ধকারের কোলে ঢলে পড়েছে। সে অন্ধকার চিরস্থায়ী। শেষ বয়েসের একটুকরো আলোর মধ্যে চিরায়িত অনন্ত অশ্রুশিক্ত হতাশার বালুচর।

এরকম পরিস্থিতির সামনে অন্তত তিরিশটা বসন্ত পার হয়ে গেছে পরিতোষ সেনের। এ মুহূর্তে কোনও কথা চলে না। নিঃশব্দে বসে থাকা ছাড়া।

একটু আত্মস্থ হতে রজত সান্যালকে বলল “ওকে নীলরতন মর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আপনারা চাইলে আমার গাড়িতে আসতে পারেন”

বৃদ্ধ একটু ধাতস্থ হয়ে বললেন “না থাক। আপনি চলে যান। আমরা একটু পরে যাব। ... যদি কিছু মনে না করেন, আপনার মোবাইল নম্বরটা দেবেন? ওখানে গিয়ে নয় আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে নেব”

প্যাডে নিজের নম্বরটা লিখে মাথা নিচু করেই বলল “সোহমের কোনও মোবাইল ছিল?”

“হ্যাঁ ছিল। লিখে নিন ওর নম্বরটা ৯৪৩২২ ৫১২৬০”

ডায়রিতে নোট করল “মোবাইলটা কিন্তু কোথাও পেলাম না। কাল রাতে কি নিয়েছিল?”

একটু ইতস্তত করে বৃদ্ধ বললেন “ঠিক মনে নেই। সব-সময় তো ওটা নিয়েই যায়। নিশ্চয়ই নিয়ে গেছিল। তবুও যখন বলছেন, পরে আরেকবার খুঁজে দেখব”

পরিতোষ উঠে পড়ল। এখন এর বেশি আর প্রশ্ন করা ঠিক হবে না। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

“কাল কতক্ষণ পর্যন্ত সোহম ছিল?” মিলনকে সরাসরি প্রশ্ন।

“রাত বারোটা। বলেছিলাম থেকে যেতে। প্রথমে একটু হেজিটেট করছিল। পরে বলল বাড়ি চলে যাবে”

“এত রাতে?”

“বলল মানিকতলা থেকে শেষ বাসটা ধরতে পারবে। কোনও অসুবিধা হবে না। ... তার মানে এখান থেকে যাওয়ার পরই ঘটনাটা ঘটেছে”

“সেরকমই তো মনে হচ্ছে। অবশ্য পোস্ট-মর্টেম রিপোর্টটা পেলে টাইম অফ ডেথ সম্বন্ধে আরও স্যাঙ্গুইন হওয়া যাবে”

মিলনের মানিকতলার পিজি অ্যাকোমোডেশনের দিকে দেখল। টিপিক্যাল ব্যাচেলারের ঘর। দড়ির ওপর প্যান্ট, সার্ট, আন্ডারওয়ার ঝুলছে। এখানে-ওখানে ছড়ানো বই। খাটে নোটবুক কম্পিউটার। জানলার পাশে তোয়ালে।

খাটের পাশের চেয়ারটায় বসে বলল “কালকে রাতে ওকে ডিস্টার্বড দেখেছিলেন?”

“মনে হল ডিস্টার্বড”

“কেন?”

“ঠিক বলতে পারব না। অস্থির ভাব। ঠিক বলে বোঝানো যাবে না। নোটবুকে থিসিসের কাজ করছিলাম। মাঝে মাঝেই বলে উঠছিল ‘তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে রে। বাবা রিটায়ার করেছে। প্রিয়া তো এখনও কলেজে পড়ে। একটা চাকরি না জোগাড় করলে বাবা আর টানতে পারবে না। প্রিয়ার বিয়েও তো দিতে হবে’ আমরা মধ্যেবিত্ত ঘরের ছেলে। চাকরিই আমাদের বেঁচে থাকার প্রধান অস্ত্র। আমাদের কী পিএইচডির শৌখিনতা চলে?”

মধ্যবিত্ত ছেলেদের কী করা উচিত, কী নয়, বিশ্লেষণ করে কী লাভ? সেও তো নিজের ছেলেকে ব্যাঙ্গালুরুতে পড়তে পাঠিয়েছে। মধ্যবিত্তদের তো শিক্ষা ছাড়া অন্য কোনও অস্ত্র নেই। সেটাই একমাত্র পুঁজি।

“নতুন কী? ওর বাবা তো রিটায়ার করেছে বেশ কিছুদিন। হঠাৎ কালকে ডিস্টার্বড কেন? চাকরির তাড়া তো নতুন নয়?”

“হতে পারে ঐত্রেয়ীর সঙ্গে মনোমালিন্য বা অন্য কোনও কিছু”

“ঐত্রেয়ী কে?”

“সোহমের প্রেমিকা। আমাদের ব্যাচমেট”

“কোথায় থাকে?”

“আগে এখানেই থাকত। এমএসসি পাশ করার পর অনেকদিন ঘরে বসে ছিল। আমরা পিএইচডি শুরু করলাম। অনেকদিন ঘরে বসে হাঁপিয়ে উঠে, চাকরি নিয়ে শেষমেশ ব্যাঙ্গালুরু চলে গেল”

“কোথায়?”

“দ্য নিউ এজ বলে একটা কোম্পানিতে”

“কীসের কোম্পানি?”

"অত বলতে পারব না। একজন বাঙালি মহিলার কম্পিউটার ফার্ম। বোধহয় আউটসোর্সিং-এর কাজ করে”

“ঐত্রেয়ীর ফোন নম্বর আছে?”

মোবাইলটা থেকে বলল “লিখে নিন”

নম্বরটা লিখতে গিয়ে হঠাৎ মনে পড়ল সোহমের মোবাইলের কথা। মানিকতলার খালের ধারে ওটা পায়নি। বাড়িতেও রজত সান্যালও ওটা খুঁজে পাননি।

“আপনার সঙ্গে থিসিস আলোচনার সময় মোবাইল ছিল?”

দ্বিধা না করেই মিলনের উত্তর “হ্যাঁ ছিল। ... একটা ফোনও এসেছিল। বোধহয় ঐত্রেয়ী”

পরিতোষ সেন ছোট পুলিস অফিসার হতে পারে, কিন্তু এ লাইনে বহুদিন। কোনও যদি, মনে হয়, এসবের মধ্যে নেই।

“কেন মনে হল?”

“সোহমের ঐত্রেয়ীর সঙ্গে কথা বলার একটা টিপিক্যাল ম্যানারিজম আছে। তুই-তুকারির মধ্যেও বিশেষ আন্তরিকতা। যেমন হয়ে থাকে বন্ধুত্বের মধ্যে প্রেম থাকলে। প্রকাশটা অন্যদের থেকে একটু আলাদা”

“কিছু বলেছিল ঐত্রেয়ী সম্বন্ধে?”

“হ্যাঁ। বলেছিল ‘শালা কবে থিসিস শেষ করে চাকরি নিয়ে ঐত্রেয়ীকে বিয়ে করব, তা না, সেখানেও ঝামেলা’ আমি জিজ্ঞেস করলাম ‘কী হয়েছে?’ বলেছিল ‘ছাড় তো। চল্ কাজটা আগে নামাই’”

“কেন বলতে পারেন?”

“না। কিছুটা আন্দাজ করতে পারছিলাম। এমনিতে ওদের কথায় আড়ি পাতি না। তবে শুনলাম সোহম বলছে ‘বিয়ে করেতে দেবে না। মামদোবাজি’। ভাবলাম আবার হয়ত সুনেত্রা কিছু ঝামেলা পাকাচ্ছে”

“সুনেত্রা কে?”

“আমাদের একই ব্যাচের ছাত্রী। ঐত্রেয়ীর মতো এমএসসি পাশ করে শেষে মুম্বাই চলে গেল”

“সুনেত্রা ঝামেলা করতে যাবে কেন?”

“সুনেত্রাও সোহমকে ভালোবাসে। সোহম কিন্তু ঐত্রেয়ীকেই। লাভ ট্রায়াঙ্গেল। আর তো কোনও কারণ নেই”

পরিতোষ সেন পকেট থেকে ডায়রিটা বার করে বলল “এই নম্বরটা কার বলতে পারেন?”

মিলন ডায়রিতে লেখা নম্বরটা দেখে মাথা নাড়ল “জানি না। আমাদের চেনা-জানা কারও নয়”

“সুনেত্রার নম্বরটা আপনার কাছে আছে?”

“কেন থাকবে না? লিখে নিন”

ডায়েরিতে সুনেত্রার নম্বরটা লিখে নিল “সুনেত্রার কী অন্য কোনও অ্যাসোসিয়েশন ছিল?”

“কী করে বলব? গোঁড়া মারোয়ারি ফ্যামিলির মেয়ে। দেব-দেবীর প্রতি বেশি আসক্তি। আমাদের বয়েসে সহজে দেখা যায় না”

উঠে পড়ল পরিতোষ। এই মুহূর্তে এর বেশি কথা বলে লাভ নেই। বরং ঐত্রেয়ী কিংবা সুনেত্রার সঙ্গে কথা বলে যদি কোনও ক্লু পাওয়া যায়। কী মনে হতে দরজা থেকে মুখ ঘুরিয়ে বলল “কোনো পলিটিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন?”

“নাঃ। সময় কোথায়? আমাদের জেনারেশনের পলিটিক্সে ইন্টারেস্ট নেই। যে যায় লঙ্কায় সেই তো রাবণ” কথার সত্যতাটা পরে খাতিয়ে দেখবে পরিতোষ।

“খুন হল কেন?”

“কী করে বলব? সেটা তো আপনাদের কাজ। লাভ ট্রায়াঙ্গেল হতে পারে। কিন্তু তার জন্য খুন! ভাবা কঠিন”

পরিতোষ সেন চলে যাচ্ছিল। মিলন দরজায় এগিয়ে এসে বলল “ওই যে জিজ্ঞেস করলেন সোহমকে ওইদিন অন্যরকম লাগছিল কি না? শুধু ওদিন নয়। বেশ কয়েকদিন থেকেই ওকে বেশ অন্যমনস্ক লাগছিল”

“কেন?”

“বলা কঠিন। এই বিয়ের ব্যাপার নিয়ে ঝামেলা হতেও পারে। চাপা ছেলে। সব কথা বলত না। আমিও খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করব। যদি কিছু পাই, আপনাকে জানাব। আপাতত মেসোমশায়ের কাছে যাই। ওনারা নিশ্চয়ই বড্ড অসহায় এখন”

পিজি অ্যাকমডেশনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল পরিতোষ। যা জেনেছে, সেগুলো আরও একটু খাতিয়ে দেখতে হবে। ঐত্রেয়ীর সঙ্গে কাল সকালেই একবার কথাও বলতে হবে। সুনেত্রার সঙ্গেও।

এই দৃশ্যটা যে বারবার কেন দেখতে হয়? তবুও চাকরি। করতেই হবে। বাবাকে দিয়ে ছেলের বডি আইডেন্টিফাই করানো। মা কান্নায় ভেঙে পড়েছে। পাড়া-পড়শি বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন সান্ত্বনা দিচ্ছে। গা-সওয়া হলেও বুকে বাজে। কারও তো ছেলে। নিজের ছেলে হলে কী এরকম নির্লিপ্ত হতে পারত? সুরজিতের কথা মনে হতেই ভাবল এবার ওর জন্য পাত্রী দেখতে হবে। ছেলেটা ব্যাঙ্গালুরুতে একা পড়ে। কখন কী হয়ে যায়। ওখানে তো কেউ দেখার নেই।

ভিড়ের মধ্যে থেকে মিলন এগিয়ে এল "ঐত্রেয়ীর সঙ্গে কথা হয়েছে?"

"না। সময় পাইনি। তবে বলব"

"দেখবেন স্যার এই কেসটার যাতে একটা সুরাহা হয়। আমরা যা হারালাম তা তো আর ফিরে পাব না। কিন্তু মাসিমা মেসোমশায়ের মুখ চেয়ে একটু দেখবেন। আমাদের তো কোনও ক্যাচ নেই। আপনারাই যা একটু ভরসা"

সেদিন বোঝেনি। আজ বুঝছে। সোহমের মৃত্যুটা মিলনকে কীভাবে নাড়িয়ে দিয়েছে। ভরসা করা আর ভরসার যোগ্য মর্যাদার মধ্যে অনেক তফাত। পরিতোষ সেন তো সামান্য একজন সাব-ইন্সপেক্টর। এরপর বড়বাবুর কাছে কেস যাবে। তারপর লালবাজার। তদন্ত চলবে। কোর্ট-কাছারি।

পথ অনেক অনেক অনেক দূর।

তিন

“প্রভু... আপকে চরনো মে মুঝে জগহ দে। অন্তিম দিনোকে কে লিয়ে মে বেচহন হু” দুর্গা ষষ্টাঙ্গে বাবা ভোলেশঙ্করের পায়ে লুটিয়ে পড়ল ভোর বেলায় বারানসীর গঙ্গার পাড়ে।

বাবা সবে প্রাতঃকৃত্য সেরে গঙ্গাস্নান করে প্রার্থনার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। অগোছালো, নোংরা লোকটা থেকে সাবধানে নিজেকে বাঁচিয়ে, যাতে তার পবিত্রতায় কলুষের ছোঁয়া না লাগে।

“তুম কৌন হো বেটে? কাঁহা সে আয়ে হো?”

“ভাধোহি সে। গরিব হু। কাম ঢুন রহা হু” মিথ্যে বলল দুর্গা।

ট্যান্ডা ফলসে ঝিমলিকে খুন করে পালাবার পর, ভরণপোষণের উপায় খুঁজছিল। বারবার ছদ্মবেশে জায়গা পালটাবার ফলে, মিথ্যে বলা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। কখনও ভাধোহিতে থাকেনি।

“তুমহারা নাম কেয়া হ্যায় বেটা?”

“চন্দ্রেশ্বর মিশ্র। লোক মুঝে চান্ডু নাম সে পুকারতে” উত্তর ঠোঁটের ডগায়। মিথ্যেকথা রক্তে ঢুকে গেছে। পৈতেও লাগিয়ে নিয়েছে।

আহা রে। এক ব্রাহ্মণ সন্তান। ফাইফরমাশ খাটার জন্য একজন হলে ভালোই হয়। নিচু জাতের কেউ তার ত্রিসীমানায় আসুক সেটা বাঞ্ছনীয় নয়। তাও আবার তার পাশে থাকা। ছেলেটিকে ধার্মিক রীতি শেখালে হয়ত তার উত্তরসূরিও হতে পারে।

“ধরম শিখোগে?”

“আপকে চরনো মে জগহ মিলে তো সব কুছ শিখ লুঙ্গা” দুর্গার আশ্বাস।

বাবার কল্পনারও বাইরে চান্ডু কেয়া চিজ। মির্জাপুরে ডানকান্স কার্পেট ফ্যাক্টরিতে কিছুদিন মজদুরের কাজ করেছে। কাজের চেয়ে মহিলা সহকর্মীদের দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকানোই বেশি। ফ্যাক্টরির ম্যানেজার দাসবাবু তো ফ্যাক্টরির মধ্যেই কাজের শেষে একজনের সঙ্গে সঙ্গম করার সময় হাতেনাতে ধরে ফেলেছিল। প্রথমবার বলে সতর্ক করে ছেড়ে দেয়। এমনিতেই ফ্যাক্টরিতে কাজের লোকের অভাব। তাই দুর্গাকে তাড়ায়নি। দুর্গার শুধরাবার কোনও লক্ষণই ছিল না। সব সময়ই অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে বচসায় লিপ্ত। নৃশংস মানসিকতার প্রতিমূর্তি। একদিন দাসবাবুরও ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল, যখন ফ্যাক্টরির দামি কার্পেট চুরি করে মির্জাপুরের দোকানে বেচতে দেখল। পুলিস ডানকানে আসার আগেই চম্পট। এক জায়গা থেকে অন্য, এধার-ওধার ঘুরে শেষমেশ বারানসীর গঙ্গার ঘাটে। ওত পেতে কোনও মুর্গিকে টুপি পরানো। যার আশ্রয়ে টিকে থাকা যায়। বাবা ভোলেশঙ্কর দুর্গার দুর্গতিতে অনুকম্পিত।

বিতৃষ্ণা সত্ত্বেও মুণ্ডনের মাধ্যমে বাবার কাছে দুর্গার অভিষেক। প্রতিবাদ না করেই কিছু সময়ের জন্য বাবার আদেশ মেনে নিল। অপেক্ষা করে দেখা যাক জল কোথায় গড়ায়। সকাল থেকে সন্ধে কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে দুর্গা হাঁপিয়ে উঠছিল। তার ওপরে সাত্ত্বিক আহার। মদ-মাংস-মেয়ে ছাড়া জীবনটা ভাবাই যায় না। কিন্তু কিছুই করার নেই। যতক্ষণ না অন্য পথ খোলে। অন্তত ফোকটে তো থাকা খাওয়া জুটে যাচ্ছে।

বাবা মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করল “চান্ডু, থোরা আরাম কর লে। কাল সে তেরা ধরম শিক্ষা শুরু হোগা”

ভয়, বিরক্তিতে দুর্গা শিউরে উঠল। পরের দিন থেকে দিনের পর দিন এই হৃদয়বিদারক যন্ত্রণা, ধর্মের অনুশীলন। মানসিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও মেনে নেওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই। গ্রীষ্ম শীত নির্বিশেষে

ভোর চারটেয় উঠে গঙ্গাস্নান। তারপর জ্ঞানের ফুলঝুরি। ভজন। সহজ সংস্কৃত মন্ত্র শেখা ও মানে বোঝা। অবশ্যম্ভাবী ব্যর্থতা। দাঁত কামড়ে হজম করতে হচ্ছে এই অত্যাচার। এই মুহূর্তে খুনির বাঁচার একমাত্র উপায়। ধার্মিক কাজের বাইরে, বাবার ফাইফরমাশ খাটা। এসবের মধ্যে বাবার ফাইফরমাশ। হাঁপিয়ে উঠছিল দুর্গা। সময়-অসময়ে, কারণে অকারণে কাজে পাঠানো। বয়সের ভারে গুছিয়ে কাজের তালিকা দিতে অপারগ। সেই সুযোগে প্রণামি পকেটস্থ করা দুর্গার পক্ষে শাপে বর। মাঝেমধ্যে লুকিয়ে চুরিয়ে জিতুর ধাবায় গিয়ে দেদার কাবাব, চিকেন রোস্ট সাঁটানো। সাত্ত্বিক খাবার যে আর সয় না। জিতুর সঙ্গে বন্ধুত্ব। ফাঁক পেলে দুজনে গঙ্গার ধারে ঘুরে বেরানো আর স্নানরত অর্ধনগ্ন মহিলাদের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকা। পুণ্যার্থী মহিলারাদেরও শ্যেনদৃষ্টি থেকে রেহাই নেই। আশ্রম জীবনে জৈবিক বাসনা পূরণের যখন কোনও অবকাশই নেই।

"কেয়া সোচ রহে হো? কেয়া করোগে কুছ সোচা?" জিতু জিজ্ঞেস করল।

"অভিতক তো নেহি। ইয়ে বাবাকা চক্কর মে তো জিন্দেগি বরবাদ হো রহা"

চিন্তায় আচ্ছন্ন। কী করে এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। ক্রমে ভ্রূণের মতো একটা উপায় দানা বাঁধছে। যদি 'বাবা' পেশা শুরু করে? চারপাশে অগণিত ভক্তবৃন্দ। কিছু সংস্কৃত শ্লোক আওরিয়ে মাত করে দেওয়া। তারপর আর পায় কে? চোখে ঠুলি পরা শিষ্যরা টাকা ভেটে ছেয়ে দেবে। কয়েকজন বাবা তো শ্রাদ্ধের মন্ত্র বিয়েতে উচ্চারণ করেও পার পেয়ে যায়। মহিলা ভক্তবৃন্দরা তো আছেই জৈবিক কামনা পূরণের জন্য। বরাবরই দেখেছে তার মধ্যে এমন এক আকর্ষণ আছে, যা মহিলাবৃন্দকে সহজেই কাবু করে ফেলতে পারে। রুপায়া, ছোকরি একসাথ। কামিনী কাঞ্চন থাকলে কীসের অভাব? শুধু খেয়াল রাখতে হবে দাসবাবুর পুলিস রিপোর্ট যাতে প্রকাশ্য না আসে। এখনও মির্জাপুরের খাতায় লিপিবদ্ধ। পুলিস হদিস পেলে কেটে পড়া মুস্কিল। নিজের আসল পরিচয় এখন পর্যন্ত গোপন রাখতে সক্ষম হয়েছে। দাসবাবু, বাবা, জিতু কেউই এখন পর্যন্ত তার আসল রূপ জানে না।

ঠিক করে ফেলেছে। তবে বারানসীতে বেশিদিন নয়। মির্জাপুরের খুবই কাছে। যে কোনও সময় পুলিস ছানবিন করতে পারে। যদি ধরা পড়ে, কেউ না কেউ ঠিক ঝিমলির মৃত্যুর সঙ্গে সূত্র খুঁজে বার করতে পারে। মন বলছে 'দুর্গা ইহা সে ভাগ। জিতনা জলদি। নেহি তো গয়া'

এক বছর পার হল বাবার ছত্রছায়ায়। এবার পালাবার পালা। কিন্তু কোথায়? কী ভাবে? মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি। এতদিনে বাবা ভোলেশঙ্করের পেয়ারের পাত্র হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি শিখে ফেলতে ওস্তাদ। ধর্মের প্রক্রিয়াগুলো বেশ রপ্ত করে ফেলেছে। সেও বাবার অনুপস্থিতিতে মাঝেমধ্যে ধর্মের লেকচার দেয়। যদিও মোক্ষ বহুদূর, বাবা খুশি। সময় হয়েছে চান্ডুর উত্তরণের। বাবা ডেকে পাঠাল এক সকালে।

"জয় শ্রী রাম। চান্ডু ষষ্টাঙ্গে বাবার পা ছুঁয়ে মাটিতে বসল।

"আয়ুষ্মান ভব" বাবার আশীর্বাদ।

চান্ডু উদগ্রীব হয়ে বাবার দিকে তাকিয়ে।

"সময় হুয়া হ্যাঁয় জীবন মে তুমকো আগে বড়না। তুম হরদোয়ার যাও। উধর কই জ্ঞানী কে পাস অধ্যায়ন করো। ও তুমহে ধরম কে বারে জাদা শিখায়গা আগে বড়নে কে লিয়ে"

আকাশ থেকে পড়ল চান্ডু। না চাইতেই আকাশ থেকে আপেলপাত। এই পালাবার সুযোগ।

"জো আপকে মর্জি, ওহি মেরা ধরম" চান্ডুর করজোড়ে সমর্পণ।

"ম্যায়ে বন্দোবস্ত কর দুঙ্গা। তুম তৈয়ার হো"

বাবা ভোলেশঙ্করই ব্যাবস্থা করে দিল তার চেনা হরিদ্বারের গুরুদের সঙ্গে শিষ্য চান্ডুর জ্ঞানলাভের জন্য। দু-মাস। তারপর আবার বারানসীতে বাবার কাছে প্রত্যাবর্তন। ফিরছে কে? চান্ডু মনে মনে হাসল।

ঠিক দুপুর দুটোয় দেড় ঘণ্টা লেটে ডুন এক্সপ্রেস ছাড়ল। চান্ডু এখন পুরদস্তুর সন্ন্যাসী। গেরুয়া আলখাল্লা, হাতে ভাঙাচোরা ব্রিফকেসের মধ্যে তার জাগতিক সঞ্চয়। বাবার দেওয়া ৪০০ টাকা। এই প্রথম ট্রেনে চড়ায়

সব ঠাহর করতে পারছিল না। সৌম্য চেহারা, পরনে গেরুয়া বসন দেখে সবাই সাহায্যে আগ্রহী। স্লিপার ক্লাসে একটা সিট খুঁজে পেল। ডুন এক্সপ্রেস পুরনো ট্রেন। হাওড়া থেকে দেরাদুন। আগেকার তুফান এক্সপ্রেসের মতো গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য এখন আর তুফান নয়। সাধারণ প্যাসেঞ্জার ট্রেন। যাদের গন্তব্যে পৌঁছনোর তাড়া নেই। তুফানের মতোই ডুন আজ জরাজীর্ণ অতীত। টাইমের মা-বাপ নেই।

চান্ডুর তাড়া নেই। সে এখন নতুন দুনিয়ার খোঁজে। ফেরবার কোনও অভিপ্রায়ই নেই। ডুন এক্সপ্রেস ধীর গতিতে বারানসী জাংশন ছেড়ে বেরতে শুরু করল। কোলাহলে প্যাসেঞ্জারদের সার্ডিনের মতো টিনে ভরে স্লিপার ক্লাসে নিয়ে যেতেও বিরক্তি।

চার

ডাঃ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় আন্দ্রেয়াকে মেপে বলল “ইউ ওয়ান্ট এ ব্রেস্ট এনলার্জমেন্ট? হোয়াই?”

“মাই প্রডিউসার প্রেফার্স মি উইথ বিগ বুবস্”

“ইউ?”

“হোয়াই নট? দ্যাট ইজ দ্য ওয়ে দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ মুভিং। ইট উড বি নাইস টু হ্যাভ বিগ বুবিস। আই উড লুক মোর অ্যাট্রাকটিভ। ইট উড গিভ মি মোর কনফিডেন্স”

ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় ভালোভাবে আন্দ্রেয়াকে পরখ করল। দিল্লির মেয়ে। কলকাতার থেকে তফাত তো থাকবেই। কলকাতার মেয়ে যা লাজুকভাবে বলে, দিল্লির মেয়েরা অনেক খোলাখুলি। সোজাসুজি। আন্দ্রেয়া স্বাভাবিকভাবেই কথাটা বলেছে। কে কীভাবে বলছে, ভেবে কী লাভ? রোজগার করতে এসেছে। মানুষের আচার-আচরণ বিশ্লেষণ করা তার কাজ নয়। তার সুনামে, অপেক্ষাকৃত কম খরচে অপারেশন পাবে বলে, দূর-দূরান্ত থেকে মেয়েরা উড়ে আসে। এদেশ কিংবা বিদেশ। কসমেটিক সর্জারি ইজ নট কভার্ড বাই ইনসিওরেন্স। সো কোয়ালিটি অ্যাট এ চিপার প্রাইস, ইজ দ্য কি এসেন্স অফ দ্য বিজনেস।

আন্দ্রেয়া হিরোইন হতে চায় মুম্বাইতে। ছুটে এসেছে কলকাতায়। একেবারে ত্রিভুজ। ছিপছিপে গড়ন। পাঞ্জাবি মেয়েদের থেকে একটু আলাদা। লক্ষ করেছে পাঞ্জাবি মেয়েরা দৈহিক অনেক বেশি হৃষ্টপুষ্ট। আন্দ্রেয়া অন্যান্য পাঞ্জাবি মেয়েদের থেকে একটু আলাদা।

“সো হোয়াট সাইজ উইল মেক ইউ হ্যাপি?” আশিসের প্রশ্ন।

“সামথিং রিয়েলি বিগ" দু-হাত ফাঁক করে বোঝাবার চেষ্টা করল “নট অ্যাস বিগ অ্যাস প্যামেলা অ্যান্ডারসন। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আই মিন?”

“সি প্লাস কাপ ওর ডি?”

“আই সাপোস সো” অনিশ্চয়তায় কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্ত।

আশিস চশমার ফাঁক দিয়ে এবার আন্দ্রয়াকে ভালো করে দেখল। ছিপছিপে গড়ন। আজকালকার মডেলরা যেমন হয়। সরু নিতম্ব। মুখটা শ্যামলা হলেও ঠোঁট আকর্ষণীয়। মুখ আন্দাজে একটু পাতলা। ভারী হলে ব্রেস্টের সঙ্গে বেশি মানাত। টপস্ পরা অবস্থায় ব্রেস্ট আছে কি না বোঝাই যায়। প্রডিউসার যে একটু উন্নত বক্ষ চাইবে - এ আর আশ্চর্য কী? চেহারাতে সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ছাপ থাকলেও আধুনিকতার একটা প্রলেপ লাগাবার চেষ্টা বেশভূষায় প্রকট। কোনও বৈচিত্র নেই। এমটিভি-র সন্দেশের ছাঁচ।

ব্যাকগ্রাউন্ড ভেরিফাই করার জন্য জিজ্ঞেস করল “হোয়ার ডু ইউ স্টে ইন ডেলহি?”

“মিনটো রোড। তিলকনগর এরিয়া”

এবার বোঝা গেল। কেন দিল্লিতে না করিয়ে কলকাতায় প্লাস্টিক সার্জারি করাতে এসেছে। দিল্লির কোনও উচু মহলের ক্যান্ডিডেট নয়। যদিও সেই স্তরে পৌঁছতে চাইছে। তাই কম খরচের গন্তব্য কলকাতার প্রসিদ্ধ প্লাস্টিক সার্জেন ডাঃ আশিস বন্দ্যোপাধায়।

“ইফ আই মেক ইট বিগার, পিপল উইল হ্যাভ এ ন্যাচারাল টেন্ডেন্সি টু লুক অ্যাট ইওর বুবস, দ্যন ফেস। আই থিংক সি কাপ উড বি গুড এনাফ। জাস্ট ওয়ান্ডারিং ইফ ইওর লিপস্ কুড বি অগমেন্টেড সাইমাল্টেনিয়াসলি। ইট উড ম্যাচ ইওর প্রোফাইল। ... জাস্ট এ থট”

আন্দ্রেয়া সামনের আয়নায় নিজেকে দেখল। ঠোঁটাটা কী খুব পাতলা? অনুপ যেদিন প্রথম চুমু খায়, সেরকম কিছু বলেনি। সে অন্য কথা। অনুপ ঠোঁটের উষ্ণতা অনুভব করতে ব্যস্ত ছিল। যৌবনকে রাঙিয়ে

দিতে। তার পরে ভেতরে সুপ্ত নিম্নাঙ্গের কামনার মুক্তি খুঁজছিল। উষ্ণতার আবেগে ঠোঁটের দিকে তাকাবার সময় হয়নি। দেহের উষ্ণতা ছাপিয়ে গিয়েছিল রূপের বাহার।

অনুপের চুমু খাওয়া আর মুম্বাইয়ের ইঁদুর দৌড়ে হিরোইন হওয়া এক জিনিস হল? ভাগ্যিস দিল্লির 'দ্য নিউ এজ' এজেন্সিতে পোর্টফোলিওটা পাঠিয়েছিল। সে তো আর কোনও সৌন্দর্য কম্পিটিশনে প্রথম হয়নি। দ্য নিউ এজ পোর্টফলিওটা মুম্বাইতে ফরওয়ার্ড করে। সেই থেকে এক প্রডিউসার তার নতুন ছবির জন্য ওকে বাছাই করে। শুধু দুটো শর্ত - আধুরা অংশগুলো কোনও প্লাস্টিক সার্জেনকে দিয়ে দর্শকের উপযোগী করতে হবে। আর কন্ট্র্যাক্ট সই করার আগে প্রডিউসারের শয্যাসঙ্গী হতে হবে। না বললেও আন্দ্রেয়ার অজানা নয়, বহুদিন আগেই তা দিয়েছে অনুপের কাছে। নয় এক রাত্রি কোনও মাঝবয়সিকে সঙ্গদান করল। যদি ভবিষ্যৎটা খুলে যায়, ক্ষতি কী?

ছুটে গেছিল দ্য নিউ এজের কর্ণধার ইন্দ্রাক্ষি রায়চৌধুরীর কাছে গ্রেটার কৈলাসের অফিসে। সেখান থেকেই ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হদিস। সস্তায় ভালো প্লাস্টিক সার্জেন। সে-ই যখন প্রসঙ্গটা তুলল, আবার নিজেকে আয়নায় দেখল। মিথ্যে বলেনি তো। সত্যি তো, ঠোঁটটা প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার মতো হলে বোধহয় আরও ভালো লাগত।

"হোয়াট ডু আই হ্যাভ টু ডু?"

"জাদা কুছ নেহি। একঠো ইনজেকশন দেনেসে ঠিক হো জায়েগা। অ্যাকোয়ামিড। হোয়েন ইউ কাম ফর ফলো আপ। জো ম্যায়নে সোচা ওহি বোলা। অব ইয়ে তুমহারা মর্জি" এটাই আশিসের স্টাইল। জোর করে চাপিয়ে দেয় না। এমনভাবে কথাটা পাড়ে, পেশেন্ট শেষ পর্যন্ত সেটা করিয়েই যাবে। যত করাবে, তত পয়সা।

এরা হিরোইন হতে চায়। স্বপ্নে ভরপুর এদের চিন্তাধারা। ইন্দ্রাক্ষির কাছে শুনেছে টুকটাক মডেলিং করেছে। একটা শুটে অনেক টাকা পায়। এই ছোটখাটো মডেলরা যদি হিরোইন হওয়ার আঙুর দেখে, কথাই নেই। টাকা ছাড়তে আপত্তি করবে না। এদের সাইকোলজিটা জানা হয়ে গেছে। সবাইকে টেক্কা দিয়ে এরা শিখরে পৌঁছতে চায়। সবসময় ভাবে যদি আরও সুন্দর হওয়া যায়। তাহলে অন্যদের লেঙ্গি মেরে বেরিয়ে যাওয়া যাবে। আশিসের কাজ ওদের সুপ্ত বাসনাটাকে জাগানো, কেল্লা ফতে।

এক সময় কত কষ্টই না করেছে। ভাটপাড়ার মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম। বাবা ছিল গোঁড়া ব্রাহ্মণ। উচ্চ-মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক। ছেলেকে ডাক্তারি পড়াতে গিয়ে বিশেষ কিছুই রেখে যেতে পারেনি। অনেক শখ ছিল। অন্য ছেলেরা যখন নতুন জামা পড়ত, ভালো রেস্তরাঁয় খেত - তখন পাইস হোটেলে খাওয়া বা মায়ের রুটি-তরকারি খেয়ে নৈহাটি লোকাল। টাকার অভাবে অনেক শখ আহ্লাদ মেটাতে পারেনি। তারপর নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজে চান্স। মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে হঠাৎ স্বর্গ পেল। সেখান থেকে কলকাতার এমএস। চণ্ডীগড়ে এমসিএইচ। ভাগ্যের চাকা ধীরে ধীরে ঘুরতে লাগল। ফেরত এসে প্র্যাকটিস। তেমন কিছু হত না। বার্ন আর স্কিন গ্রাফটিং। অর্থপেডিক সার্জেনদের কিছু রেফ্যারেল।

রোজগারের থেকে বউ শুচিস্মিতার প্যানপ্যানানিই বেশি "তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না। ভাবলাম প্লাস্টিক সার্জেনকে বিয়ে করে সারা জীবন আরামে কেটে যাবে। তা না ... ওই মাস গেলে হিসেব"

কুলকিনারা না পেয়ে, মিথ্যে স্বপ্নের প্রাসাদ ভেঙে, ছোটবেলার প্রেমিক অনঙ্গর হাত ধরে ডিভোর্স। আমেরিকায় পাড়ি দিল শুচিস্মিতা। আশিস একা। রাতের খাবার গরম করতে গিয়ে ভাবছে, এটা কী জীবন!

টাকা নেই। বউ নেই। ঘর নেই। কী রইল জীবনে?

অন্ধকারে টিভি দেখা আর মাল খাওয়া ছাড়া এন্টারটেনমেন্টও নেই। সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার। আর স্বপ্ন নয়। শুধু বাস্তব। টাকা চাই। সুন্দরী চাই। অনেক... অনেক... অনেক। বউ যখন নেই, তখন রোজ রাতে নিত্য নতুন সঙ্গিনী একান্ত প্রয়োজন। টাকা না থাকলে, কে সঙ্গ দেবে? যৌবনকে যতই বোতলের মধ্যে বন্দি

করে রাখা যাক না কেন, ছিপিটা খুলে বেরিয়ে আসতে চায়। খালি বেহুলার বাসরে ছিদ্রের অপেক্ষা। সুপ্ত উচ্ছ্বাস কী বাধা মানে?

ভাটপাড়ার ছেলের টাকা না থাকলে মেয়েরা আসবেই বা কেন? শুরু হল আরেক নতুন ব্যবসায়িক খেলা। পেপার, টিভি, ইন্টারনেটে অ্যাড। লিন্ডসে স্ট্রিটের অলিগলির হোটেলগুলোয় টাউট ফিট করা। ম্যাজিক ঘটল। কে শালা বার্ন আর পচা ঘায়ের জমাদারি করে? তার থেকে হাটে সৌন্দর্যের স্বপ্ন বেচো। সব হবে। টাকা, মেয়েছেলে, যা চাও। আর যেসব স্বপ্ন অপূর্ণ থেকে গেছে... স... ব...

জীবন আবার নবরূপে দেখা দিল নানা পসরা নিয়ে। প্রগতিশীল বিদেশি ছাঁচে ঘেরা সভ্যতার হাত ধরে। টিভি, মিডিয়ার সাপ্লিমেন্টগুলো না-পাওয়া বাসনার আগুনে ঘি ঢালল লন্ডন পাব, তন্ত্র, ইনকগনিটো ঘেঁষা মহিলাদের নতুন যুগের কান্ডারি করে। পেজ থ্রি ফুলেফেঁপে ব্যবসার পসরা সাজিয়ে দিল আশিসের দ্বারে। শুধু মহিলা নয়, ছেলেরাও উষ্ণতার মধ্যে দেহ খোঁজে। টিভি সিরিয়ালের পথে পা বাড়াতে গেলেও সেই দেহ। বেদবাক্যটা সাজল নতুন আভরণেঃ

দেহং সত্য দেহং ধর্ম
দেহই পরমং তপঃ
দেহই বাজারে একমাত্র পণ্য
তাকেই শ্রদ্ধায় পূজা কর

আন্দ্রেয়া নিজেকে আয়নায় দেখে বলল “এনিথিং এলস্ আই নিড?”

আন্দ্রেয়ার সরু নিতম্বে হাত বুলিয়ে বলল “ইউ হ্যাভ ট্রোক্যান্টারিক ফ্যাট। এ বিট অফ লাইপোসাকশন উড কমপ্লিট দ্য স্টোরি”

যত অপারেশন, যত বিক্রি করতে পারবে তত অর্থ। মানি ইজ হানি। সেই হানি লুকিয়ে আছে হানিগুলোর হীনমন্যতাকে জাগ্রত করায়। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে ঠাহর করার চেষ্টা করল, ঠিকমতো কী ঢালতে পেরেছে? চোখ বলছে আন্দ্রেয়া ভাবছে। মশলাতে কাজ হয়েছে। ঘি যদি আগুনে ঠিকমতো ঢালা যায় আগুন তো জ্বলবেই। আশিসের কোমল উষ্ণ স্পর্শের জাদু সৌন্দর্য বৃদ্ধির রং ছড়িয়েছে। যার হাতে এত যাদু, না জানি ছুরি চালানোয় আরও কত কী!

“ইফ আই ওয়ান্ট ব্রেস্ট এনলার্জমেন্ট অ্যান্ড লাইপোসাকশন হোয়াট উড বি দ্য প্রাইস?”

“নট এ লট। অ্যাবাউট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ। মাচ চিপার দ্যান ডেলহি”

কয়েক মিনিট। আন্দ্রেয়াকে ভাবতে দিয়ে ফোনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আর্ত চাতকের মতো বৃষ্টির আশায় বসে না থেকে ব্যস্ততা দেখানোই কাজ। ডাক্তার পেশেন্টের ডিসিশনের জন্য বসে আছে, ভাবতেও অস্বস্তি। এক সময় টেকনিকটা রপ্ত করতে পারেনি। ধীরে ধীরে শিখেছে। জাল ফেলে নির্বিকার হয়ে বসে থাকো। দেখো মাছ জালে পড়ে কি না।

যখন প্র্যাকটিস ছিল না তখনও বাবা-মা বেঁচে। ভাটপাড়ার পুরনো বাড়িতেই থাকতেন। আশিস কলকাতায় স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়ে স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করার পাশা খেলছে।

বাবা বলেছিল “ভাটপাড়া তো দূর নয়। এখান থেকেই তো যাতায়াত করতে পারিস”

“সময় নষ্ট হবে”

“কতটা? শিয়ালদা কিংবা বিধাননগর থেকে লোকাল ট্রেন ধরবি। মাত্র তো এক ঘণ্টা”

“টাইমটা ফ্যাক্টর নয় বাবা। শরীরের ধকল”

অতএব স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়ে কলকাতায়। শনি-রবিবার ভাটপাড়ায় আসা।

মা বলত “হোটেলে খেয়ে রোগা হয়ে গেছে। বাড়িতে থাকলে ভালোমন্দ খাবার করে দিতে পারতাম”

পসার তেমন না থাকলেও ভাড়া নিয়েছিল কলকাতার বনেদি এলাকায়। ম্যান্ডেভিলা গার্ডেন্সের বহুতল অ্যাপারটমেন্টে। দিনভর পেশেন্টের আশায় এক ডাক্তারের চেম্বার থেকে আরেক। লিন্ডসে স্ট্রিটের হোটেলের মালিকদের সঙ্গে দেখা করে টাউট ফিট। কমিশনের হিসেব-নিকেশ। সন্ধেতে রামের বোতলে ভুলে থাকা। শুচিস্মিতা চলে যাওয়ার পর সব যেন শূন্য। সন্ধেবেলা মনের কথা বলার কেউ নেই। নিরালায় সওদাগরি অফিসের কনিষ্ঠ কেরানির মতো ঢাকাই শাড়ি পরা গৃহবধূর স্বপ্ন দেখা। যে এল, সে রইল না। যদি-বা কেউ আসে - সে কী সাজবে অনেক না-চাওয়া না-পাওয়া না-ছোঁয়া ভালোবাসার সীমাহীন মাধুর্যে।

আশিস সবে স্নান সেরে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে রামের বোতলটা খুলে বসেছে। হঠাত ডোরবেল। দরজার ওপারে মধ্য কুড়ির যুবতী।

"একটু চিনি হবে? বাই দ্য ওয়ে, আমার নাম ইন্দ্রাক্ষি রায়চৌধুরী। উলটো ফ্ল্যাটের"

নামটা ফ্ল্যাটের দরজায় নেমপ্লেটে দেখেছে। আলাপ হয়নি।

"আসুন আসুন। ভেতরে আসুন। আপনি উলটো ফ্ল্যাটের? নামটা দরজায় দেখেছি"

ইন্দ্রাক্ষি ঘরে ঢুকে মাথা নাড়ল। বিনয়ের সঙ্গে বলল "সারাদিনের খাটাখাটনির পর বাড়ি এসে দেখি চিনি শেষ। খেয়ালই করিনি। ভাবলাম, যদি আপনার কাছে ধার নেওয়া যায়..."

মুচকি হেসে বলল "চিনিও কেউ ধার নেয়? দেওয়ার মতো চিনি আছে। প্রথমবার আমার বাড়িতে এলেন। বসুন, চা করে আনি"

আশিস কিচেনে যাচ্ছিল। ইন্দ্রাক্ষি টেবলে রামের বোতল দেখে বলল "আবার চা করবেন? তার থেকে আপনার প্রসাদটাই ভাগ করে নিই। একটা গ্লাস হবে?"

কিচেন থেকে আরেকটা গ্লাস এগিয়ে দিয়ে বলল "খাটনি বাঁচল" মনে মনে ভাবল সঙ্গীও জুটে গেল।

রাম গ্লাসে ঢেলে ইন্দ্রাক্ষি বলল "সারাদিন যা ধকল গেছে না। অফিসে ঝামেলা"

চুমুক দিয়ে দেখল ইন্দ্রাক্ষিকে। হলুদ সালোয়ার কামিজ। লম্বাটে মুখ। চুলটা কাঁধ পর্যন্ত। মাঝখান দিয়ে সিঁথি কাটা। দৃষ্টিটা নীচে নেমে এল। সাধারণ হার গলায়। ডান হাতে ঘড়ি। সু-উন্নত বক্ষদেশ। হারের ল্যাজটা আলোছায়ার মতো ঢেকে রেখেছে দুই বুকের মাঝখানের ফাঁকটাকে। সোফায় বসে বলে আন্দাজ হচ্ছে না।

"আপনার ফ্ল্যাট?"

"লোনে কেনা। আপনি ডাক্তার?"

"প্লাস্টিক সার্জেন। আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়"

ভুরুটা ওপরে তুলে বিস্ময় "প্লাস্টিক সার্জেন! বাবাঃ" রামের গ্লাসে কোক মিশিয়ে বলল "আমি কোম্পানিতে চাকরি করি। নামটা তো জানেন। ইন্দ্রাক্ষি রায়চৌধুরী"

"কোন কোম্পানি?"

"ফ্যাশন এজেন্সি। নাম শোনেননি নিশ্চয়ই। বিউটি অ্যাট ইটস্ বেস্ট"

এক ঢোকে রাম গিলতে গিয়ে আবার চোখ ইন্দ্রাক্ষির বুকে। যেন ফ্যাশনের সঙ্গে বুকের কোথায় যেন অবিচ্ছেদ্য মিল। বক্ষ আর নিতম্ব ছাড়া কী ফ্যাশন হয়? তার মাধুর্য না বুঝলে কী কসমেটিক সার্জারি করা যায়!

ঠাট্টাচ্ছলে বলল "কোথায় বিউটি আর কোথায় আমি। মনে হচ্ছে বিউটি অ্যান্ড দ্য বিস্ট একসঙ্গে রাম খাচ্ছে"

জিভ কেটে ইন্দ্রাক্ষি বলল "এ মা ছিঃ ছিঃ। তা কেন?"

জিভ কাটলে যে কোনো মেয়েকে এত মধুর লাগে, আগে জানা ছিল না। নাভির কাছে সুড়সুড়ি টের পাচ্ছে। শুচিস্মিতার সঙ্গ-হারানো অনুভূতিগুলো আবার চাগাড় দিচ্ছে। হাত কচলে রামে চুমুক। অচেনা আকর্ষণ সামনে। এর মধ্যে এমন কিছু আছে, যা অন্য মেয়ের নেই। কী সেটা? যৌবন? না সাবলীলতা? না

কি মাদকতা? জানে না। এই মেয়েটির উপস্থিতি যে কোনও পুরুষকে অনায়াসে বশ করতে পারে, যা থেকে পেশায় মহিলাদের শরীর ঘাঁটা ডাঃ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়েরও পরিত্রাণ নেই।

সুপ্ত ইচ্ছেটাকে চাপা দেওয়ার জন্য কথাটা ঘুরিয়ে বলল "আপনি একা থাকেন?"

"হ্যাঁ। বিয়ে করিনি। একাই থাকি"

সব প্রশ্নের জবাব একটা পঙক্তি। ইন্দ্রাক্ষির জীবন যেন ওই কটি শব্দের মধ্যে বাঁধা। আশিস ইতস্তত করছিল কিছু বলবে কি না। এতটা যখন সাবলীল রাখ-ঢাক করে লাভ নেই। দুজনের মাঝে কাচের দেওয়ালটা ভাঙাই শ্রেয়।

"আমার কাহিনিটা একটু অন্য। ডিভোর্সড। ভাড়ায় থাকি"

ইন্দ্রাক্ষি চুপ। কয়েক মুহূর্ত। হাতটা চেয়ারে ছড়িয়ে বলল "চেনা হয়ে ভালোই হল। যদিও চিনি চাইতেই এসেছিলাম, মন বলছিল অন্য কিছু পেলে ভালো, রিল্যাকসেশনের জন্য। থ্যাংকস্ ফর শেয়ারিং দ্য ইভিনিং উইথ মি"

মন চাইছিল আরও কিছু। ভাটপাড়ার রক্ষণশীলতা থামিয়ে দিল। নাঃ। প্রথম দিনে, এর বেশি এগোনো ঠিক হবে না।

"আলাপ হয়ে ভালো হল। আমারও তো কোনওদিন চিনির প্রয়োজন হতে পারে। কে জানে?"

পেগে শেষ চুমুক দিয়ে উঠে পড়ল ইন্দ্রাক্ষি "নিশ্চয়। দরকার হলে কড়া নাড়বেন। চিনি-দুধ ঠিক সময়ই মজুত রাখব" ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসি। মানে বোঝবার আগেই লকেটটা সরিয়ে ব্লাউজের খাঁজ থেকে একটা কার্ড বার করে দিল "আমার কার্ড"

আশিস অবাক। ড্রয়ার থেকে নিজের কার্ডটা ইন্দ্রাক্ষিকে দিয়ে বলল "আপনি কী বেডরুমেও কার্ড নিয়ে শুতে যান?"

বেরিয়ে যাওয়ার আগে চোখ টিপল "এজেন্সিতে কাজ করি। কখন যে প্রয়োজন হবে, আমিই কী জানি? গুড নাইট। চিনিটা আর নিলাম না। পাওনা রইল। কাল দোকান থেকে কিনে নেব। দুধের দরকার হলে বলবেন। কমতি হবে না"

এত বদান্যতার উৎস আন্দাজ করতে না পারলেও চোখ টেপার অর্থ বুঝতে অসুবিধা হল না। ওপাশের ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ হওয়ার আগে আশিস হাত নাড়ল "সুইট ড্রিমস্"

"ডান। আই উইল হ্যাভ অল দ্য থ্রি ডান" আন্দ্রেয়ার কথায় ফোন রেখে চোখের দিকে তাকাল। দৃষ্টি যে মনের শেষ দ্বিধাটুকু নির্মূল করে দিতে পারে, তার জানা। মাছ তবে জালে ফাঁসল।

"ফাইন। হোয়েন ইউ হ্যাভ অর্গ্যানাইজড্ ইওর ফাইনান্সেস, লেট মি নো"

"আই অ্যাম রেডি। হোয়েন ক্যান ইউ গিভ মি এ ডেট?"

মোবাইলের অর্গ্যানাইজারটা উলটে বলল "ফ্রাইডে। হাউ অ্যাবাউট দ্যাট?"

"ফাইন" মাথা নাড়ল আন্দ্রেয়া।

মোবাইলে ডিটেলসটা নোট করার সময় তখনও একটা বিষয় জানত না আশিস। অপারেশনের দুদিন আগে ইন্দ্রাক্ষির ফোন। প্লাস্টিক সার্জারির নয়া সংযোজন। ইন্দ্রাক্ষির অপারেশনের প্রোফাইলেক্টিক অ্যান্টিবায়োটিক্। তার নতুন স্বপ্নের আগাম সংযোজন। স্বপ্নেও ভাবেনি আশিস। ভাবতে শুধু পারে ইন্দ্রাক্ষি।

তাই তো সে ইন্দ্রাক্ষি!

কী রূপ দেখতে চায় আন্দ্রেয়ার - তার বিশেষ অনুরোধ।

এ অনুরোধে সাড়া না দিয়ে সে যাবে কোথায়? এতদিনে সে বুঝে গেছে তার জীবনে একটাই নারী। সেই তো বহু চেনা অন্তরের ইন্দ্র। সেই তো প্রোজ্জ্বল হৃদয়ে অঙ্গীকারের একমাত্র সাক্ষী। সেই তো তার জীবন, মরণ, স্বপন, শয়ন। তার নিভৃত বাসরের একা সম্রাজ্ঞী। তার ডাকে সাড়া না দিয়ে যাবে কোথায়?

তার জীবনের ধ্রুবতারা, না-লেখা বন্ধনের একমাত্র সহমর্মী। নতুন রূপে খুঁজে পাওয়া বনলতা সেনের শান্তির প্রলেপ। বহুদেশ ঘুরে একান্ত তরল অনল গরলে, নিভৃত অন্ধকারের আলোয় অগ্নিসাক্ষী। তার একমাত্র ইন্দ্রাক্ষি।

পাঁচ

রাজেন্দ্র চতুর্বেদী ওরফে রাজু তার ঐতিহ্যময় বেদিক পরম্পরার কলঙ্ক। জীবনের শুরু দালালি দিয়ে। বাসভূমি মথুরার কাছে, বাবা সংস্কৃতের অধ্যাপক। পণ্ডিত বাবা যতই মনে করাক না কেন, ওরা সম্রাট অশোকের নবরত্নের অন্যতম বীরবলের বংশধর, যে চতুর্বেদী ছিল। কোনওদিনই বিশ্বাস করেনি বাবাকে। গোঁড়া রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম। অ্যালেকজান্ডার দ্য গ্রেটের জমানা থেকে চতুর্বেদী পরিবারের পরম্পরা। এরা যুগ-যুগান্ত শ্রদ্ধার পাত্র চারটি বেদের পাণ্ডিত্যের জন্য।

রাজু অন্য ধাতুতে গড়া। মহিলা সংগ্রহ করে খদ্দেরের কাছে বেচায় পারদর্শী। মুম্বাইয়ের নিষিদ্ধ পল্লিতে তার অবাধ বিচরণ। মাফিয়া, আন্ডারওয়ার্ল্ড গ্যাং, উঠতি তারকা, জাল সাধু, নেশাখোর, দালালদের পীঠস্থান যে দুনিয়ায় অপরাধ ও শাস্তির সহাবস্থান। এখানেই রাজু স্বাভাবিক, সক্রিয়, তৎপর। মক্কেলদের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ। তাই কেউ রাজুর ক্ষতি করে না। মথুরার রংহীন জীবনের চেয়ে মুম্বাইয়ের এই এলাকা অনেক প্রাণবন্ত। পরিবারের মুখে চুনকালি লেপে, বাবার ছত্রছায়া থেকে পালিয়ে, নিজের ভাগ্য গড়তে তার এখানে পদার্পণ। প্রথমে কষ্ট হলেও একগুঁয়েমির জেরে পাকাপাকি নিজের জায়গা করে নিতে সক্ষম এই দয়াহীন দুনিয়ায়। ধীরে ধীরে জাল বুনে একদল চ্যালাও জুটিয়েছে। ভালো কামাই। কিছুদিনের মধ্যে মেয়েছেলের দালালিতে আভিজাত্য আনতে নিজের অফিসও খুলেছে। ক্রমশ মক্কেলদের ক্লাসের পরিবর্তন। রাজুরও উঁচু সোসাইটিতে বিচরণ।

নিঃস্ব থেকে সর্বস্ব। এই রাজুর কাহিনি।

প্রেগন্যান্ট হয়ে ঘেঁটে দিল অনুস্কা। শালা কন্ডমও ফুটো হয়ে যায়, ভাবতে পারেনি রাজু। অনুস্কা ধারভির। ‘ভাই’ দাগি ধমাকা কাম্বলের রখেল। ভয় ওর সাগরেদরা না পিছু ধাওয়া করে। আসল নাম দিলীপ কাম্বলে। বোম বানাতে ওস্তাদ বলে ‘ধমাকা’ উপাধি। প্রেগেন্সিতে অনুস্কার বিবর্তন। রাখেলের থেকে সংসার করে শান্তির পক্ষপাতী। নিরন্তর ঘ্যানঘ্যানানি ‘সাদি করো। মুঝসে সাদি করো’ মৌমাছির আওয়াজের মতো বিরক্তিকর। রাজু অথৈ জলে। বোকা মেয়ে কোথাকার। কে বলেছিল তার সঙ্গে শুতে? মাগি ইচ্ছে করেই ফাঁসিয়েছে। ওই তো কন্ডমের সাপ্লায়ার। নিশ্চয়ই ফুটো মাল লাগিয়ে বাগে এনেছে।

আশ্চর্যভাবে ধমাকা সাগরেদদের পাঠাল না রাজুর মোকাবিলা করতে। কাম্বলে জানত। মনে মনে রাজুকে অভিনন্দন দিল অনুস্কাকে ঘাড় থেকে নামাবার জন্যে। রাখেল তো। তার কি একটা রাখেল? অন্যদের কে দেখবে? সুন্দরী হলেও অনুস্কা টাইম-পাস মস্তির জন্য। তার আসল ভালোবাসা বোম। রাগে ফুঁসছে রাজু। কী করতে পারে? মাগিটা তাকে চুনা লাগিয়েছে। ভীত রাজু কোণঠাসা বন্দি বাঘের মতো। বাঘ জালে ফাঁসলে আত্মরক্ষা করে। এটাই জঙ্গলের নিয়ম। রাজুও ওদের মতো ভাবতে লাগল বেরোবার উপায়। এ কাঁটা গলায় লটকালে শুধু ধান্দার ক্ষতি নয়, তার অবাধ জীবনেরও ইতি।

অনুস্কাকে ডেকে পাঠাল। সূর্য মুম্বাইয়ের ঝাপসা স্কাইলাইনের পেছনে অস্ত যাচ্ছে। দামি সোফায় বসিয়ে কাঁধের ওপর হাত রেখে বিগলিত দৃষ্টি। গভীর আবেগে চোখ বুজে অনুস্কার মাথা তার বুকে।

“চল না কাহি ঘুম আয়ে”

আহ্লাদে গদগদ অনুস্কা “কাহাঁ?”

“হরদোয়ার”

“তু যাঁহা যাঁহা চলেগা, মেরা সায়া সাথ হোগা” ফিল্মি সুরে গুনগুনিয়ে উঠল অনুস্কা।

মনে মনে রাজু হাসল। ইয়ে মুম্বাইওয়ালা ফিল্মকে আলওয়া ঔর কুছ সোচ নেহি সকতা। উসে জো ভি করনা হ্যাঁয়, মুম্বাই সে বহত দূর। হরিদ্বার যেতে যেতে ভাবল ওকে কোথায় ফেলা যায়। উৎকণ্ঠার ঘূর্ণিঝড়।

হরিদ্বার। ঈশ্বরের মর্ত্যনিবাস। হিন্দুদের পীঠস্থান। গঙ্গার উৎস স্রোতস্বিনী আলকানন্দা আর ভাগীরথীর সংযোগস্থল দেবীপ্রয়াগে। সেখানে থেকে তীব্রতা হ্রাস করে ইন্ডো-গ্যাঞ্জেটিক প্লেনে ভারতীয় সভ্যতার মানচিত্র এঁকে গঙ্গার অবরোহণ বেলাভূমি হরিদ্বারে। পবিত্র গঙ্গা যদি হিন্দুত্বের কেন্দ্রবিন্দু হয়, হরিদ্বার তারই সিংহদ্বার। হরির অর্থ বিষ্ণু। দ্বারের অর্থ দরজা। তাই হরিদ্বার বিষ্ণুর প্রবেশদ্বার। আবার হরদোয়ার শিবেরও দরজা। কোটি লোক হরিহরের এই একাত্ম পুণ্যস্থানে গঙ্গায় ডুব দিয়ে পাপ ধুতে ছুটে আসে মোক্ষলাভের আশায়। আসে শান্তি, প্রার্থনা, প্রায়শ্চিত্ত করতে।

রাজুর এখানে আসা অবশ্য এসবের জন্য নয়। অনুস্কার ঠিকানা লাগাতে। যদিও জানে না কীভাবে। দিল্লি পর্যন্ত উড়ানে। সেখান থেকে ছ-ঘণ্টা গাড়িতে হরিদ্বার। অনুস্কা যদিও এই ধকলে ক্লান্ত তবুও মন প্রসন্ন। যাত্রার উৎকর্ষতায় উৎফুল্ল। যদিও জানে না তার পরিণতি। মুম্বাইয়ের লোকাল ট্রেনে চড়তেই অনীহা। রাজু দ্বন্দ্বে। জানে না, এরপরে কী? যাত্রার বেশিরভাগ সময় ভাবলেও কোনও সদুত্তর মাথায় এল না।

"কিতনা দিন ইধর?"

"জো তুমহারি মর্জি" নিজেও তো জানে না।

উদ্দেশ্যহীনভাবে হরিদ্বারের মন্দির থেকে পীঠস্থানে ঘুরে বেড়ানো। অনুস্কার ভালো লাগলেও রাজু অধৈর্য। এভাবে তো চলতে পারে না। মুম্বাইতে ঝা চকচকে ব্যবসা যে মার খাচ্ছে। হঠাৎ ঈশ্বর মুখ তুলে চাইলেন। ঘুরিয়ে দিলেন ভাগ্যের চাকা। হর-কি-পৌরিতে স্নান করতে গিয়ে এক সাধুর সঙ্গে পরিচয় - গোবিন্দ মাহারজ।

হরিদ্বারের কোলাহল থেকে দূরে, দেরাদুন হাইওয়ের ওপাশে, পাহাড়ের পাদদেশে গোবিন্দ মহারাজের আশ্রম। প্রার্থনা, ধ্যানে মানসিক জড়তা কাটিয়ে ঈশ্বরের কোলে শান্তির বাতাবরণ। এই নির্জনতায় পাহাড়ি বাতাসের ভাষা শোনা যায় পাখিদের কলকাকলির মধ্যে। তার-ই কেন্দ্রবিন্দুর বেদিতে বসে গোবিন্দ মহারাজ উদাত্ত দরাজ কণ্ঠে ভক্তদের ঈশ্বরের বাণী শোনাচ্ছেন। অনুস্কা তাকে দেখে অভিভূত। ওরা দুজনেই চুপচাপ শেষের সারিতে গিয়ে বসল।

কী কণ্ঠস্বর এই সুপুরুষের! সব সাধুরাই কী এত মোহিত শক্তির অধিকারী? গৌরবর্ণ, ছয় ফিট কোমরবন্ধ অবধি গেরুয়ায়র ছোঁয়া। চওড়া কাঁধ, ঘন কালো চুল, গোবিন্দ মহারাজের খোলা ওপরাংশের মাংসপেশি যেন পাথর খোদাই। চোখের শ্যেন দৃষ্টি সাধারণ কাউকে বিদ্ধ করে ছিঁড়ে ফেলতে পারে। অনুস্কা মুগ্ধ, অভিভূত। বাবাকে দেখে তার নিম্নভাগের সিংহদ্বার, হরিদ্বারে আবার দ্বার খুলতে আগ্রহী। যদি সুযোগ মেলে। বাবার আকর্ষণ অবহেলার নয়। বয়স? কী হবে জেনে? রাজু লক্ষ করল বাবার সব শিষ্যই মহিলা। ভাবল দুজনের মধ্যে এখানেই মিল। দুজনেরই মহিলামহলে বিচরণ। যদিও বাবার দৈববাণী বুঝতে অপারাগ, মহিলা ভক্তবৃন্দ বিহ্বল, মন্ত্রমুগ্ধ। বাণীর অন্তে করতালি, বাবার কণ্ঠে ছন্দ মিলিয়ে সমুজ্জ্বল দৃষ্টিতে শূন্যতার দিকে চেয়ে। বাবার দুপাশে কাঙ্ক্ষিত দুই সুন্দরী। প্রয়োজনে বাবার খিদমতের জন্য প্রস্তুত। রাজুও মুগ্ধ।

গোবিন্দ মহারাজের শ্যেনদৃষ্টি চোখ এড়ায়নি রাজু আর অনুস্কার প্রবেশ।

হাত তুলে অনুস্কাকে আহবান "ইধর আও বেটি। মেরে পাস বৈঠ"

হতচকিত অনুস্কা। বাবা তাকে ডাকছে! সে ধন্য। অনুস্কা রাজুর সম্মতি চেয়ে তাকাতে, রাজু মাথা নাড়ল। উঠে লাজুকভাবে মহারাজের কাছে গিয়ে বসল। তার সান্নিধ্যে মুগ্ধ। তাই দেখে রাজুর বিকৃত বুদ্ধির নতুন ফোয়ারা।

"ক্যায়সে লাগা?" বাণীর শেষে রাজুর প্রশ্ন।

"ক্যায়সা? স্বরগ কে তরাহ"

"তুমহারে ইয়ে হালত মে, আশ্রম মে কুছ দিন বিতানে সে শান্তি ঔর বিশ্রাম দোনো হি মিলেগা" ধূর্ত রাজু বোঝাল।

অনুস্কা আর কী বেশি চাইতে পারে? তৎক্ষণাৎ রাজি। রাজু বোঝাল ব্যবসার কাজে তাকে কিছুদিনের জন্য মুম্বাই যেতে হবে। ফেরত এসে অনুস্কাকে নিয়ে যাবে। অনুস্কা রাজি। সেইমতো বাবার সঙ্গে ভেটের অভিপ্রায়। বাবার সানন্দ সম্মতিতে রাজু স্তম্ভিত।

"নাম কেয়া বেটি?"

অনুস্কা গোবিন্দ মহারাজের পদদেশে ষষ্টাঙ্গে প্রণাম সেরে নাম বলল।

"ও কুছ দিন আপকে চরনো মে বিতানা চাহতি হ্যায়" রাজুর মহারাজের কাছে আবদার "শান্তিকে লিয়ে। পোয়াতি হ্যায়..."

বাবার বুঝতে অসুবিধা হল না "বেটে, ইয়ে মহিলাওকে আশ্রম। জিতনা দিন খুশ রহে। লেকিন গর্ভবতী ঔরতকে লিয়ে মুস্কিল হো সকতা হ্যায়"

"কুছ দিনও কি তো বাত হ্যায়। রাখ লিজিয়ে। মুম্বাই সে লৌট কর ম্যায় লে জাউঙ্গা। আখরি সময় তো উহা বিতানেই হোগা"

"ঠিক হ্যায়" বাবার সম্মতি।

অনুস্কা ঘোরাচ্ছন্ন। খুশি। ভাবছে কী ভাবে এই সুপুরুষের শয্যাসঙ্গী হওয়া যায়। জানে না, ভণ্ড বাবা মহিলাদের সঙ্গমের আনন্দযজ্ঞে পারদর্শী।

ব্যাবসার খাতিরে রাজুর মুম্বাইতে প্রত্যাবর্তন। প্রতিজ্ঞা, কোনও কিছুতেই আর এমুখো হবে না। অনুস্কা ভাবল, ভালোই তো। রাজু যাতে আর এ পথ না মাড়ায়। সানন্দে রাজুকে বিদায়। গোবিন্দ মহারাজের আশ্রমের লীলাক্ষেত্রে আরেক নারী সংযোজন। অনুস্কা বাবাকে বোঝাতে সক্ষম হল, এই মুহূর্তে গর্ভস্থ সন্তানের অনাবশ্যকতা। শান্তি, ধ্যানই তার কাম্য বাবার তত্বাবোধনে। খালাস করা হল ভ্রূণকে দেরাদুনের এক ঘিঞ্জি ক্লিনিকে। অন্যান্য মহিলাদের বারবার গর্ভবতী করার জন্য বাবা এই ক্লিনিকের নিয়মিত ক্লায়েন্ট। সিদ্ধহস্ত।

মিলনাত্মক ধর্মচর্চা হরিদ্বারে সম্ভব নয় বলেই বসতি থেকে দূরে, পাহাড়ের পাদদেশে, জঙ্গলের মধ্যে এই আশ্রম। আশ্রমের গতিবিধির ওপর ছানবিন করা ব্যক্তিরা নিমেষে উধাও। আর খোঁজ পাওয়া দুষ্কর বাবার স্বরচিত জালে।

অনুস্কার পুরনো অভ্যাসে প্রত্যাবর্তন - সেক্স আর ঠগবাজি বাবার সম্মতিতে চোখের সামনে। বাবাও সেই পথের পথিক। মধুর এই জীবনে, অনুস্কা বাবার কাছের লোক হয়ে উঠল। আশ্রমের ছত্রছায়ায় তার ক্রিয়াকলাপের ব্যাপ্তি একদা বাবার প্রিয় দীপার প্রতিবাদী বিষদৃষ্টি উপেক্ষা করে। বাবার কাছে প্রতিবাদ করে বিফল। বাবার আনুস্কাকেই পছন্দ। পুরনো মাল দীপাকে নিয়ে সেও বীতশ্রদ্ধ, ক্লান্ত।

আশ্চর্যভাবে রাজুর সঙ্গে এই ভণ্ডের যোগাযোগে কিন্তু ছেদ পড়েনি। দুজনেই নারীর পূজারি। বিনিময় অবশ্যম্ভাবী।

বছর দুয়েকের মধ্যে দীপার বিস্ফোরণে বাবা গোবিন্দ মহারাজ বীতশ্রদ্ধ। অনেক হয়েছে। আর নয়। দীপা কী ভুলে গেছে বাবা তাকে কত করেছে? মুজাফফরনগরের এঁদো ঘিঞ্জি বস্তি থেকে আশ্রমে শুধু স্থানই দেয়নি, কল্পনাতীত নির্মল আনন্দও তো দিয়েছে। অনুস্কার নখের যোগ্য নয়। অনুস্কা বহ্নিশিখা। আগুন জ্বালাতে পারে নিম্নাঙ্গ থেকে সারা দেহে। নতুন রূপে আঁকতে পারে কামসূত্র। দীপা শুধু সহ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে নয়, বোঝাও বটে। এর আগে এমন কোনও ধূর্ত নারীর সংস্পর্শে আসেনি।

গোধূলি রাতের দিকে ঢলে পড়েছে। ভক্তরা ডেরায় ফিরে গেছে। বাবা দীপাকে নিয়ে গেল আশ্রম থেকে দূরে পাহাড়ের গা ঘেঁষা ঝর্নার ধারে। একাকী দুজনে সবুজ ঘাসের গালিচায় বসে। হাতে হাত। কাছে টেনে নিল দীপাকে।

আলিঙ্গনে বিহ্বল দীপাকে প্রশ্ন "বাত কেয়া দীপা? কেয়া চাহিয়ে তুমহে?"

"আপকো। সিরফ আপকোই চাহিয়ে। বিচ মে অনুস্কা কিউ?"

"ম্যায় তো সবকে লিয়ে। হর কোই মেরে পেয়ার কা হকদার। ঈশ্বরকে মাফিক" বাবার মিথ্যে সান্ত্বনা।

বিশ্বাস হল না দীপার। বাবাকে হাড়েহাড়ে চেনে। বারবার বিরক্তিকর অভিব্যক্তি অনুস্কাকে বহিষ্কারের জন্য। বাবাও দৃঢ় সংকল্প। অনুস্কাই শ্রেষ্ঠ। যত বাক বিতণ্ডা বাড়ছে, ততই অধৈর্য হয়ে পড়ছে বাবা।

"ইয়ে নেগি চলেগা। ম্যায় কভি ইয়ে হোনে নেহি দুঙ্গি। ম্যায় আশ্রমকে হর কে সাথ ইসকা বিরোধ করুঙ্গি"

দীপার চিৎকার কী শান্ত পাহাড়ের বুক চিরে কোথাও পৌঁছচ্ছে? একমাত্র বাবার ধমনি থেকে মস্তিষ্কে। রাগে কাঁপছে। হিংস্র হায়নার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল দীপার ওপর। টানতে টানতে নিয়ে গেল ঝর্নার ধারে। পাইথনের মতো গলা চিপে মুখটা ডুবিয়ে দিল ঝর্নার জলে। কিছুক্ষণ পরে দাপাদাপি শেষ। শিথিল হয়ে গেল দেহটা। চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। থেমে গেছে জীবনের স্পন্দন।

বাবা তখনও চেয়ে আছে ওর ঠিকরে বেরনো চোখে। প্রাণহীনের আকাশের শূন্যতায় দৃষ্টি। কুড়ি বছর আগের পেয়ারের ঝিমলিকে নতুন রূপে দেখছে দুর্গা প্রাসাদ। আজকের গোবিন্দ মহারাজ।

ছয়

অসিতকে স্নেহাশিস জিজ্ঞেস করল "শেষ কখন জীবিত অবস্থায় দেখেছিলে?"

"কাল রাতে" অসিতের মুখ নিচু।

"কোথায়?"

"ওনার ঘরে আমায় ডেকে পাঠিয়েছিল"

"কখন?"

"ঠিক মনে নেই। ঘড়ি তো নেই। দশটা সাড়ে-দশটা হবে"

"কেন ডেকেছিল?"

"সিগারেট আনার জন্য"

"কী সিগারেট?" স্নেহাশিসের গোল্ড ফ্লেকে সুখটান।

"ইন্ডিয়া কিংস চেয়েছিলেন। এখানে পাওয়া যায় না। তাই ক্লাসিক এনে দিলাম"

"বকশিস দিয়েছিল?"

"হ্যাঁ। দশ টাকা" মাথা নিচু, লাজুক উত্তর।

"ঘরে আর কেউ ছিল?" তাকাল অসিতের মুখে। অনেক সময় মুখের এক্সপ্রেশন দেখে কথার সত্যতা বিচার করা যায়।

"না। একাই ছিলেন" দৃঢ় নম্র উত্তর।

"ড্রিংক করছিলেন?"

"হ্যাঁ। গোলাপি নাইটি পরে খাটে শুয়ে টিভি দেখছিলেন। পাশের টেবলে আধ-ভরা গ্লাস ছিল। বোধহয় ড্রিংক হবে"

"কী করে বুঝলে?"

"মদের গন্ধটা আমার চেনা"

"তুমি ড্রিংক এনে দিয়েছিলে?"

"না। উনি রিসর্টে ড্রিংকের অর্ডার দেননি। নিজেই এনেছিলেন। পাশে বোতলও ছিল"

খটকা লাগল। গ্লাস আর নাইটিটা সুইমিং পুলের ধারে পেয়েছে। কিন্তু বোতলটা গেল কোথায়? ঘরে বা সুইমিং পুলের আশেপাশে তো পাওয়া যায়নি। প্যান্টি, ব্রা তো ঘরেই। হয়ত নাইটি পরে, গ্লাস, বোতল নিয়েই সুইমিং পুলে গেছিল। উলঙ্গ হয়ে নিশ্চয়ই নীচে যায়নি। এত রাতে সুইমিং পুলে কেন? রিসর্টে তো অন্যান্য বাসিন্দাও ছিল। নামকরা মডেল। কারও চোখে পড়তে পারে সি-থ্রু নাইটি পরা মেহুলিকে। সে হুঁশ কী ওর ছিল? ড্রিংকের মাত্রা বেশি হলে হুঁশ হারানো অস্বাভাবিক নয়। হলফ করে বলা শক্ত। সুপুরুষ স্নেহাশিস অনেক মহিলা দেখেছে। বুটিক ড্রেসে বা বিবস্ত্র। দু পেগ পেটে পড়লে, সামনে নীল জলরাশি পেলে, বস্ত্রহীন হওয়ার মাদকতা জাগা অজানা নয়। মহামূল্য সেই ওয়াইনের বোতল কোথায়? কে, কেন ওটা সরিয়ে ফেলল?

রক্ষণশীল পরিবারের শিরিনকে নগ্ন দেখেছে। অহল্যা, অর্চনাকেও। সেসব মনে করতে চায় না। কলেজের উজ্জ্বল যৌবন এখন অতীত। মনে করলেই দুর্গতি। অভ্রদিতার সাজানো সংসারে ফাটল। প্রথম যৌবনের উচ্ছ্বাসকে যেমন বাক্সবন্দি করা যায় না, পরবর্তিকালে বহিঃপ্রকাশ করলে সদ্গতির বদলে দুর্গতি যে অনিবার্য সেটুকু বোঝার বুদ্ধি আইপিএসের টপার স্নেহাশিসের আছে।

"রস্তারে দেখলাম এই ফ্লোরে আরও দুজন ছিল"

"হ্যাঁ। ২০৯ আর ২১১ নম্বর ঘরে"

"ওরা কী করছিল?"

"কী করছিল কী করে বলব? আমার ডাক পড়েনি"

রস্তারে দেখেছে ২০৯-তে মিস্টার অ্যান্ড মিসেস বাজোরিয়া। কার মিসেস কে জানে? জিজ্ঞাসাবাদে এসব প্রসঙ্গ না তোলাই ভালো। সমস্যা হতে পারে। বাজোরিয়া বাংলার নামি ফিল্ম প্রডিউসার। বেশি ঘাঁটাঘাটি করতে গেলে ট্র্যান্সফার কেন, চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। এদের অর্থে পার্টিগুলো রঙিন। ওপরওয়ালারা এদের কেনা গোলাম। এতদিনের চাকরিতে এটা বুঝেছে, কারণ ছাড়া, এদের ব্যক্তিগত জীবনে ছানবিন না করাই ভালো।

২১১-তে গোয়েঙ্কা নামের মারোয়ারি ছোকরা ও তার আশিকি। বাবার কাঁচা পয়সায় মেয়ে নিয়ে বিলাসবহুল রিসর্টে ফূর্তি করতে বাধা কোথায়? করবে না-ই বা কেন? এদের জন্যই তো এই বিলাসবহুল রিসর্টগুলো। দোতালার ফ্লোরটা অপেক্ষাকৃত বিত্তবানদের জন্য। তিনতলায় সস্তার ঘর। অনেক খদ্দের বাঙালি গৃহবধূ। বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে নিশিযাপন করতে উইকএন্ডে এখানে।

ম্যানেজার সত্যসুন্দর মাইতি জানে "সব বুঝতে পারি স্যার। এরাই আমাদের গ্রাহক। তাই ঘাঁটাই না"

সত্যি তো। এদের ঘাঁটালে দ্য হেভেন নরকে পরিণত হতে কতক্ষণ। এদের জন্যই এই রিসর্ট। আমোদ-আহ্লাদের উপভোগ্য উপঢৌকন না জোগাতে পারলে রিসর্ট চলবেই বা কী করে? মধ্যরাতে অনেকেরই কিন্তু সুইমিং পুলে নামার সাহস নেই। প্রয়োজনও পড়ে না। ঘরে কামসূত্র প্র্যাকটিসে ব্যস্ততার মধ্যে ফুরসত কোথায়? সেসব ভাবার বিষয় নয়। আইপিএস টপার বোতলের কথা ভাবছে। গেল কোথায়? হঠাৎ শিরিনই বা কেন এত বছর পর ফোন করল মেহুলির খবর নিতে? নিছক কলিগের জন্য উৎকণ্ঠা? না কি, পেছনে অন্য কোনও স্বার্থ? অন্য কিছু জড়িয়ে? আবেগ সরিয়ে পুলিসের দৃষ্টিতে দেখছে শিরিনকে। মেহুলি এখন বডি নাম্বার! কত সহজেই না জলজ্যন্ত তরতাজা প্রাণ একটা বডি নাম্বার হয়ে যায়। বিবস্ত্র, না নতুন রূপে সজ্জিতা সে নিয়ে এখন কারও মাথাব্যথা নেই।

নাইটি পরে স্নান করা যায় না। তাই ওটা পোলের রডে ঝুলিয়ে নগ্ন হয়ে সুইমিং পুলে স্নান। রাতে আর কে দেখবে? মেহুলি কী সাঁতার জানত? ওয়াইনের নেশায় জলে ডুব দিতে কার না ভালো লাগে? সাঁতার জানে কি জানে না নেশার ঘোরে খেয়াল করার অবস্থায় ছিল না। আত্মহত্যাও তো হতে পারে? সুদূর মুম্বাই থেকে এক নামি মডেল মেদিনীপুরের রিসর্টে আত্মহত্যা করতে আসবে কেন? শুধু নাইটি জড়িয়ে সুইমিং পুলে গেছিল, বোতল গ্লাস সমেত। তারপর? এই তারপরটাই খুনের সূত্র।

"তুমি ওনাকে সুইমিং পুলে যেতে দেখেছিলে?"

"না। বকশিশ নিয়ে ঘরে চলে আসি। ঘন্টি আছে। দরকার হলে ডাক পড়বে। যদিও সারারাত ঘন্টি বাজেনি। কেউ ডাকেনি বলে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম"

অসিতকে ছাড়ার আগে শেষবারের মতো বাজিয়ে নিল "এখানে থাকার সময় আর কেউ কী ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল?"

"না" কী মনে হতে বলল "হ্যাঁ, একজন এসেছিলেন। ধুতি ফতুয়া পরা মাঝবয়সি লোক। মনে হল এখানকারই। বারবার ওনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছিল। মেমসাহেবকে জিজ্ঞেস করতে উনি হাত নেড়ে বললেন, কারও সঙ্গে দেখা করতে চান না। একা থাকতে চান। পরে লোকটিকেও আর খুঁজে পেলাম না"

"তুমি চেন?"

"আগে কখনও দেখিনি"

"কীসে করে এসেছিলেন?"

"বলতে পারব না"

“ওই যে বাইরে গাড়িটা রাখা ওতে কে এসেছিল?”

“ওই ইন্ডিকা গাড়িটায় তো মেমসাহেব এসেছিলেন”

“ড্রাইভার?”

“নীচে আছে নিশ্চয়ই। ভাড়া গাড়ি তো”

বন্ধ ইন্ডিকা গাড়িটা আছে, ড্রাইভার বেপাত্তা। হলুদ নাম্বার প্লেট। মানে ভাড়া গাড়ি। অনেক খুঁজেও ড্রাইভারের হদিস পাওয়া গেল না। মৃত্যু দেখে পুলিসের ভয়ে কেটে পড়েছে। কিংবা ইনভলভড্‌ও থাকতে পারে। কে জানে? ও-ই হয়ত বোতলটা সরিয়েছে। আরেক উটকো ঝামেলা। এখন আবার মোটর ভেহিকলস থেকে গাড়ির মালিকের হদিস বার করা। কেন যে মাগিগুলো মুম্বাই থেকে এখানে মরতে আসে? অর্থ নেই তো কী? আইপিএস হয়ে কোনও ভুল করেনি। অভ্রদিতা যতই কমপ্লেন করুক না কেন, এই উজ্জ্বল, উচ্ছল জীবনের মাদকতায় শান্তি থাকত না। অভ্রদিতাও হয়ত হারিয়ে যেত। ঋজু এ পৃথিবীর মুখও দেখত না। ঈশ্বর যা করেন, মঙ্গলের জন্যেই।

বাজোরিয়া আর মারোয়ারি ছোকরাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তেমন কিছু মেলেনি। বিবস্ত্র মডেল। মুম্বাই থেকে এসে খুন। পুলিস ছানবিন করছে। ওপরে তিনটি বাঙালি যুগল মুখ ঢাকতে স্বাভাবিকভাবে ব্যস্ত। এই চক্রে পুলিসের জেরায় জড়িয়ে পড়লে বাড়িতে জানাজানি, কেলেঙ্কারি।

সবারই একটা কথা “আমরা কিছু জানি না। উনি যে এখানে ছিলেন, তা-ই জানতাম না”

সুন্দরী বিবস্ত্র মেয়ে মডেল মেহুলি। রিসর্টের সুইমিং পুলে মৃত। আগে বুক না করে হঠাৎ এসেছে। স্নেহাশিস ঠিক বুঝতে পারছিল না, কোন দিক দিয়ে শুরু করবে। শিরিনের কাছ থেকে মুম্বাইতে? না ক্লুগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করবে? তবু তো শিরিন একটা লিঙ্ক। চাইলে হার্টথ্রব স্নেহাশিসকে অনেক কথাই বলে দিতে পারে। ফোনে তার প্রতি টান এখনও প্রকট। শিরিনের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

বডি ততক্ষণে পোস্ট মর্টেমে চলে গেছে। মিডিয়ার ভিড়ও ধীরে ধীরে হালকা হতে শুরু করেছে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যে যার মতো করে রং চড়াবে। যত রং, যত ড্রামা, তত খাবে। এ নিয়ে মিলেনিয়াম পার্কে একটা লাইভ অনুষ্ঠানও হতে পারে। কোনটা ঠিক, কোনটা বেঠিক। কী হওয়া উচিত ছিল, কী হয়নি, সমাজ কোন দিকে এগোচ্ছে। মতামতের ফুলঝুরি। এসএমএস পোল নিয়ে মিডিয়া বেশ কিছু কামাবে। হতভাগ্য স্নেহাশিস। মাস মাইনেয় সেই মেদিনীপুরে। শেষমেশ এই মৃত্যুর কোনও কূলকিনারা হবে না। একদিন বিগত অনেক ইতিহাসের মতো এটাও স্মৃতির পাতায় জায়গা করে নেবে। কিংবা কিছুদিন পর তাও হয়ত আর থাকবে না। যদি না কেস কোনও নতুন বাঁক নেয়। তখনও তাকে এই কেস নিয়ে লড়ে যেতে হবে, পাবলিক প্রসিকিউটারের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে।

“হ্যালো শিরিন, ব্যস্ত?”

“না ফ্রি। এই মাত্র শুট থেকে ফিরলাম”

“কোথায় আছ?”

“আন্ধেরিতে। ফ্ল্যাটে। সারাদিনের ধকল। কী আর করা যাবে? যতদিন বয়েস আছে কিছু কামিয়ে নিচ্ছি। বয়েস চলে গেলে তো কেউ পুঁছবে না”

রোম্যান্টিক স্বরে বলল “তুমি চিরযৌবনা। তোমার বয়েস কে কেড়ে নেবে?”

ব্রা-টা ড্রেসিং টেবলের স্টুলে ফেলে, প্যান্টি পরা শিরিন খাটে বসে সিগারেট ধরাল “ফুল চন্দন পড়ুক তোমার মুখে”

“আমার কপালে ফুল-চন্দন নেই। মুখঝামটা আছে”

“কেন?” সিগারেটের ধোঁয়া শূন্যে।

“মেহুলির মৃত্যুর কূল-কিনারা করতে না পারলে এ ছাড়া আর কী জুটবে? কোত্থেকে যে শুরু করি... তুমি যদি মুম্বাই চক্র সম্বন্ধে না কিছু জানাও”

“ফোনে এসব সম্ভব? মুম্বাই চলে এস”

শুধুই কী নিছক ইনভেস্টিগেশনের জন্য ডাকা? না পেছনে অন্য কোনও অভিসন্ধি? বুঝতে পারল না। মন বলছিল, কোথাও পৌঁছতে হলে মেহুলির রণক্ষেত্র মুম্বাইতে যেতে হবে। পশ্চিম বাংলায় বসে আধখ্যাঁচড়া তদন্ত করা যেতে পারে, কিন্তু আসল যোগসূত্র কোনওভাবেই পাওয়া সম্ভব নয়।

“মেহুলি কী কলকাতার মেয়ে?”

“ওর অরিজিন্যাল বাড়ি কাঁথিতে। যদিও কর্নফিল্ড রোডে থাকত। এখন অবশ্য ওরা মুম্বাইতে সেটেল্ড”

“ওরা?”

“মা আর ও। বাবা গত বছর মারা গেছেন। এক ভাই। শুনেছি দিল্লিতে থাকে”

“কতটা চেন ওদেরকে?”

“প্রফেশনালি এ লাইনে যতটুকু”

শিরিনকে না ধরলে হবে লিঙ্কস পাওয়া যাবে না। তবু যখন বলেছে কাঁথিতে বাড়ি, ওখানে একটু ছানবিন দরকার। যদি কোনও সূত্র পাওয়া যায়। বিশেষ করে, ধুতি-পাঞ্জাবি পরা আগন্তুকের।

“কাঁথিতে কোথায়?”

সিগারেটটা অ্যাসট্রেতে নিভিয়ে বুকে হাত বুলিয়ে বলল “অতশত জানি না। শুনেছিলাম ওদের দেশের বাড়ি কাঁথি। তুমি কী মুম্বাই আসবে?”

“তুমি ডাকলে না এসে পারি”

এতদিনের লুকোনো ইচ্ছেটা একদিনের জন্য হলেও বাস্তবে। এই আশায় বলল “কবে আসবে?”

“নেক্সট উইক। ফ্রি আছ?”

“তুমি এলে অ্যাসাইনমেন্ট নেব না। ফোন করে দিও। এয়ারপোর্টে রিসিভ করব”

“দরকার হবে না। মুম্বাই পুলিসের গাড়ি আছে। ফোনে জানাব কবে যাচ্ছি”

স্নেহাশিস অভ্রদিতার কথা ভাবছিল। মুম্বাই যাবে শুনলেই অভ্রদিতা বাপের বাড়ি যাওয়ার কথা বলবে। সে যাক। অনেকদিন যায় না। ঋজুকে নিয়ে নয় কয়েকদিন কাটিয়ে আসুক।

ট্র্যান্সফার পেতে গেলে তো কিছু করে দেখাতে হবে। মেহুলি থাকুক চাই না থাকুক, সেটা বড় নয়। মেহুলির হাত ধরে উত্তরণটা পাকা করলে, মন্দ কী?

কাঁথিতে গিয়ে অনেক ছানবিন করে একটা সূত্র পাওয়া গেল। মেহুলিদের আদি বাড়ি নিউ বাস স্ট্যান্ড এলাকায়। চাকরি সূত্রে বাবা কলকাতায় থাকতেন। মাঝেমধ্যে পুরনো বাড়িতে আসতেন। পুরনো বাড়িটা প্রায় ভেঙে পড়ছে। ইটগুলো খসে খসে পড়েছে। কবে রং করা হয়েছিল বোধহয় বাড়ির বাসিন্দারাও ভুলে গেছেন।

কড়া নাড়তেই দরজা খুলল এক বৃদ্ধা। সত্তরোর্ধ্ব তো বটেই। স্নেহাশিসের মনে হল আশি ছুঁয়েছে। পরনে সাদা থান। বিধবা।

“তুমি কে বাবা?” চশমাটা ঠিক করে বৃদ্ধা ওকে দেখল।

আইডি কার্ড দেখিয়ে ভেতরে ঢুকে বলল “আপনি এখানে একাই থাকেন?”

“হ্যাঁ বাবা। বস” চৌকির ওপর বসল।

বৃদ্ধা ঘরের কোণ থেকে একটা পিঁড়ি টেনে বলল “কী হয়ছে বাবা?”

“আপনি মেহুলির কে হন?”

“মেহুলি!?” ভ্রু কোঁচকাল বৃদ্ধা “বিপিনের মেয়ে? ওকে আমরা কেল্টুস বলি। বিপিন আমার পরের ভাই। ও তো গত বছর মারা গেছে”

“জানি” যেন অনেক কিছুই জানে বিপিনের সম্বন্ধে “বিপিন তো ছেলে-মেয়ে-বউ নিয়ে কলকাতায় থাকত। এখানে আসত?”

"দু-মাসে একবার। ওরা যখন কলকাতায় ছিল। তারপর বম্বে চলে যাওয়ার পর চিঠিপত্রে যেটুকু যোগাযোগ"

"মেহুলি মানে কেল্টুস আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে বাবা মারা যাওয়ার পর?"

মাথা নাড়ল "নাঃ। ওরা বম্বেতে বড় হালে থাকে। এই বুড়ি পিসিমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে কেন? ক'দিন বসে এই যক্ষের ধন সামলাব? আমারও তো দিন হয়ে এসেছে" হতাশার সুর।

"এখানে একাই থাকেন?"

"সেই তিরিশ বছর বয়েসে বিধবা হলাম। তারপর থেকেই তো একা। তখন অবশ্য বিপিনরা এখানে থাকত। বিয়ে করল। কেল্টুস হল। তারপর চাকরি নিয়ে কলকাতা চলে গেল"

"আপনি গেলেন না?"

"এই ভিটে ছেড়ে কোথাও যে মন টেঁকে না। বাকি যে কটা দিন আছি, এখানেই কাটিয়ে মরতে চাই"

"আর কেউ নেই?" স্নেহাশিস হাঁটুর ওপর পা তুলল।

"বিপিনের ছোট ভাই নীতিন বরাবরই ডিব্রুগড়ে থাকে। এখানে কোনওদিন আসত না। এখন তো বয়েস হয়েছে। আসতে চাইলেও আর বোধহয় পারবে না"

"মেহুলি মানে কেল্টুসের সঙ্গে আপনার শেষ কবে কথা হয়েছে?"

"বিপিন যখন মারা গেল তখন ফোন করেছিল"

"ধুতি ফতুয়া পরা কোনও প্রৌঢ়কে চেনেন?"

"এখানে ক'জন প্যান্ট-সার্ট পরে বাবা? সবাই তো ধুতি কিংবা লুঙ্গিই পরে। কেন বাবা?"

"একটু মনে করুন তো। যদি ওরকম কেউ চেনা থাকে?"

"অতীন নয় তো?"

"সে কে?"

"আমার ছোট ভাই। নীতিনের পরে"

"ঠিকানা জানেন?"

"কেন জানব না? ওই তো নিউ বাস স্ট্যান্ডে থাকে। যদিও আমার সঙ্গে যোগাযোগ নেই। একবার টাকা চাইতে এসেছিল। দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছি। আর এমুখো হয়নি। আরে, সারা জীবন যে দিদিকে একবারও দেখলি না, খালি টাকার সময় তার কথা মনে পড়ে? শ্বশুরবাড়ি থেকে কোনও সাহায্যই পাইনি। বাপের বাড়ি থেকেও সেভাবে নয়। যেটুকু বা আমাকে একটু করেছে, সে একমাত্র বিপিনই। শেষকালে, মরার আগে এই আত্মীয়-কুটুম্বদের নিয়ে থাকার চেয়ে একা থাকা অনেক ভালো" শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছলেন বৃদ্ধা। নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন "আজকাল দয়া-মায়া কমে গেছে। তুমি এসব প্রশ্ন করছ কেন বাবা?"

একটু গুছিয়ে স্নেহাশিস বলল "মেহুলি মানে কেল্টুস আর নেই"

"কী বলছ বাবা! জানতাম এটা হবে। আমি জানতাম। কী হয়েছে?"

"এই মেদিনীপুরেই একটা রিসর্টে খুন হয়েছে। মারা যাওয়ার চারদিন আগে ও মেদিনীপুরে এসেছিল। ভাবলাম হয়ত আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে"

"না তো। করলে তো এখানে এসেই থাকতে বলতাম। ওদেরই তো বাড়ি। এখন ওরা বম্বের ডাকসাইটে লোক। এই পোড়ো বাড়িতে থাকবে কেন?"

"যদি আপনার ছোটভাই অতীনের ঠিকানা আর নম্বরটা দেন"

বৃদ্ধা পিঁড়ি ছেড়ে উঠল "দাঁড়াও দেখি কোথায় আছে" ভেতরের ঘরে এগোতে গিয়ে বলল "পইপই করে বিপিনকে বলেছিলাম মেয়েটাকে বম্বেতে নাচানাচি করতে দিস না। লোভ। বুঝলে বাবা, লোভ। লোভে পাপ। পাপে মৃত্যু" বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

স্নেহাশিস ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল সিলিংয়ে প্রাগৈতিহাসিক ফ্যানের দিকে। খসে পড়া প্লাস্টারের ওপাশে ইটের কয়েকটা তাক। তার ওপর সাদা-কালো কয়েকটা ছবি। বোধহয় বৃদ্ধার কম বয়েসের। সঙ্গে যে দুটি লোক তারা বোধহয় ভাই। পাশের বিবাহিতা ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই বিপিনের স্ত্রী। সামনে ফ্রক পরা ছোট শিশুটি সম্ভবত মেহুলি। যখন ছোট ছিল ওরা তো এখানেই থাকত। হয়ত সেই সময়কার ছবি। আজ সেই স্মৃতি ছবি হয়েছে। সম্পর্কটা পুরনো দিনের ছবির মধ্যেই।

মাঝে মাঝে স্নেহাশিসের মনে হয় সম্পর্ক কত ক্ষণস্থায়ী। সব কিছুই প্রয়োজনের হিসেবে বাঁধা। প্রয়োজনের মাপকাঠিতে কখনও তৈরি হয়, কখনও হারিয়ে যায়। পড়ে থাকে স্মৃতি। কেটে যায় জীবন। কিছুই থাকে না। শুধু পড়ে থাকে বস্তাপচা অতীতের পাণ্ডুলিপি। কেউ সেই স্মৃতি রোমন্থন করে জীবনের অর্থ খোঁজে। কেউ তাকে দূরে ঠেলে নিঃসঙ্গ জীবনের বোঝা শুধুমাত্র নিজের বাঁচার তাগিদে টেনে নিয়ে যায়। মানুষের সঙ্গে জীবনের যোগসূত্রটা বড়ই ক্ষীণ।

বৃদ্ধা যখন ঘরে ঢুকছে, স্নেহাশিস তখন চৌকি ছেড়ে উঠে পড়েছে।

বৃদ্ধা ছোট ডায়রি খুলল "দেখ তো বাবা অতীনের নম্বর আর ঠিকানাটা আছে কি না? বুড়ো হয়ে গেছি। আজকাল চোখে ভালোভাবে দেখতেও পারি না। ছানি পড়েছে তো"

স্নেহাশিস ডায়রি থেকে অতীনের ঠিকানা ফোন নোটবুকে লিখল। বৃদ্ধার দিকে বিনম্র হাসি ছুড়ে বলল "অনেক জ্বালাতন করলাম। কিছু মনে করবেন না। আশীর্বাদ করবেন মেহুলি মানে আপনাদের কেল্টুসের মৃত্যুর যদি কূল-কিনারা করতে পারি"

বৃদ্ধা শাড়ি দিয়ে চোখের জল মুছে দরজাটা ভেজাবার আগে বলল "সম্পর্ক না রাখলেও তো রক্তের একটা সম্পর্ক আছে। কেল্টুসের মরার কথা শুনে মনটা ভারী হয়ে গেল। পারবে বাবা, নিশ্চয়ই পারবে। আজকাল তো কোনও খুনের কূল-কিনারা হয় না। দেখ, যদি এই বৃদ্ধার আশীর্বাদ লাগে। আমার তো এ ছাড়া আর কিছুই দেওয়ার নেই"

"সেই আশীর্বাদটুকুই আপনার ছেলেকে দিন" বেরবার আগে বলল।

ওর দিকে সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল "আমার আর্শীবাদ সব সময় তোমার সঙ্গে থাকবে। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন"

লাল বাতি গাড়ির দিকে এগোল। গাড়িটা মিলিয়ে যাওয়ার দিকে চেয়ে ধীরে দরজাটা বন্ধ করে দিল বৃদ্ধা।

সাত

তীব্র গতিতে ছুটে আসছে ট্রাকটা। সোফির মনে হল, ট্রাকটা রাস্তার ডান দিক না ঘেঁষে, ওর গাড়ির মুখ বরাবর এগিয়ে আসছে। ভয়ে শিউরে উঠল। স্টিয়ারিংটা বাঁ দিকে কাটাল। পাশে অনেকটা খাদ। বেশি ঘোরানো যাবে না। তবুও যতটা সম্ভব, বাঁ দিকে কাটিয়ে ট্রাকের গতিপথ থেকে সরে দাঁড়াবার চেষ্টা।

পাশের সিটে অঙ্কুর ভয়ে শিউরে উঠল "ঔর বাঁয়ে ঘুমাও"

"কৈসে? দেখ নেহি রহে হ? পাস মে গেহরাই"

অঙ্কুরের-ই চালাবার কথা ছিল। বেশি হুইস্কি খেয়েছে বলে সোফি দেয়নি "দেখ রহে হো অপনে আপকো? কিতনা পিয়া। ঐসে দারু পি কর গাড়ি চলানে হাম সব উপর চলে যায়েঙ্গে। লো, পাস মে বৈঠো। ম্যায় চালাতি হুঁ"

পেছন থেকে শিবানী করঞ্জোয়ালা "হাঁ সোফিকো হি চলানে দো। ইয়ে শালি কমবক্ত সন্নিধি ভি বহত বিয়ার পিয়া। সারে রাস্তে পিসাব করতে করতে জায়েগি। শালি ইধর ইতনা পিসাবখানে কাঁহা?"

পাশ থেকে সন্নিধির প্রতিবাদ "কেঁও মৌসি? সারে হাইওয়ে তো এক পিসাবখানা"

"লো বাত শুন। ইয়ে কমবক্ত ভি দারু পিকর উলটি সিধি বোলতি হ্যায়। কিতনি বার কহা দারু পিকর উলটি-সিধি বোলনেকা নহি, করনেকা হ্যায়। ইসে মরদ লোক খুশ হোতা। উলটি-সিধি বোলে তো মরদকা দিমাক চড় যাতা। মস্তিকা মুড বিগড় যাতা"

সোফি গাড়ির স্টিয়ারিং হুইলে বসে বলেছিল "চলো। ম্যায় হি চলা লেতি। বৈঠ মৌসি। ... সন্নিধি পিসাব করনা হ্যায় তো অভি কর লে। রাস্তে মে ঝোপড়ি ভি নেহি মিলেগা"

"পিসাব কী তেরা বাপকা মাল? যব চাও নিকল আয়েগা?" সন্নিধি খেঁকিয়ে উঠল।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে সোফি বলল "লে ফির চল্। পিসাব কো তেরা বাপকে পিঞ্জরে মে বন্ধ কর। নভিন ভোরা জব বোলে নিকল না"

পেছনের দরজাটা সন্নিধি বন্ধ করল "নিকলনে তো পড়েগাহি। নেহি তো শালি রোটি কমাতে কমাতে জিন্দেগি গুজর জায়গা। হমে ভি তো অনসূয়া বাসু বননা হ্যায়" অন্ধকারে হেড-লাইটটা অন করে সন্তর্পণে গাড়ি চালাতে লাগল। মাঝরাত হলেও ম্যাথেরন পৌঁছতে হবে। অঙ্কুর, সোফি আর সন্নিধি, রাত নটায় মুম্বাইয়ের নাইটক্লাব 'ইনসমনিয়া' থেকে বেরিয়েছে। মাঝে মৌসিকে তুলেছে। উইকেন্ডে উপরি কামানোর সুযোগ। ছাড়ে কে?

অন্ধকার রাত। বেশিদূর দেখা যাচ্ছে না। হেড লাইটের আলোয় যতটা। তারপর ঘন অন্ধকার। মুম্বাইয়ের উষ্ণতা কুয়াশায় ম্রিয়মাণ।

"ফগ লাইট জলা দে সোফি" হুইস্কির নেশা জেঁকে বসলেও অঙ্কুরের স্বাভাবিক বুদ্ধি লোপ পায়নি।

ফগ লাইট জ্বালিয়ে যতদূর দেখা যায়। আলোর কণা কুয়াশার মধ্যে মুক্তোর মতো রিফ্লেক্ট করে হারিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে। নেশার ঘোরে তারই ফাঁক দিয়ে রাস্তা ফলো করার চেষ্টা। গাড়ি যাতে বেপথে না যায়। অঙ্কুরের ভেতর চাপা উত্তেজনা। প্রেম-ভালোবাসা। তাও অন্যের মত-মতো? সন্নিধিকে ডাম্প করে মেহুলিকে বিয়ে? হোক না সে নামী-দামি মডেল। অঙ্কুরের কী? ভালোবাসা তো বাজারে বিক্রির নয়। নামের ওপর দাঁওতে চড়াতে হবে।

সন্নিধির সঙ্গে অদ্ভুতভাবে আলাপ। একদিন বিকেলে ব্যান্ডারা বিচে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরছে। হঠাৎ পানিপুরি খাওয়ার শখ। সেখানে আরও একটি মেয়ে। আটটা পানিপুরি শেষ করে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে।

ছিপছিপে কুঁড়ি। নীল জিনস্, সাদা মিনি টপস্। সরু নাভির সাড়ম্বর শোভায় চিকচিকে দুল ঝুলছে। সরু নিতম্ব। এদের গোলগাপ্পা খেলেও ওজন বাড়ে না।

"ব্যাস আঠ মে খতম?" মেয়েটি তার দিকে তাকিয়ে।

"বহত হো গয়া। ইসসে জাদা খানে পর রাতকে খানা ভি বন্ধ"

"আরাম সে খাও। চলো ম্যায় আজ তুমহে খিলাতি। জি ভরকে খাও। ইয়েহি আজকা ডিনার। ... আরে ভাই, উসকো ঔর চার দো। মেরে তরফ সে"

"আপকা শুভনাম?"

"সন্নিধি"

"অঙ্কুর"

"জনম তো বহত পহলে। ফির ভি অভি তক অঙ্কুর? কিসকে?"

"ইঞ্জিনিয়ারিং কা অঙ্কুর। আইআইটি মে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং"

"তব তো শিরফ অঙ্কুর নেহি অসলি দিমাক কে মালিক"

পানিপুরির তেঁতুল জলটা গিলে বলেছিল "আপ?"

"কোম্পানি মে পিআরও"

সেই আলাপ। সেদিন মোবাইল নম্বর বিনিময় আর পানিপুরিতে ইতি। দুটো তরতাজা প্রাণের আবেগ সেখানে থামেনি। ম্যারিন ড্রাইভে হাঁটা। কোলাবার বাড়িতে সামোসা। ইরসে সিনেমা। অঙ্কুরের জীবনে শুধু ছন্দ নয়, অর্থের রূপও। সন্নিধির অর্থ। দ্য নিউ এজে পিআরও। পার্ট টাইম মডেলিং। হিরোইন হওয়ার শখ। ওর কোলাবায় বাড়ি। বাবার মুম্বাইতে একটা ফুড চেনের ব্যবসা। বাবা বলে "এক টাইম ম্যায় সবজি লে কর রাস্তে মে ঘুমতা থা। উঁহা সে ইঁহা। রূপয়ে লুটানে কা নেহি। রখনে কা"

বিচক্ষণ বাবা হাতখরচের জন্য মাসে বিশ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছে। তাতে কী চলে? এক একটা উইকেন্ডে অনায়সেই পাঁচ হাজার টাকা উড়ে যায়। চাকরি থেকেও মাস গেলে হাজার তিরিশ। তাও যথেষ্ট নয়। অগতির গতি, জীবনের আরেক ছন্দের আলোকিত দূত মৌসি। সন্নিধির হাত ধরেই অঙ্কুরের রঙিন দুনিয়ায় প্রবেশ। নট জাস্ট জ্যাঝ বাই দ্য বে, ফ্রে অ্যান্ড আইস, প্রাইভ, ইনসমনিয়া, ব্লিঙ্গ-এর মতো মুম্বাইয়ের নাইট ক্লাবে বিচরণ। মধ্যবিত্ত অঙ্কুরকে নতুন স্বপ্নে ভরে দিয়েছিল। মধ্যরাতের মাদকতা তো ফোকটে আসে না? টাকা চাই। সন্নিধির মাস মাইনেয় পূর্ণ হওয়ার নয়। শর্ত একটাই - মন অঙ্কুরের কাছে, দেহ মৌসির জিম্মায়। অঙ্কুর মানতে না পারলেও, আবেগের কাছে মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে কুরবান করেছিল। সন্নিধির তালে। ওকে যে সে ভালোবাসে।

সোফির বাবার হীরের ব্যাবসা। বেশিরভাগ সময় বাইরে। ছোটবেলায় মা মারা গেছে। মালাবার হিলসের বাড়িতে সোফি সাম্রাজ্ঞি। বাপের অঢেল টাকা। গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট। পড়াশোনার ইচ্ছে নেই। করে কী হবে? ক্লাব, পার্টি, নাচ, ছেলেবন্ধু নিয়ে মশগুল। এখন সেটাও একঘেয়ে। ইয়ং ছেলেদের দেখলে আর উত্তেজনা জাগে না। চাওয়ার থেকে পাওয়াটা বেশি হলে আকাঙ্ক্ষা ক্ষীণ হয়ে আসে। ওর মনে হয় উত্তেজনার পদ্ধতিগুলোও গতে বাঁধা।

"সেক্স তো চার কিসম কা হ্যায়। অভিতক পাঁচওয়া নেহি হুয়া। ইয়ে প্রগ্রেস? জিন্দগি ঘুম-ফির কর দেখনে মেঁ। কেয়া বোলা কিতাব মে? ভ্যারাইটি ইজ দ্য স্পাইস অফ লাইফ"

তাই তো মৌসি ভালো। মাঝে-মাঝে বয়স্ক ক্লায়েন্টদের সঙ্গে মুম্বাইয়ের বাইরে নিয়ে যায়। মন্দ লাগে না। এরা ভেটারান। অনেক শেখা যায়। সঙ্গে ফাইভ স্টার খাওয়া থাকা ফ্রি। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। সেবার যখন চতুর্বেদীর সঙ্গে বেরিয়েছিল, ওর টয়োটা ক্যামরি হাইওয়ের ধারে হঠাৎ দাঁড় করিয়ে দেয়।

"কেয়া হুয়া?" সানগ্লাস খুলে। সোফির চেহারার মধ্যে এমন পুষ্ট মাদকতা আছে যা চতুর্বেদী কেন, মৌসির অন্যান্য ক্লায়েন্টদেরও আচ্ছন্ন করে। দেহটাকে ভোগ করতে চায়।

"পিসাব করনেকা" সান্নিধির কথা 'সারে হাইওয়ে এক পিসাবখানা' মনে হতেই হাসি।

"কেয়া হুয়া?" অঙ্কুরের চোখ এড়ায়নি "ঠিক হো?"

"তুমসে জাদা। একঠো সিগারেট জ্বালা দে না"

নেশার সঙ্গে ধোঁয়ার একটা সামঞ্জস্য আছে। নেশাটা ধোঁয়ার মধ্যে মিলিয়ে যায়। কিংবা ধোঁয়ার বাষ্প নেশার আবছায়ায় লুকোচুরি খেলে। যেমন কায়ার সঙ্গে মায়া। স্বপ্নলোকের ছায়াকে জীবন্ত করতে চায় রঙের ফুলঝুরিতে।

পেচ্ছাপ সেরে রাজু চতুর্বেদী গাড়িতে "রাস্তে মে রুকনা হ্যায়"

"কাঁহা?" অবাক।

"ভওয়ানিশঙ্করকে আশ্রম মে"

"ইয়ে কোই বাত হুয়া? মস্তি করনে আয়ে। আশ্রম মে কেয়া জরুরত?"

"কভি উহা গয়া?"

"নেহি। আশ্রম জানে কে উমর অভি বহত বাকি"

"ফির ওহা চলো। মস্তি হি মস্তি"

"আশ্রম মে মস্তি কা কেয়া?" বুঝতে পারছিল না।

"বহত কুছ। জিন্দেগি কিতনা দেখা? দেখনে সে শিখেগা" সত্যি তো।

শিখনা বহত কুছ। জিন্দেগি দেখনে আভি ভি বাকি। বহত, বহত কুছ। বাঙ্গাল কি ছোকরি শিরিন, মুম্বাই মডেলিং ওয়ার্ল্ড মে অভি তক ঘুসনে নেহি দিয়া। শালি বহত হুঁশিয়ার। ইন বাঙ্গালি লড়কি লোগ দিমাক সে খেলতা। নঙ্গে হোনে পর ভি উনলোগকে দিমাক অ্যাক্টিভ। শোনে সে করনে দেনা - সব ওয়াক্ত দিমাক। কব সটকনা। সিনেমা মে ভি ওহি বাত। অনসূয়া বাসু কৈসে সুপারস্টার? শালি সন্নিধি জাদা পিতি ঔর পিসাব করতি। ধন্দে কে বাত্ ক্র। ধন্ধে সিরিফ নীচে মুরতি। উপর নেহি উগলতি। দিমাক সে কাম লো। দিমাককে নীচে সব চক্কর কে বাত। সোফি বকোয়াস কে লিয়ে জিন্দেগি নেহি জিনে মাঙতা। জিন্দেগি আগে বড়নে। স্টার হোনে পর। পৈসে ফেকনে কে লিয়ে নেহি। জিন্দেগি কা নয়ে রঙ মে।

সন্নিধিকো বোলা থা "দ্য নিউ এজ মে কুছ কর দে"

"কেয়া? এক নই লড়কি সুনেত্রা শালি হামকো ভি হঠা দেগি"

"কৌন হ্যায় ইয়ে ছোকরি?"

"সুনেত্রা আগারওয়াল"

"রাজস্থান সে?"

"নেহি নেহি। ইয়ে শালি ভি বাঙ্গাল কি"

"সব শালি বাঙ্গালি ছোকরি মুম্বাই মে একাঠ্যা। হম মারাঠি লোগ যায় কাঁহা?"

"গুজরাট" সন্নিধি নির্বিকার। সন্নিধি ছোটখাটো ব্যাপারেই খুশি। বাইরে ভাবতে পারে না।

সেই প্রথম ভওয়ানিশঙ্করের নাম শুনেছিল সোফি। পরে বেশ কয়েকবার একলা এসেছে। ট্রেনে মুম্বাই থেকে নেরাল। তারপর টয় ট্রেনে ম্যাথেরনে। কারও ল্যাজ নয়। মস্তি হবে না।

ভওয়ানিশঙ্কর অদ্ভুত সাধু। ধবধবে ফর্সা রং। মুখ ভর্তি দাড়িগোঁফ। সাদা সিল্কের আলখাল্লা। বিরাট হলঘরে উচ্চ বেদিতে আসীন, মুচকি হাসি। চারজন সুন্দরী যুবতী ঘেরা। একজন পা টিপছে। আরেকজন হাঁটুর ওপর হাত রেখে বসে। ফাই-ফরমাস খাটার জন্য আরেকজন। ভক্তদের আশীর্বাদ কুড়োবার জন্য অন্যজন। বেদির নীচে বিশাল ভক্ত মহিলাবাহিনী। সোফি ওদের মধ্যে বসল। বাবা ওদের দিকে চেয়ে মিটমিট হাসছেন। পরে জ্ঞান আর প্রসাদ বিতরণ। প্রসাদ আর জ্ঞানের পালা শেষ করে বাবা দেখবেন। যে মহিলার দিকে চোখ পড়বে ডেকে তার হাতে ফুল ধরাবেন। সে রাতের মেহমান। ঈশ্বর পাওয়ার উপযুক্ত।

ফুল পেয়ে সোফির সেই ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য একবার হয়েছিল। সে রাতের কথা আজও ভোলেনি। ঈশ্বরের নানা রূপে আত্মপ্রকাশ। ভওয়ানিশঙ্কর আত্মপ্রকাশ করেছিল তার আধ্যাত্মিক মহিমায়। আন্তরিক আলোকে। নিজস্ব আঙ্গিক। উদ্ধত লিঙ্গ। দেহ ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি। দেহের মধ্যে ঈশ্বরের অবস্থান, প্রকাশ। পরিতৃপ্তিতে লৌকিক ক্লান্তির অবসান। ইহলোক থেকে স্বর্গলোক। ঈশ্বরের উদ্ধত লিঙ্গকে শিবের আসনে বসিয়ে অচেনা পৃথিবীর অদেখা অনেক রং খুঁজে পেয়েছিল সোফি। সেই দেবতাকে লিঙ্গের ঊর্ধ্বে বসিয়ে, নিজেকে খুঁজতে। আত্মা না দেহ? জানা নেই। খুঁজতে চেয়েছিল দেহের রোম-রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণ-ছন্দকে। নিজের দেহের অজানা অমৃত। পার্থিব স্বর্গলোক। দীক্ষা শুধু মনের নয়। হাতেখড়ি, দেহের ঝলকে। নিজেকে ভুলে রাতের অজানা স্বপ্নালোক থেকে স্বর্গালোক। আসল পাওয়ার মন্ত্র শিখিয়েছিল ভাওয়ানিশঙ্করজি। অলক্ষ্যে। নিভৃত অন্ধকারে।

কিছুক্ষণ আগে মৌসির মোবাইল বাজে “নেহি নেহি বহত রাত হুয়া”

ওপাশের কণ্ঠস্বর জানা নেই। সোফি বুঝতে পারছিল মৌসি কেউকেটা কারও সঙ্গে কথা বলছে “কল সুবে লড়কি লোগ লেকর হাজির”

কোন মক্কেল রে বাবা? রাতে নয়, দিনে মেয়ে চায়! ফোনটা রাখতে নেশার ঘোরে অঙ্কুর বলেছিল “ফির ম্যায় কাঁহা যাউ?”

মৌসির ঘাড় বেঁকিয়ে জবাব “মেরে সাথ তু ভি জায়েগা। তুঝে ভি ঈশ্বরপ্রাপ্তিকে রাস্তে দেখনা হ্যায়। ভওয়ানিশঙ্করজিকে আশ্রম মে”

সোফির কান সজাগ। এখানেও ভওয়ানিশঙ্করজি! চতুর্বেদী থেকে মৌসি। সবাই ভওয়ানিশঙ্করের শরণাপন্ন। সোফিও। ওরা সেকথা জানে না। ভওয়ানিশঙ্করও জানাবে না। গুরুদেব কী রাতের লীলামাহাত্ম্য দিনের বাণীতে শোনায়? সেখানে শুধু ঈশ্বরের নাম।

সেদিন চতুর্বেদী শুধু বাবার পা ছুঁয়ে প্রণামই করেনি। বাবাকে রক্ত-মাংসের ভেটও চড়িয়েছিল। দুপুরে বাবার সঙ্গে বিনিদ্র বিশ্রাম ভুলতে পারেনি সোফি। এ তো নির্বাণ থেকে মহানির্বাণের পথে অনন্ত যাত্রা। আনন্দ,পাওয়া, কামনার অন্তিম পরিতৃপ্তি। অন্য পুরুষ যা দিতে পারে না, বাবাজি পারে। তাই তো তিনি সবার গুরুর গুরু মহাগুরু।

মৌসির কথা টেনে অঙ্কুর বলল “উধর জো চাহা মিলেগা?”

“কেও নেহি? ইস লিয়ে তো হামারে ভগোয়ান”

কথা বাড়ায়নি অঙ্কুর। সে সাধারণ ঘরের। মাহেমে বাবার ছোট্ট ফ্ল্যাট। মেধাবী অঙ্কুরের উদ্দেশ্য আইআইটি থেকে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং করে বিদেশে পাড়ি। যদি বাবাজি সম্ভাবনা বাতলায়। স্বপ্ন ছোট্ট চাকরির মধ্যেই সীমিত থাকত, যদি না সন্নিধির আর্বিভাব হত। সন্নিধি অঙ্কুরকে দেখিয়েছিল জীবনের রঙের অন্য এক রূপ। রূপয়ে রহনে সে দুনিয়া মুটঠি মে। দ্য নিউ এজে নগণ্য চাকরি করতে পারে। ফুডচেন মালিকের মেয়ের চাওয়াটা মোটেই নগণ্য নয়। উচ্ছল পাথেয়গুলো চিনতে কার্পণ্য নেই সন্নিধির। তার উষ্ণ নরম ছোঁয়ায় মধ্যবিত্ত অঙ্কুর দেখেছিল অন্য পৃথিবীর স্বপ্ন। সন্নিধির হাত ধরে, বুক ছুঁয়ে, সম্ভোগের শিখরে দোদুল্যমান সরু নিতম্বের নিষ্পেষণে। শুধু সন্নিধি নয়, দ্য নিউ এজের মালকিনও বরণ করে নিয়েছিল বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তার তাকে।

ওদের পিসাব করা হল না। মনে হল ট্রাকটা গতিপথ ছেড়ে ওদের দিকে ধেয়ে আসছে।

ভয়ে শিউরে উঠল অঙ্কুর “ইয়ে তো হামারে তরফ আ রহা”

“কাঁহা যাউ? বাঁয়ে তরফ জগহ জাদা নেহি” সোফি স্টিয়ারিং আরও ঘোরাল।

পেছন থেকে সন্নিধি চেঁচিয়ে উঠল “মর গয়া। হামে মারনে কা কৌশিস কর রহা!”

প্রচণ্ড আওয়াজ। লরিটা হু হু করে বেরিয়ে গেল। তারপর সবকিছু অন্ধকার।

রাত তিনটে। হঠাৎ মোবাইল বেজে উঠল। অজিত পান্ডে দাগরুশেঠ হাওয়াই গণপতি মন্দিরে পূজা দিয়ে ভাবছিল ভুডওয়ারপেটে রাত কাটাবে। মন সায় দেয়েনি। মন পড়ে সহেলির আখড়ায়। ম্যাথেরনের নিভৃত কোণে। দু-ঘণ্টা ড্রাইভ করে ফিরে এসেছিল সহেলির বাহুডোরে।

কাজকম্ম শেষে সহেলির সঙ্গে যখন ঘুমিয়ে পড়েছে। দূরভাষে কনট্রোলরুমের বাজপেয়ীর গলা "সাহাব এক গাড়িকা অ্যাক্সিডেন্ট হুয়া। অভি ভি কোই জিন্দা হো সকতা। জলদি আইয়ে"

শালে ভোসরি কা। কমবক্ত ইস টাইম মে কিসিকো অ্যাক্সিডেন্ট হোনা থা। অজিত পান্ডে সহেলির বাহুডোর শিথিল করে জামা-প্যান্ট পরল। কর্তব্য আগে। বিবস্ত্র সহেলি তখন গভীর ঘুমে। ওকে ঘুমোতে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

পাহাড়ের খাড়ায় বোল্ডারের পাশে গাড়িটা ঝুলছে। গাড়ি থেকে অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ। মানে কেউ বেঁচে আছে। অজিত পান্ডে তৎপর। বাঁচা প্রাণ নেশার থেকে দামি। মোবাইলে হাঁকডাক শুরু করে দিল। এখনও এখানে প্রাণের স্পন্দন।

অ্যাম্বুলেন্স, ডাক্তার, পুলিস ফোর্স, ফরেনসিক এক্সপার্ট। মাঝরাতে ম্যাথেরনের পথে ভাঙা গাড়ি সহ কতগুলো মানুষকে নিয়ে লড়ে যাচ্ছে অজিত পান্ডে। নেশা কেটে গেছে। কর্ত্যব্যের দামামা। সহেলির উক্তি থেকে বিপরীত। বাঁচানোর স্পৃহা। যেটুকু করার তাকে করতেই হবে। অজিত ঠাওর করার চেষ্টা করল কজন আছে। কজন-ই বা বেঁচে? অন্ধকারে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। টর্চ মারল। একটি তরুণী। একটি তরুণ। রক্তে ঢাকা মুখগুলো অস্পষ্ট। এছাড়াও একজন মধ্যবয়স্কা। গাড়ির জানলার ফ্রেমটা পেটে ঢুকে গেছে। কেয়া মালুম ইসমে কোই জিন্দা হ্যায় ইয়া নেহি। কাটার নেহি লানে সে ঔর কিসিকো নিকল নেহি সকেগা। অন্যান্যদের সহায়তায় একঘণ্টা লাগল বডিগুলো কাটার দিয়ে ফ্রেম কেটে বার করতে। ডাক্তার পালসে হাত দিয়ে বলল "কোই জিন্দা নেহি। শিরফ ও লড়কি ছোড় কর"

তবুও... চারটে বডি অ্যাম্বুলেন্সে তুলে দিয়ে হাসপাতালে পাঠানোর বন্দোবস্ত করে ওদের আইডেন্টিফাই করার কাজে মন লাগাল। রাতে খুব বেশি দেখা যাচ্ছে না। ভোরের আলো না ফোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

দিন যতই দাবদাহ হিউমিড হোক, পাহাড়ের বুকে ভোরের কুয়াশার নিজস্ব মাধুর্য অস্বীকার করার উপায় নেই। এই জন্যই মুম্বাইয়ে ট্র্যান্সফার চায় না। জনবহুল মুম্বাইয়ের তোলাবাজদের সঙ্গে সামঝোতার মধ্যে জীবন অনেক দুর্বিষহ। মস্তি করনে কে টাইম মে ভি সোচনা পড়তা হ্যায় ইয়ে রেন্ডি কিসকা রাখেল? পাহাড়কে কিনারে মৌজ করনে কা বহত ফুরসত। থোড়া কামাও। থোরা জিও।

ফুটে ওঠা ভোরের আলোর দিকে দেখল। নেশা কেটে গেছে। সহেলির মাদকতাও হারিয়ে গেছে দিনের আলোয়। দূরে পাহাড়ের বুকে কুয়াশা ভেদ করে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে দিনের প্রথম আলো। ঢেউ খেলিয়ে যাচ্ছে দিগন্তে। কেয়া মস্ত দিন হ্যায়। লেকিন দেখনেকা ফুরসত কাহাঁ? এক টুটি গাড়ি ঔর চার বডি হাসপাতাল মে। কৈসে হুয়া? ইনলোগ কেয়া দারু পি কর গাড়ি চলা রহে থে? জরুর কোই লরিকে সাথ টক্কর। এটা স্বাভাবিক অ্যাক্সিডেন্ট মনে হচ্ছে। ফির ভি। জিন্দা লড়কি জিয়ে তো উসসে বহত কুছ পতা চলেগা। অভি তো ইন আদমিকা পতা মালুম করনা হ্যায়। কৌন হ্যায় ইনলোগ? কাঁহা সে আয়ে? কাঁহা যা রহে থে?

দিবালোকে তালাশ শুরু করে দিল অজিত পান্ডে।

আট

মধুসূদন মুখুজ্জে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে খবরের কাগজ দেখল। তিনটে মৃত্যু। পশ্চিম বাংলায় নয়, সুদূর মুম্বাই থেকে ম্যাথেরনের পথে। গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট। মৃতের নাম সোফি চৌধুরী, অঙ্কুর করঞ্জওয়ালা, শিবানী রাওয়াল। সন্নিধি সিরিয়াসলি ইনজিওরড।

দুটো বিস্কুট পেলে ভালো হত। সে গুড়ে বালি। রিটায়ারমেন্টের এখনও তো দু-বছর বাকি। অথচ এখন থেকেই গিন্নি বাজে খরচ বন্ধ করে দিয়েছে। সকালের চায়ের সঙ্গে বরাদ্দ দুটো বিস্কুটও এখন পাত থেকে হাওয়া। এক মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। এখন হিসেব করে কী লাভ?

গিন্নি ঝাঁঝিয়ে "রিটায়ারমেন্টের পর সবাই কিছু না কিছু করে। সিকিউরিটি এজেন্সিতে চাকরি। কিংবা ডিটেকটিভ এজেন্সিতে। তোমার সে মুরোদও নেই। ওই পেনশনের টাকাতেই শেষ জীবন কাটাতে হবে। এখন থেকে হিসেব না করলে, দিনে দিনে আগুন ছোঁয়া বাজারে বাঁচব কী করে?"

তাই এক পেয়ালা চা-ই সম্বল। নেহাত টিভির দোহাই দিয়ে, খবরের কাগজটা এখনও ছেঁটে দেয়েনি। ভাগ্য ভালো বলতে হবে। ডিউটি যাওয়ার আগে খবরের কাগজে চোখ বোলানোর অভ্যাসটা তাই এখনও মুছে ফেলতে হয়নি। ডিউটি মানে ওই আর কী। ঘরে বসে না থেকে, লালবাজারের ফাইল সেকশনে বসা। পুরোনো কেসের রিপোর্টগুলো সাজানো। কেরানির চাকরি, না পুলিসের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারের, কে জানে? বুড়ো বয়সে প্রোমোটেড হয়ে এসি হলে এর থেকে আর বেশি কী আশা করতে পারে আইপিএস বড়বাবুরা? গভর্নমেন্টের চাকরি। এতদিন সার্ভিসের পর তো কেউ চাকরি খেতে পারবে না? তাই ওই নামকা ওয়াস্তে কোথাও বসিয়ে রাখা। মধুসূদন মুখুজ্জে কোনওদিক দিয়েই সাকসেসফুল পুলিস অফিসার নয়। না পারে মন্ত্রী-আমলাদের তোষামোদ করতে। না পারে কোনও অ্যাসাইনমেন্ট পূর্ণ করতে। এ হেন লোক কেন যে পুলিসে এসেছিল, ভেবেই আশ্চর্য অফিসের লোক।

বিএসসি পাশ করে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বাবা রিটায়ার করেছেন দেখে মামার দয়া হল। মামা তখন হোম সেক্রেটারিয়াটের কেরানি। মন্ত্রীকে বলেকয়ে পুলিসে ঢুকিয়ে দেয়। সেই থেকে চলছে।

হেঁসেল থেকে গিন্নির হাঁক "ফেরার সময় এক কিলো মুড়ি কিনে এনো। পারলে উজ্জ্বলার চানাচুর"

"সেদিন তো এত চানাচুর আনলাম। শেষ করে ফেললে?"

"উপায় কী? কিছু দিয়ে তো পেট ভরাতে হবে। নয় কী?... দুটো পাউরুটিও"

খাতা লেখো। গিন্নির ফাই-ফরমাশ খাটো। এই তো জীবন। দিনে দিনে গিন্নি আরও ফুলেফেঁপে ঢোল হচ্ছে। এমনিতেই গাঁটের ব্যামো আছে। এবার না হার্টেও ধরে। কয়েকদিন থেকেই ভাবছিল জেনারেল হেলথ চেক আপ করাবে। সরকারি খরচে হয়ে যাবে। গিন্নির ও নিজের।

কিছু হতে পারেনি বলে একদিন দুঃখ ছিল। তখন আকাঙ্ক্ষাও ছিল। এখন আর নেই। অনেকের কিছু হয় না। অনেক হতভাগ্য বাঙালির মতো মধুসূদনেরও কিছু হবে না। সবাই তো ইন্দ্রজিৎ হতে পারে না। অমল-বিমল-কমলরাও পৃথিবীতে থাকবে। ক্ষতি নেই। আর পাঁচটা বাঙালির মতো, জীবনের অন্যান্য কর্তব্য তো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছে। বিস্কুট না দিলেও সে কথা গিন্নি ভালো করেই জানে। গিন্নির থেকেও দ্বিগুণ সাইজের মেয়ে, টেপিকে সসম্মানে পার করতে পেরেছে। সে কী কম কৃতিত্বের?

পুবের জানলাটা কোনওদিনই খুলতে দেয় না গিন্নি "ঘরে ধুলো ঢুকবে। তোমাকে তো পরিষ্কার করতে হয় না। গাঁটের ব্যামোতে মরছি। অত খাটাখাটনি সইবে না"

তাই পশ্চিমের রোদটুকুকে সম্বল করে খবরের কাগজের পাতা ওলটানো। মৃত্যুর সংবাদ পড়ে, স্নান সেরে অফিসের গাড়িতে লালবাজার।

একরাশ খুন রাহাজানি রেপের রিপোর্ট জমা পড়েছে। সেগুলো পড়ে, অনাদিকে দিয়ে বিভিন্ন তাকে সাজাতে হবে। যেগুলো ক্লোজড বা কারও সুপারিশে এগনো যাবে না, সেগুলোকে আলাদা করে, তকমা দিয়ে, অন্য কোণায় তুলে রাখতে হবে। যেগুলোর ইনভেস্টিগেশন চলছে সেগুলো অ্যাকটিভ হিসাবে অন্যধারে সাজিয়ে রাখতে হবে। কে কোনও কেস নিয়ে ইনভেস্টিগেশনে কদ্দূর এগিয়েছে, রিপোর্ট লিখে সেই সংক্রান্ত সবকিছু ওপরওয়ালার কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে। একঘেয়ে কাজ। এই কাজের জন্য সরকার থেকে মাসিক মুনাফা, আকাশছোঁয়া বাজারে পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ জোগায়।

মেদিনীপুরের রিসর্ট দ্য হেভেনে মুম্বাইয়ের মডেলের মৃত্যুর প্রাথমিক রিপোর্ট ও পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট সামনে। মন দিয়ে স্নেহাশিসের প্রাথমিক তদন্তের রিপোর্ট পড়ল। আইপিএস অফিসারের চোস্ত ইংরেজিতে ডিটেলিং। ইয়ং আইপিএস। তদন্ত ঠিকভাবেই করবে। মধুসূদনের মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে, কেন মুম্বাইয়ের মডেল মেদিনীপুরে ছুটি কাটাতে গেছিল? কার প্ররোচনায়? কোন স্বার্থে? অতীন কী মেহুলির সঙ্গে দেখা করেছিল? কে ওই ধুতি-ফতুয়া পরা? বোতলটা গেল কোথায়? অকেজো মাথা কাজ করছে। ইনভেস্টিগেশন নিয়ে নয়। লিঙ্ক নিয়ে।

খুব অবাক লাগছে। ড্রাউনিং-এ মারা গেছে। সুইমিং পুলে সাঁতার কাটতে গিয়ে ডুবে মরল কী করে? সাঁতার না জানলে সুইমিং পুলে গেছিল কেন? ভিসেরা রিপোর্টে তিনটে ওষুধ গ্যাস্ট্রিক কন্টেন্টে - টলবিউটামাইড, গ্লেনেসারাইড আর অ্যালজোলাম। এই তিনটের সঙ্গে নিশ্চয়ই মৃত্যুর সম্পর্ক আছে। কোনও ডাক্তার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করতে হবে। রিপোর্ট বলছে ‘ড্রাগস ফাউন্ড ইন দ্য ভিসেরা বাট কস অফ ডেথ ডিউ টু অ্যাসফেকশিয়া অ্যাস এ রেসাল্ট অফ ড্রাউনিং’ মানে সুইমিং পুলে ডুবে মৃত্যু। ওয়াইনের মধ্যে ওষুধগুলো মেশানো ছিল না তো? যদি থেকেই থাকে, সিন অফ ক্রাইম থেকে বোতলটা উধাও হল কী করে? কে কেন সরাল? বারবার ঘুরপাক খাচ্ছে একটাই চিন্তা। মেদিনীপুরে কেন? কার ডাকে? ছেঁড়া ছবি, হারিয়ে যাওয়া ওয়াইনের বোতল, মোবাইল নম্বর সূত্র।

স্নেহাশিস মেহুলির মোবাইলের অসংখ্য নম্বর লিস্ট করেছে। হাজার চারেককে তো আর জেরা করা যায় না। সেদিন যারা ফোন করেছিল, তাদের ট্যাপ করেছে। কে এক ভওয়ানিশঙ্কর মহারাষ্ট্রের ম্যাথেরন থেকে। খোঁজ নিয়ে স্নেহাশিস জেনেছে ভওয়ানিশঙ্করের ওখানে আশ্রম। মধুসূদনের মাথায় ঢুকছে না, মুম্বাইয়ের মডেলের সঙ্গে আশ্রমের কী সর্ম্পক? স্বল্প অভিজ্ঞতায় দেখেছে সো-বিজরা ভাগ্য, জ্যোতিষ, আশ্রম এসবে বিশ্বাস করে। এই আপাত দুনিয়ায় ভাগ্যের চাকা ঘুরতে কতক্ষণ? খ্যাতির চূড়া থেকে মাটিতে পড়তে সময় লাগে না। বাকি দুটো ওয়েস্ট বেঙ্গলের - দুটোই সুইচড্ অফ। একটি নম্বর থেকে বেশ কটা ফোন। মেহুলিও দুবার ফোন করেছিল। কাকে?

কে বলে মধুসূদন মুখুজ্জের বুদ্ধি নেই? কপালটাই মন্দ। বড়সাহেবরা বুঝল না। ভাবনা চিন্তা যাই থাকলেও বাস্তবে রূপয়িত করতে পারেনি। তাই সার্ভিস রেকর্ডে কোনও কৃতিত্বের চিহ্ন নেই। চিন্তার জন্য প্রমোশন হয় না। কাজের জন্য হয়। দুঃখটা সেখানেই। বড়সাহেবরাও বুঝল না। সহধর্মিণীও নয়। মাঝেমাঝে ভীষণ অসহায় লাগে। টেপিটা যদি কলকাতায় থাকত, নিয়মিত দেখতে পেত। বারোডায় থাকে। কালে-ভদ্রে আসে।

আবার চোখ বোলাল রিপোর্টে। দ্বিতীয় খুন ইয়ং ছেলে। মানিকতলা খালের ধারে। সঙ্গে পোস্ট-মর্টেমের ইতিবৃত্ত। স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। পেছন থেকে ছুরি দিয়ে গলা কাটা। পরিতোষ সেনের রিপোর্টে স্পষ্ট। পোস্ট-মর্টেমেও। মধুসূদন ভাবছে সোহমের ফোন নম্বরটা মেহুলির ডেডবডির কাছে বাস টিকিটে কী করে এল? একটা যোগসূত্র আছে। দুটো ক্যারেক্টার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই রিপোর্টে নেই। ঐত্রেয়ী আর সুনেত্রা। পরিতোষ সেন বোধহয় সন্ধান করেনি। আরও খোঁজ প্রয়োজন। নোটে লিখতে হবে ‘ফর ফারদার ইনভেস্টিগেশন’। এএসআই আর আইপিএস-এর মধ্যে এখানেই তফাত।

মানিকতলা থানার বড়বাবুকে ফোন “অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ পুলিস মধুসূদন মুখুজ্জে”

“বলুন” গুরুগম্ভীর আওয়াজ।

“আপনাদের ওখানে সোহম সান্যাল বলে একটি ছেলে খুন হয়েছিল”

“রিপোর্ট চলে গেছে” নির্বিকার ওসি।

খুন খারাপি নিয়ে সময় নষ্ট করে ফায়দা নেই। অযথা ঝুটঝামেলা। এর থেকে প্রমোটার, মানিকতলা বাজারের তোলাবাজদের সময় দিলে কিছু আসবে।

“সেটাই তো পড়ছি। ঐত্রেয়ী আর সুনেত্রা সম্বন্ধে আরও ডিটেল্ড রিপোর্ট চাই”

অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশানারের আদেশ। করতেই হবে। “দেখি খোঁজ-খবর নিয়ে। আরেকটা রিপোর্ট পাঠিয়ে দেব স্যার”

ফোন কেটে দিল বড়বাবু।

এই গা-ছাড়া ভাবটা বেদনাদায়ক। যুগ পালটে গেছে। আজকের দিনে পুলিসের চাকরি অন্যান্য আর পাঁচটা চাকরির মতোই, গুছিয়ে নেওয়ার কাজ। সেটাই করতে পারল না মধুসূদন। তাই গিন্নির গঞ্জনা। আজকের কাগজের তিনটে মৃত্যুর ডিটেলস পেলে ভালো ছিল। লরির ধাক্কা। মধুসূদনের মনে হল এটা অ্যাক্সিডেন্ট না অন্য কিছু? অন্য কিছু থাকতেও তো পারে। পল্টুর চায়ের দোকানের আড্ডায় বসে ধাঁধার খেলাটা ভালোই জমবে।

নয় জীবনে কিছু করেনি। এ লাইনে তো বহুদিন। অস্বাভাবিকতার গন্ধ দূর থেকেই পায়। তার কিছু করণীয় নেই। ঘটনাটা ঘটেছে মুম্বাই-ম্যাথেরনের পথে। অনাদি ক্লোজড ফাইলগুলো সাজাচ্ছিল। রিপোর্টগুলো গুছিয়ে বলল “বুঝলি অনাদি। খুনগুলো আইসোলেটেড ইনসিডেন্ট নয়। কোথাও যোগসূত্র থাকতে পারে” জানে না কেন বলল। মন বলছিল। তারই বহিঃপ্রকাশ।

অনাদি ঠিক বুঝতে পারেনি। ফাইলের সিঁড়ির ওপর থেকে নীচে স্যারের দিকে তাকাল “কোন খুন স্যার?”

“মেদিনীপুর রিসর্টের খুন, মানিকতলা খালের খুন। আজকের লরি অ্যাক্সিডেন্ট”

অনাদি কোনও খুনের ব্যাপারেই জানে না। স্যারের দিকে ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে “কী স্যার?”

মধুসূদন চায়ে চুমুক দিয়ে বলল “মেদিনীপুরে মডেল খুন। মানিকতালা খালে ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট। লরি অ্যাক্সিডেন্টেও দুই সুন্দরী আর মেধাবী ছেলে” নিজের মনেই আওড়াল বিউটি অ্যান্ড ব্রিলিয়ান্স”

যাই ভাবুক এ মনগড়া। জানে বাস্তবে কোনও সম্পর্ক নেই। নিছক কল্পনা।

সিআইডির ডেপুটি কমিশনারকে ফোন “বিরক্ত করলাম স্যার”

আবার মধুসূদন। লোকটা এমনিতেই কাজের নয়। কাজের সময় ফোন কেন? অন্য কেউ হলে পাত্তাই দিত না। ‘ব্যস্ত আছি’ বলে ফোনটা রেখে দিত। অনঙ্গ দত্ত অতটা নির্দয় হতে পারে না। লোকটা পুলিশি কাজে অপদার্থ হলেও, বহুবছর আগে ওরা যখন শিলিগুড়িতে পোস্টেড, কমব্যাটে একবার গুরুতর জখম হয়েছিল। তখন দিন-রাত লোকটা বেডের পাশে বসে সেবা করেছে। সেকথা ভুলতে পারে না।

“বলো মধুসূদন”

“স্যার, আজকের পেপারে, মুম্বাই থেকে মেথেরন যাওয়ার পথে লরি অ্যাক্সিডেন্টে তিনজন মারা গেছে। তার রিপোর্ট পাওয়া যাবে?”

“তা দিয়ে তোমার কী?”

“যদি জোগাড় করে দিতে পারেন...” মধুসূদনের বিনম্র আবদার।

“ওটা তো মহারাষ্ট্র পুলিসের এক্তিয়ার। আমাদের নয়। কেন দেবে?”

“যদি কোনওভাবে পারেন”

“এখানকার সঙ্গে লিঙ্ক থাকলে দিতে পারে। লিঙ্ক দেখাতে পারলে চেষ্টা করতে পারি”

ফোনটা কেটে দিল অনঙ্গ দত্ত।

শনিবারের সান্ধ্য আড্ডা ভালোই জমে। গিন্নিরা টিভি সিরিয়ালে ব্যস্ত। ঘরে টিভির গাঁকগাঁক চিৎকারের চেয়ে পল্টুর চায়ের দোকানের গরম চা-সিঙারা বেশি মনোরঞ্জক। জমাটি আড্ডা।

কুঞ্জবিহারীবাবু বছরদুয়েক রিটায়ার করেছেন। শঙ্করদয়াল এবছর। মধুসূদনের দু-বছর এখনও বাকি। তড়িৎ, তাপস আর শুভঙ্করও ষাটের দিকে এগোচ্ছে।

"পল্টু গরম গরম চা বানা" মধুসূদন ঢুকেই হাঁক ছাড়ল। চা আর সিঙারা নিয়ে পল্টু হাজির হওয়ার আগে কুঞ্জবিহারী ও শঙ্করদয়ালও এসে পড়ল।

শঙ্করদয়াল বসে বলল "বিকেলে চা দিয়ে গিন্নি টিভি নিয়ে বসেছে। রাত সাড়ে নটার আগে উঠবে না"

কুঞ্জবিহারী শঙ্করদয়ালের দিকে তাকাল "সদ্য রিটায়ার করেছ তো, এখনও চা পাচ্ছ। গিন্নি বলে, সারাদিন নাকি কিছুই করি না। রিটায়ারের দু-বছর তো হল। বিকেলের সব কাজ আমারই করার। ... এমনকী ওর চা-ও"

শঙ্করদয়াল ওর দিকে তাকাল "যাই বল, পল্টুর চায়ের টেস্ট-ই আলাদা"

মধুসূদন বলল "চা তো তোমার সামনে। আমার রসে গুড় ঢাল তো বাবা"

চায়ে চুমুক দিয়ে মধুসূদন দুটি মার্ডারের বিবরণ দিতে বসল। রসকষহীন ভাবে রিপোর্টের ইতিবৃত্ত শুনিয়ে বলল "কী মনে হচ্ছে ভায়া? লিঙ্ক আছে?"

নীরবতা। চায়ে চুমুক। মচমচে সিঙারা খাওয়ার আওয়াজ। মধুসূদন নতুন ধাঁধার অঙ্ক নিয়ে। ওরা বোঝে। অনাদি ছাড়া কেউ শোনার নেই অফিসে। বাড়িতেও তাই। সিরিয়ালের দৌলতে বাড়ির গিন্নিরা সন্ধেবেলা থেকে মৌনব্রত অবলম্বন করে। নিজের বুদ্ধিকে কাজে লাগাবার একমাত্র জায়গা পল্টুর এই চায়ের দোকান। পাখা চললেও তেমন হাওয়া দিচ্ছে না। মান্ধাতা আমলের লম্বা রডের কালো সিলিং ফ্যান। এখনকার গ্লোবাল হিটিং-এ অনুপযুক্ত। পৃথিবী পলটালেও পল্টুর চায়ের দোকান আগের মতোই।

রুমাল দিয়ে টাকে জমা ঘাম মুছে শঙ্করদয়াল বলল "আছে"

"কী ভাবে?"

"মেদিনীপুরের রিসর্টে যে গেছিল তাকে কেউ ইনসট্রাকশন দিয়েছিল সোহমের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। তাই নম্বরটা কাগজে লেখা"

"সোহম ফোন করেনি তো?" মধুসূদন ঘাড় ঘুরিয়ে প্রশ্ন ছুড়ে দিল।

"না। সোহম ফোন করলে নম্বরটা লেখার প্রয়োজন হত না। সিএলআইতে উঠে আসত। করেও থাকতে পারে। কে জানে? তুমি বললে সোহমের পকেট থেকে কগজে লেখা ফোন নম্বর পাওয়া গেছে। এটা কী ওই ভদ্রলোকের? না অন্য কারও? একটু থেমে কুঞ্জবিহারী বলল "মোবাইলটা পাওয়া গেছে?"

"না"

"পাওয়া গেলে অনেক কিছু জানা যেত। এই দুটো খুনের পেছনে থার্ড ওয়ান ইনভলভড সেটা বোঝা যাচ্ছে"

"কে?"

"বলা মুস্কিল। ডিটেল্ড ইনভেস্টিগেশন হলে বোঝা যাবে। একটা জিনিস অদ্ভুত লাগছে। ওই যে মুম্বাইয়ের মডেলটা, কী যেন নাম বললে..."

"মেহুলি"

"কেন বাংলায় এসেছিল? রহস্যটা ওখানেই"

"কাঁথিতে ওর আদিবাড়ি"

"সেখানে তো যায়নি?"

“মাঝের দুদিন ছিল কোথায়? শেষ দুদিন তো দ্য হেভেনে। বাড়ির সঙ্গে তো কোনও সম্পর্ক দেখছি না”

কুঞ্জবিহারী, শঙ্করদয়ালের কথা টেনে বলল “কলকাতাতেই বা কোথায় উঠেছিল, সেটাও তো জানা নেই। খালি জানা থিয়েটার রোডের ক্যাশ টিল থেকে টাকা তুলেছিল”

তড়িৎ বেজার মুখে ঢুকল “দেরি হয়ে গেল। ভিড়ের জন্য দুটো বাস মিস”

“এখন সিরিয়াস আলোচনা হচ্ছে। তুমি চা খাও”

“বাদ দিও না ভাই” মধুসূদনকে আবার কেঁচেগণ্ডূষ করতে হল ঘটনাগুলো।

তড়িৎ এক লাফে বলল “জানি না তোমাদের আগে কী কথা হয়েছে। আমার মনে হচ্ছে লিঙ্কটা ঐত্রেয়ী কিংবা সুনেত্রা”

“মনে হওয়ার কারণ?”

“ঐত্রেয়ী অ্যান্ড সুনেত্রা আর দ্য আনডেফাইনড ফ্যাক্টরস। এটা স্পষ্ট সোহম রিটইয়ার্ড সরকারি চাকুরের ছেলে। পিএইচডি করছিল। মধ্যবিত্ত ব্যাকগ্রাউন্ড। মুম্বাইয়ের মডেলের সঙ্গে লিঙ্ক হওয়া অস্বাভাবিক। মারা যাওয়ার আগে ঐত্রেয়ী ফোন করেছিল। তারপর আর যোগাযোগ করেছিল কি না, জানা নেই। আপাত দৃষ্টিতে সোহম যে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসে, মেহুলির সঙ্গে লিঙ্ক অস্বাভাবিক। সম্ভব, যদি সুনেত্রা থেকে কোনও লিঙ্ক পাওয়া যায়। ও তো মুম্বাইতে থাকে”

“মোবাইল ফোনটা?” মধুসূদনের প্রশ্ন।

“সোহমের ইনভেস্টিগেশনে অনেক কিছু বাকি”

“মানিকতলা থানার ওসির কোনও আগ্রহই নেই”

“দেখ গিয়ে, টাকা খেয়েছে। যারা খুনে ইনভলভড তারাই খাইয়েছে। মধু তুমি ওসিকে বাদ দাও। ওই এএসআইয়ের পেছনে লেগে থাক। যদি করে তো ওই করবে”

“তাই করতে হবে দেখছি। সবাই এত দায়সারা ভাবে কাজ করে, কাউকে বলেও কিছু হবে কি না কে জানে?”

“তুমি তো অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার”

মধুসূদন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল “নামেই। পল্টু, আরেক রাউন্ড চা দে। ... সত্যি লিঙ্ক আছে তো? না জোর করে লিঙ্ক করার চেষ্টা করছি?”

“লিঙ্ক আছে বলেই মনে হচ্ছে” কুঞ্জবিহারী মধুসূদনকে আশ্বস্ত করল।

“মুম্বাই-ম্যাথেরনের অ্যাক্সিডেন্ট?”

“অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। কোনও লিঙ্ক দেখছি না” তড়িৎ দাঁড়ি টেনে দিল।

পল্টুর চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে মধুসূদন ঠিক করল, মানিকতলার বড়বাবু নয়। এএসআই পরিতোষ সেনকে কালকে ফোন করে বলতে হবে ঐত্রেয়ী আর সুনেত্রা সম্বন্ধে আরও খোঁজখবর নিতে।

নয়

এয়ারপোর্টের লবিতে শিরিনকে দেখে চমকে উঠল স্নেহাশিস। কী দেখতে হয়েছে শিরিন। আটপৌরে কলকাতার সাবেকি বনেদি মুসলমান বাড়ির মেয়েটার কী পরিবর্তন। পরিচ্ছন্ন এলোকেশী শিরিনের এখন বব ছাঁট। শাড়ির বদলে, কালো জিনস সাদা টপস। গাঢ় খয়েরি লিপস্টিক। বাঁ হাতে সোনার ঘড়ি। সোনার বালা পরা, ডান হাতে মোবাইল।

"ইউ আর লাকি। ফ্লাইট লেট করেনি"

"ইউসুয়ালি লেট হয়?"

"কম করে আধঘণ্টা। মাঝে-মাঝে তিন চার ঘণ্টাও"

শিরিনের মতো স্নেহাশিসের অত সৌভাগ্য হয় না প্লেনে নিয়মিত যাতায়াতের। আগে বরাদ্দ ছিল ফার্স্ট ক্লাস এসি। এখন সিনিয়রিটির জোরে ইকনমি ক্লাসে ফ্লাইট। যাতায়াতে সময় কম লাগে।

শিরিনকে বলল "তুমি অনেক পালটে গেছ"

"তুমি কিন্তু ঠিক আগের মতোই" স্নেহাশিসকে আপাদমস্তক ছেঁচে বলল "আগের মতোই হ্যান্ডসাম। একটু অবশ্য ভুঁড়ি হয়েছে। হবেই তো। অভ্রদিতা ভালোমন্দ খাওয়াচ্ছে"

স্নেহাশিস কথা বাড়াল না। মুম্বাই পুলিসের জয়েন্ট কমিশনার রোশন শেঠ ও চ্যালাচামুণ্ডারা ওকে নিতে এসেছে।

"এক মিনিট" এগিয়ে গেল রোশনের দিকে।

"কৈসে হো ভাই? বহতদিন বাদ কাম কে সিলসিলে মে ফির মুলাকাত"

"দাদা কিতনা দিন বিত গয়া। দেহরাদুন মে ট্রেনিংকে বাদ"

রোশনকে জড়িয়ে ধরল "ভুলু কৈসে? ও সব দিনকা কাহানি"

স্নেহাশিসের কানে ফিসফিস করে রোশন বলল "ইয়ে মডেল তুমহারা জান পেহচান?"

"ছোটে উমর কে দোস্ত"

"পেয়ার?"

"রোশনি চাঁদ সে আতি, সিতারো সে নেহি। মোহাব্বত এক সে হোতি, হাজারো সে নেহি"

"তুম বাঙ্গালি লোগ সায়রি বিনা বাত নেহি করতা"

শিরিন স্নেহাশিসকে বলল "তোমার জন্য পুরো উইকটা অফ নিয়ে নিয়েছি। শুধু তোমার জন্য"

"রোশনের সঙ্গে ফোর্ট হেডকোয়ার্টার্স-এ রিপোর্ট করে আসছি"

"আমার সঙ্গে লাঞ্চ। অ্যাট ব্যান্ড্রা হলিডে ইন। ওকে?"

"সিওর"

শিরিন হাত নেড়ে বেরিয়ে গেল। স্নেহাশিস চেয়ে রইল শিরিনের দোদুল্যমান নিতম্বের দিকে। আগের থেকে একটু মেদ জমেছে। সেটা বয়েসের ভারে, না কনট্রাসেপটিভের এফেক্ট বোঝা মুস্কিল। ওর নিতম্বের ছন্দেই মুম্বাইয়ের রোশনাইতে সাকসেস। একদিন স্বপ্ন দেখত স্নেহাশিসও। শিরিনের নিতম্ব থেকে মেহুলির বিবস্ত্র গ্ল্যামার বিকিকিনির হাটে। সেখানে স্নেহাশিস নেই। বাসরসজ্জা অন্যত্র। দেহের সজ্জায় মুখরিত হোর্ডিং। পেছনে অর্থের ঝলকানি। মাস মাইনের গোলামি নয়। অর্থ দেহের যুগলবন্দি। তাই চার হাজারের সুইটে মেহুলি। মুম্বাই-দিল্লি-সিঙ্গাপুর শিরিন। ওদের দুনিয়া থেকে স্নেহাশিস বহুদূর। তবুও, প্রথম যৌবনের

অনুভুতির রেশ সঙ্গোপনে কোথাও বর্তমান। তারই ভরসায় মুম্বাই আসা। না হলে কি শিরিন এক সপ্তাহ ছুটি নিয়ে অ্যাসাইনমেন্ট ক্যানসেল করে? লাখ টাকার লোকসান সত্ত্বেও।

এয়ারপোর্টের বাইরে কার পার্কের দিকে যেতে প্রাণ ভরে শ্বাস নিল শিরিন। কতকাল প্রাণ ভরে বাতাসের ঘ্রাণ নেয়নি। বাক্সবন্দি স্বপ্নের মায়াপুরী মুম্বাইয়ের আকাশটাকেও ভালো করে দেখা যায় না। দিনের প্রথম আলো ফোটার আগেই সুটের জন্য তোড়জোড়। নিজেকে আরও মোহময় করার অদম্য স্পৃহা। দশ মিনিটের সুটের জন্য দু-ঘণ্টা ধরে মেক আপ। আরও দু-ঘণ্টা টেক-রিটেক বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে। পার্টি, লৌকিকতা সেরে মধ্যেরাতে যখন বাড়ি ফেরে, বিবস্ত্র দেহটাকে শাওয়ারের জলে ভিজিয়ে ক্লান্তি মোছা। দু-পেগ সাঁটিয়ে ঘুম।

এ আরেক জীবন। যার নাম সাকসেস।

সকালের আকাশটা তখনও ঘামে ভিজিয়ে দেয়েনি মুম্বাইকে। ঝরঝরে লাগছে। দেহ থেকেও মনটা। তবে কী মনটা আজও কলেজের দিনের স্নেহাশিসের রোমাঞ্চে বন্দি? না পাওয়াটা কী আজও তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে চঞ্চল মনটাকে? চাওয়াটা কী বাক্সবন্দি কুঠরিতে এক টুকরো আকাশ খুঁজছে? যেমন খুঁজত সেই সময় প্রিন্সেপ ঘাটে, দিনশেষে স্টিমারের ভেঁপুর আওয়াজে। মুছে যাওয়া রং কী আত্মপ্রকাশ করছে এই মুহূর্তে?

"মুলাকাত হুয়া?" মোবাইলে চতুর্বেদী।

"হাঁ" মৃদু জবাব।

"বাত হুয়া?"

"নেহি। উধর বহত পুলিস থে"

"ফির?" চতুর্বেদী নাছোড়বান্দা।

"সামকো আকেলে মে বাত কর লুঙ্গা"

শিরিন ফোনটা কেটে দিল। কথা বাড়াতে চায় না। ঝরঝরে দিনের ঘ্রাণটা নষ্ট করতে চায় না চতুর্বেদীর সঙ্গে কথা বাড়িয়ে। এদের জীবনে প্রাণের অভাব। হিসেবের দাঁড়িপাল্লায় চলছে। মেহুলির মৃত্যুতে কেন চতুর্বেদীর এত আগ্রহ? শিরিনের জানা নেই। চতুর্বেদীর কথা না শুনলে মুম্বাইতে তাকে করে খেতে হবে না। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। ফোনটা স্ল্যাক্সের ডান পকেটে গুঁজে, বাঁ পকেটের রুমাল দিয়ে ঘাম মুছল। চতুর্বেদীর মতিগতি একটু তো জানা। সো-বিজ জগতে চতুর্বেদীর হাত সর্বত্র। সিনেমা, সিরিয়াল থেকে মডেলিং। বাছাই সুন্দরীদের নিয়ে রাতের অভিসার। মেহুলিও কী সে পথে? ঘরের ভেতরে মাঝরাতের খেলা বাইরের আলোয় কি প্রকাশ পায়? কানা-ঘুষায় আসে। ব্যস্, ওটুকুই। কতটা সত্যি, কতটা বানানো, কে জানে? রাতের কাহিনি হারিয়ে যায় দিনে। এমনি নেশার ঘোরে মুখ ফস্কে বেরিয়ে এসেছিল স্নেহাশিসের কথা। সে কবেকার। মনেও ছিল না।

"তুম তো বাঙ্গালকে ছোকরি। উধর কোই জান-পহেচান হ্যায়?"

"কেও নেহি? বহত। কলকাত্তা মে বড়া হুয়া। বহত সারি জান-পেহচান"

"জইসে?" হুইস্কির নেশায় শিরিনের কোমর জড়িয়ে চতুর্বেদী।

"পুলিস সে ছোটে-বড়ে কই স্টার। দো-একঠো মন্ত্রী ভি" শিরিনও সেদিন নেশাগ্রস্ত। মাপা পৃথিবীতে আস্ফালনের বহিঃপ্রকাশ।

স্মিত হেসে চতুর্বেদী বলেছিল "পুলিসকে সাথ কৈসে পেহচান? উধর কোই চোরি-ডাকায়তি কিয়া?"

বুড়োর দিকে হেলে বলেছিল "নেহিতো। মেরে কলেজকে দোস্ত অব বড়া পুলিস অফিসার"

কান শিরিনের কথায় সজাগ। চোখ উপারাংশের ক্লিভেজে।

মেহুলির আবির্ভাবে কথা হারিয়ে যায়। চতুর্বেদীর চোখ শিরিনের ক্লিভেজ থেকে মেহুলির স্তনে। সুউচ্চ ভরাট স্তন পরিত্রাণ খুঁজছে ভাগ্যবানের করযুগলে।

"আজকল কাঁহা ঘুমতি-ফিরতি? দিখাই নেহি। কভি ভি হামে ইয়াদ করো"

মেহুলি চতুর্বেদীর পাশে বসে দেহের অর্ধেকাংশ লুটিয়ে বলেছিল "আপ তো মেরে দিল মে হমেসা বসা হ্যায়। সিরিফ ম্যায় হি বদকিসমত আপকে ইয়াদ মে কভি নেহি আয়া"

"মেরে খোয়াবো মে হর খুবসুরত লড়কি হর ওয়ক্ত রহেতা। তুম নেহি জানে, ম্যায় জানু"

মেহুলি চতুর্বেদীর কাঁধের ওপর স্তন ঘসে, ঝুঁকে বলেছিল "হম আপকে দিল মে কৈসে জানু ইয়াদ নেহি করনে?"

"করুঙ্গা... জরুর করুঙ্গা। আজ রাতকে মেহেফিল তুমহি সে। ফির তো বিসওয়াস হোগা তুম সিরিফ খোয়াব মে নেহি, জিন্দগি মে ভি"

বসে থাকতে পারেনি শিরিন। থাকাটাও ঠিক নয়। এখানে সে কাবাব মে হাড্ডি। চতুর্বেদীর বিরিয়ানি আজ মেহুলি। খুশিই হয়েছিল। চতুর্বেদীর খপ্পর থেকে পালাবার এর থেকে ভালো উপায় আর কী? মেহুলি সুন্দরী স্বাস্থবতী, দিতেও প্রস্তুত। মুম্বাইতে পাড়ি শুধু একটাই স্বপ্ন নিয়ে। হাজারও মেয়ের স্বপ্ন। সবাই ছুটছে স্বপ্নের পথে। কজন-ই বা পৌঁছতে পারছে মোহনায়? মেহুলি যদি অন্যদের টপকে মোহনায় পৌঁছতে পারে, সে তো বাঙালির গর্ব। অনসূয়া বসু থেকে মেহুলি। যেদিকে তাকাও সেদিকেই বাঙালি। মেহুলির মতো হাজার সুন্দরী পরিবেষ্টিত চতুর্বেদী।

হঠাত মেহুলি সম্পর্কে এত আগ্রহ? কেনই বা শিরিনকে তার সম্বন্ধে খোঁজ নিতে বলা? অনেক প্রশ্ন থেকে যায় পর্দার আড়ালে। উত্তর খোঁজা শিরিনের মতো সেলিব্রিটির বৃথা প্রচেষ্টা। এ লাইনে বেশি প্রশ্ন করলে বিপদ। কখন যে কী হয়ে যায়। প্রশ্ন নয়। নীরবে কাজ করে যাও।

কাঠি কাবাব মুখে পুরে শিরিনকে স্নেহাশিস বলল "কেমন লাগছে মুম্বাই জীবন?"

"কী বলব? ভালো না খারাপ?" সানগ্লাস খুলে ব্যাগে ঢোকাল।

"যেমন তাই বলবে"

"জীবন তো অনেক বড়। মুহূর্তটাকে আমি ভালোমন্দের ছাঁচে ফেলি না। এ মুহূর্তটা আমার একার। হিসেব-নিকেশের মধ্যে তাকে কুরবান দিতে চাই না"

এই হচ্ছে মহিলাদের নিয়ে মুস্কিল। স্নেহাশিস এখনও বুঝতে পারে না, কী জাদু আছে ওর, যা নগ্ন বিস্ময়ে উপভোগ করতে চায়। দেহসৌষ্ঠব না আন্তরিকতা? অভ্রদিতাও কি জানে? যদি জানত অন্যরা কীভাবে দেখে তাহলে ছোটখাটো বিপ্লব হয়ে যেত। অত ভাবার সময় নেই অভ্রদিতার।

"ভী...ষ...ণ...ভালো। কতদিন পর তোমায় কাছে পেলাম। ভাবতেও পারিনি"

"কী ভাবতে পারনি?" বলতে গিয়েও থেমে গেল। কেঁচ-খুঁড়তে সাপ না বেরিয়ে পড়ে। প্রথম যৌবনের উচ্ছ্বাস না আবার উড়তে চায়। রক্ষণশীল কলকাতার পরিবেশ অন্য। আর মুম্বাইয়ের ছুটে চলা মাদকতার রং ভিন্ন।

শিরিনের কথায় গুরুত্ব না দিয়ে, সুইমিং পুলের দিকে তাকিয়ে বলল "এই আর্টিফিশিয়াল পৃথিবী ভালো লাগে?"

উষ্ণ আকাশের প্রখর আলোয় শূন্যে চেয়ে স্নেহাশিস অন্য জগতে। যেখানে মুম্বাইয়ের মেকি উষ্ণতা নেই, প্রলুব্ধ কাম, অর্থের পিপাসা নেই। স্বপ্নের ললিপপ হাতছানি দিয়ে কলুষিত করে না। কিং খান, বিপস বা ক্যাটস আলোকিত করে না জীবন। বিরাট সাংস্কৃতিক ব্যবধান। সেখানে টিমটিমে টিউবে মেদিনীপুরের বাংলোয় ঋজুর হোমটাস্ক গাইড করা আরেক পৃথিবী। কোনটা কবিতা, কোনটা সোনাটা, কে জানে? যেটা জীবন সেটাই মধ্যাকর্ষণ শক্তি। ব্যাপ্তির বাইরে প্রযুক্তি। শিরিন বা অভ্রদিতা অবান্তর। শিরিনের তালে তাল মিলিয়ে প্রশ্নের উত্তর খোঁজা। যে কাজের জন্য কলকাতা থেকে মুম্বাই পাড়ি।

"এখানে মেহুলি এসেছিল?"

"মানে? ঠিক বুঝলাম না"

ব্যান্ড্রার হলিডে ইনের সুইমিং পুলে তাকিয়ে মনে পড়ল দ্য হেভেনে মেহুলির নগ্ন মৃতদেহ। কে জানে? এতবছর পরে দেখা শিরিনকে এখনও চেনা বাকি।

"এটা কী তোমাদের স্বর্গের পীঠস্থান?"

"না না এ সে জায়গা নয়। সে সব ঠেক অন্য জায়গায়" টম কলিনসে চুমুক।

"কোথায়?"

"তা দিয়ে তোমার কী? তুমি তো আর হিরো হতে আসনি। সেসব বড়লোকদের ফার্মহাউসে"

স্নেহাশিসের মনে পড়ল, বাবুদের বাগানবাড়িতে বাইজি নাচানো। যুগ পাল্টাতে পারে, কিন্তু একই পথে, অন্য রূপে আমোদ-আহ্লাদের ব্যঞ্জনা।

ফেলে আসা স্বপ্ন এখন অন্য গতে। শুধু কাজ। ঠিকমতো করে যাওয়া। মানে এখন মেহুলির মৃত্যুর কূল-কিনারা।

"হঠাৎ মেহুলির খোঁজে সেদিন ফোন?" কোনও ভণিতা নেই স্নেহাশিসের।

প্রশ্নটা অবশ্যম্ভাবী জেনেও উত্তর তৈরি করে রাখা হয়নি। চতুর্বেদীর কাহিনি বললে কেঁচো খুড়তে সাপ বেরবে। মুম্বাইয়ের পাট ইতি করে পার্ক সার্কাসের দরগা রোডের বাড়িতে ফেরত।

"আমার কলিগ। ইন্ডাস্ট্রিতে সবাই বলাবলি করছিল। শুনেছিলাম কলকাতায় গেছে। চেনা বলতে তুমি। হয়ত হদিস দিতে পারবে। তোমার তো ওখানে অনেক চেনা-জানা। সত্যি বলতে কি, তোমার সঙ্গে কথা বলার একটা অজুহাতও খুঁজছিলাম"

স্নেহাশিস বুঝতে পারছে, শিরিন মেহুলির কথা ঘুরিয়ে রোমান্সের দিকে নিতে চাইছে। পুলিসের শ্যেনদৃষ্টি শিরিনকে পরখ করছে বাগে আনতে।

"মেহুলি কী এখানে একাই থাকত?"

"না, ওর বাবা মায়ের সঙ্গে। কিছুদিন আগে বাবা মারা যায়। এখন মায়ের সঙ্গে"

সিরিয়ালের মতো অর্থহীন কথোপকথন। এসব তো কাঁথি থেকে জেনেই এসেছে। ভেতরের খবর বার করার পথ স্নেহাশিসের জানা। তার জন্য কী সে প্রস্তুত? অভ্রদিতা অলিখিত কাচের দেওয়াল তৈরি করে দিয়েছে। ভাবছিল, ও পথ না মাড়িয়ে শিরিনকে পথে আনবে।

শিরিনের হাতের ওপর হাত। আলতো চাপ আবেগে "তুমি সাহায্য না করলে আমার ট্র্যান্সফার কোনও মফসসলে দেবে। কী মুখে ফেরত যাব?"

শিরিনের দোটানা। একদিকে চতুর্বেদী। অন্যদিকে হার্টথ্রব। কোনটা ছেড়ে কোনটা ধরবে? দুটোকেই অস্বীকার করা যায় না। ভবিষ্যৎ না হৃদয়।

"মেহুলির একজন বয়ফ্রেন্ড ছিল। সায়ন। আমাদের লাইনের নয়। স্টেটস-এ কীসের বিজনেস। মুম্বাইতে আদিবাড়ি"

"মডেলিং থেকে বিজনেস। যোগসূত্র কীভাবে?"

"কী করে বলব? প্রায়শই একসঙ্গে দেখা যেত। আমার সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। ভালো ছেলে। আসলে কী জান স্নেহাশিস, কাজের সূত্রে অনেকের সঙ্গেই আমাদের লটঘট করতে হয়। মন কিন্তু পড়ে থাকে মনের খোঁজে। এত বছর মুম্বাইতে। বিয়ে তো করিনি। এখানে কেউ কারও নয়। সবই ধান্দার সম্পর্ক। কাউকে সেভাবে আপন করতে পারলাম না"

দুটো পৃথিবীকে আলাদা করে দিল শিরিন। দুটো পৃথিবী এক নয়। কাজের বাইরে মন আজও তাকে খোঁজে। আইপিএস অফিসারের সে বোঝার বুদ্ধি আছে।

"কতটা কেরিয়ারিস্ট ছিল মেহুলি?"

"এখানে কে নয়? আমরা সবাই। আমরা মডেলিং-এ খুশি। মেহুলি মডেলিং-এ নাম করেছিল বটে। হিরোইন হওয়ার স্বপ্ন দিনকে দিন বাড়ছিল"

স্নেহাশিসের সব কেমন গোল পাকিয়ে যাচ্ছে। যে হিরোইন হতে চায়, তার বিচরণ মুম্বাইয়ের দুনিয়ায়। মেদিনীপুরের রিসর্টে কেন?

"মেদিনীপুরে রিসর্টে কী কোনও প্রডিউসার..."

বাজোরিয়ার কথা মনে পড়ে গেল। মেহুলির পরের ২০৯ নম্বর ঘরে উঠেছিল। ওর লেনদেন করতে গেছিল? বাজোরিয়ার 'মিসেস' তবে ওখানে কেন?

"সেটা তো আমাদেরও প্রশ্ন" লেদার পার্স থেকে আয়না বার করে লিপস্টিকের প্রলেপ লাগিয়ে মেনু কার্ড এগিয়ে দিল "কী খাবে? অর্ডার দিয়ে দাও। ভুলো না, রাতে কিন্তু আমার ফ্ল্যাটে। নিজে হাতে রান্না করব। না বলতে পারবে না। সারাদিন চড়ে বেড়াও কিছু বলব না। মনে রেখ, রাতে আমার সঙ্গে ডিনার। পাক্কা"

মেনু কার্ড হাতে নিয়ে ভাবছিল, ডিনারে না গেলে আসল কথা বার করতে পারবে না। পেটে কয়েক পেগ না পড়লে, মহিলাদের থেকে কথা বার করা মুস্কিল। বিশেষ করে যদি পেশাদার হয়। ডিনারে যেতেই হবে।

তারপর। কদ্দূর?

দশ

ইন্দ্রাক্ষি রায়চৌধুরী গলার চশমাটা নাকে বসিয়ে মেনু কার্ডে চোখ বোলাল “প্রন ককটেল অর্ডার দিই?”

ডাঃ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ইন্দ্রাক্ষির দিকে তাকাল। ইন্দ্রাক্ষি আগের থেকে অনেক সুন্দর। কবেকার পরিচয়। ম্যান্ডেভিলা গার্ডেন্সে চিনি দিয়ে। তারপর কত বসন্ত, হাতে হাত, মনে মন।

কিছুদিন যেতেই এক সন্ধ্যায় ইন্দ্রাক্ষির ফ্ল্যাটে আশিস। চিনি বা দুধের আশায় নয়।

“কী ব্যাপার? আসুন আসুন” সাদর আমন্ত্রণে ঘরে ডেকে নিয়েছিল।

শনিবারের সন্ধে। মোবাইল ড্রয়িং রুমের টেবলে রেখে বলেছিল “কেমন আছেন?”

চোখ ঘুরিয়ে ফিরে দেখছিল ফ্ল্যাটের ছিমছাম সাজানো ড্রয়িং রুম। হালকা খয়েরি রঙের লেদার সোফা। কোণে টেবলে মার্বেলের টেবল ল্যাম্প। সোফার ওপরে আর্টিস্টের আঁকা বিবস্ত্র মহিলার ছবি। ঘাসের গালিচায় উলটো দিক ফিরে শুয়ে।

“ছবিটা কার আঁকা?”

“অরিজিন্যাল নয়, প্রিন্ট। রেনোয়ার”

দেওয়ালে দুটো ইজিপশিয়ান গোল চাকতির প্লেক। ড্রয়িং রুমের ওধারে ছোট্ট ডাইনিং এরিয়া বারান্দায় মিশেছে। চোখ নেমে এল ওর ওপর। সামনে কাটা ডবল ব্রেস্টিং কালো কাফতান। কালো লেসের দড়ি দিয়ে কোমরে বাঁধা। চুল লুটিয়ে পড়েছে কাঁধের নীচে। মেকআপহীন মুখে আধো তন্দ্রা ভাব। সদ্য ঘুম থেকে উঠেছে।

টেবলে রাখা উইলস্ ফ্লেক সিগারেট ধরাল “হাফ-ডে। ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম”

“ব্যাঘাত ঘটালাম না তো?”

“একেবারেই নয়। কিছুক্ষণ হল উঠেছি। গা ম্যাজম্যাজ করছিল। বেরতে ইচ্ছে করছিল না। এসে ভালোই করেছেন। শনিবারের সন্ধে। একা টিভি দেখা ছাড়া আর কিছু করার নেই। আপনার চেম্বার নেই?”

“শনিবার বিকেলে চেম্বার থাকে না। শহরের তো নই, ভাটপাড়ার। কলকাতায় বন্ধু-বান্ধবও বিশেষ নেই। ভাবলাম আপনি যদি ফ্রি থাকেন...”

“বেশ করেছেন। কী খাবেন? চা না টা?”

“চায়ের টাইম পার হয়ে গেছে। আপনাকে চিনিও আনতে বেরোতে হবে”

“একেবারেই নয়। আজ চিনি-দুধ মজুত” কাঁধের চুল পেছনে ঠেলল “হুইস্কি, না ভডকা?”

"আপনি?"

“গেস্ট যা খাবে আমিও তাই”

“তাহলে হুইস্কি”

মোবাইলে অর্ডার “দুটো রেশমি কাবাব। একটা চিকেন টিক্কা। দু-প্লেট বিরিয়ানি। আর দুটো মটন কাবাব। আমার অ্যাড্রেস্...”

উঠে বেডরুমে। ফিরে এল টিচার্স-এর বোতল নিয়ে।

“চলবে তো?” মাথা নাড়ল আশিস। আবার কিচেনে ফেরত ইন্দ্রাক্ষি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ভরে গেল সামনের টেবলটা। হুইস্কির গ্লাস, বরফ, ঠান্ডা জল, কুরকুরে, পট্যাটো চিপস, ডালমুট।

“বরফ না জল?”

আশিসের চোখ কাফতানের ফাঁক দিয়ে স্তনের একাংশে। পেশেন্টের স্তন আর ইন্দ্রাক্ষির মধ্যে কত তফাত। একটা আবেগহীন রোজগার। অন্যটা আবেগপূর্ণ বাসনার সম্ভার। সুচিস্মিতা চলে যাওয়ার পর নীচের আকাঙ্ক্ষা আত্মপ্রকাশ করেনি। কিংবা ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল।

"বরফ। অন দ্য রকস্"

উলটোদিকের সোফায় বসল ইন্দ্রাক্ষি। ওর চাহনি চোখ এড়ায়নি ইন্দ্রাক্ষির।

"বিয়ে করেননি কেন?"

"মনের মতো কাউকে পাইনি। পাত্রী ঠিক করে দিন। করে ফেলছি। আপাতত শনিবারের সন্ধেতে টিভি, হুইস্কি। রাত একা, ফাঁকা"

একাকিত্বের কারণ ভিন্ন হলেও ইচ্ছে নেই বিশ্লেষণে। অতীত শুধু ব্যথার নিভৃত অন্ধকার। তাই ইন্দ্রাক্ষির দরজায় বেল। অন্ধকারের মধ্যে আলো। নিঃশব্দ আহ্বান। সুপ্ত কামনার নিষ্কৃতির উপায়।

"কর্নার ল্যাম্প জ্বালিয়ে বড় আলোটা নিভিয়ে দিই?"

মাথা নাড়ল। ক্ষীণ আলোয় দেখল ইন্দ্রাক্ষির চোখের পাতার মেদ। এখন আর সে মেদ নেই। মুখ অনেক টানটান। বব চুল মনমোহিনী হাসির সঙ্গে মানান। মধ্য চল্লিশেও মনে হয়, পঁয়ত্রিশের বেশি নয়। হাসলে গালে টোল পড়ে। হাল্কা নীল রঙের টপসের ওপর চশমা, বুকের খাঁজ ঢেকে রাখলেও, নাকে তোলায় প্রকট। ইন্দ্রাক্ষি এখনও লো কাট টপস্ পরে কেন?

বললেই উত্তর "ডিসাইনার টপস্। তুমি প্লাস্টিক সার্জেন হতে পার, ডিসাইনের কিছু বোঝো না"

বোঝে না আবার? ইন্দ্রাক্ষি দেখতে এত সুন্দর হল কী করে? তার হাতের ছোঁয়ায় চল্লিশোর্ধ্ব আজ তিরিশের কোটায়। ইন্দ্রাক্ষি ভুলে গেছে? ইন্দ্রাক্ষি ভুললেও, আশিস ভোলেনি তার তার কারসাজি। স্ম্যাস ফেস লিফট উইথ ফোর কোয়াড্রেন্ট ব্লেফারপ্লাস্টি। নিখুঁত কাজ। বয়সের, মধ্যাকর্ষণের ভারেও টানটান। দিনে-দিনেই ইন্দ্রাক্ষির প্রতি আকর্ষণ বাড়ছে।

সেদিন সম্পর্কটা নিছক আকর্ষণ ছিল। আকর্ষণের সংজ্ঞাও ছিল অন্য। ইন্দ্রাক্ষিই সোফা ছেড়ে উঠে এসেছিল তার পাশে। হুইস্কির গ্লাসটা টেবলে রেখে হাত রেখেছিল কাঁধে। মাথা এলিয়ে দিয়েছিল হাতে। এত তাড়াতাড়ি কিক লাগবে বুঝতে পারেনি। অনেকদিন ধরেই জমছিল। এই মুহূর্তে বাঁধভাঙা প্লাবনে আত্মপ্রকাশ করতে চাইছে। সেটা আশিস কিংবা ইন্দ্রাক্ষি নামাঙ্কিত দুই সত্তা। দুজনেরই প্রবল জৈবিক চাহিদা। সামলাতে পারেনি। নেশা তখন মাথায়। ঠোঁট চেপে দিয়েছিল ওর ঠোঁটে। বাধা দেয়নি ইন্দ্রাক্ষি। বহিঃপ্রকাশ রিপুর নীতি। ইন্দ্রাক্ষির নরম ফোমের বিছানায় বিবস্ত্র দেহের নিবিড় আলিঙ্গনে। সেদিন সম্পর্কটা দেহেই সীমাবদ্ধ ছিল। মনটা কেঁপে ওঠেনি।

আশিসের প্র্যাকটিস নিজস্ব গতিতে বাড়ছে। ইন্দ্রাক্ষি দিশাহারা অতৃপ্ত। সামান্য চাকরি থেকে মুক্তি খুঁজছে।

ভাটপাড়া থেকে বারবার সত্তরোর্ধ্ব বাবার ফোনে কাতর মিনতি "আমার বয়েস হচ্ছে। টাকার মুখও দেখছিস। আবার বিয়ে কর। তোর ঘর দেখে যেতে চাই"

বাবার কাতর অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেনি। সুচিস্মিতার পর, মেখলা নতুন সাজে এসেছিল জীবনে। বরণডালা সাজিয়ে তাকে আপন করে নিয়েছিল ইন্দ্রাক্ষি। ইন্দ্রাক্ষির প্রতি জৈবিক আকর্ষণ তখন মানসিকে রূপান্তরিত। সেই আবহে মেখলার কাছে পৌরুষকে দাঁড় করাতে পারেনি।

"আগে জানলে বিয়ে করতাম না" মেখলা অভিযোগ করলেও আশিসের মন জুড়ে ইন্দ্রাক্ষি।

মেখলাকে পরিপূর্ণ করতে পারেনি। তখনই অনুভব করেছিল দেহে-প্রাণে সর্বত্র ইন্দ্রাক্ষি। অস্বীকার করার ক্ষমতা ছিল না ভেতরের আবেগকে। ছিল না বলেই মেখলাকে সম্পূর্ণভাবে সঁপে দিতে পারেনি। অনুভব করেছিল অন্তরের আলোড়নে। সদর্পে বলতে পারেনি মেখলাকে 'আমি পুরুষ'। পৌরুষের রন্ধ্রে ইন্দ্রাক্ষি একচ্ছত্র আধিপত্যে। সেখানে সে পূর্ণ কামে সম্পূর্ণ। মেখলার বাহুডোরে নয়। সুচিস্মিতা ছেড়ে গেল অর্থের স্বল্পতায়। মেখলা বিদায় নিল পৌরুষের অভাবে। হারিয়ে গেল মোহময় অজানা জীবনের আঙিনায়।

ইন্দ্রাক্ষির নিশিতে তখন সুর। রাতে ফ্ল্যাটের আলো নিভিয়ে স্টিরিওতে 'সেই তো আবার কাছে এলে দূরে গিয়ে বল না কী সুখ তুমি পেলে' মান্না দে নয়, ইন্দ্রাক্ষির মনের সুর। সেই সুরের রেশ সম্পর্কহীন সম্পর্কের আবর্তে। কামনা থেকে স্বপ্নের মায়ালোকে।

ইন্দ্রাক্ষি মেনু থেকে চোখ সরিয়ে চশমা বুকে বেয়ারার দিকে ইঙ্গিত করে বলল "টু প্রন ককটেলস প্লিজ"

বেয়ারা চলে যেতে ইন্দ্রাক্ষি সোফা ছেড়ে উঠে পড়ল "এক্সকিউজ মি ফর এ মোমেন্ট। আই হ্যাভ টু গো টু দ্য লু"

কালো স্ল্যাকসে দৌদুল্যমান নিতম্বের দিকে চেয়ে থাকল আশিস। কুড়ি বছরের প্লাস্টিক সার্জেনের জীবনে কম মেয়ে তো দেখেনি। প্রথম যৌবনে সুন্দরী দেহের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করলেও, এখন আর করে না। মেখলা চলে যাওয়ার পর আকর্ষণটা আরও ফিকে। ইন্দ্রাক্ষির মধ্য-চল্লিশের দেহ প্রথম যৌবনের রস-সাগরে ফেরায় বারবার। প্রেম? মনে হতেই হাসি পেল। বুড়ো বয়সে আবার প্রেম হয় নাকি? প্রেম কি না জানে না, তবে মেয়েটার মধ্যে অদ্ভুত আকর্ষণ প্রথম দিন থেকেই অনুভব করেছে। সেই আকর্ষণ এখন সুদৃঢ়, সুপ্রতিষ্ঠিত। ইন্দ্রাক্ষি না বুঝলেও আশিস অনুভব করতে পারে। আকর্ষণকে বয়স, যৌবনের পরিধি দিয়ে বিচার করলে ভুল হবে। আকর্ষণটা সামগ্রিক। অদেখা শক্তি চুম্বকের মতো তাকে গাঢ় বলয়ে জড়িয়ে রেখেছে। সমস্ত সত্তা দিয়ে গ্রাস করতে চাইছে। আশিস অসহায়, শিশু।

শুধু ফেস লিফট ছাড়া অন্য কিছু করার প্রয়োজন নেই ইন্দ্রাক্ষির জানা। দেহের দোলা, চোখের মাদকতা, ঠোঁটের একটুকরো ঝলক - সবই জয়ের উপঢৌকন। শুধু দেহ নয়। অন্তরালে কাজ করে প্রখর চিন্তাশীল মন-ও। খাওয়া, বসা, প্রেমে, নতুন কিছু ভাবছে। নতুন দিক। সাকসেসের এক-একটা স্টেপ। কোম্পানিকে কী করে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর করা যায়। শাখা-প্রশাখা আজ ভারতের আনাচে-কানাচে। আমোয়েবার সিউডপোডিয়ার মতো আইটি থেকে মডেলিং এজেন্সি থেকে শো-বিজ দুনিয়ায়। এখন তার সঙ্গে মিলেছে আরেক নতুন স্বপ্ন। নিজের চিন্তাকে পার্থিব আকার দিতে একটা ইনস্টিটিউট তৈরি করা।

সেদিনের ইন্দ্রাক্ষি আর আজকের মধ্যে কত তফাত। বিষণ্ণ চাকুরের শনিবার সন্ধ্যায় উত্তাপ খুঁজত আশিসের নিবিড় বন্ধনে। এখনকার বৃহত্তর দুনিয়ার কর্ত্রী হয়েও কী সেদিনের মতো মানসিক অরগ্যাজমের মার্গে পোঁছতে চায়? চাওয়াটা চিরকালই থেকে যায়। কিন্তু অরগ্যাজমের নিখাদ পন্থা পরিবর্তনশীল নতুন আকারে। ছোট্ট ফ্যাশন কোম্পানির চাকুরে ইন্দ্রাক্ষি আজ 'দ্য নিউ এজ' গ্রুপের মালকিন কাম প্রেসিডেন্ট। বিয়ে করেনি। অভিপ্রায়ও নেই। বিয়ের স্বাদ যখন সাত পাকে না জড়িয়েই পাচ্ছে, কী প্রয়োজন? মেখলার সঙ্গে আশিসের বিয়ের পর কিছুদিন মনমরা হলেও, ইন্দ্রাক্ষি বুঝেছিল, আশিস যেখানেই গাঁটছড়া বাঁধুক চিরকাল তারই।

এক রাতে বলেছিল "চাকরি আর ভালো লাগছে না"

ওর নরম স্তনে হাত বুলিয়ে আশিসের উত্তর "না লাগলেও করতে হবে। পেট চলবে কী করে?"

"বিজনেস" দেহটা নিয়ে খেলে রিপিট করেছিল "নিজের বিজনেস"

"কীসের?" আশিসের হাত ইন্দ্রাক্ষির স্তন থেকে নীচে নামছে।

"যা করি তাই। ফ্যাশন এজেন্সি। এছাড়া আমি আর কী জানি?"

"খরচা?"

"কী আর এমন? ঘর ভাড়া, টেলিফোন, রিসেপশনিস্ট" ওর রোমশ বুকে আঁকিবুকি "এক কাজ করলে কেমন হয়? লাউডন স্ট্রিট বা থিয়েটার রোডে একটা অফিস ভাড়া নিই। দিনের বেলা ওখানে ফ্যাশন এজেন্সি চালাব। সন্ধেতে তোমার চেম্বার। উই উইল স্প্লিট দ্য কস্ট বিটুইন টু অফ আস"

আইডিয়াটা মন্দ নয়। একা নিজে ওই পশ এরিয়ায় চেম্বার করতে পারবে না। ভাগাভাগি করলে দুজনেরই সুবিধে। ওই ফ্যাশন এজেন্সিতে যে সব মেয়েরা আসবে, বোর্ড দেখে আশিসের নামও জেনে যাবে। তার পসারের পক্ষেও সুবিধে।

সেই রাতেই শুরু হয়েছিল দ্য নিউ এজের কনসেপ্ট। সেই কোম্পানি আজ এত বছরে, ফুলে ফেঁপে, থিয়েটার রোডের সীমানা পেরিয়ে সারা ভারতে। জনসংযোগ থেকে বিপণন ইন্দ্রাক্ষি সবেতেই অনন্যা।

লেডিস রুম থেকে ফিরে দেখল আশিস মোবাইলে "রক্ত পড়ছে? চিন্তা করার দরকার নেই। বসিয়ে দাও। নাকে আরেকটা বিব দিয়ে দাও। কিছুক্ষণের মধ্যেই কমে যাবে"

উলটো দিকের সোফায় বসে লেডিস ব্যাগ থেকে এসটি-ডা-লডারের মেক-আপ কিটের আয়নায় লিপস্টিকের হাল্কা প্রলেপ লাগিয়ে নিল। আশিসেকে জিজ্ঞেস করল "আজ ক'টা ছিল?"

"দুটো ব্রেস্ট অগমেন্টেশন, একটা রাইনোপ্লাস্টি। ব্যস"

"যথেষ্ট নয়? ব্রেস্ট কারা করাল? বাচ্চা মেয়ে, মডেল না ফিল্ম স্টার?"

"কোনওটাই নয়। মধ্যবিত্ত গৃহবধূ" মুচকি হেসে আশিসের জবাব।

টিভি, সিনেমার দৌলতে আজকাল গৃহবধূরাও সুন্দর হতে চায়। আগে শাড়ি-গয়না ডিম্যান্ড করত। এখন কসমেটিক সার্জারি। যুগের হাওয়া, বিদেশের জল পেরিয়ে আমাদের দেশেও। এই পাশ্চাত্যের হাওয়া শুধু মধ্যবিত্ত গৃহবধূকে প্লাস্টিক সার্জারির ছুরির তলায় ফেলেনি, ফেলেছে অনেক ডিভোর্সি গৃহবধূদের নবতম বাবুদের হাত ধরে।

"তোমাদের কত আনন্দ। রোজ রোজ নতুন সৃষ্টি করতে পার" বলতে গিয়েও পারল না, কত মহিলাদের দেহের সৌন্দর্য ফোকটে উপভোগ করতে পার। আশিস খেপে বলবে "তোমাকে ছাড়া আর কটা মেয়ের সঙ্গে আমায় দেখেছ?"

"সৃষ্টি না ছাই। স্রেফ রুজি-রোজগার"

"আমাদের লাইনে সৃষ্টির কিছু নেই। একঘেয়ে। শুধু টাকা কামাও। কোম্পানির মুনাফা বাড়াও। ব্যালেন্স সিট। এতে যে পৃথিবীর কী উন্নতি হচ্ছে, কে জানে?"

"পৃথিবীর উন্নতি কে করতে পারে? নিজের উন্নতি করে কিছু কামিয়ে নেওয়া। ব্যস, এই পর্যন্ত"

"আমিও তো তাই করছি। যদিও মন থেকে মেনে নিতে পারছি না। একটাই তো জীবন। কিছুই যদি যেতে করে না পারলাম..."

ইন্দ্রাক্ষি সম্রাজ্ঞীর আসনে বসেও সৃষ্টির মাদকতায় বিভোর।

"আমাদের মতো নগণ্য লোক এর থেকে বেশি কী করতে পারে?"

"রুজি রোজগার সবাই করতে পারে। এমন কিছু যার জন্য পৃথিবী আমায় মনে রাখবে" একটু থেমে বলল "আমাদেরকে"

"কী?" উত্তর দিতে যাচ্ছিল। বেয়ারা প্রন ককটেল টেবলে রাখতে ক্রিস্ট্যাল গ্লাসটা টেনে সুতির ন্যাপকিন উরুতে বিছিয়ে প্রন ককটেলে কামড় দিল ইন্দ্রাক্ষি। আশিস ওর দিকে তাকিয়ে। এত বছর হয়ে গেল। এত কাছ থেকে দেখেছে। তবুও মনে হয় ওকে চেনা বাকি। ভালোবাসার বাইরে।

ধোঁয়াশায় ভরা অচেনা, অজানা ইন্দ্রাক্ষিকে।

এগারো

"বাঁচাও..."

নীচ থেকে নারী কণ্ঠের আর্ত চিৎকার কাচের জানলা ভেদ করে স্নেহাশিসের কানে পৌঁছল। মুম্বাইয়ের ভ্যাপসা হিউমিডিটির জন্য, শিরিনের তেরোতলার ফ্ল্যাটের জানলা দরজা বন্ধই ছিল। ড্রয়িং রুমে স্প্লিট এসি চলছে। কোণে ব্রাসের ফ্লোর ল্যাম্প মৃদু আলোকিত করেছে নাতিশীতোষ্ণ ঘরের একাংশ। টেবলে ছড়ানো কাবাব, স্যসেজ, চিপস্, ফিশফ্রাই। সবে তৃতীয় পেগে চুমুক দিয়েছে। শিরিন শুনতেও পায়নি। ভডকা স্প্রাইটের গ্লাস ফেলে আরও কিছু ভাজতে গেছে।

"করছ কী? এত খাওয়া যায়?"

"এতদিন পরে এলে, রান্না করে খাওয়াব না? সব হোম মেড। পেট খারাপ হবে না। আসছি..."

সেই মুহূর্তে নারীকণ্ঠের আর্তনাদ।

"কারও চিৎকার শুনলাম"

"ক পেগ হল? এখনই উলটোপালটা শুনছ। একটু পরে আমাকেও চিনতে পারবে না" শিরিন ফ্রায়েড প্রনগুলো টেবলে রেখে ভডকা নিয়ে সোফায় বসল। কত বছর পর স্নেহাশিসকে পেয়েছে। সন্ধেটা মাটি করতে চায় না।

যত খাক পুলিসের কান সর্বদা সজাগ। মনে হল না ভুল শুনেছে। শিরিন সি-থ্রু সরু স্ট্র্যাপের গোলাপি নাইটি পরে। তার ওপর অগোছাল হাউসকোট। শিথিল দড়ির আলগা প্যাঁচ। টেবলে ক্লাসিকের প্যাকেট এগিয়ে বলল "কিছুই তো খাচ্ছ না। তোমার জন্য সারাদিন কত কষ্ট করে রান্না করলাম"

ফ্রায়েড প্রন মুখে পুরে স্নেহাশিস বলল "এই তো খাচ্ছি। সত্যি আওয়াজ শোননি?"

"না শুনিনি"

"তোমার আতিথিয়তায় এক সপ্তাহেই ভুঁড়ি বেড়ে যাবে"

অভ্রদিতা আজকাল স্নেহাশিসের ওজন নিয়ে সজাগ। জানে স্নেহাশিস মুম্বাইতে তদন্তের জন্য। যদি জানত, শিরিনের ম্যাগনাম টাওয়ার্স র ফ্ল্যাটে সান্ধ্য আসর, কুরুক্ষেত্র বাঁধিয়ে দিত। বিয়ের আগে কম কৈফিয়ত দিতে হয়নি। শিরিনের সঙ্গে সম্পর্ক কী? কদ্দূর গেছিলে? নিছকই বন্ধুত্ব না অন্য কিছু? মহিলাদের কেবলই হারানোর ভয়। আগলে রাখার মধ্যেই শান্তি। গয়না থেকে স্বামীপুত্র। সত্যি কী আগলে রাখা যায়? কে বোঝাবে অভ্রদিতাকে?

সিগারেটের ধোঁয়া ছুড়ে শিরিন বলল "আরও কটা পেটে পড়ুক। তখন চিৎকারের বদলে প্রেমের গান শুনবে। এটা সিনেমাপাড়া। কোন নায়িকা মাল খেয়ে মাকে ঠেঙাচ্ছে, কোন হিরো বউকে পাশের ঘরে বন্ধ করে, কোনও উঠতি মডেলের সঙ্গে রঙিলা - এসব নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই। ইনভেস্টিগেশন করতে এসেছ, করে যাও। ইয়ে মুম্বাই সেলিব্রিটি লোগকা নাইট লাইফ। ছোড়ো"

কানে এল গুঞ্জন। ক্রমশ হৈ হৈ তে পৌঁছতে আর সংযত থাকতে পারল না স্নেহাশিস। ড্রয়িংরুম সংলগ্ন ব্যালকনিতে বেরিয়ে এল। তেরোতলা থেকে অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না। মনে হল কোনও মেয়ের বডি নীচে পড়ে। তাকে ঘিরছে ফ্ল্যাটের বাসিন্দা। লক্ষ করল, কালো স্যানট্রো গাড়ি বেরিয়ে গেল।

"ভুল শুনিনি। কিছু একটা হয়েছে"

"কেন লাফড়ায় জড়াচ্ছ?" শিরিন সাজানো সন্ধে মাটি করতে চায় না। স্নেহাশিসকে বোঝাবে কী করে?

তেরোতলা থেকে লিফটে স্নেহাশিস যখন নীচে পৌঁছল ভিড় জমে গেছে। ভিড় ঠেলে বডিটার দিকে এগোতে বাধা দিল পুলিস। সাত বাংলার পুলিস চৌকির এএসআই ততক্ষণে ওখানে। সারা মুখে রক্ত। মাথা থেতলে ব্রেনের কিছু অংশ বেরিয়ে গেছে। বেশভুষা বোঝাচ্ছে মহিলার মৃতদেহ। ঘিয়ে রঙের সালোয়ার-কামিজ পরা রক্তাক্ত পিণ্ড। দুটো পা-ই ফ্র্যাকচার। ডান হাতটা ওপরের দিকে। বাঁ হাত পেটের ওপর। নিশ্চয়ই বেঁচে নেই। তবুও সুনিশ্চিত হওয়ার জন্য এগতেই পুলিস পথ আটকাল "থাম্বা! টিকরে জানার নাই"

অন্যান্য পুলিস ভিড় সামলাতে ব্যস্ত। ভিড়ের মধ্যে কে বলে উঠল "ইয়ে তো সুনেত্রা। কেও কুদ পড়ি?"

বেঁচে আছে কি না জানতে হবে তো। আইডি কার্ড বার করে এএসআইকে দেখাতেই স্যালুট ঠুকে সরে দাঁড়াল। পালস্ নেই। নিশ্বাস নিচ্ছে না। প্রাণের স্পন্দন পেলে সেটা প্রায়রিটি। ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এল।

মোবাইলে রোশনকে ফোন "ব্যস্ত হো?"

"নেহি। সিনেমা সে লৌট রহা হুঁ বিবিকো লেকর"

"ম্যাগনাম টাওয়ার্স মে হু। অভি ইধর এক লড়কি কুদ পড়া। মুঝে হোমিসাইড লাগতা। খুন কে সিলসিলে মে আয়া। ইধর ঔর একঠো মার্ডার"

"কৈসে মালুম মার্ডার?"

"দিল বোলে"

"ঠহের। অন্ধেরি ইস্ট মে হু। বিবিকো ঘর ছোড় কর আ রহা। কৌন কমপ্লেকস মে?"

"ম্যাগনাম টাওয়ার্স । আ কর ফোন লাগানা"

"আধে ঘণ্টে মে"

শিরিন এই ফাঁকে আরও দুপেগ ভডকা গিলেছে। তাড়াতাড়ি খাওয়ায় নেশা চড়েছে। চাপা উত্তেজনাকে লাগামে আনার চেষ্টা। টেবলে পড়া মোবাইলটায় "বাত হুয়া?"

"অভি বৈঠা থে হোনে কে লিয়ে। কোন কমবক্ত ফ্ল্যাট সে কুদ পড়া। উসকো দেখনে গয়া"

"আনে সে বাত কর লেনা"

স্নেহাশিস ঘরে ঢুকতেই মোবাইল কেটে দিল। ঝুঁকতেই কোমরের দড়ি খুলে গেল। নেশার ঘোরে লক্ষ করেনি। সোফায় গা এলাতেই স্নেহাশিসের চোখ পড়ল সি থ্রু গোলাপি নাইটির তলায়। উলটো সোফায় গা এলিয়ে হুইস্কিতে চুমুক। সন্ধেটাই মাটি। খুনের কিনারা করতে এসে আরেকটা মৃত্যু। কেবলই মনে হচ্ছে, এটা আত্মহত্যা নয়, হত্যা! বেশ কিছুটা হুইস্কি গিলে বলল "কে বলল মেয়েটির নাম সুনেত্রা"

ভাবলেশহীন, চতুর্থ ভডকায় স্প্রাইট ঢেলে বলল "সুনেত্রা? আমার উলটো দিকের ফ্ল্যাটের? ... সুনেত্রা আগারওয়াল। হঠাৎ আত্মহত্যা করল কেন?"

"হত্যা না আত্মহত্যা ইনভেস্টিগেশন না করে বলা যায়? কী করত?"

"এজেন্সিতে চাকরি। ছাড়ো তো"

হাউসকোট কাঁধের ওপর। ভডকার গ্লাস হাতে টলতে টলতে উঠে স্নেহাশিসের পাশে। হাতটা কাঁধে ছড়িয়ে ওর মুখটা টেনে গালে আলতো করে চুমু "দ্য নাইট ইজ স্টিল ইয়ং। কথা দিয়েছিলে আজকের সন্ধে শুধু আমার জন্য" চুমু খেয়ে বলল "জাস্ট ফর মি"

প্রেম, যৌবন, শিরিনের ঠোঁটের স্পর্শ - সব বেসুরো এই মুহূর্তে। তানপুরাটা ঠিক সুরেই বাজছিল। হঠাৎ মেয়েটির আকস্মিক মৃত্যু কর্ডগুলো ছিঁড়ে দিয়েছে। ছন্দ নেই। রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণ মিলেমিশে চিন্তায় গোলাকার। শিরিন কী পাষাণ? পাশের ফ্ল্যাটের মেয়ে মারা গেছে, অথচ নির্বিকার। খুপড়ির আবদ্ধতা কী অনুভুতিটাকেও গ্রাস করেছে! একে অপরকে চেনে, সম্পর্ক তৈরি হয়। পাশাপাশি চলে। পাশের মানুষটা যখন হারিয়ে যায়, একটু চোখের জল, একটু সামাজিক আতিথিয়তা। ব্যস। জীবন চলতে থাকে নিজের গতিতে... তাহলে কী সম্পর্কের মূল্যটাই স্থূল? এটাই পৃথিবীর নিয়ম। কিন্তু এই ব্যাপ্তি যে এত কম, ভাবতেও পারছে না।

তোমার পাশের ফ্ল্যাটের একজন মারা গেছে। ইউ সিম আনকনসার্নড?”

“হার্ডলি নিউ হার একসেপ্ট ফর হার ফেস। লিফটে দেখা হলে একটু হাসি। দ্যাটস অল” স্নেহাশিসের ওপর দেহটা ছড়িয়ে বলল “এতে কী অনুভুতি জন্মায়? তোমার কোলে শুয়েও তো অনুভুতি জাগাতে পারছি না। হাউ ডু ইউ এক্সপেক্ট মি টু বি পারটার্বড বাই হার ডেথ?”

মিথ্যে বলেনি। এবার সাড়া না দিলে মুম্বাই আসাই পণ্ড। অভ্রদিতা আর কোনওদিনও কলকাতার মুখ দেখবে না। রোশন আসার আগে হাতে মোটে আধঘণ্টা। শিরিনের উত্তেজনাকে প্রশ্রয় না দিলে মেহুলির খুনের কূল-কিনারা হবে না।

শিরিনের নাভিতে বিলি কেটে বলল “ইউ আর রাইট। দ্য নাইট ইজ স্টিল ইয়ং” মুখটা নামিয়ে শিরিনকে চুমু। ভডকার গ্লাস টেবলে রেখে ওর গলা জড়িয়ে ধরে মুখটা টেনে আনল নিজের বুকে। শিরিনের বুকে মুখ রেখে স্নেহাশিস ভাবছে - এও কী ভালোবাসা? শিরিন অতিরিক্ত ভাবেই ভালোবাসতে চাইছে? রোশন না আসা পর্যন্ত বুকে মুখ গুঁজেই ভাবতে হবে। রোশনের ফোনে শিরিনকে ছেড়ে উঠে পড়ল।

“কোথায় চললে?” জড়ানো গলায় শিরিন।

“রোশন এসেছে। মেয়েটির মৃত্যুর তদন্ত করতে। ওকে গিয়ে হেল্প করি”

চমকে উঠল শিরিন “এর মধ্যে তুমি কেন?”

“রোশন অনেক দিনের বন্ধু। সকালে যাকে এয়ারপোর্টে দেখলে। যখন আছি, দেখি বুদ্ধি দিয়ে যদি সাহায্য করতে পারি”

বিমর্ষ শিরিন হাউসকোট পেঁচিয়ে কোমরের দড়ি বাঁধল “কোথায় ভাবলাম এতদিন পর জমিয়ে আড্ডা দেব। তা না, উনি চললেন অন্য কে মরেছে, তার তদন্ত করতে। তোমাদের পুলিস অফিসারদের বলিহারি। খুন রাহাজানি আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পার না?”

“রাতে তো এখানেই। দ্য নাইট ইস স্টিল ইয়ং মাই বিউটিফুল লেডি”

জানে আপত্তি জানিয়েও লাভ নেই। তবুও আবদারের সুর “না গেলেই নয়?”

“তুমি ডিনার রেডি করো। এই এলাম...” কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বেরিয়ে গেল স্নেহাশিস।

ওসিওয়ারা থানার ওসি যখন বডিটার সদগতি নিয়ে ব্যস্ত, কেয়ারটেকারের কাছ থেকে সুনেত্রার ফ্ল্যাটের ডুপ্লিকেট চাবি নিয়ে দরজা খুলে ঢুকল। স্নেহাশিস লক্ষ করল দরজায় নেমপ্লেট নেই। সাজানো না হলেও, ছিমছাম। একই কমপ্লেক্সে হলেও ইনটিরিয়ারের তারতম্য দেখে বোঝা যায়, শিরিনের সঙ্গে আর্থিক পার্থক্য। ড্রয়িং রুমে বেতের সোফা। এক কোণায় বাঁকুড়ার কিছু মূর্তি। দেওয়ালে ব্যাটিকের চিত্রপট, বিভিন্ন ধরনের মুখোশ। সাধারণ টিভি। বেতের দুটো মোড়া। সোফার ওধারে ডিভান। ডায়নিং সাইডে কাচের টেবল। ওপরে খালি কাচের গ্লাস। চারটে রট আয়রনের চেয়ার। সবের মধ্যে বাংলার পরিচ্ছন্ন ছাপ। মেয়েটি নিশ্চয়ই কলকাতার। বাংলার সঙ্গে কোথাও বন্ধন। ফ্ল্যাটে কী এমন হল, মেয়েটাকে তেরোতলা থেকে লাফ দিতে হল?

কাচের টেবলে চোখ পড়তেই স্নেহাশিস ওদিকে। মোবাইল ফোন। স্বভাবসিদ্ধ পুলিসি কায়দায় স্যামসাং মোবাইলে কল হিস্ট্রিতে চোখ। প্রচুর কল। ইনকামিং-আউটগোয়িং নিয়ে প্রায় খান তিরিশ। শেষ কল মিলন চ্যাটার্জির। মারা যাওয়ার আগে শেষ কলটা ওর থেকে। কলের টাইম নোট করল। কে এই মিলন চ্যাটার্জি? শুধু ঘরের আসবাব নয়, ফোনেও বাংলার সঙ্গে লিঙ্ক।

কেয়ারটেকারকে জিজ্ঞেস করল “কেয়া নাম উসকা?”

“সুনেত্রা আগারওয়াল”

“বাঙ্গাল কা?”

“মালুম নেহি সাহাব”

“উনকা আপনা ফ্ল্যাট?”

“কিরায়া মে। ইয়ে ফ্ল্যাট কোই কোম্পানি কা”

“কৌন কোম্পানি?”

“মালুম নেহি। সেক্রেটারি সে পুছনা”

এখানে শিরিনের এসির সোয়াস্তি নেই। মুম্বাইয়ের ভ্যাপসা গরমে দরদর করে ঘামছে।

“রোশন ফ্যান চলা দে ভাই”

ফ্যানের হাওয়ায় কিছুটা সোয়াস্তি। ফিরে গেল দরজায় ডবল চেক করতে। সেলফ লকিং তো? হ্যাঁ। মনে পড়ল শিরিনের ফ্ল্যাট ছেড়ে বারান্দায় আসতে একটা কালো স্যানট্রো বেরতে দেখেছিল। মৃত্যুর পরমুহূর্তে কে বেরিয়ে গেল? রোশন যখন বারানদায় ক্লু খুঁজছে, স্নেহাশিস সুনেত্রার মোবাইলের ফোনবুক স্ক্রোল করছে। সন্নিধি নামে এসে থমকাল। কিছুদিন আগেই না সন্নিধি বলে একটা মেয়ে গুরুতর যখম হয়েছিল মাথেরানের পথে। এ সে নয়ত?

“রোশন কুছদিন পহলে ম্যাথেরনকা সড়ক মে এক অ্যাক্সিডেন্ট হুয়া থা?”

বারান্দা থেকে রোশনের জবাব “হাঁ। কেঁও?”

“ও কেস কৌন ইনভেস্টিগেট কর রাহা?”

“কেয়া মালুম। ডিজি বোল সাকেগা। ও তো মুম্বাইকে বাহার কা”

আবার স্ক্রোল করতে ভওয়ানিশঙ্করের নাম। নামটা চেনা। বহুবছর আগে মেয়েঘটিত ব্যাপারে হেডলাইনসে। সময়ের গতিতে যেমন সব সেনসেশনাল খবর চাপা পড়ে যায়, সেই খবরও অতীত।

বেডরুমে ডবল বেডেড খাট, ড্রেসিং টেবল, আলমারি। সাদামাটা আসবাব। জানলার কোণার টেবলে নোটবুক প্লাগ লাগানো কম্পিউটার। সুইচ অন করতেই স্ক্রিনে ‘লোডিং উইন্ডোস এক্স পি হোম এডিশন’ দেখে স্বস্তি। পাসওয়ার্ড ছাড়া কম্পিউটারে ঢুকতে পারবে। কম্পিউটারে কিছু প্রকৃতির ছবি। মাই পিকচার্স-এ অনেক মনোরম দৃশ্য। দার্জিলিং, কুতুব মিনার থেকে ব্যান্ড্রা বিচের পানিপুরি ডাবওয়ালা। মেয়েটার ছবি তোলার শখ ছিল। পরপর কয়েকটা ছবির ওপর চোখ থামল। সাধুবাবাদের ছবি। মেয়েটার বয়স তো বেশি নয়। সাধু সন্ন্যাসীদের ছবি কেন? আউটলুক খুলতেই অনেক চিঠি। বেশিরভাগ কাজের অ্যাপ্লিকেশন। সুনেত্রা কী অন্য কাজ খুঁজছিল? খুঁজতেই পারে। কে না উন্নতি চায়? আজকালকার যুগে কেউ স্ট্যাটিক থাকতে চায় না। এগোতে চায়।

টাচপ্যাড স্ক্রোল করে একটা নামের সঙ্গে অনেক করেসপনডেন্স। সোহম সান্যাল।

চেয়ারে বসে। নামটা ঘুরপাক খাচ্ছে। কোথায় শুনেছে, ঠাহর করতে পারছে না। পড়ছে চিঠিগুলো। একটা চিঠিতে সব চিঠির সার ‘সোহম ইউ নিউ দ্যাট আই হ্যাভ লাভড্ ইউ অলওয়েজ। বাট অল দ্য টাইম ইউ ওয়ার থিংকিং অফ ইওর সোশাল পজিশন। আই মাইট কাম ফ্রম এ মারোয়ারি ব্যাকগ্রাউন্ড, বাট লাভ ইজ বিয়ন্ড অল বেরিয়ার্স অফ রেস কালচার অ্যান্ড সিভিলাইজেশন। ইউ কুড নট অ্যাকসেপ্ট মি। ইউ ওয়ার অল দ্য টাইম থিংকিং অফ কেরিয়ার অ্যান্ড ইওর ফ্যামিলি। আই হ্যাভ কাম টু নো ফ্রম মিলন দ্যাট ইউ আর নাউ ইনভলভড উইথ আওয়ার ফ্রেন্ড ঐত্রেয়ী। ইফ ইউ কুড নট অ্যাকসেপ্ট মি হাউ কুড ইউ অ্যাকসেপ্ট ঐত্রেয়ী”

স্নেহাশিস থামল। পাশের ফ্ল্যাটের নাইটি পরা শিরিনও একই প্রশ্ন করতে পারে। মনে মনে হয়ত বহুবার করেছে। এখনও করছে। এই মিলন কী শেষ ফোনটা করেছিল? মিলন এদের মধ্যে কীভাবে আসছে? খুঁজতে লাগল মিলনের কোনও চিঠি। নাঃ নেই। তবে কলকাতা থেকে আরও কয়েকটা ছেলের চিঠি আছে। বেশিভাগ সোহমের গতিবিধি সম্পর্কে ইনফরমেশন।

রোশন ঘরে ঢুকে বলল “ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট কো বুলায়া। আনে মে থোড়া টাইম লাগেগা। ও তো ওসিওয়ারা পুলিস চৌকি মে নেহি”

রোশনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল “কুছ মিলা?”

“কুছ নেহি। কেয়া কোই আদমি আয়া? ইয়ে লড়কি খুদকুশি কর লি কৌন জানে?”

“খুদকুশি ভি হো সাকতা। গ্লাসকো ফরেনসিক এক্সামিনেশন মে ভেজ। ইস কম্পিউটার মে ক্যই চিঠি হ্যায়। ওহি পড় রাহা থা। কোই বাঙ্গালকা লড়কা সোহম সান্যলকে সাথ উসকা মোহাব্বত থা। ম্যায় ইয়ে কম্পিউটার দেখতা। তুম পতা করো ইয়ে লড়কি কাঁহা কাম করতি? ফ্ল্যাট কিসকে নামপে? তুমহারে আনে সে পহেলে এক কালা স্যানট্রো গাড়ি নিকল গয়া। ও গাড়ি কেয়া ইয়ে কমপ্লেক্সকা কিসিকা?”

“ম্যায় পতা লাগাতি। তু ইধর ছানবিন কর। ওসিওয়ারা পুলিস স্টেশন মে ভি জানা হ্যায়”

“ওহ কাঁহা?”

"ইহা হি। জুহু-মালাড লিঙ্ক রোডকে বগল মে” রোশন বেরিয়ে গেল। স্নেহাশিস চিঠিগুলোর প্রতি মনোনিবেশ করতে যাচ্ছিল। ফোনটা বেজে উঠল। শিরিন।

“আর কতক্ষণ একা বসে ভডকা খাব? তোমার জন্য ছুটি নিলাম। তুমি এখানকার কোন লাফড়ায় ভিড়ে গেলে। ছাড়ো না। এটা ওদের ব্যাপার। তুমি জড়াচ্ছ কেন?”

বুঝতে পারছে না, কী করবে? সত্যি তো। সারাদিন কত খেটে শিরিন তার জন্য রান্না করেছে। সে কি না মুম্বাইয়ের কোন মেয়ের মৃত্যু নিয়ে ভিড়ে। কম্পিউটারের চিঠিগুলো তো কালকেও পড়া যেতে পারে।

“এখুনি আসছি” উঠে পড়ল। কেয়ারটেকারকে বলল “চাবি হামারে পাস রহেগা”

নীচে নেমে রোশনকে ফোন “ওহ লড়কি বুলা রহি। ম্যায় ঘর লক কর দিয়া। ওসিকে পাস চাবি রখ দেতা। তু অপনে ঢঙ্গ সে প্রাইমারি ইনভেস্টিগেশন কর লে। সিরিফ মেরে লিয়ে কম্পিউটার ঔর মোবাইল রখনা। সায়েদ বাঙ্গাল সে কুছ রিস্তা হ্যায়। কল দেখ লুঙ্গা। অগর ম্যায় কুছ কাম আ সকু”

শেষ পর্যন্ত হুইস্কি নিয়ে বসতে দেখে নাইটির দড়িতে ফাঁস লাগিয়ে শিরিন বলল “ওগুলো খেয়ো না। ঠান্ডা হয়ে গেছে। গরম গরম আরও কয়েকটা ভেজে আনি। ভাবলাম সারা রাত বুঝি ওই মেয়েটার ফ্ল্যাটেই কাটিয়ে দেবে”

চুমুক দিয়ে বলল “বরফ দেবে? গলে জল। আমার খেয়ে দেয়ে কাজ নেই। মৃতা মেয়ের ফ্ল্যাটে সারা রাত কাটাব। সামনে যখন জীবিত বর্তমান মজুত”

বরফগুলো আইস কিউবের ড্রামে ঢেলে কিচেন থেকে উত্তর “আমিও কোনদিন ছবি হয়ে যাব। যে ভাবে সব মারা যাচ্ছে” শিরিনের কথায় জড়তা। বেশ কয়েক পেগ গিলেছে। ভাজাটা টেবলের ওপর রেখে কোলের ওপর ছড়িয়ে বলল “শ্যাল ইউ স্টার্ট হোয়ার উই লেফট?”

ডান হাতে হুইস্কি বাঁ হাতের তালু দিয়ে শিরিনের স্তনের চারপাশে বুলিয়ে বলল “তুমি ওকে চিনতে?”

“কাকে?” স্নেহাশিসের হাত “এখন আমি কাউকে চিনি না। শুধু তোমাকে ছাড়া”

“তাই তো ফিরে এলাম”

আধশোয়া শিরিন স্নেহাশিসের গলা জড়িয়ে চুমু খেল।

“হ্যাঙ্গ অন। তাড়া কীসের? দ্য নাইট ইজ স্টিল ইয়ং”

“এ নিয়ে তিনবার। নেশায় গুনতে গিয়ে দেখব ইয়ংটা ওল্ড হয়ে গেছে”

“তুমি বরং কোলে শুয়ে থাক। অন্তত হুইস্কিটা খেতে দাও। বরফ গললে হুইস্কির স্বাদই মাটি। ... মেয়েটাকে চিনতে?”

“সুনেত্রা। জাস্ট মুখচেনা। সুবিধের মেয়ে ছিল না”

“কেন?”

“বেসিক্যালি কলকাতার। এখানে যে ক্রাউডের সঙ্গে মিশত, ডুবিয়াস। শুনেছি এখানে যে এজেন্সিতে কাজ করত, সেটা কোনও ফ্যাশন এজেন্সি। এসব এজেন্সিতে লাইনে ঢোকার জন্য অনেক উলটোপালটা লোক আসে” স্নেহাশিসের সিগারেটে দুটান “এসব লোকেদের সঙ্গে মিশলে আমাদের ইমেজের ক্ষতি”

ভুলেই গেছিল। উরুতে শুয়ে থাকলেও বাইরের দুনিয়ায় সুপরিচিত নামী মডেল। এই বিলাসবহুল ফ্ল্যাটের মালকিনের দাম অনেক। শুট প্রতি কয়েক লাখ। কেনই বা মিশতে যাবে এজেন্সির সাধারণ চাকুরের সঙ্গে? পাশের ফ্ল্যাটের চিত্র দেখে তারতম্য স্পষ্ট।

শিরিনের প্যান্টির নিম্নাংশের মাঝে সুড়সুড়ি দিয়ে বলল "তোমার কী মনে হয়? সুইসাইড না হোমিসাইড?"

আরামে শিরিনের উচ্ছ্বাস "আহঃ... কদ্দিন পর... ক্যারি অন... থেমো না..."

ওর কী মাথায় ঢুকছে প্রশ্নগুলো "বললে না তো?"

"তোমরা পুলিসের লোকেরা প্রেম করতেও জান না। আহঃ... ক্যারি অন... লাভলি... হেভেনলি... গোলি মার সুনেত্রাকে.... মরল না বাঁচল জেনে কী লাভ?"

ছুটে চলা উত্তরণের নেশায় মানুষগুলো মরবার আগেই মৃত। সুনেত্রা মারা গেছে। শিরিন কী বেঁচে? জীবন্ত প্রাণ আর মৃত জীবন এক বৃন্তে দাঁড়িপাল্লার দুই প্রান্তে। স্বপ্ন বাস্তবের আলোকে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর ধূসরতায় নিয়ে যাচ্ছে। কোনটা জীবন, কোনটা মৃত্যু, কে বলবে? পুলিসের কারবার দৈহিক। মন থাকুক অভ্রদিতার দিনান্তের আফসোসে। বা শিরিনের উত্তেজনায়।

নিস্পৃহভাবে বলল "তুমি কত পালটে গেছ"

শিরিন প্যান্টির ওপর স্নেহাশিসের হাতে চাপ দিল "কত বছর পার হয়ে গেল। জীবনের কত জল ঘোলা হল। তুমি বিয়ে করে বউ বাচ্চা নিয়ে সংসারী হলে। সব পালটে গেল। আমি পড়ে রইলাম মমতা ছাড়া পৃথিবীর সঙ্গে যুঝতে। কদ্দিন পর এলে। এই তাসের দেশের পৃথিবীতে প্রাণ পেলাম। সেটুকুও ভোগ করতে দেবে না? কী আছে আমার জীবনে?" চোখে জল। কাঁদছে। মানুষ শিরিনকে নতুনভাবে চিনছে স্নেহাশিস। কিছুই মারা যায়নি। জীবনের হতাশার প্রকাশ স্নেহাশিসের স্পর্শে। ভিক্টোরিয়ার দিনের অতীত করাঘাত করছে নারী সত্তাকে।

চোখের জল না মুছেই বলল "বারবার স্বপ্ন ভেঙেছে। তোমার ফোন পাওয়ার পর থেকেই আজকের প্রতীক্ষায় ছিলাম। সকালে উঠেই মনে পড়ল কলেজ পিকনিকের দিনগুলো। ম্যাসাঞ্জরে ময়ূরাক্ষী ভবনের বারান্দায় তুমি আমি দিনের প্রথম সূর্য দেখেছিলাম। প্রাণভরে উপভোগ করেছি। না না স্নেহাশিস, সে অনুভূতি আজও ভুলিনি" নেশায় মনের জমে থাকা দুঃখ উজাড় করে দিচ্ছে কাঁপা স্বরে। স্নেহাশিসের উরুর ফাঁকে মুখ গুঁজে কাঁদছে।

স্নেহাশিসেরই ভুল। ভুল সময়ে, ভুল কথা বলে ফেলেছে। থাক না। আজ রাতটা ওকে কাটাতে দিক ওর মতো করে। তদন্তের জন্য তো বহুদিন পড়ে। শিরিনকে পাঁজাকোলা করে তুলে বেডরুমে। সারা গাল চুমুতে ভরিয়ে দিল। নাইটিটা সরিয়ে দিল গা থেকে। ব্রায়ের হুক আলগা করে ছুড়ে দিল খাটের ওপাশে। দেরি না করে প্যান্টিটা খুলে ফেলে দিল। শিরিনের জঙ্গলের দৃশ্যে স্নেহাশিসের বিদ্রোহ। মুক্তি খুঁজছে। শিরিনের গভীরে। বিদ্রোহীর আত্মপ্রকাশ।

সার্টের বোতামগুলো খুলে বলল "আজকে না বলতে পারবে না। শুধু এই কয়েকটা দিন দাও। তোমার কাছে কিছু চাইব না। দেবে না?"

বারো

কথা রেখেছিল রোশন। ঠিক সকাল দশটায় গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিল হেড- কোয়ার্টার থেকে।

"না গেলেই নয়?" বাথরোব জড়ানো শিরিন বাথরুম থেকে বেরিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিল।

"অ্যাসাইনমেন্টে এসেছি। দ্য ইভিনিং উই উইল স্পেন্ড টুগেদার" শিরিনের গালে হাত বুলিয়ে ঠোঁটে চুমু দিয়ে লিফটে।

হেড-কোয়াটার্সে যাওয়ার কোনও আগ্রহই ছিল না স্নেহাশিসের। কমপ্লেক্সের বাইরে চৌরাস্তার মোড়ে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা। কখন শিরিন বেরিয়ে যায়। পাক্কা এক ঘণ্টা সিগারেট ধ্বংস। অবশেষে শিরিন টয়োটা ক্যাম্রি ড্রাইভ করে বেরিয়ে গেল। গোলাপি টপস, সানগ্লাস। মুখে যদিও বলেছে 'না গেলেই নয়?' মন চাইছিল স্নেহাশিস বেরিয়ে যাক। চতুর্বেদীর তলব। যেতেই হবে।

শিরিনকে বেরিয়ে যেতে দেখে স্নেহাশিস ফিরে এল ম্যাগনাম টাওয়ার্স র অ্যাপার্টমেন্টে। কেয়ারটেকারের ঘরে "কাল রাত কোই অজনবি আয়া?"

"সাব, বাহারকা আদমিকে আনে-জানে ইস রেজিস্টার মে রখতে। দেখ লিজিয়ে"

রেজিস্টার উলটে চোখ বোলাল আগতদের নাম-ঠিকানা আগমনের সময়ের দিকে। ১৩বি ফ্ল্যাটটা সুনেত্রা আগারওয়ালের। রেজিস্টারে ওই ফ্ল্যাটে কারও আগমন লিপিবদ্ধ নেই। কিছুটা বিমর্ষ হয়ে খাতা রেখে দিচ্ছিল। হঠাৎ চোখ পড়ল ফ্ল্যাট ১৩এ ওপর। আরে, ওটা তো শিরিনের ফ্ল্যাট। একজনের নাম লেখা। কিছুটা অস্পষ্ট। নামটা পড়ার চেষ্টা করল। সিন্ধ রাও দেশমুখ। টাইম অফ এনট্রি ৭ ৩০ পিএম। সে সময় তো সে শিরিনের ফ্ল্যাটে। আর তো কেউ আসেনি। কে এই লোক? যে শিরিনের ফ্ল্যাটের নাম করে কমপ্লেক্সে ঢুকেছিল অথচ শিরিনের ফ্ল্যাটে আসেনি? এই কি সে যাকে কালো স্যানট্রো গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখেছিল কাল রাতে? এত ফ্ল্যাট থাকতে, শিরিনের ফ্ল্যাটের নাম দিয়ে ঢুকল কেন? তবে কী শিরিনের সঙ্গে কোনও যোগসাজস আছে? না কি, স্নেহাশিস ওখানে আছে বলেই অ্যালিবি খাড়া করছে?

"১৩এ ফ্ল্যাট তো শিরিন মেমসাবকা। সাড়ে-সাত বজে তো উধর হম থে। ঔর কোই তো নেহি আয়া। তব ইয়ে আদমি সিন্ধ রাও দেশমুখ কিধর কিসকে ঘরমে আয়া থা?"

"কেয়া জানে বাবু? যব কোই আতা তো নাম-পতে ঔর ফ্ল্যাট নম্বর ইধর লিখতা"

"ওহ ফ্ল্যাট মে ফোন নেহি করতা?"

"নেহি সাব। ইধার রেওয়াজ নেহি"

এ আবার কী ধরনের সিকিউরিটি? সব শো। গোড়ায় গলদ। শিরিনের ফ্ল্যাটের নাম যখন ব্যাবহার করেছে, তখন কী শিরিনের সঙ্গে যোগাযোগ আছে? না কি স্নেহাশিসকে সাক্ষী রেখে অন্য কোনও ফ্ল্যাটে ঢুকেছে? সুনেত্রা আগারওয়ালের ফ্ল্যাটে। লিফট নিয়ে উঠে এল তেরো তলায়। চাবিটা দিয়ে ঢুকল সুনেত্রা আগারওয়ালের ফ্ল্যাটে। একাই খুঁজতে হবে সিন অফ ক্রাইম। সুইসাইড না হোমিসাইড?

রোশনকে ফোন "অব ফ্ল্যাট মে হু। টাইম মিলে তো আ জানা। কাল প্রাইমারি ইনভেস্টিগেশন সব কর লিয়া? ম্যায় হাত দে সকু?"

"জরুর। থোড়া বহত টাইম লগেগা জানে মে। সাত বাংলা মে এক ড্রাগ র‍্যাকেট পকড়া। উধর পুছতাছ করনা পড়েগা"

"ঠিক হ্যায়। ম্যায় ইধর দেখতা হু। তু আনে কা টাইম কুছ খানা লে আনা"

"জরুর দোস্ত"

ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করতে গিয়ে দেখল সেলফ-লকিং দরজা। কালকে নেশার ঘোরে ঠিক খেয়াল করেনি। কেউ যদি ঘরে এসে বেরিয়ে যায়, বোঝাও যাবে না সে ঘরে এসেছিল। কেউ এসেছিল কী? এসেই যদি থাকে, নিশ্চয়ই সুনেত্রার সঙ্গে তার পরিচয় ছিল। না হলে, ভেতরে ঢুকল কী করে? এই অজ্ঞাত সিন্ধ রাও দেশমুখ, এটা ওর আসল নাম না হওয়াই স্বাভাবিক। দুটো পসিবলিটি খুঁটিয়ে দেখতে হবে। হোমিসাইড না সুইসাইড? উত্তর লুকিয়ে আছে কম্পিউটার আর মোবাইলে।

পরিতোষ সেন তার বসের মতো পিছুপা হয়নি। মধুসূদন মুখুজ্জের ফোন পেয়ে বলল "নিশ্চয়ই দেখব স্যার। ওদের পরিবারকে দেখে বড্ড মায়া হচ্ছিল। ওদের তো কোনও খুঁটির জোর নেই। আমারও তো ওই বয়সি একটা ছেলে আছে। বড়সাহেব আমায় অন্য একটা কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। বললেন রিপোর্টটা উনি পাঠিয়ে দেবেন। আমি আর গা করিনি। হয়ত উনি নিজেই ইনভেস্টিগেশন করবেন ভেবেছিলাম"

ফোনটা নামিয়ে মনটা দুঃখে ভরে গেল। শহরে কত কিছু ঘটে যাচ্ছে। সবের কী কূল-কিনারা হয়? কিছু কিছুর হয়। যেখানে কোনও রথী মহারথীদের হস্তক্ষেপ থাকে। রিটায়ার্ড রজত সান্যালের সে ক্ষমতা নেই।

ঐত্রেয়ীকে ফোন। লাইন লাগতেই নারীকণ্ঠের আওয়াজ "ঐত্রেয়ী মুখার্জি স্পিকিং"

"পরিতোষ সেন। মানিকতলা থানার এএসআই"

"বলুন" নিস্পৃহ গম্ভীর আওয়াজ।

"আপনি সোহম সান্যালকে চিনতেন?"

"হ্যাঁ। আমি এখন ব্যাঙ্গালোরে" অতিরিক্ত আবেগ নেই। এতদিনে ব্যাপারটা সামলে নিয়েছে। মিলন তো বলেইছিল ঐত্রেয়ী ব্যাঙ্গালুরুতে চাকরি করে।

"সোহম মারা গেছে জানেন?"

"শুনলাম। আমাদের কমন ফ্রেন্ডের কাছে"

যেন পরিতোষ সেন শুনতে পায়নি "কার কাছে?"

"আমি এখন অফিসে। আপনার কিছু প্রশ্ন থাকলে সন্ধেবেলা ফোন করুন"

"কটায়?"

"রাত আটটার পর"

রাত তখন রাত নটা। পরিতোষ সেন সবে ডিউটি থেকে ফিরেছে। মনে পড়ল ঐত্রেয়ীকে এখনও ফোন করা হয়নি।

"পরিতোষ সেন বলছি। সকালে ফোন করেছিলাম..."

"হ্যাঁ বলুন" ওপাশে ঐত্রেয়ী।

"এখন ব্যাঙ্গালুরুতেই থাকেন?"

"কিছুদিন ধরে আছি"

"শুনলাম সোহমের বন্ধু ছিলেন। সোহম যে রাতে মারা যায় আপনি ফোন করেছিলেন?"

"আপনাকে কে বলল?"

"মিলন। আপনাদের বন্ধু মিলন চ্যাটার্জি"

"ও কী করে জানল?"

"সোহম তখন ওর পিজি অ্যাকোমোডেশনে যখন আপনি ফোন করেছিলেন। বোধহয় সোহমের কথা বলা দেখে আন্দাজ করেছিল। সোহমের মৃত্যুর দিন আপনি কোথায় ছিলেন?"

"ব্যাঙ্গালুরুতে" সংক্ষিপ্ত উত্তর।

"কবে থেকে ওখানে?"

"প্রায় মাস দুয়েক। আগে অবশ্য কলকাতাতেই ছিলাম"

"হঠাৎ ওখানে?"

বিরক্ত হয়েই বলল "চাকরি পেলাম। চলে এলাম। যেখানে চাকরি সেখানেই তো থাকতে হবে" বোঝাই যাচ্ছে ব্যাঙ্গালুরু যাওয়াতে খুশি নয়।

"কোনও কোম্পানি?"

"দ্য নিউ এজ"

"কোম্পানির মালিক কে?"

"অতশত জানি না। হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজার মিঃ পি কে খাসনবিস আমায় পোস্টিং দেন"

কোম্পানি নিয়ে কথা না বাড়িয়ে আসল কথায় এল "আপনার সঙ্গে সোহমের কী সম্পর্ক?"

"মানে?" বিরক্ত ঐত্রেয়ী। নিজেকে সামলে বলল "বন্ধুত্ব"

"নিছক বন্ধুত্ব? কী রকম? এর বাইরেও অন্য কিছু?"

"সব কথা কী আপনাকে বলতে হবে? মাত্রা ছাড়িয়ে প্রশ্ন করছেন" ঐত্রেয়ীর প্রচ্ছন্ন ধমকানি। শিক্ষিত মেয়ে। এএসআইয়ের এক্তিয়ার অজানা নয়।

"ঠিক আছে। ও ব্যাপারে প্রশ্ন করব না। সোহমের বন্ধু ছিলেন বলেই দু-একটা প্রশ্ন না করে পারছি না। আপনিও তো চান সোহমের মৃত্যুর কিনারা। কিছু তথ্য না জানলে আমাদের পক্ষে এগোনো মুস্কিল"

"আমিও চাই সোহমের মৃত্যুর বিহিত হোক" ঐত্রেয়ীর সম্মতি।

"আপনি কী ওই রাতে ওকে ফোন করেছিলেন?"

"হ্যাঁ"

"ওর কথায় কোনও আশঙ্কা বা চিন্তা লক্ষ করেছিলেন?"

"না। আর পাঁচটা দিনের মতোই স্বাভাবিক"

"এনি প্রবলেম?"

"নাঃ।... বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই ও বিব্রত। বলেছিল বাবা রিটায়ার করেছে। বোন প্রিয়ার বিয়ে বাকি। থিসিসটাও শেষ হয়নি। অথচ চেন্নাইতে মোটা মাইনের চাকরির অফার। কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না"

"আর কিছু?"

বলতে যাচ্ছিল ঐত্রেয়ী। সামলে নিয়ে বলল "নাঃ। তেমন কিছু নয়"

"কারও ওর ওপর শত্রুতা? আই মিন কোনও পলিটিক্যাল পার্টি?"

"বাপের জন্মে যে রাজনীতি করল না, তার কোনও পার্টির সঙ্গে শত্রুতা থাকবে কেন?"

"অন্য ব্যাপারে কী জড়িয়ে পড়েছিল?"

ওদের মিউচুয়াল ফ্রেন্ড সুনেত্রা আগারওয়ালের কথা মনে এলেও চেপে গেল। এটা মার্ডার কেস। ব্যক্তিগত টানাপোড়েনের জের টানতে চাইল না। মনোমালিন্যটা ওদের মধ্যেই থাক। সোহমের মৃত্যুর মধ্যে টেনে পুলিসি ঝামেলা বাড়াতে চায় না। এই পুলিসদের বিশ্বাস নেই। কীসের সঙ্গে কোনটাকে লটকে দেবে কোনও ভরসা আছে? ভাগ্যিস। যদি জানত সুনেত্রা এখন জীবিত নেই তাহলে তো আরেক গাড্ডায়। পৃথিবীতে কত কিছু ঘটে তার কতটুকুই বা আমরা জানতে পারি? আর জানলেও, কটাই বা বুঝতে পারি? আর বুঝলেও, কতটুকুই বা করতে পারি?

"আর তো কিছু মনে পড়ছে না। যদি আর কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে পরে ফোন করতে পারেন"

"আপাতত নেই" ফোনটা রাখতে যাচ্ছিল, কী মনে হতে বলল "একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছিলাম। ডেড বডির কাছ থেকে মোবাইলটা পাওয়া যায়নি। আপনি কিছু বলতে পারবেন?"

"কী করে বলব? আমি তো ডেড বডির পাশে ছিলাম না" ব্যঙ্গ করেই বলল।

"কোথায় ছিলেন সেদিন?"

"এখানে। ব্যাঙ্গালুরুতে"

“কী করে জানলেন সোহমের মৃত্যুর খবর?”

“পরের দিন মিলন ফোনে জানায়”

"কলকাতায় গেছিলেন ওকে দেখতে?"

“নাঃ। ইচ্ছে ছিল। ছুটি পাইনি। লোকটাই যখন বেঁচে নেই, ওর ডেড বডি দেখে কী হবে? আপনার প্রশ্ন শেষ হয়েছে? না কি আর কিছু আছে? এই ফিরেছি। এবার রান্না করতে হবে” ফোন কেটে দিল ঐত্রেয়ী।

কতগুলো প্রশ্ন উঁকি মারছে পরিতোষ সেনের মাথায়। কথা শুনে মনে হল না সোহমের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক ছিল। ভাবলেশহীন, নির্বিকার। অথচ মিলন তো বলল ওদের ভাব-ভালোবাসার কথা। যুগটা কী এতই বদলে গেল? আপনজনের বিদায়ব্যথা মানুষকে নাড়া দেয় না। সবাই ছুটছে। এই ছুটে চলা পৃথিবীর অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে মাসের মাইনে গুনতে গুনতে জীবন পার করে দিল। তার ছেলেটাও কী একদিন এমনিভাবে বাবার মৃত্যুকে জীবনের অবশ্যম্ভাবী নিয়ম মেনে, অনুশোচনামুক্ত হারিয়ে যাবে? ভারাক্রান্ত হৃদয় ফোন রেখে, ইউনিফর্ম ছেড়ে হাঁক দিল “কই গো, খাবার বাড়ো। স্নান সেরে আসছি”

খিদের ক্লান্তিতে ভুলে গেছিল, ফোনের হদিস পায়নি। সোহমের পকেট থেকে পাওয়া ফোন নম্বরেরও কূল-কিনারা হয়নি। কাল নয় সুনেত্রাকে ফোন করে বাকি কাহিনি জেনে নেবে।

স্নেহাশিস ফ্ল্যাটের দরজা ভেতর থেকে লক করে গিয়ে দাঁড়াল ব্যালকনিতে। কংক্রিট নগরীর বহুতল আকাশ ছুঁতে চাইছে। কিংবা আকাশটাকে ঢেকে দিতে। কংক্রিটের চূড়া থেকে ফিরে দেখল স্বপ্নরাজ্যের সকালের আকাশটাকে। কোথায় সবুজের সমারোহ, বনাঞ্চলের স্নিগ্ধ ছায়া, গোপগড়ের পাপড়ি মেলা ফুলের হাসি? গরিব কৃষক ছেলের মিষ্টি-মধুর বাঁশি। অভ্রদিতা যতই দুঃখ করুক ছায়াঘেরা সবুজ ছেড়ে কেন যে লোকে ছোটে এই কংক্রিটের জালে?

ব্যালকনিতে ধ্বস্তাধস্তির চিহ্ন খুঁজছে। কোণে সিগারেটের টুকরো। কাল রাতে অন্ধকারে রোশন মিস্ করেছে। সুনেত্রা কী সিগারেট খেত? যদি না, তবে কে এসেছিল যে সিগারেট খায়? ড্রয়িং রুম থেকে শোবার ঘর। খুঁজে বেড়াচ্ছে কোনও অন্য মানুষের আর্বিভাবের ক্লু। সিগারেট ধরিয়ে অ্যাশট্রে খুঁজছে। যে সিগারেট খায় তার বাড়িতে অ্যাশট্রে নেই!? তাহলে সিগারেট বাট কে ফেলেছে? আগে কোনও ছেলেবন্ধু এসে থাকতে পারে। অ্যাশট্রে না পেয়ে বারান্দায় সিগারেট খেতে চলে এসেছিল। পরিষ্কারের আগেই মৃত্যু। কিচেন থেকে কাপ নিয়ে কম্পিউটারের পাশে বসল। ছবিগুলো স্ক্রোল করছে এলোমেলোভাবে। বিভিন্ন ধরনের। অকস্মাৎ একটা ছবিতে থমকে। ছবিটার চোখ কোথায় দেখেছে। চেনা, অথচ মনে করতে পারছে না।

মাঝে মাঝে মনে হয় সত্যি বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। যদি ফেলুদার মতো হতে পারত। একটা নাম বলতেই লোকটার ইতিহাস বলে দিতে পারত। হিন্দি সিনেমার নায়কের মতো সবসময় জেতা যায় না। শুধু রঙিন পর্দায় সম্ভব, জীবনে নয়। স্বপ্নের দুনিয়ায় সব মানুষই কাউকে সুপার-হিরো বা সবজান্তা দেখতে চায়। তাই বিদগ্ধ গুণীদের নিয়ে কতই না রহস্য-রোমাঞ্চ উপন্যাস লেখা। যখন স্বপ্নের মানুষদের মতো সবজান্তা হতে পারে না, মনে হয়, কেনই বা পুলিসে? শুধু চাকরির তাগিদে? প্রতিদিন খুন, রাহাজানি দেখেও কেনই বা বুদ্ধি ওদের মতো তীক্ষ্ণ নয়? কারণ সে জীবন্ত। অন্যরা লেখকদের স্বপ্ন। কল্পলোকে ভেসে বেড়ানো বুদবুদ।

মাথায় এসব চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। ছবিগুলো ওলটাতে লাগল। এত সাধু-সন্ন্যসীর ছবি কেন? সুনেত্রা কী আধ্যাত্মিক ছিল? বিভিন্ন সাধু-সন্ন্যাসীর ছবির মধ্যে হঠাৎ শিরিনের ছবি। জিনস-টপসে হাসছে। বোধহয় সুনেত্রার তোলা। না হলে কম্পিউটারে কী করে? শিরিন যে বলছিল সুনেত্রার সঙ্গে কেবল ‘হ্যালো-হায়’ সম্পর্ক। সুনেত্রার সঙ্গে সম্পর্ক ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেল?

মোবাইলে শিরিন “হ্যালো স্নেহাশিস... তুমি কোথায়?”

“কাজে। কেন?”

"আজ রাতে লাসানিয়া খাবে?"

"যা খাওয়াবে"

"ভাবছিলাম, লেটস মেক ইট অ্যান ইটালিয়ান ইভিনিং টুডে"

"হোটেলে?"

"নাঃ... বাড়িতে। তোমার জন্য ইটালিয়ান রান্না করব"

"তাহলে এক বোতল সিয়ান্তি নিয়ে এস"

শিরিন ফোন কেটে দিল।

এতক্ষণ মনে পড়ছিল না। এই লোকটার চোখের সঙ্গে মেহুলির সুটে পাওয়া আধছেঁড়া ছবির অনেক মিল। ফিরে গেল ওই লোকটার ছবিটায়। ভালোভাবে দেখল। কল্পনায় আঁকার চেষ্টা করল মুখটাকে। যদি আগে জানত। ছবিটা রিপোর্টের সঙ্গে অ্যাটাচ করে পাঠিয়ে দিয়েছে। এখন আবার লালবাজারে গিয়ে ছবিটা খুঁজে বার করতে হবে। যদি অনুমান সত্যি হয়, তবে মেহুলির মৃত্যুর সঙ্গে এই মেয়েটির মৃত্যুর কোনও যোগসাজস আছে। স্নেহাশিস কী তবে একটা আইসোলেটেড মৃত্যুর তদন্ত করতে গিয়ে বৃহত্তর চক্রে ঢুকে পড়েছে?

ফোন করল রোশনকে "আনেকে ওয়াক্ত একঠো হার্ড ডিস্ক ভি লে আনা"

"কিউ?"

"কম্পিউটার মে বহত সারি চিজকা ঠিকানা লাগানা হ্যায়। ঔর হো সকে তো মোবাইল নম্বরকা সার্ভিস প্রোভাইডারকে পাস সে সুনেত্রাকে মোবাইল কল কা পুরা প্রিন্ট আউট"

"উসকা মোবাইল নম্বর?"

"মালুম নেহি। উসকে মোবাইল সে একঠো মিসড্ কল দেতা হুঁ"

রোশন ইতস্তত করে বলল "মত কর। ইয়ে টাম্পারিং অফ এভিডেন্স হোগা। তু মেরে উপর ছোড় দে। ম্যায় পাতা লাগাতা" ফোনটা কেটে দিল।

উইন্ডোস এক্সপ্লোরার এলোমেলো ওলটাচ্ছে। 'মাই ভিডিওস' এ স্ক্রোল করতে গিয়ে কতগুলো থাম্বনেলস দেখে অবাক। এ কী? এ তো কল্পনারও বাইরে। ডবল ক্লিক করতে উইনডোস মিডিয়া প্লেয়ারে ভিডিও খুলে গেল। এ তো ব্লু ফিল্ম। একজন ছ'ফিট লম্বা ভারতীয় সুপুরুষের সঙ্গে তিনটি মহিলার দৈহিক লীলা। গ্রুপ সেক্স। এ ছবি সুনেত্রা আগারোয়ালের কম্পিউটারে কেন? সন্ন্যাসীভক্ত মেয়েটা কী ব্লু ফিল্ম দেখত? আরেকটা ভিডিও। আবার সেই পুরুষ। এবার অন্য দুই নারী। নতুন রূপে, নতুন আঙ্গিকে কামসূত্র। শয়নকক্ষ দেখে মনে হচ্ছে বিলাসবহুল পাঁচ তারা হোটেল। সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি, চাপা দাড়ি, সুপুরুষের সামনে ধীরে ধীরে বিবস্ত্র হচ্ছে দুই নারী। হুইস্কি খেতে খেতে স্ট্রিপটিজ দেখছে। দুটি নারীই ভারতীয়। বেশভূষা দেখে মনে হচ্ছে উচ্চবিত্ত ঘরের। প্রথমটির পরনে নীল জিনস্, সাদা টপস্। অর্থহীন ঝাঁকানির মতো নৃত্যের তালে তালে ছন্দ মিলিয়ে, খুলে ফেলছে সাদা টপস। সালোয়ার-কামিজ পরা অন্য নারীর হাতের স্পর্শে খুলে গেল জিনস্। কালো লেসের প্যান্টি আর ব্রা কালো পর্দার মতো ঢেকে রেখেছে শ্বেতশুভ্র দেহ। দুহাত উঁচু করে সালোয়ার থেকে মুক্ত করছে অন্যকে। একসময় কামিজও মাটিতে। পুরুষ নির্বাক দেখছে। একসময় ফর্সা দেহ থেকে কালোর আভরণও খসে পরল। শ্যামলা দেহ থেকে সাদার শেষ সুতিকণাটুকুও। শুরু দুই নারীদেহের দৈহিক লীলা। সৌম্য পুরুষ নীরব দর্শক।

ভিডিওটা বন্ধ করে দিল। শিরিনের কথামতো গরমিল লোকদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল? সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। খোঁজ লাগাতে হবে, কে এই পুরুষ? সুনেত্রা আগারওয়ালের সঙ্গে কী সম্পর্ক? ভিডিও নিয়ে আর সময় নষ্টর মানে হয় না। সন্ধেবেলা জীবন্ত ভিডিও মজুত ইটালিয়ান খাবার, ওয়াইনের সঙ্গে।

হাসি পেল। প্রথম যৌবনে এই ভিডিও দেখার জন্য সবাই মিলে কোনও বন্ধুর চিলেকোঠায় হুমড়ি খেয়ে পড়ত। তারপর জীবনে প্রচুর নারী। সেই সঙ্গে ভিডিও দেখার বাসনাও মলিন। সামনে যখন জীবন্ত সুন্দরী,

কী লাভ মিথ্যে ছবির ফুলঝুরিতে? মুম্বাইয়ের টপ মডেল বিবস্ত্র হতে আগ্রহী। একটু ভয়। শিরিনের অনেক কিছুই অস্পষ্ট। শেষে জড়িয়ে আবার নিজেই কেওড়াতলার বডি নম্বর ফোর হবে না তো? ঠিক আঁচ করতে পারছে না মৌচাকের কোথায় দাঁড়িয়ে। শিরিনই বা কোথায়? ছবিটা একবার ভেসে উঠে মিলিয়ে গেল - 'মুম্বাইয়ের বিখ্যাত মডেলের ফ্ল্যাটে তরুণ পুলিস অফিসারের মৃতদেহ'। খবরটা রোমহর্ষক হলেও অভ্রদিতা, ঋজুর পক্ষে সুখকর হবে না।

আউটলুকে ই-মেল পড়ছে। এক মহিলার সঙ্গে অনেক ই-মেল বিনিময়। নাম ঐত্রেয়ী। ঐত্রেয়ী মুখার্জি। কে এই মহিলা? গত রাতে সোহমকে লেখা চিঠিতে এই নামের উল্লেখ দেখেছে। এ তো লাভ ট্রাইঙ্গেল। সোহম স্যান্যাল। সুনেত্রা আগারওয়াল। ঐত্রেয়ী মুখার্জি। অনেক চিঠি। সোহমকে ঐত্রেয়ীর খপ্পর থেকে মুক্ত করবার অনুরোধ অনুনয়। একটা চিঠিতে, সোহমের জবাব 'সুনেত্রা হোয়াই ডোন্ট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস সিমপল ইস্যু। ইউ মে হ্যাভ ফলেন ইন লাভ উইথ মি। বাট আই হ্যাভ নো সাচ ফিলিংস ফর ইউ' প্রেমে প্রতিঘাত। আছড়ে পড়েছে ঐত্রেয়ীর ওপর। তার থেকেই কী আত্মহত্যা? ই-মেলের শব্দে মাথায় জলতরঙ্গ। 'হোয়াই কান্ট ইউ লিভ সোহম আউট?' 'হাউ ডেয়ার ইউ অর্ডার মি?' 'আই উইল মেক শিওর ইউ আর আউট অফ সোহমস লাইফ' 'আই উইল সি ইউ আউট অফ ইওর লাইফ টু'

ওরে বাবা। রাগে খুনের হুমকি। মহিলাদের বিবেক নিয়ে তর্ক-বিতর্ক আকাশ ছুঁতে পারে। ভাগ্যিস শিরিন সেই পর্যায় যায়নি। অভ্রদিতার সঙ্গে স্নেহাশিসকে বাঁচতে দিয়েছে। আজ যদি কিছু চায় প্রত্যাখ্যান করে কী করে? কে এই সোহম? কেই বা ঐত্রেয়ী? এই মৃত্যুর অনেক ক্লু বাংলার মাটিতে। চিঠি পড়ে অদ্ভুত লাগল। সোহম ঐত্রেয়ীর গতিবিধির অনেক তথ্য মিলন চ্যাটার্জির চিঠিতে। মিলনের কী স্বার্থ সুনেত্রাকে এত কথা জানাবার? এই মিলন শেষবারের মতো ফোন করেছিল সুনেত্রা আগারোয়ালকে।

বেল বেজে উঠল। দরজা খুলতেই রোশনের সঙ্গে হাবিলদার প্লাস্টিকের ব্যাগ নিয়ে ঢুকল।

"ইস মে কেয়া?"

"চাইনিজ। তু মেরা মেহমান। কামকে বিচ ইধর লাঞ্চ করুঙ্গা"

"ডিস্ক লায়া?"

রোশন হবিলদারেকে "শিউকুমার, গাড়ি সে হামারে অ্যাটাচি লানা। সিরিফ ডিস্ক কেও? বহত কুছ"

"এয়ারপোর্ট মে দেখা ছোটা উমর কা দোস্ত শিরিন কে বারে জান-পহেচান করোগে? উলটে তরফ ফ্ল্যাট মে রহতি"

"কাল তো তু উধারি রাত বিতায়া" মুচকি হাসল।

"চল কম্পিউটারকে পাস। ম্যায় বতাতা হু" সব তথ্য রোশনকে দেখাল।

"কল রাত শিরিন বোলা সুনেত্রা সে উসকা সিরিফ 'হ্যালো-হায়' রিলেশন। ঔর ইধর দেখ। উসকা ইতনা তসবির। সোচনে কি বাত হ্যায় না?"

মাথা নাড়ল রোশন "সহি। উসসে কিতনা দিনকে জান-পহেচান?"

"এক সাথ কলেজ মে পড়তে থে" মোহাব্বতের কথা চেপে গেল "ফির ম্যায় আইপিএস, সাদি। ও মুম্বাই আয়া তকদির ঢোড়নে। জিস খুনকে সিলসিলে ম্যায় ইঁহা, যব উধর ইনভেস্টিগেশন কর রহা থা, উসকা ফোন চার বরষ বাদ। মেহুলিকে বারে মে পুছতাছ কর রহি থি"

গরমে মাথা কাজ করছিল না। পাখার তালায় রোশনের মাথা কাজ করছে। ইধর কুছ ঢুরনা পড়েগা। লড়কি ইধর মরি। পরন্তু বাঙ্গাল কি। শিরিন, মেহুলি ভি ওহা কি। বাঙ্গাল সে গহরা তালুক হ্যায়।

"চার বরষ মে ফোন নেহি কিয়া?"

"নেহি"

"ফির তো সোচনেকে বাত"

"ভিডিওকে আদমি ঔর ছোকরি লোগ..."

"ভিডিও সে সমঝ নেহি হোতা। ফির ভি তসভির দেখ কর লগতা ইনলোগ মারাঠি। তুঝে? সুসাইড ইয়া হোমিসাইড?"

"হোমিসাইডকে এভিডেন্স নেহি মিলা। দিল বোলতা হ্যায় সুইসাইড নেহি। তেরেকো বোলনা ভুল গয়া। কাল রাত এক আদমি ইস বিল্ডিং মে আয়া থা। রেজিস্টার মে লিখা উসকা নাম, সিন্ধ রাও দেশমুখ। শিরিনকে ভিসিটর। টাইম অফ এন্ট্রি ৭ ৩০। উস ওয়াক্ত হম শিরিনকে উহা। কোই ভিসিটর নেহি আয়া। কৌন ইয়ে আদমি? শিরিনকে নামমে এনট্রি কিউ?"

"সয়েদ শিরিনকে সাথ কুছ তালুক হ্যায়। আয়া থা উসে মিলনে। ফির তুঝে উধর দেখ কর সটক্ পড়া"

"ইয়ে ভি হো সকতা, ইয়ে আদমি ইস লড়কি কে ফ্ল্যাট মে আয়া থা। নাম ছোড়, ইয়ে নাম সয়েদ গলত। হমে কনফিউজ করানেকে লিয়ে বগলওয়ালা ফ্ল্যাটকা পতা লিখা"

"হো সকতা"

"যব ইয়ে লড়কি কি চিল্লানেকা আওয়াজ শুনা ঔর ব্যালকনি সে দেখা এক কালা স্যানট্রোকো নিকলতে। সয়েদ ইয়ে আদমি কালা স্যানট্রো মে আয়া থা"

"আওয়াজ শুননেকে কিতনা দের বাদ ব্যালকনি মে গয়া?"

"কই মিনিট"

"অব হমে দেখ না হ্যায় উপরসে লিফট মে নীচে জানে কিতনা টাইম লাগতা। ফির গাড়ি কর নিকলনে মে। স্টপওয়াচ শুরু কর। মোবাইল মে হ্যায়?"

"হাঁ। যব ম্যয় হাঁ বলুঙ্গা"

রোশন বেরিয়ে গেল। স্নেহাশিস বারান্দায়। রোশনকে বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে কার পার্কে। স্টার্ট দিয়ে যখন গাড়িটা গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল, স্নেহাশিস টাইম দেখল। পুরো আট মিনিট।

ব্রিফকেস হাতে ফিরতেই বলল "পুরে আঠ মিনিট"

"তু কেয়া আঠ মিনিটকে বাদ ব্যালকনি মে গয়া?"

"নেহি। উতনা নেহি হোগা" মনে করার চেষ্টা।

"ইয়ে আদমি তেরা মার্ডারার নেহি। উস টাইম মে বারন্দে সে লড়কি কো ঢকেলকর স্যানট্রো লে কর নিকল নেহি সকতা" ডাইনিং টেবলে বসে হাবিলদারকে বলল "শিউকুমার, খানা লগানা"

স্নেহাশিস ভাবছে কতক্ষণ সে শিরিনের প্রন খাচ্ছিল? কতক্ষণইবা ক্লাসিক ধরাতে লেগেছিল? চার মিনিটের বেশি হতে পারে না। তাহলে কী মেয়েটা সত্যি আত্মহত্যা করেছে? মন বিশ্বাস করছে না।

"চলা আ। খানে সে দিমাক খুলেগা"

কম্পিউটারের চেয়ার ছেড়ে খাবার টেবলে বসল স্নেহাশিস। সব কিছু গুলিয়ে যাচ্ছে। রোশন ঠিকই বলেছে। পেটে কিছু না পড়লে মাথা কাজ করবে না।

ক্ষুধা সর্বগ্রাসী।

তেরো

“ওঃ নমঃ শিবায়…”

বাবা আসন ছেড়ে অগণিত মহিলাভক্তকে শান্তির বাণী শুনিয়ে এবেলার মতো ঈশ্বরপ্রাপ্তির উপদেশ শেষ করলেন। এবার অপরাহ্ণের বিশ্রাম। ভক্তদের কাছ থেকে বিদায়। ভক্তদের পুষ্পবৃষ্টিতে ভরে গেল শ্বেতশুভ্র বসন সৌম্য বাবার ছ-ফিট লম্বা দেহ। ভক্তবৃন্দের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন।

পাহাড়ের ওপর জঙ্গলের ভেতর এই আশ্রমে সর্বত্রই শান্তির বাণী। প্রকৃতি মৌনতায় ভরিয়ে দিয়েছে কোলাহল মুখরিত মর্ত্যলোক থেকে স্বর্গলোক দেখার এই মনোরম পটভূমিকে। দূরে সারি সারি অশ্বত্থ গাছ। নীচে নাম না জানা ফুলের শোভা। তার ফাঁকে আলো-আঁধারির লুকোচুরি। বনের মেলায় প্রকৃতির ছোঁয়া সবুজের আনাচে-কানাচে। ধ্যানগম্ভীর পৃথিবী নতুন রূপে সাজতে চাইছে মহমায়ার অন্ধকারের বাইরে। নতুন বরণডালি নিয়ে চিরযৌবনা হয়ে নতুন ছন্দে, নিঃশব্দ আনন্দে। রূপহীন মরুভূমির মধ্যে মরূদ্যানের আশায়। গীত-বর্ণ-রূপ মাখা ঈশ্বরপ্রাপ্তির অনন্ত গভীরতায়।

ভওয়ানিশঙ্করের আশ্রম ম্যাথেরনের সবুজের গভীরের বনছায়ায়। দস্তুরি নাকা থেকে হাঁটা পথে প্রায় আট মাইল। এক সময় এই সবুজের ভাণ্ডারের ঠিকনা ছিল অজানা। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে থানের গভর্নর হিউগ পয়েনটিজ্ ম্যালেট সহ্যাদ্রি রেঞ্জের ওপর জায়গাটা আবিষ্কার করেন। তদানীন্তন বম্বের গভর্নর লর্ড এলফিনস্টোন সেটাকে মনোরম হিল রিসর্টে পরিণত করতে উদ্যোগী হন। তারপর বহুবছর। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অস্তাচল। কোথায় আজও সাবেকিয়ানার ছোঁয়া। এখানে যান্ত্রিক যানবাহনের অনুপ্রবেশ নেই।

“কা হো চতুর্বেদী? ইতনে দিন খবর নেহি? কাঁহা গুম হো গেয়ে?” বাবা গোবিন্দ মহারাজ এখনও ফোনের চিৎকার ভোলেনি। দিনকে দিন হরিদ্বারের আশ্রম থেকে মুম্বাইয়ের লাইন খারাপ হচ্ছে।

রাজু চতুর্বেদী রম্ভার সঙ্গে উদ্দাম সম্ভোগ শেষ করে প্যান্ট লাগাচ্ছিল। রম্ভা - তার নবতম ধ্যান বিছনা থেকে জীবনে। তাড়াতাড়ি প্যান্ট ঠিক করল যেন বাবা সামনে দাঁড়িয়ে।

“নমস্তে বাবা। মুম্বাই মে। কৈসে হো আপ?” স্বাভাবিক আওয়াজ।

“তন্দুরস্ত। তুমহে চিন্তাকে জরুরত নেহি। থোড়ি সি মুসিবত আ পড়ি। তুমহারে সহায়তা জরুরত” অনুনয় নয়, আদেশ।

“বাবা মেরে জিন্দেগি তো আপকে চরনো মে। আদেশ কিজিয়ে”

“ফোন মে নেহি। ইধর আনা পড়েগা”

হপ্তা খানেক পর রম্ভাকে বগলদাবা করে বাবার আশ্রমে রাজু হাজির। তৎক্ষণাৎ বাবার দৃষ্টি রম্ভার দিকে। চতুর্বেদী সর্বদাই ভোগ্য নারী পরিবেষ্টিত। বাবা আপাদমস্তক রম্ভাকে মাপল। পারলে গিলে ফেলে।

“কেয়া তকলিফ বাবা?”

অন্যদের শ্রবণের বাইরে রাজুকে গোপন ঘরে নিয়ে গেল। দীপার মৃত্যুর কয়েক বছর পর জল ঘোলা হয়েছে।

“ইয়াদ হ্যায় কোই বরষ পহেলে আশ্রমকে এক ছোকরি পানি মে ডুব কর খুদকুশি কি” মিথ্যে গল্পটাই দীপার মৃত্যুর পর বাবা প্রচার করেছিল। পুলিসকেও। ঘটা করে দীপার শ্রাদ্ধ চোখের জলের মধ্যে। এক সপ্তাহ নিজেকে মন্দিরের গোপনে মৌনী হয়ে দীপার মৃত্যুতে কুম্ভীরাশ্রু ঝরিয়ে সবাইকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিল দীপার অকাল প্রয়াণের গভীর বেদনা। লোকে জানত, বাবা দীপার আত্মার শান্তি কামানায় ধ্যানে। আসল কাহিনি অজানা। চতুর্বেদী, যে মুম্বাই থেকে নারী ভেটে বাবার আশ্রম প্রোজ্জ্বল করত সেও নয়।

“হাঁ বাবা। ইয়াদ হ্যায় আপ উসকে আত্মাকে শান্তিকে লিয়ে কিতনে প্রার্থনা কি”

"ইয়ে পুলিসকে চক্কর মেরা নিরাশা কে কারণ। জিত্নে ভি উনহে খুস করো, চাহনা দিনকে দিন জাদাহি বড় রহি হ্যায়। ইতনে দিন বাদ দীপাকে কেস মে কুছ জাদাহি দিলচস লে থা হ্যায়"

"ইয়ে তো চিন্তাকে বিষয়। কেয়া করু?" রাজু বুঝে উঠতে পারছে না।

"কুছ তো সোচো... ম্যায় কেয়া তুমহে অ্যায়সে হি মুম্বাই সে বুলায়া। ইসসে নিকল নে কে লিয়ে..."

"জরুর। থোড়া ওয়াক্ত দিজিয়ে"

সেই সন্ধেয় রম্ভা বলল "ইয়ে আশ্রম শান্তিকে বাতাবরণ। কই দিন ইহা রহে সকু?"

"জরুর। বাবাকে কামকে সিলসিলে মে হমে মুম্বাই লৌটনা হ্যায়। লৌট আ কর লে জাউঙ্গা" চতুর্বেদীর সায়।

রম্ভার তো বটেই, বাবাও খুশি। আরেক সুন্দরী আশ্রম আলোকিত করল।

কয়েক বছর আগে, দীপার মৃত্যুর পর আশ্রমের আবাসিকদের অনেককেই ছেঁটে বাদ দিয়েছিল। নিজেও গুটিয়ে নিয়েছিল। বিশ্বস্ত কয়েকজন ছাড়া সবাইকেই বিদায় দিয়ে। যারা ছিল, বাবাকে হাড়েহাড়ে চিনত। জানত বেগরবাই করলে ভয়াবহ পরিণতির কথা। পেয়ারের অনুস্কা তো ছিলই। হারেমে যোগ হল রম্ভা। তাছাড়া প্রীতি, রীতা আরও দুজন নিয়ে মোট ছয়।

মাসখানেক পর রাজু চতুর্বেদী ফেরত এল নতুন অভিসন্ধি সাজিয়ে। তার অগণিত অর্থবান ক্লায়েন্ট, যাদের বাবার সংস্পর্শে নিয়ে ধন্য করেছে, পবিত্র করেছে, তাদেরই মধ্যে একজনের ম্যাথেরনে বাগানবাড়ি। রক্ষণাবেক্ষণে বিপুল অর্থব্যয়ের জন্য সে বাবাকে দান করতে প্রস্তুত। বাবা তাকে ঈশ্বরের পথ দেখিয়েছে। ছেলে অ্যামেরিকায় পাকাপাকিভাবে। নিজেও বাগানবাড়িতে বড় একটা যায় না। এহেন মহাপুরুষের জন্য সে বাগানবাড়ি দান করতে প্রস্তুত। আসন্ন বিপদ আন্দাজ করে বাবাও স্থান পরিবর্তনের কথা ভাবছে। হাতে স্বর্গ পেল, খবরটা জেনে।

এক সকালে হঠাৎ বাবা হরিদ্বার থেকে উধাও। যেমন উধাও হয়েছিল মির্জাপুর বা বারানসী থেকে। সঙ্গে ছয় মহিলা। ভক্তরা জানল বাবা হিমালয়ে বনবাসে গেছেন জ্ঞান আহরণ করতে, আরও নিবিড়ভাবে ঈশ্বরকে পেতে, তাঁর কাছাকাছি থাকতে।

"তথাস্তু মহারাজ" ভক্তদের বিনম্র সায়।

রাজেন্দ্র চতুর্বেদীর মতো সর্বকালীন দালালের সহায়তায় বাবা গোবিন্দ মহারাজের জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু সম্পূর্ণ সন্ন্যাসী রূপে শান্ত, নিবিড় ম্যাথেরন লেকের ধারে অবস্থিত বাগানবাড়িতে নতুন আশ্রম সাজিয়ে। এখন আর সে গোবিন্দ মহারাজ নয়, ঈশ্বরের নয়া অবতার স্বামী ভওয়ানিশঙ্কর।

কুড়ি বছরের লহংপুর গ্রামের দুর্গা প্রসাদ ঝিমলির মৃত্যুর পর অনেক দূর এসেছে। ভওয়ানিশঙ্করজির আত্মিক উন্নতির মন্ত্র যে লোকমুখে ছড়িয়ে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে, এই আশ্রমের মধ্যে না দাঁড়ালে বোঝা যায় না।

"ঈশ্বর লেনে সে নেহি মিলতা। দেনে মে হি আত্মাকা শান্তি প্রাপ্ত হোতা"

সেই দিতেই হাজারও ভক্তবৃন্দ এখানে জড়ো হয়। যদি বা ভওয়ানিশঙ্করের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরদর্শন হয়। ঈশ্বর দূরে অজানা রহস্যে ঢাকা, না-দেখা বিগ্রহ হলেও, ভওয়ানিশঙ্কর সেই সুদূরের পার্থিব রূপ। তার চরণকমলে নিজেকে সঁপার মধ্যেই ঈশ্বরের দর্শনের পথ। ভওয়ানিশঙ্কর তাই বড় কাছের মানুষ। আরও কাছে পাওয়ার মধ্যেই ঈশ্বরপ্রাপ্তির সম্ভাবনা।

বাবা অপরাহ্নের বিশ্রামের জন্য নিজ কক্ষে প্রস্থান করলেন। কক্ষের সংলগ্ন ডাইনিং সুইটে বাবার অপরাহ্ন ভোজের বিশাল সমারোহ। এখানে শিষ্যদের প্রবেশ নিষধ। চারজন সুন্দরী বাদে - রীতা, অনুস্কা, প্রীতি আর রম্ভা। এদের মধ্যে দুজন অপরাহ্নে বাবার সেবায়, দুজন নিশিভোজের সময় ও পরে। বিরিয়ানি, মটন চাঁপ, লস্যি। বাবা অপরাহ্নে স্বল্পাহারী। কে বলেছে ঈশ্বর পেতে শাকাহারি হতে হবে? ভোগের মধ্যেই ত্যাগের মন্ত্র। ভোগ না করলে কী ত্যাগ করা যায়? খাওয়া শেষে এক ঘণ্টা নিদ্রা। পাহারায় দুজন সুন্দরী। নিদ্রা শেষে

বাবা খাটের পাশে বেল টিপবেন। এবার সময় সুন্দরী দর্শন। ভিআইপি চতুর্বেদী বা কোনও মন্ত্রী এলে তা স্থগিত। ভিআইপিদের সুন্দরী ভেটে অপরাহ্ণের সাধনা পূর্ণ।

ঘুম থেকে উঠে, বেল টেপার আগেই ফোন।

"থোরা তকলিফ মে হুঁ" চতুর্বেদী।

"কেঁও?"

"বাঙ্গালকে ছোকরি মেহুলি, জিসে আপকে চরণওমে এক সময় অর্পণ কিয়া, বাঙ্গাল মে মরনেকে বাদ উহাকা পুলিস ইনভেস্টিগেশন কে চক্কর মে অভি মুম্বাই"

"তো কেয়া?" বাবা নিস্পৃহ।

"হামলোগকে নাম জানে তো?"

"ইতনা পরিসান কেও? উসকে ফোনলিস্টসে মুঝে ভি ফোন কিয়া"

"আপকো ভি?"

"ক্রস ভেরিফাই তো করেগি"

"জান জায় তো?" চতুর্বেদীর সংশয়।

"কাঁহা ঠৈরা?"

"ম্যাগনাম টাওয়ার্স পর মডেল শিরিনকে ফ্ল্যাট মে"

"ওঁহা কেও?"

"দোনো ছোটে উমরকে দোস্ত"

"ইয়ে লড়কি কভি ইধর আয়া?"

"নেহি"

"একদিন লে আও। উসে ভি কুছ জীবনকে ধর্ম শিখানা হ্যায়"

"আপ জো সহি সমঝে। কোশিশ করুঙ্গা। ডর, পুলিস জাদা হি জান যায়"

"ঘাবরাও মত। সব ঠিক হো জায়েগা। উস লড়কি পর কড়ি নজর রখো"

"জো আজ্ঞা"

ফোন কেটে, বেল টিপল। গেরুয়া আলখাল্লা পরা সুন্দরী বাবার সেবক রম্ভা হাজির। দেহে যৌবনের উদ্ভাস। চলার ছন্দে প্রকাশ। নিতম্বের কম্পনে ছন্দের আভাস। বাবার দিকে ঝুঁকলে প্রশস্ত অর্ধ-উদভাসিত স্তন।

"কেয়া সেবা করু বাবা?"

"পহেলি রো মে লাল সালোয়ার পহেনে বৈঠনেওয়ালিকো লানা। ঈশ্বরকে পথ শিখানা হ্যায়"

রম্ভা নিতম্বের ছন্দের হিল্লোলে শয়নকক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল। রম্ভার বুকের দোলা পাছার মেলা বাবার ঈশ্বরকে জাগিয়ে তোলে। দেহই ঈশ্বরের ব্যাপ্তি, তার মধ্যে তাঁর মর্ত্য প্রকাশ। সন্তুষ্টিতে পূর্ণতা। কিছু সময় পর মেয়েটিকে খুঁজে পেল আশ্রমের ক্যান্টিন থেকে বেরচ্ছে। ফিসফিস করে রম্ভা বলল "বাবা আপকো ইয়াদ কিয়া"

প্রশস্তির দ্যুতি মেয়েটির মুখে। কতদিন আশ্রমে এসে বিফল মনে ফিরে গেছে। যদি বা বাবার চোখ পড়ে। কিন্তু হাজারও ভক্তদের মতো সে থেকে গেছে কেবলই তার বাণীর করুণায়। ভাবেনি কখনও বাবা তাকে 'বিশেষ ভক্তের' তালিকায় ফেলবে। এ যে ঈশ্বরকে পাওয়া।

আজ সেই বহু প্রতীক্ষিত দিন। বাবার শয়নকক্ষে ঢুকতে দরজা বন্ধ করে রম্ভার প্রস্থান। বাবা বিছানায়। পা ঝোলানো। পায়ের কাছে বসে প্রণাম করল।

"কেয়া নাম বেটি?"

"মেনকা"

"স্বর্গ কে অপ্সরা"

"উধর অপ্সরা লোগ কেয়া করতে?" বাবা মাথায় হাত রাখল।

"দেওতাকে মনোরঞ্জন"

"তুম দে সকোগে?"

"আপকে আজ্ঞা"

"ঈশ্বর বাদ দিখাউঙ্গা। পহলে তুমহারে আসলি রূপ দেখে"

বুঝতে অসুবিধা হল না ভওয়ানিশঙ্করের ইচ্ছে। বস্ত্রহীন উন্মুক্ত যৌবন। বাবা উঠে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ওপাশে লেক ম্যাথেরন। চারধারে বনাঞ্চল। তার মাঝে শান্ত স্নিগ্ধ নীল জলরাশি। অপরাহ্ণের আলো-আঁধারি লুকোচুরি খেলে যাচ্ছে। 'জয় জগদীশ হরে' - মনকে জাগতিক মায়া থেকে মুক্তি দিতে তৎপর ইন্দ্রলোকের সুখে। নীলা জলরাশির মৃদু তরঙ্গে প্রকৃতির ডাক। রুক্ষ মানব কলুষতার বাইরে। দূরে ডানা মেলা সাদা বলাকার মধ্যে সেই সুর। স্থান-কালের প্রবাহ ভেদ করে প্রকৃতি, আত্মা, মানুষ মিশে যায় সমবেত আনন্দ মূর্ছনা। মনে হয় জাগতিক পৃথিবী, কতই না গৌণ, কত তুচ্ছ। বাবা লেক ম্যাথেরনের দিকে নিষ্পলক চেয়ে। মেনকা বাবার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

স্বপ্ন তো দেখেছিল রাজীবকেও নিয়ে। বিয়ের রাতে সম্ভোগের থেকে পাঁচ বছর। আর আনন্দ বন্যায় ভাসায়নি। দেখতে কী এতই খারাপ? তবে ঠাঁই কেন নেই ওর যৌবনে? বিষণ্ণতা, নারীর খিদেতে নিম্নাংশের চাওয়া দ্বিগুণ। বাড়িয়ে দিয়েছে না-পাওয়া সুপ্ত বাসনা। পুনের সুসজ্জিত কল্যাণীনগরের বাংলোর সামগ্রী মাত্র। লোক নিন্দার ভয় দাঁড়াতে পারেনি অন্য কোনও পুরুষের সামনে। বলতে পারেনি 'ম্যায় তুমহারে লিয়ে। সব কুছ দেনে তৈয়ার। মুঝে আপনাওগে?'

পূর্ণতা খুঁজতে পুনে থেকে ট্রেনে। করজাতে নেমে সিএসটির লোকাল ট্রেন ধরে নেরাল। সেখান থেকে টয়ট্রেনে ম্যাথেরন বাজার। টুকটুক করে হারদার হিলসে জনমপট্টি স্টেশনে আরোহণ, ট্রেন আর রাস্তার প্রথম মিলন। রাস্তা হারায় প্রকৃতিতে। আবার মেলে ভেখরা কুণ্ডে। এই মিলন বিচ্ছেদের যুগলবন্দিতে হারনোর মধ্যে পাওয়ার ছন্দ। মাউন্ট ব্যারি পার হতেই মনোরম দৃশ্য হারিয়ে যায় সরু অন্ধকার সুড়ঙ্গে। প্যানোরমা পয়েন্টের দৃশ্য দেখে মনে হয় রাজীবের বাইরেও পৃথিবী বর্তমান। বারবার হাতছানি দেয় পুনে থেকে ম্যাথেরন বাজারে। জীবন যেখানে নিঃসাড়, স্তব্ধ, প্রকৃতির কোলেই শান্তির বাণী বাবার চরণকমলে। যৌবন থাকতেও, অপূর্ণ জৈবিক চাওয়া পূর্ণতার খোঁজে।

ঘরের আলো-আঁধারিতে ধীরে ধীরে খসে পড়ছে মেনকার আভরণ। বাবা জানলার পরদা টেনে দিল। লাল সালোয়ার, গোলাপি ব্রা, প্যান্টি লুটিয়ে পড়ল লেদার সোফায়।

"অব কেয়া কর সঁকু আপকে লিয়ে?"

বস্ত্রহীন মেনকা আদেশের অপেক্ষায়। বাবার শ্যেনদৃষ্টির মোহে আচ্ছন্ন। সাদা আলখাল্লাটা গা থেকে সরাতেই সুপুরুষ বাবার বিবস্ত্র শিব। তার এতদিনের স্বপ্ন। আজ স্বপ্ন পুরুষের পুরুষাঙ্গের আহ্বান প্রতীক্ষিত কামনার মজলিসে। নতুন আলিঙ্গনে।

"শিউজি লিঙ্গকে পূজা মাঙ্গতে"

পুজই তো দিতে এসেছে। শিউজির পুজো। হাঁটু গেড়ে বসল। ঠোঁটের ছোঁয়া দিয়ে শিবকে বরণ। জাগানো আকাঙ্খিত মুক্তির অভিলাষে।

সান্ধ্য ভজন-সংকীর্তন শেষে ভক্তদের আশীর্বাদ দিয়ে বাবা আশ্রমের অন্দরমহলে এলে অনুস্কা জানাল "থানেকে ওসি আপ সে একেলে মে বাতচিত করনে মাংতা"

"কেঁও? আজকে ভাষণ সমাপ্ত হো চুকা"

"দুসরে কুছ..."

বাইরের ঘরে দেহ বিছিয়ে বললেন “ঠিক হ্যায়। ভেজ দো”

ম্যাথেরনের ওসি অজিত পান্ডে ঢুকতেই বেতের সোফার দিকে ইঙ্গিত “কেয়া পিয়গে? চায় ইয়া কফি?”

“কুছ নেহি”

“বোলো পান্ডে কিস সিলসিলে মে?”

“কুছদিন পহলে নেরাল সে দস্তুরি নাকাকে রাস্তে মে একঠো কার অ্যাক্সিডেন্ট হুয়া”

“শুনা থা। ঈশ্বর উন আত্মাও কো শান্তি দে”

“উন আত্মাকে কেয়া হোগা ইয়ে হম নেহি জানে। লেকিন আপকে সামনে আশান্তিকে বাতাবরণ দেখ রহা হুঁ”

“কেঁও?”

“অ্যাক্সিডেন্টকে তিনকে দেহান্ত হো চুকা। ঔর চৌঠি সন্নিধি অভিতক জিন্দা”

“কাঁহা?”

“পহলে ইধরকে ম্যাথেরন মিউনিসিপল হসপিটাল। উসকে বাপ ব্যান্ড্রাকে লীলাবতী হাসপাতাল লে গয়া। ইতনে তক বেহোশ থি আইটিইউ মে। দো-দিন পহলে হোশ আয়া। পুলিস পুছতাছ করনে পর আপকা নাম বোলা”

“তো কেয়া? আশ্রম মে হাজারো ভক্ত আতে। ও ভি সয়েদ আ রহি থি” ভওয়ানিশঙ্কর নির্বিকার।

“বাত ওহ নেহি। আপকে নাম কে সাথ ইয়ে ভি মালুম কিয়া সুনেত্রা আগারওয়ালকে সাথ আপকে তালুক। ওহ ভি কই বার আ চুকে। উসকে ভি দেহান্ত হো গয়া। খবর উসকে কম্পিউটারমে আপকা বহত সারি তসভির মিলা”

“মেরে হাজারো ভক্ত। কিসিকে কম্পিউটার মে কুছ তসভির হো সকতা। ইনলোগকে দেহান্ত কে সাথ মেরা কেয়া তালুক?”

“ইনভেস্টিগেশনকে সিলসিলে ইধর আয়ে তো আপকে ধন্দে কে পতা লাগ যায়...”

“আশ্রম সে কেয়া তুমহে কম মিলতি? গভর্নমেন্ট জো দেতি, উসসে জাদা। বহত জাদা। তুম কিসলিয়ে হো?”

“ও সব ঠিক হ্যায় বাবা। পরন্তু মুম্বাইকে উপরওয়ালা ইধর ছানবিন করে, তো ম্যায় কেয়া করু?”

“রোকো। জইসে ভি উসে রোকো” বাবা কঠোর।

“কৈসে? আপ হি বোল দিজিয়ে?”

“কৌন হ্যায় ইয়ে মুম্বাইকে অফিসার?”

“জয়েন্ট কমিশনার রোশন, রোশন শেঠ”

“জয়েন্ট কমিশনার। উসে তো সিরিফ মুম্বাই মে ছানবিনকে হক হ্যায়, বাহার নেহি। তুমি ঐসি রিপোর্ট সাজাও, মহারাষ্ট্রকে ডিজি তুমহারে রিপোর্টকে ভরোসে উসে ছানবিনকে পারমিশন না দে”

“উসকে সাথ বঙ্গালকে একঠো পুলিস অফিসার ভি”

“বাঙ্গাল সে ইধর কেও?”

"বাঙ্গাল মে মেহুলি মার্ডারকে সিলসিলে মে। ইনভেস্টিগেশন মে আয়ে তো সুনেত্রা ফ্ল্যাট সে কুদ পড়ি”

“হমে ফোন কিয়া। জো বোল না বোল দিয়া। ফিকর মত করো”

বাবা নড়েচড়ে বসল। দুফের কো চতুর্বেদী ভি ইয়ে বাঙ্গালকে পুলিস অফিসারকে বারে বোল রহা থা। ফির তো, শোচনে কা বাত। ইয়ে সালে বাঙ্গালকে অফিসার অপনে ঢঙ সে পারমিশন মাঙ্গ লেতা। ফির ভি। কুছ করনে পরেঙ্গা।

“কেয়া নাম হ্যায় উসকা?”

“শুনা হ্যায় স্নেহাশিস চ্যাটার্জি”

বাবার মুখে উদ্বেগের ছায়া। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। অজিত পান্ডের হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। যদি বা রোশন শেঠকে পলিটিক্যাল লেভেল থেকে থামানো যায়, এই বাঙালিকে থামাবে কী করে? কোথাকার জল কোথায় গড়ায় কে বলতে পারে?

চতুর্বেদীর কথা মনে পড়ল ‘ম্যাগনাম টাওয়ার্স পর মডেল শিরিনকে ফ্ল্যাট মে’ ইয়ে বাঙ্গালকে পুলিসকো রোকনে পড়েগা। শিরিন সে মুলাকাত জরুরি হ্যায়। শিরিন হি ইসকো রৌক সকেগি। পান্ডেকে বলল “ইনভেস্টিগেশনকে রিপোর্ট আচ্ছে সে বনানা। ভেজনেকে পহলে হমকো দিখা লেনা। কেয়া নাম বতায়া? হাঁ রোশন। উসকো বোলো তুম সব সমহাল লোগে”

বাবা দরজা খুলতেই অনুস্কা ঘরে। ওকে ইঙ্গিত করল “দশ”

দশ হাজার টাকার বান্ডল অজিত পান্ডের দিকে বাড়িয়ে দিল। পকেটে গুঁজে অজিত পান্ডে উঠে দাঁড়াল “জি বাবা। আপ জো আচ্ছা সমঝে” প্রণাম করে বেরিয়ে গেল।

চিন্তিত ফাইভ-স্টার অন্দরমহলে ঢুকে অনুস্কাকে ইঙ্গিত “সিঙ্গল মল্ট অন দ্য রকস্”

গ্লেনমর‍্যাঙ্গিতে চুমুক দিয়ে, অনুস্কাকে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হাত নাড়ল। ফোন চতুর্বেদীকে “মামলা থোড়া বহত গম্ভীর”

“আপকো ওহি বোল রহা থা দুফেরকো”

“শিরিনকো জিতনা জলদি মেরে পাস লাও। নেহি তো ভান্ডা চৌপট”

“জরুর। কোশিশ করুঙ্গা”

“কোশিশ নেহি। মুঝে উনহে চাহিয়ে। অ্যাট এনি কস্ট। জইসে ভি হো”

“দেখে কেয়া কর সকে। বঙ্গালকে পুলিস উসকে সাথ জিতনা তক রহেগা, লে আনা মুস্কিল। সমঝ রহি হো?”

“পুলিসকো দুসরে চক্কর মে লগা দো”

“দেখে। কেয়া কর সকু”

ফোন কেটে, এক ঢোঁকে দুপেগ হুইস্কি গলায়। বেলে অনুস্কাকে তলব “আজ বাহারকে মেহমান নেহি। তুমহারে সেবা চাহিয়ে”

অনুস্কা দরজা বন্ধ করে গৈরিক বসন পরিত্যাগ করল। বিবস্ত্র ভওয়ানিশঙ্করের কোলে নগ্ন দেহ বিছিয়ে বলল “কুছ উদাস লগ রহে হো?”

বাঁ হাতে হুইস্কি। ডান হাত দিয়ে অনুস্কার ঘন কেশাবৃত নিম্নাঙ্গে হাত বোলাল “থোড়া বহত”

চাপা দাড়িতে হাত বুলিয়ে অনুস্কা “ভুল যাও। তুমহারে পরিসানি দূর করনে কে লিয়ে তো ম্যায় হু। আরাম সে হুইস্কি পিও। দেখো হম কেয়া করে...”

বাইরে লেক ম্যাথেরনের ওপর পূর্ণিমার চাঁদ জ্বলজ্বল করছে। স্নিগ্ধ কিরণ ছড়িয়ে দিয়েছে কালো জলরাশিতে। মুক্তর মতো চিকচিক করছে। আলো-আঁধারির লুকোচুরিতে মায়াময় স্বপ্নালোকের আহ্বান। ভাসতে চায় সুখের স্বর্গে। অনুস্কার ছন্দময় আবাহনে। মাদকতার তন্দ্রালোকে। আনন্দি কল্যাণের মিঠে কোমল সুরে। সপ্তম মার্গে বাবার উচ্ছ্বাসের ঝালায়।

অজিত পান্ডে সহেলির বাড়ির দিকে পা বাড়িয়ে ভাবছে আজ বহত মস্তি। পকেট মে ইতনা রূপয়ে।

আনন্দের মধ্যেও বুকটা কেঁপে উঠল। ভয় করছে। বাবা কেন কেসটা ধামাচাপা দিতে চাইছে? সে কী শুধু লীলাভূমির আসল মাহাত্ম্য লুকতে? না অন্য কিছু? ভওয়ানিশঙ্কর এই চক্রের সঙ্গে জড়িয়ে নেই তো? কোন মৌচাকে ঢুকেছে, নিজেও জানে না।

চৌদ্দ

মধুসূদন কুঞ্জবিহারীকে বলল "আরেকটা মৃত্যু। এবার মুম্বাইতে। খবরের কাগজে নিশ্চয়ই পড়েছ?"

কুঞ্জবিহারী মাথা নাড়ল "পড়েছি। ওরা বলছে সুইসাইড?"

"আমার কাছে অন্য তথ্য আছে" মধুসূদন রহস্যকে ঘনীভূত করতে আগ্রহী। শঙ্করদয়ালের পাশে চেয়ার টেনে বসে বসল "নাটকটা বেশ জমে উঠেছে। পল্টু, চা দে"

শঙ্করদয়াল বলল "আবার নতুন কী হল?"

"মুম্বাইয়ের ম্যাগনাম টাওয়ার্স কমপ্লেক্সের তেরোতলা ফ্ল্যাট থেকে মেয়েটি ঝাঁপ দিয়েছে। কেউ ছিল না ফ্ল্যাটে। আপাতদৃষ্টিতে এটা সুইসাইড, তাই না?"

"তাছাড়া কী?"

"আমিও তাই ভেবেছিলাম। মেদিনীপুরের এসপি স্নেহাশিস চ্যাটার্জি লালবাজারে মেহুলির ইনভেস্টিগেশনে যে ছেঁড়া ছবি পাওয়া গেছিল, তার কপি চেয়েছে। ওই মডেলের কেসটা ওই ইনভেস্টিগেট করছে। স্নেহাশিসকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছে"

তাপস টিপ্পনি কাটল "মেদিনীপুরের পুলিস মুম্বাইতে কী করতে?"

"জানি না। নিশ্চয়ই মেহুলি মৃত্যুর ইনভেস্টিগেশন। আফটার অল, মেহুলি মুম্বাইয়ের মেয়ে"

"যা ভাবছিলাম, তাই" শঙ্করদয়াল মাঝখানে কথা পাড়ল।

"দাঁড়াও দাড়াও, অন্য সবাই আসুক। চা আসুক। তারপর বলছি। কুঞ্জবিহারী তোমার নাতনির কত বয়েস হল?"

"এই সবে ছয়তে পড়ল"

"মেয়ে-জামাই ভালো আছে?"

মাথা নাড়ল "আর মাস দুয়েক পরে চেন্নাই থেকে কলকাতায় আসছে"

"কদ্দিন থাকবে?"

"জামাই দু-সপ্তাহের বেশি ছুটি পাবে না। হাসপাতাল আছে। মেয়ে আর নাতনি মাস খানেক থাকবে। বড় একা লাগে। ওরা এলে ঘরটা ভরে ওঠে"

"জামাই কলকাতার কোনও হাসপাতালে জয়েন করছে না কেন?"

"বিলেত থেকে ফিরে ওখানকার লেডি ফ্লোরেনসে চাকরি পায়। এখন বলে কলকাতার ওয়ার্ক কালচারের সঙ্গে তাল মেলাতে পারে না। ওখানে অনেক ভালো আছে"

"কোথায় থাকে?"

"রাজা আন্নামালাইপুরমে"

"তাহলে তো মাস খানেক পল্টুর দোকান থেকে ছুটি। কী বল?"

"একেবারেই নয়। শনিবারের সন্ধে এখানে বাঁধা। মেয়ে-জামাই আসুক, চাই না আসুক"

তড়িৎ প্রবেশ করল "দেরি হয়ে গেল। না?"

"কবে বাবা ঠিক সময় এসেছ?" ব্যঙ্গ করল তাপস "নাও, আবার ওনাকে শুরু থেকে গল্প শোনাও"

মধুসূদন বিরক্ত হল "আমি কী স্ক্র্যাচ পড়া রেকর্ড নাকি? বারবার এক জিনিস শোনাতে হবে? এই শেষবার। এরপর দেরি করলে আর রিপিট করতে পারব না বলে রাখলাম"

তড়িৎ চায়ে চুমুক দিয়ে আগের কাহিনি শুনল। মধুসূদন বলে চলেছে “লিঙ্ক আছে। স্নেহাশিস ফোন করেছিল। মেহুলি কেসের ইনভেস্টিগেশনে ওখানে। বলল মুম্বাইতেও যখন মৃত্যু হয়েছে, যার কথা একটু আগে বলছিলাম, ওই বিল্ডিংয়ে সে সময় ও ছিল। মেয়েটির নাম সুনেত্রা আগারওয়াল। খবরের কাগজে বেরিয়েছে। সে নাকি কলকাতারই মেয়ে। মুম্বাইতে চাকরি করতে গেছিল”

“লিঙ্কটা কোথায়?”

“সুনেত্রা আগারওয়ালের কম্পিউটার, মোবাইল থেকে অনেক কিছু পেয়েছে। ডিটেল্ড রিপোর্ট কলকাতায় এসে পাঠাবে। যা বলল তার সার সুনেত্রা সোহমকে ভালোবাসত। মানে মানিকতলার খালের ডেড বডি। সোহম আর ঐত্রেয়ী, যার কথা তুমি সেদিন বলছিলে তড়িৎ, ওদের মধ্যেও প্রেম ছিল। এই নিয়ে একটা লাভ ট্রাইঙ্গেল”

“ও কী জানে সোহমকে মার্ডার করা হয়েছে?” তড়িৎ প্রশ্ন ছুড়ে দিল।

“জানত না। আমিই বললাম। ওই আধা ছেঁড়া ছবি মেহুলির মেদিনীপুরের সুইট থেকে পাওয়া গেছে, ওটা ই-মেলে পাঠানো সম্ভব কি না”

“কেন?” শঙ্করদয়ালের প্রশ্ন।

“ও নাকি, সুনত্রো আগারওয়ালের কম্পিউটারে একজনের ছবি দেখেছে, যার সঙ্গে হয়ত এই ছেঁড়া ছবিটার মিল থাকতে পারে। ভায়া আমরা তো আগের যুগের। ছবিটা কী করে ই-মেলে পাঠাব?”

শুভঙ্কর কম্পিউটার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল “তেমন কিছু নয়। স্ক্যান করে পাঠিয়ে দাও”

“আমি কী ছাই কম্পিউটার জানি? কাউকে ধরতে হবে স্ক্যান করাতে। ই-মেল করতে” মধুসূদন চিন্তায় ঘাম মুছল।

এমনিতেই ডিপার্টমেন্টে কেউ পাত্তা দেয় না। কাজ করানো যে কত মুস্কিল, সেই জানে। হাজারো প্রশ্ন। বাবা-বাছা করে করিয়ে নিতে হয়। আবারও কার হাতে পায়ে ধরতে হবে।

“পাঠাতে তো হবেই, না হলে লিঙ্কটা বেরোবে না। দেখি কী করি”

“আরেকটা কথা বলতেই ভুলে গেছিলাম। সুনেত্রার মোবাইলে অনেক ফোনের মধ্যে শেষের ফোন সোহমের বন্ধু মিলনের। রিপোর্টগুলো আবার ওল্টালাম। মানিকতলার এএসআই পরিতোষ সেন যে এটা ইনভেস্টিগেট করেছে, সে নাকি সোহমের বন্ধু মিলনকেও জেরা করেছিল। জেরার রিপোর্ট আছে”

“ঐত্রেয়ীর কোনও খোঁজ পেলে?”

"পরিতোষ সেন ইনভেস্টিগেট করছে। এখনও কোনও রিপোর্ট হাতে পাইনি। সোমবার পরিতোষ সেনকে আবার ফোন করে দেখব নতুন কিছু পেল কী না?”

কুঞ্জবিহারী এতক্ষণ ওদের কথা শুনছিল। এবার আলোচনার রেশ টেনে বলল “তার মানে মেহুলির ডেথ, সোহমের ডেথ আর এই কলকাতার মেয়েটার কথা বললে, কী যেন নাম...?”

“সুনেত্রা আগারওয়াল”

“হ্যাঁ সুনেত্রা আগারওয়ালের ডেথ, তিনটেরই একটা লিঙ্ক পাওয়া যাচ্ছে”

“লিঙ্কটা কী?”

“পশ্চিমবাংলা”

তাপসের প্রশ্ন “অন্য দুটো তো হোমিসাইড। সেটা বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু সুনেত্রার মৃত্যুটা কী সুইসাইড না হোমিসাইড? কিছু বলল?”

“এখন পর্যন্ত কোনও খুনের এভিডেন্স পায়নি । তবে সব লিঙ্কগুলো ট্রেস না করে কিছু বলতে পারছে না। তাছাড়া পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট না পেলে, ওই বা কী করে সঠিক বলবে?”

“মেহুলির মৃত্যু হোমিসাইড জানলে কী করে? ডুবেও তো মারা যেতে পারে?”

“আমার এক পরিচিত ডাক্তার, চয়ন ছেত্রিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। ভিসেরা রিপোর্টে টলবিউটামাইড, গ্লেনেসারাইড আর অ্যালজোলাম পাওয়া গেছে। উনি বললেন এই তিনটে ওয়াইনের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে প্রথমে একটা ঝিমুনি আসে, তারপর স্থান-কাল-পাত্র সব গুলিয়ে যায়। বেহোশ হয়ে পড়ে”

“ওয়াইনের সঙ্গে মিশিয়ে খেয়েছিল কী করে জানলে?”

“স্নেহাশিসের রিপোর্টে ওখানকার কাজের লোক অসিত মেহুলিকে ওয়াইন খেতে দেখেছে”

“ওয়াইনের বোতলটা পাওয়া গেছিল?” তড়িতের প্রশ্নে নড়ে-চড়ে বসল মধুসূদন।

“নাঃ। সেটাই তো সন্দেহ বেশি করে বাড়াচ্ছে। বোতলটা গেল কোথায়? আর কেনই বা হাওয়া হয়ে গেল? তার মানে কী কেউ ওই বোতলে ওষুধগুলো মিশিয়েছিল? যদি মিশিয়েই থাকে তো মেহুলির কাছে বোতলটা পৌঁছল কী করে?”

“মেহুলি কী বোতলটা সঙ্গে করেই এনেছিল?”

“স্নেহাশিসের রিপোর্ট অনুযায়ী মেহুলি সঙ্গে করে এনেছিল। রিসর্টে কোনও ওয়াইনের অর্ডার দেয়নি”

“মানে আততায়ীর সঙ্গে মেহুলির কোথাও দেখা হয়েছিল”

“তাই তো মনে হচ্ছে। কোথায়? কে সে?”

মধুসূদন শঙ্করদয়ালের কথায় মুচকি হাসল “যদি জানা যেত গল্পের যবনিকাও পড়ে যেত। সেটাই তো আসল প্রশ্ন। নয় কী?”

“তবে কী ওদিন যে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা লোকটা এসেছিল, সেই ওটা সরিয়েছে? না হলে ও ওখানে কী করছিল?”

“এর মধ্যে ধুতি-পাঞ্জাবি এল কোত্থেকে?” তাপস প্রশ্ন করল।

“কাজের ছেলেটি ওই রকম একটা লোককে রিসর্টে দেখেছিল। সে নাকি মেহুলির সঙ্গে দেখাও করতে চেয়েছিল। মেহুলি সম্মতি দেয়নি”

শঙ্করদয়াল সিঙারাতে কামড় দিল “ওই লোকটাই তাহলে খুনি। এখনও মাথায় ঢুকছে না, ওই লোকটিকে যদি মেহুলি এনট্রি না দিয়ে থাকে, তো মেহুলির ঘরে ঢুকল কী করে?”

মধুসূদন সায় দিল “সেটা তো আমারও প্রশ্ন। এক যদি, ওই ছেলেটিকে দিয়ে পাঠিয়ে থাকে”

তাপস বলল “সে কাজ ছেলেটি করবে না। কারণ ওর চাকরি যাওয়ার ভয় আছে। ওই লোকটি কী মেহুলির পরিচিত? নিজেই গেছিল মেহুলির সঙ্গে দেখা করতে?”

মধুসূদন বলল “রিপোর্টে তার কোনও উল্লেখ নেই”

আলোচনাটা হঠাৎ থেমে গেছে দেখে কুঞ্জবিহারী বলল “পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট বলছে ডেথ ডিউ টু ড্রাউনিং, ডাক্তারবাবু কী বললেন?”

“রিপোর্ট পড়ে মনে হল মেহুলি ওয়াইন খাওয়ার ফাঁকে নাইটি পরে, বোতল আর গ্লাস নিয়ে সুইমিং পুলে গেছিল। সেখানেই আরও ওয়াইন খেয়ে নাইটি খুলে স্নান করতে নামে। রাতে কে দেখবে অন্ধকারে?”

“যে দেখার সে ঠিক দেখছিল। যে বোতলটা উধাও করেছে”

শঙ্করদয়াল বলল “হয়ত যখন স্নান করতে গেছিল তখন ঝিমুনি আসেনি। সাঁতার কাটতে কাটতে স্থান-কাল-পাত্র গুলিয়ে ফেলে। শেষে বেহোশ হয়ে ডুবে যায়। তাই ওরা বলেছে ডেথ ডিউ টু ড্রাউনিং”

মধুসূদন মাথা নাড়ল “হতেই পারে। তার মানে এটা হোমিসাইড?”

শঙ্করদয়াল মাথা নাড়ল “তাই তো মনে হচ্ছে”

তড়িৎ অনেকক্ষণ নীরব দর্শক। এবার আলোচনায় যোগ দিল “যদি আগের দুটো হোমিসাইড হয়, তবে মুম্বাইয়ের তেরো তলা থেকে ঝাঁপটা সুইসাইড হবে কেন? আমরা যখন বলছি লিঙ্ক আছে”

শুভঙ্কর এমনিতেই কম কথা বলে। সব শুনে বলল “যতক্ষণ না মুম্বাইয়ের মেয়েটির পোস্ট মর্টেম ও পুরো ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট পাবে, কনফার্মড্ হওয়া যাবে না। তিন জায়গায় তিনটে খুন। মোটিভ না জানলে

আমরা সেই অকূলে”

ঠিকই তো বলছে শুভঙ্কর। কতগুলো আনভেরিফায়েড এভিডেন্সের ভিত্তিতে তো আর কনক্লুশনে আসা যায় না। প্রমাণ চাই। নিশ্চিত প্রমাণ।

কুঞ্জবিহারী সায় দিল “হ্যাঁ প্রমাণ চাই। ... পল্টু,এই পল্টু, আরও দু প্লেট সিঙারা দে তো”

শঙ্করদয়াল কুঞ্জবিহারীর দিকে তাকাল “আজকে কী গিন্নি বাড়িতে মিল অফ্ করে দিয়েছে? বয়স হচ্ছে ভায়া। রয়ে সয়ে খাও। নেহাত তোমার ডায়েবেটিস নেই। না হলে গিন্নি আলু খাওয়াও বন্ধ করে দিত”

কুঞ্জবিহারী হাসল “আরে, মরতে তো সাবাইকেই একদিন হবে। মরার আগে খাওয়াটাই বা বাদ দিই বা কেন?”

শুভঙ্কর খাওয়ার কথা না ভেবে বলল “লিঙ্ক আছে। এটা কনফার্মড্। কোথায় কী ভাবে সেগুলো ভাবতে হবে। অবশ্য মোটিভটাও”

ওরা যখন দ্বিতীয় রাউন্ড সিঙারা সমেত চায়ে হাত দিয়েছে, মধুসূদন ভেবে চলেছে মোটিভ কী হতে পারে?

এভিডেন্স নিয়ে ওরা ভাবুক। ও ভাবছে চরিত্রগুলোর ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে।

পনেরো

ইন্দ্রাক্ষি রায়চৌধুরী মিঃ পি কে খাসনবিসকে ধমকিয়ে বলল “নাথিং ইজ রাইট”

“কেন ম্যাডাম?”

“আমাদের এজেন্সির মেয়ে মারা গেল, আপনি প্রশ্ন করছেন কেন? এভাবে যদি এমপ্লয়িরা মারা যায়, ব্যবসা লাটে উঠবে”

“আমি কী করতে পারি ম্যাডাম? চাকরির পর মেয়েরা কী করে, খোঁজ রাখি কী করে?”

“রাখতেই হবে। শুধু চাকরিতে নেওয়ার সময় বায়োডাটা দেখলে চলবে না, প্রত্যেকটা এমপ্লয়ির ব্যাকগ্রাউন্ড সম্বন্ধে হোমওয়ার্কও করতে হবে। আমাদের অর্গানাইজেশনের ক্রেডিবিলিটি আছে” ইন্দ্রাক্ষি কঠোর।

“কী করে জানব, অন্য সময় কী করে?”

“খোঁজ নিন। লোক লাগান। জেনেই এজেন্সিতে চাকরি দেবেন”

টেবলে রাখা প্যাকেট থেকে সিগারেট ধরাল। মুখে বেগুনি আভায় উত্তেজনার বহিঃপ্রকাশ। পারদটা প্রকট হাতের কম্পনে, মার্জিত শ্লেষে।

“অলরেডি পুলিস ফোন করেছিল। রুটিন ইনভেস্টিগেশনে আসবে। যদি মিডিয়ার কানে পৌঁছয় এজেন্সিতে আর কেউ আসবে না। ইমপ্লিকেশনটা এবার বুঝতে পারছেন?” অ্যাশট্রেতে সিগারেটটা গুঁজে বলল “তিলতিল করে এজেন্সি তৈরি করেছি। আই কান্ট অ্যাফোর্ড টু পুট ইট আন্ডার স্ক্যানার”

খাসনবিস আমতা করে বলল “ম্যাডাম একটা কথা বলব, যদি কিছু মনে না করেন...”

“বল”

"আউটসোর্সিং নিয়ে কোনও প্রবলেম নেই। যত প্রবলেম ফ্যাশন এজেন্সির মেয়েগুলোকে নিয়ে। ওদের গতিবিধি সব সময় ট্র্যাক করা যায় না”

ইন্দ্রাক্ষি তীক্ষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল “কী বলতে চান? ফ্যাশন এজেন্সি সেগমেন্টটা বাদ দিয়ে দেব? ওটাই তো মেইন সোর্স অফ ইনকাম। কোথায় কোন মেয়ে মরল তার জন্য পুরো বিজনেসটা বন্ধ করে দেব? কত কষ্ট করে দাঁড় করিয়েছি। একটা সাজানো সংসার এভাবে ভেঙে দেওয়া যায় না”

থিয়েটার রোডের সেই ছোট্ট ভাড়া ঘর থেকে গ্রেটার কৈলাসের নেহেরু সেন্টারের এই বিশাল অফিস। মাঝে কুড়িটা বছর। ছোট্ট ফ্যাশন এজেন্সি দিয়ে শুরু। আজ, ফ্যাশন, কম্পিউটার আউটসোর্সিং, ইন্টারন্যাশনাল ম্যানপাওয়ার প্লেসমেন্ট, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট থেকে ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউশন। আমোয়েবার সিউডোপোডিয়ার মতো বিস্তার করেছে দ্য নিউ এজ। দিল্লি থেকে ভারতের অন্যান্য শহরে, ব্রাঞ্চ থেকে সাব ব্রাঞ্চ।

সেদিন বাহুডোরের কামাতুর মেয়েটাকে ঠিক চিনতে পারেনি আশিস। ভেতরের সুপ্ত স্বপ্ন কালের ফেরে কোনও সময় আত্মপ্রকাশ করে। প্রথম জীবনে ভালোবাসা। পরে উচ্চাশা। এই দুইয়ের যুগলবন্দি দৈহিক ও মানসিকভাবে কাছের মনে হয় আশিসের। থিয়েটার রোডে প্র্যাকটিস থাকলেও, উইকেন্ডে দিল্লির গ্রেটার কৈলাসের ফ্ল্যাটে, ইন্দ্রাক্ষির বাহুডোরে নিশিযাপন না করলে, সপ্তাহটা আধুরা। অর্থের অভাব নেই। রিপুর টান তো অস্বীকার করা যায় না?

সিগারেটটা নিভিয়ে বলল “এই ফ্যাশন এজেন্সি থেকেই আমার শুরু” ইন্টারকমে সেক্রেটারিকে বলল “বলজিৎ কৌর কো ভেজনা। খাসনবিসকে বলল “বসুন। উই হ্যাভ টু সর্ট দিস আউট”

অপেক্ষা বলজিৎ কৌরের জন্য। ইন্দ্রাক্ষির মোবাইলে কল। খাসনবিস বুঝতে পারল না কার।

"ফ্রাইডেতে আসতে পারবে? ইন্সটেড অফ স্যাটারডে?"

ওপাশ থেকে উত্তর। প্রত্যুত্তরে শুনল "ঠিক আছে। জাস্ট কনফার্ম দ্য ফ্লাইট। উইল বি অ্যাট এয়ারপোর্ট" ফোন কেটে দিল।

মিসেস বলজিৎ কৌর ঘরে ঢুকতেই খাসনবিসের পাশের চেয়ারে ইঙ্গিত "প্লিজ টেক এ সিট"

আরেকটা সিগারেট ধরাল "আই ওয়াজ জাস্ট টেলিং মিঃ খাসশনবিস দ্যাট এ লেডি হ্যাস ডায়েড ফ্রম আওয়ার অর্গানাইজেশন। ইট'জ অ্যালার্মিং। দ্য আদার ওয়ান হ্যাড মেনি কনট্র্যাক্টস্ ফ্রম আস। দিস মে ডেটার আদার্স ফ্রম বিইং এ পার্ট অফ আওয়ার অর্গানাইজেশন"

কোম্পানির অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিরেকটার মিসেস কৌর বলল "ইয়েস, সামথিং টু ওয়ারি। শ্যাল আই ইনভেস্টিগেট?"

"নো পয়েন্ট। সো মেনি গার্লস আর লিঙ্কড্ উইথ আওয়ার অর্গানাইজেশন। ইফ ইউ ট্রাই টু ইনভেস্টিগেট দে উডন্ট লাইক ইট। ফিল অ্যালার্মড। মে মিন ইন্টারভেনিং অন দেয়ার প্রাইভেসি। নট অল হ্যাভ এ ক্লিন আফটার-অফিস ব্যাকগ্রাউন্ড। ইট উড ফ্রাইটেন দেম। আই ডোন্ট ওয়ান্ট এনি ওয়ান টু বি ফ্রাইটেনড ওয়ারকিং ইন আওয়ার অর্গানাইজেশন"

মিসেস কৌর অর্গানাইজেশনের বহুদিনের কর্মী। বয়েসে ইন্দ্রাক্ষির থেকে কিছুটা ছোটো হলেও ভীষণ এফিসিয়েন্ট। ইন্দ্রাক্ষির সাম্রাজ্য বিস্তারের পেছনে মিসেস কৌরের প্রচ্ছন্ন হাত। বিচক্ষণ এই মধ্যবয়সির কাছে কোনও নতুন নন-ইনভেসিভ সলিউশন চাইছে। সেটা বুঝতে পারছে মিসেস কৌর। সেও তো এই অর্গানাইজেশনে প্রায় প্রথম থেকেই আছে। ইন্দ্রাক্ষির অবাধ বিশ্বাস।

"উইথ দ্য ডেথ পুলিস স্টার্ট কোয়েশ্চেনিং দেম?"

ইন্দ্রাক্ষি খাসনবিশকে বলল "প্লিজ টেল দেম ইট ইজ অ্যান আইসোলেটেড ইনসিডেন্ট। দ্য গার্ল ওয়াজ ওনলি ওয়ার্কিং উইথ দ্য কোম্পানি। ইউ হ্যাভ নো ক্লু অফ হার পারসোনাল লাইফ। ডস্ দ্যাট সাউন্ড রিসনেবল মিসেস কৌর?"

"সাউন্ডস্ ফাইন। বাট হোয়াট অ্যাবাউট দ্য আদার ক্লায়েন্টস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ আওয়ার অর্গানাইজেশন?"

"দ্য মডেলস্?"

"প্রেসাইসলি। মেহুলি ওয়াজ আওয়ার ক্লায়েন্ট টু"

"উই ওয়ার ওনলি কনসার্নড উইথ হার কনট্র্যাক্টস্ অ্যান্ড প্লেসমেন্ট। হাউ ডু উই নো হোয়াট সি ওয়াজ ডুয়িং রেস্ট অফ দ্য টাইম?"

"ট্রু" ঘাড় নাড়ল মিসেস কৌর।

উঠে পড়ল ইন্দ্রাক্ষি। পায়েচারি করছে। সাদা স্ল্যাক্সের নীচের ঢলঢলে অংশটা হাওয়ায় লেপ্টে আছে। নীল টপ্সের পেছন দেখতে পাচ্ছে খাসনবিস আর কৌর। ম্যাডাম যেন কিছু একটা ভাবছেন। কাঠের প্যানেলের দেওয়ালে কাকু ক্লক টিকটিক করছে। এরপর? মিসেস কৌরের দিকে ফিরে বলল "ফাইন্ড আউট অ্যাবাউট দিস গার্ল"

"মেহুলি?"

"নো। উই ডিড হার প্লেসমেন্ট ওনলি। সি ইজ এ নোন মডেল। নট মাই কনসার্ন" খাসনবিসকে বলল "ওই মেয়েটা। আমাদের মুম্বাই ডিভিশনের। কী যেন নাম?"

"সুনেত্রা আগারওয়াল"

"ওর ফাইলটা নিয়ে আসুন তো। ও কি এখান থেকে রিক্রুটেড, না মুম্বাই?"

"দেখছি" খাসনবিস বেরিয়ে গেল।

চেয়ারে বসে মিসেস কৌরকে “হোয়েদার দ্য টু ডেথস্ আর রিলেটেড অর নট, হ্যাভেন্ট এ ক্লু। বাট দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট বোথ আর লিংকড উইথ আওয়ার অর্গানাইজেশন ইস সিওর টু রেইস কোয়েশ্চনস্”

“হোয়াটএভার মে ইট বি, উই হ্যাভ টু হ্যন্ডল ইট। হাউ?”

“মেহুলিস ওয়ান ক্যান ইজিলি বি ব্রাসড অ্যাসাইড। দ্যাট গার্ল আগারওয়াল বিইং ওয়ান অফ আওয়ার এমপ্লয়িস উইল সিওরলি পুট আস আন্ডার স্ক্যানার। আই ওয়ান্ট টু লুক অ্যাট হার রিক্রুটমেন্ট ডিটেলস সো আই হ্যাভ দ্য আনসারস”

মিসেস কৌর বুঝতে পারছে ইন্দ্রাক্ষির ব্রেন জেট স্পিডে কাজ করছে। এভাবে কাজ না করলে কী স্ক্র্যাচ থেকে এই সাম্রাজ্য করতে পারে? কৌর জানে, এই মহিলা দশ স্টেপ আগে চিন্তা করে। তাইতো দ্য নিউ এজ ভারতে একটা নাম। তখনও অর্গানাইজেশন এভাবে ফুলে ফেঁপে ছত্রছায়া বিস্তার করেনি। কলকাতায় মেন ব্রাঞ্চ। দিল্লির গ্রেটার কৈলাসে এই অফিসঘরটুকু। মিসেস কৌর সেই থেকেই এই অর্গানাইজেশনে। স্বামী মারা যাওয়ার পর মেয়ে বিয়ে করে অ্যামেরিকায়। বছরে একবার আসে। এখন সারা জীবনটাই দ্য নিউ এজ। তার প্রচেষ্টা, অধ্যবসায়, নিষ্ঠা ও ইন্দ্রাক্ষির বুদ্ধির যুগলবন্দিতে সাম্রজ্যের বিস্তার।

তখনও দিল্লি ব্রাঞ্চের তেমন বিকাশ হয়নি। একদিন সেই-ই ইন্দ্রাক্ষিকে বলেছিল “উই হ্যাভ টু হুক দ্য মুম্বাই শো-বিজ ওয়ার্ল্ড ইন আওয়ার পকেট”

“হাউ?”

“ডোন্ট হ্যাভ টু টেল ইউ হাউ। মাই হাসব্যান্ড ওয়াজ ইন দ্য মিনিস্ট্রি। আই হ্যাভ প্লেনটি অফ কনট্যাক্টস্ হিয়ার। আই ক্যান ওয়ার্ক আউট দ্য দিল্লি চ্যাপটার। ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক আউট দ্য মুম্বাই লিংকস”

আউটসোরসিংয়ের লিংকসগুলো মিসেস কৌর-ই জোগাড় করে দিয়েছিল। বিদেশে লেবার এক্সপেনসিভ। এখানে অনেক সস্তা। সাহেবদের জানা থাকলেও, ইন্ডিয়ান কোনও এজেন্সির ক্রেডিবিলিটি তেমন গড়ে ওঠেনি। দিল্লির মসনদ থেকে সাহেবদের অফিসে পৌঁছে গেছিল অভয়বাণী। জুটে গেছিল আউটসোরসিং কনট্র্যাক্ট।

‘বিউটি অ্যাট ইটস্ বেস্ট’ প্রথম চাকরি জীবনের লোকদের সঙ্গে নতুন সূত্র। ইন্দ্রাক্ষির মন ছোঁয়া আন্তরিকতা, কমিশনের বহর ভাসিয়ে দিয়েছিল মুম্বাইয়ের ব্যাবসায়িক সাম্রাজ্যকে। একটা মোবাইল নম্বর। দিন নেই, রাত নেই, অফিস আওয়ার্স নেই। ফোন করো, বান্দা হাজির। ক্রমে বিস্তার লাভ করল সাম্রাজ্য।

কৌরকে বলল “ইউ আর রাইট। উই হ্যাভ টু বি প্রিপেয়ার্ড। দো উই নো উই হ্যাভ নাথিং টু ডু উইথ দিস ডেথস”

ইন্দ্রাক্ষি মুচকি হাসল “ইট ইজ নট এ কোয়েশ্চেন অফ নোয়িং। ইট ইজ অফ কনভিনসিং”

শুক্রুবারের রাত শুধু আরেকটা মধুযামিনী নয়। অনেক কথা আশিসের সঙ্গে।

এয়ারপোর্টে ট্রলি ঠেলে রাস্তা পার হয়ে পার্কিং লটের দিকে এগোতে আশিস বলল “হঠাৎ জরুরি তলব?”

“ঘরে চলো। কথা আছে” ইন্দ্রাক্ষি গাড়ির বুট খুলল।

ড্রাইভিং সিটে বসে দরজাটা খুলে দিতেই পাশে আশিস বসল “সে কথা নয় পরে। এত চিন্তিত কেন?”

“বাড়িতে গিয়ে বলব। কাল ক’টা কেস ছিল?”

"চারটে। ক্যান্সেল করে দিলাম। নেক্সট উইকে অ্যাকোমডেট করে নিয়েছি”

গ্রেটার কৈলাসের ফ্ল্যাটের সোফায় পাজামা-পাঞ্জাবি পরে, হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে আশিসের প্রশ্ন “কী হয়েছে?”

আশিস ইন্দ্রাক্ষি কখনও একসঙ্গে থাকে না হাউস খাস এনক্লেভের বাড়িতে। ইন্দ্রাক্ষির নিজস্ব ফ্ল্যাট গ্রেটার কৈলাস-টু। এখানেই উইকএন্ড কাটায় আশিসের সঙ্গে। এখানে কোনও কাজের লোক নেই, বেয়ারা বাবুর্চি

নেই। ইন্দ্রাক্ষিই সব কাজ করে। এটা তার নিজের নিভৃত সংসার। লোকচক্ষুর আড়ালে আশিসের সঙ্গে মধু-মিলনের মধ্যে অন্য কেউ নেই। মনের বাসর। নিজেকে খুঁজে পাওয়ার একাকী নিভৃত অবসর।

ইন্দ্রাক্ষি ভডকায় চুমুক দিল "ওপাশের খবর কদ্দূর?"

"মেহুলির মৃত্যুর?"

"হ্যাঁ"

সিগারেট ধরিয়ে, ইন্দ্রাক্ষির কাঁধে হাত ছড়িয়ে গালে চুমু খেল "তুমি কী জানতে চাও জানি ডার্লিং। মেহুলি দেখাতে এসেছিল, ওরা জানে কি না? উত্তর, না। জানলে দেখা করতে আসত"

"এদিকে ওই মেয়েটার মৃত্যু, মানে সুনেত্রা আগারওয়াল নিয়ে, কলকাতার কে এক পুলিস উঠেপড়ে লেগেছে। অবভিয়াসলি ওরা জানে আমাদের মুম্বাই এজেন্সিতে কাজ করত। মুম্বাই ব্রাঞ্চের চিফ দারুওয়ালার সঙ্গে দেখাও করে গেছে"

"কাজ করত তো কী হয়েছে? কে কবে মরল, আমাদের ঠিক-ঠিকানা রাখতে গেলে তো আর অর্গানাইজেশন চালাতে হবে না। সবার বাঁচা-মরার ঠিকেদারি কী আমরা নিয়ে রেখেছি?"

এই জন্যেই আশিসকে এত ভালো লাগে। যখন গভীর সমস্যায় জর্জরিত, কত সহজেই না সব কিছু হাল্কা করে দেয়। এই একচ্ছত্র রাজকীয়তায় একটু মুক্তি। মনের কাউকে পাওয়ার পরম পরিতৃপ্তি। কাজের দুনিয়ার বাইরে নিশ্চিন্ত বটের ছায়া।

আশিস সিগারেটের ধোঁয়া ছুড়ে কাঁধের ওপর রাখা হাতটা ইন্দ্রাক্ষির বুকের ওপর নামিয়ে ব্লাউজের ফাঁক দিয়ে আকুলি-বিকুলি কাটতে লাগল "ইকোয়েশনটা কী মিলছে?"

আশিসকে স্তন নিয়ে খেলতে দিয়ে ভডকায় চুমুক "মিলবে। ঠিক মিলবে"

"এখন ওসব ভুলে যাও। ইকোয়েশনটা শুধু কষে যাও"

সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে ঠোঁটে চুমু। চোখের ওপর ডান হাত বুলিয়ে মুখ গুঁজে দিল ওর স্তনে। ওকে মুক্তি দেওয়ার একটাই রাস্তা। উষ্ণতার সাগরে ভাসিয়ে সব চিন্তাকে আবেগের জলপ্রপাতে নিষ্কৃতি। সেখানেই ওর চিন্তার মুক্তি। নিজেকে ছেড়ে দেওয়ার পরিতৃপ্তি। আজ আর ভাবনা নয়। শুধু দেহ। কাল সকালে কথা হবে। সারা সপ্তাহের ক্লান্তিকে মিশিয়ে দিতে চায় রিপুর আকাশ। নতুন ছন্দে। সন্ধ্যার ঝরঝরে হাওয়ায় গ্রেটার কৈলাসের সাজানো আসরে।

পরের দিন সকালে উঠে আধা ঘুমন্ত আশিসের জন্য চা তৈরি করছিল ইন্দ্রাক্ষি। মোবাইল বেজে উঠল। ওপাশে খাসনবিস "ম্যাডাম ডিটেলস পেয়েছি। সুনেত্রা আগারওয়াল কলকাতার মেয়ে। কলকাতা থেকে ওর অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছিল। সায়েন্স কলেজের এক ফিজিক্স প্রফেসারের রেফারেন্সে। মুম্বাই অফিসের জন্য। মুম্বাই অফিসে খবর নিয়ে জানলাম, ও অফিসের কাজে খুশি ছিল না"

"কী করে জানলে?"

"অফিস কলিগদের প্রায়ই বলত। গোঁড়া মারোয়ারি পরিবারের। ঈশ্বরভক্ত। শো-বিজ দুনিয়ায় মন টিকছিল না"

"চাকরি ছেড়ে দেয়নি কেন?"

"তার-ই চেষ্টা করছিল। এর মধ্যেই কে এক চতুর্বেদী নামে লোক ওকে মুম্বাইয়ের কাছে এক সাধুবাবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়"

"ঠিক আছে। ফাইলটা আমার টেবলে সোমবারের মধ্যে পাঠিয়ে দিতে বলো"

মুচকি হেসে ফোনটা নামিয়ে রাখল। বিবস্ত্র আশিস ততক্ষণে কিচেনে "চা কই?"

আশিসের নেতানো পুরুষাঙ্গে এক পলক তাকিয়ে ইলেকট্রিক কেটল অন করল। হাজার হোক আশিস সম্মানিত অতিথি।

ভোরের সূর্য কিচেনের ভেনিশিয়ান ব্লাইন্ডের ফাঁক দিয়ে আলো-আঁধারি রচনা করলেও ইন্দ্রাক্ষি দ্বিতীয়বার আশিসের বস্ত্রহীন অবয়বে চেয়ে বলল "মুখ ধুয়ে জামা পরে এস। ততক্ষণে চা রেডি। কথা আছে"

ষোলো

চেন্নাইয়ের লেডি ফ্লোরেন্স হাসপাতালের সামনে বিরাট গণ্ডগোল। জনতার চিৎকার। ক্ষোভের চিৎকার 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস'। ধীরে ধীরে মিডিয়ার ওবি ভ্যান আসতে শুরু করেছে। হাসপাতালের পিআরওরা ভিড়, মিডিয়া সামাল দিতে হিমসিম।

আজকের ব্রেকিং নিউজ। খবরটা ঠিক হলে, মিডিয়া মাইলেজটা লুটতে পারবে। এতগুলো নিউজ চ্যানেলে 'দিনের বাণী'-র মতো 'সেনসেশনল খবর' সারাদিন স্ক্র্যাচড রেকর্ডের মতো বারবার বাজাতে থাকবে। ভুলে যায়, মনেরও ক্লান্তি আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভুঁইফোড় জনদরদি নেতারা স্বশরীরে পাতাল ভেদ করে আবির্ভূত হবে। তারাও মাইলেজ খুঁজছে। কালকের হেড-লাইনসে নতুন রস। যুক্তি-তক্কের বন্যা। বিতর্কসভার আয়োজন করে ইলেকট্রনিক মিডিয়া অ্যাডে টু-পাইস কামিয়ে নেবে। এসএমএস পোলে বাড়তি। গণ্যমান্য রিটায়ার্ড লোকেরা পাস্ট-টাইমে কিছু কামাতে টিভিতে বসবে। পেনশনার্স ফ্রুটফুল অকুপেশন। মতামতের ফুলঝুরি। যুক্তির পক্ষে-বিপক্ষে তাদের জীবনের দেখা নানান অভিধান। চিকিৎসার অব্যবস্থা নিয়ে অর্থহীন বক্তব্য। কীভাবে প্রাইভেট হাসপাতালের কর্মাশিয়াল মরণকামড় থেকে সাধারণের মুক্তি। মিডিয়ার টিআরপি বাড়বে।

নীলকান্থের বডি তখনও মর্গে। কখন ফরেনসিক এক্সপার্ট শব-ব্যবচ্ছেদ করে ডেথ সার্টিফিকেট লেখে। মর্গের দরজায় তখনও বসে শোকস্তব্ধ বাবা-মা-ভাই-বোন-আত্মীয় বন্ধুবান্ধব। জানতে, কেন নীলকান্থ এভাবে মারা গেল? সাতাশ বছরের সুস্থ সবল যুবকের এমন কী হয়েছিল, হাসপাতালের ক্র্যাস-টিমও বাঁচাতে পারল না? কী এমন হয়েছিল নীলকান্থের? তেমন কিছু না। কয়েকদিন ধরেই পেটে চিনচিন ব্যথা। ডাক্তার ওষুধও দিয়েছিল, কমেনি।

বাবা রঙ্গনাথন বললেন "আই থিঙ্ক ইউ শুড সি এ গ্যসট্রোএনটেরোলজিস্ট"

বাবার আদেশ মেনে নীলকান্থ দেখাতে গেছিল লেডি ফ্লোরেন্সের নামকরা গ্যসট্রোএনটেরোলজিস্ট ডাঃ স্বামীনাথনকে। কয়েকটা মাত্র ইনভেস্টিগেশন। বাইরেও করানো যেত।

ডাঃ স্বামীনাথন বললেন "বেটার টু বি অ্যাডমিটেড"

"হোয়াই? জাস্ট ফর এ ফিউ ইনভেস্টিগেশনস?"

"উই ক্যান চেক ইউ থররোলি। সিন্স ইউ আর হ্যাভিং দ্য প্রবলেম ফর এ হোয়াইল, ইট ইজ এসেনশিয়াল উই ক্যারি আউট এ থররো চেক আপ"

ডাঃ স্বামীনাথন জানে, যত ইনভেস্টিগেশন করাতে পারবে হাসপাতালের তত লাভ, কমিশন। হাসপাতালও খুশি। সেও। বউও। বউ-এর কাছে স্বামীর সাকসেস তার আর্থিক আমদানি।

নীলকান্থ ইতস্তত করছে দেখে বলল "উই উইলা রিলিজা ইউ ইন কপল অফ ডেস। আফটার অল, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু পে এনিথিং। ইট উইল বি পেইড বাই দ্য ইনসিরিওরেন্স"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভর্তি হয়েছিল নীলকান্থ।

মেডিক্যাল ডিরেক্টরের নাভিঃশ্বাস। বারবার স্বামীনাথনকে প্রশ্ন "হাউ ডিড ইট হ্যাপেন?"

"ডোন্টঅ নো স্যার"

"ওয়াজ দেয়ার এনি প্রবলেম?"

"নাথিং স্যার"

স্বামীনাথনের মাথায় ঢুকছে না কী ভাবে নীলকান্থ মারা গেল। দেয়ার ইজ নো মেডিক্যাল রিজন হি কুড থিংক।

“হোয়াট লেড টু দ্য ক্যাটাস্ট্রফি?”

“নো ক্লু স্যার”

একটা তরতাজা জীবন্ত প্রাণ চলে গেল। কেন চলে গেল, কেউ তার কোনও ডাক্তারি ব্যাখ্যা দিতে পারছে না। মেডিক্যাল ডিরেক্টর বুঝতে পারছে না, কী জবাব দেবে। ডাক্তারি কারণ যখন নেই, পোস্ট-মর্টেমে পাঠাতেই হবে। কারণ ছাড়া ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়া যাবে না।

মেডিক্যাল ডিরেক্টর যখন স্বামীনাথনের সঙ্গে কথা বলছে, ঘরে ঢুকল পুলিস “মে আই?”

চেয়ারে ইঙ্গিত “প্লিজ”

কার্ড দেখাল অ্যাডিশনল কমিশনার অফ পুলিস। এসব ক্ষেত্রে প্রাথমিক তদন্তে আসে ওসি। আশ্চর্য হল অ্যাডিশনল কমিশনার দিলওয়ান সিংকে দেখে। বড়সড় গণ্ডগোলের খবর পেয়ে নিজেই চলে এসেছে। ভণিতা না করেই প্রশ্ন “কুড আই সি দ্য মেডিক্যাল রেকর্ডস্?”

“সিওর” পেশেন্টের ফাইলটা এগিয়ে দিল।

“হোয়াই ওয়াজ হি অ্যাডমিটেড?”

স্বামীনাথন ইতস্তত করছে দেখে, মেডিক্যাল ডিরেক্টর ব্রিগেডিয়ার সান্যাল বলল “ফর ইনভেস্টিগেশনস”

“হু ওয়াজ দ্য কনসালট্যান্ট ট্রিটিং হিম?”

স্বামীনাথনের দিকে ইঙ্গিত “হিম”

“কুড ইউ এক্সপ্লেন হোয়াই হি ডায়েড?”

“নো ক্লু” স্বামীনাথন নার্ভাস।

“লেট মি ক্যারি আউট সাম প্রিলিমিনারি ইনভেস্টিগেশনস। ইউ মাইন্ড?”

ব্রিগ সান্যাল সায় দিল “নট অ্যাট অল। প্লিজ গো আহেড”

“ব্রিগেডিয়ার, কুড ইউ গিভ মি ওয়ান অফ ইওর স্টাফ টু জেরক্স দ্য নোটস্”

“সিওর” সেক্রেটারিকে বলল “প্লিজ হেল্প দেম”

সময় নষ্ট করতে চায় না। পাছে হাসপাতাল কতৃপক্ষ নোটস উলটে ফেলে, আগেভাগে আন্ট্যাম্পার্ড নথি চাই। কোর্ট নিডস এভিডেন্স। দিলওয়ান সিং বেরিয়ে যেতেই ফোন “হোম সেক্রেটারি মিঃ আয়াঙ্গার ওয়ান্টস্ টু টক”

“পুট হিম থ্রু”

ভণিতা না করেই আয়াঙ্গার বলল “দ্য মেডিক্যাল ডিরেক্টর আই প্রেসিউম?”

“ইয়েস। ব্রিগেডিয়ার সান্যাল”

“প্লিজ কোয়াপারেট উইথ মাই স্টাফ মিঃ দিলওয়ান সিং ইন ক্যারিং আউট দ্য ইনভেস্টিগেশনস”

“সিওর উইল, স্যার” ফোন কেটে দিল মিঃ আয়াঙ্গার।

ব্রিগেডিয়ারের মাথায় ঢুকছে না, হোম সেক্রেটারি পর্যন্ত ব্যাপারটা পৌঁছল কী করে? নিশ্চয়ই বড়সড় ক্যাচ আছে।

অ্যাডমিন সিট দেখল। ফাদার্স নেমে লেখা আছে রঙ্গনাথন। এ কী চিফ সেক্রেটারি রঙ্গানাথনের ছেলে? তাহলে তো এটা নিয়ে তুমুল শোরগোল হবে। নোটস নিয়ে সিইওর ঘরে “স্যার উই আর ইন ফর ট্রবল। দ্য বয় হু ডায়েড দিস মর্নিং সিমস দ্য সান অফ দ্য চিফ সেক্রেটারি মিঃ রঙ্গনাথন”

“হাউ ডিড ইট হ্যাপেন?”

“হ্যাভেন্ট এ ক্লু। হি ওয়াজ মিয়ারলি অ্যাডমিটেড ফর ইনভেস্টিগেশনস”

“এনি অ্যাবনর্মালিটি?”

"ডাঃ স্বামীনাথন টেলস মি আপটু ইয়েস্টারডে নাথিং কনক্লুসিভ ওয়াজ ডিটেকটেড। অ্যাডিশনল কমিশনার ইজ হিয়ার টু ডু দ্য ইনভেস্টিগেশনস। দ্য হোম সেক্রেটারি কল্ড মি নাউ"

সিইও ঠান্ডা মাথায় বলল "ইফ উই আর নট অ্যাট ফল্ট দেয়ার ইজ নাথিং টু ওয়ারি। ইউ ক্যারি অন। হেল্প দেম" ব্রিগেডিয়ার সান্যাল বেরিয়ে যাচ্ছিল "ডোন্ট টক টু দ্য মিডিয়া। আই উইল ডু দ্য টকিং"

এইখানেই খারাপ লাগে ব্রিগেডিয়ারের। হাসপাতালের সব কাজ করেও শেষ পাবলিসিটি সিইও রেড্ডি নিয়ে বেরিয়ে যাবে। এখানেই টেকনোক্র্যাট আর বুরোক্র্যাটের মধ্যে তফাত।

রেড্ডি সেক্রেটারিকে মিডিয়া হ্যান্ডেলিং টিমকে ডাকতে বলল। প্রত্যেক বড় হাসপাতালে অনেকটা গুপ্ত বাহিনীর মতো মিডিয়া হ্যান্ডেলিং স্কোয়াড আছে। মাইনে দিয়ে রাখা মিডিয়ার সঙ্গে 'দোস্তি' রেখে কোনও ঘটনাকে নির্মূল করা বা হাসপাতালকে হাইলাইট করার জন্য। এরা খেলা জানে। মিডিয়াও এদের থেকে প্রসাদ পায়। ওরা আসতে ব্রিফ করতে বসল।

দিলওয়ান সিং যখন ওয়ার্ডে, ততক্ষণে নাইট সিস্টারকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। তরতাজা যুবকের মরদেহ খাটে ফ্যালফ্যাল করে সিলিঙে চেয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই রাইগার মর্টিস হয়ে যাবে। হোমিসাইড বলে ভাবার কোনও কারণ নেই। ওর ব্যাকগ্রাউন্ড কিছুটা জানা। চিফ সেক্রেটারির একমাত্র ছেলে। স্যারকে জিজ্ঞেস করতে হবে মানসিক দিকগুলো। প্রেম করত? কী অ্যাম্বিশন ছিল? কোনও ডিপ্রেশনে ভুগছিল কি না? সুইসাইডেরও কোনও চিহ্ন নেই। চিফ সেক্রেটারির ছেলে বলে কথা। কারণটা তো খুঁজে বার করতেই হবে।

"হোয়াট ডিড ইউ সি?"

ডে সিস্টার হেমা বলল "হি হ্যাড নর্মাল ডিনার আফটার দ্য ভিসিটিং আওয়ার্স। টুডে মর্নিং হি ওয়াজ সাপোসড টু হ্যাভ লিপিড প্রফাইল। উই হ্যাড সার্ভড হিম ডিনারঅ অ্যাট সেভেনঅ ইয়েস্টারডে"

"দেন?"

"হোয়েন আই কেম ইন দ্য মর্নিং অ্যাট সিক্স আই ফাউন্ডঅ হিম ডেডঅ"

"হোয়াট অ্যাবাউট নাইট সিস্টারস রাউন্ড?"

"ইউসুয়ালি উই ডু নট ডিস্টার্ব নর্মাল পেশেন্টস আনলেস দে রিং ফর সামথিং। হি ডিড নট রিং"

নাইট সিস্টার কাভেরিকে প্রশ্ন "ডিড এনিওয়ান কাম অ্যাট নাইট?"

"নো স্যার। নোবডি ইজ অ্যালাউডঅ ইন দ্য ওয়ার্ড আফটার দ্য ভিসিটিং আওয়ার্স। একসেপ্ট দ্য পেশেন্টস"

দিলওয়ানের মাথায় অন্য চিন্তা। যতক্ষণ না পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট আসবে, সেদিকে এগোনো যাবে না। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে বিশেষ কিছু পাওয়া গেল না। মেডিক্যাল রেকর্ডের জেরক্স কপিটা নিয়ে বডি পোস্ট-মর্টেমে পাঠাতে বলে বেরিয়ে এল। একজন মেডিক্যাল এক্সপার্টকে দিয়ে এর ব্যাখ্যা জানতে হবে।

সাদা ধুতির ওপর সাদা হাফ সার্ট পরা রঙ্গনাথন ঘরে ঢুকতেই স্যালুট দিয়ে উঠে দাঁড়াল দিলওয়ান সিং। সোফায় বসতে ইঙ্গিত করল "এনি ডেভেলপমেন্ট?"

"স্যার ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড ক্যান আই আস্ক ইউ এ ফিউ রেলেভেন্ট কোয়েশ্চেনস?"

ধুতিটাকে পেঁচিয়ে রঙ্গনাথন বসল "ক্যারি অন"

সাউথ ইন্ডিয়ান স্টাইলে মাথায় আড়াআড়িভাবে চন্দনের তিলক। ব্রাহ্মণ, আয়েঙ্গার।

"টেল মি এ বিট মোর অ্যাবাউট ইওর সন"

চোখের জল মুছল "হি ওয়াজ এ ব্রিলিয়ন্ট স্টুডেন্ট। রাইট ফ্রম হিজ স্কুল ডেইজ হি নেভার স্টুড সেকেন্ড ইন লাইফ। টপার ফ্রম আইআইটি চেন্নাই। কমপ্লিটেড এমবিএ ফ্রম আইআইএম আহমেদাবাদ। হি ওয়ান্টেড টু গো টু স্টেটস। উই ডিড নট অ্যালাউ"

“হোয়াই?”

"হি ইজ আওয়ার ওনলি চাইল্ড। ইফ উই হ্যাড অ্যানাদার ইট উড হ্যাভ বিন ফাইন। বাট হিজ মাদার ওয়ান্টেড হিম টু বি বিসাইড আস”

“ওয়াজ হি ওয়ার্কিং?”

“হি ওয়াজ দ্য মার্কেটিং ডিরেক্টর অফ তিরুপতি ইনকরপোরেশন”

“হোয়াই ওয়াজ হি অ্যাডমিটেড টু হসপিট্যাল?”

“ওয়েল, হি ওয়াজ হ্যাভিং এ টামি পেইন ফর এ ফিউ মান্থস। দ্য লোকাল ডক্টর হ্যাড বিন ট্রিটিং হিম। আই আস্কড হিম টু গো অ্যান্ড সি এ স্পেশালিস্ট গ্যাসট্রোএনটেরোলজিস্ট। হি ওয়েন্ট টু সি ডাঃ স্বামীনাথন অ্যাট লেডি ফ্লোরেন্স, হু অ্যাডভাইসড্ অ্যাডমিশন ফর সাম টেস্টস”

“কান্ট দে হ্যাভ বিন ডান উইদাউট অ্যাডমিশন?”

“ডোন্ট নো। আই অ্যাম নট এ ডক্টর। ... হোয়েন উইল দ্য পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট বি রেডি?”

“সুন। বাই দ্য ওয়ে ওয়াস হি সাফারিং ফ্রম ডিপ্রেশন?”

“নট টু মাই নলেজ। হি ওয়াজ হেইল অ্যান্ড হার্টি”

“এনি অ্যাফেয়ার্স?”

"নো আইডিয়া। হি ডিড নট টেল আস। হাউএভার সিন্স হি ওয়াজ ইন মার্কেটিং হি ওয়াজ ইনভলভড্ উইথ অ্যান অ্যাড ফর দ্য কোম্পানি”

“তিরুপতি ইনকরপোরেশন?”

“ইয়েস। হি ইউসড এ বেঙ্গলি গার্ল ফর দ্য অ্যাড। দিস গার্ল ইউসড টু কল হিম সামটাইম। প্রেসিউমেবলি প্রফেশনল”

“হোয়াটজ হার নেম?”

“নো আইডিয়া। আই হ্যাভ নো টাইম ফর দিস ম্যাটার্স। নাউ আই ফিল ইফ আই হ্যাড গিভেন হিম মোর টাইম, আই কুড হ্যাভ গিভেন ইউ এ লিড। আওয়ার সিএম ডিপেন্ডস সো মাচ অন মি দ্যাট আই অ্যাম ওভারপুশড”

একজন বড় সরকারি আমলা একমাত্র ছেলেকে হারানোর জন্য নিজেকে দায়ী করছে। দিলওয়ান কত নগণ্য অফিসার। চিফ সেক্রেটারির ব্যক্তিগত জীবনে যাওয়া বাঞ্ছনীয় নয় বুঝে উঠে পড়ল।

“স্যার আই উইল ট্রাই মাই লেভেল বেস্ট, আই প্রমিস”

গাড়িতে উঠে মনে হল কে এই বাঙালি মডেল? তিরুপতি ইনকরপোরেশন থেকে এর নথি বার করতে হবে। হয়ত মৃত্যুর কারণের হদিস সেখান থেকে পাওয়া যেতে পারে। চিফ সেক্রটারির ছেলে বলে কথা। পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট আসতে বেশিদিন লাগল না।

দিলওয়ান সিং মেডিক্যাল ডিরেক্টরের ঘরে "ক্যান আই টক টু ডাঃ স্বামীনাথন প্লিজ। উইথ দ্য রেকর্ডস্"

তথাস্তু। রেকর্ড সহ স্বামীনাথন হাজির।

“ওয়াজ নীলকান্থ ডায়েবেটিক?”

“নট টু মাই নলেজ” স্বামীনাথন নোটস উল্টে ব্লাড রিপোর্ট খুঁজছিল। ওটা পেয়ে দিলওয়ানকে দিল “আই অ্যাম রাইট। দ্য রিপোর্ট শো সুগার টু বি নর্মাল”

রুমালে মাথা মুছে বলল “দেন হাউ কাম হাই ডোস অফ ইনসুলিন ওয়াজ ফাউন্ড ইন হিস ব্লাড অ্যাট পোস্ট মর্টেম?”

চমকে উঠল মেডিক্যাল ডিকেক্টর, ডাঃ স্বামীনথনও।

“ইনসুলিন!”

অবাক বিস্ময় “আই ডিডন্ট প্রেসক্রাইব এনি ইনসুলিন। হোয়াই শুড আই? হি ওয়াজ অ্যাডমিটেড ফর ইনভেস্টিগেশনস ওনলি”

“দেন সাম ওয়ান ইন দ্য হসপিট্যাল পুসড দ্য ইনসুলিন। উই হ্যাভ টু থরলি ক্যারি আউট এ ডিটেল ইনভেস্টিগেশন অফ ইওর হসপিট্যাল। প্লিজ কনভে এ বোর্ড মিটিং ইমিডিয়েটলি ইনভলভিং ইন দ্য ফার্স্ট ইন্সট্যান্স দ্য সিইও, বোথ অফ ইউ, দ্য নার্সিং সুপারিনটেনডেন্ট, দ্য চিফ অফ ফার্মেসি অ্যান্ড দ্য হেড অফ হসপিট্যাল সিকিউরিটি” উঠে বলল "ফ্রম দ্য পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট ইট ইজ অবভিয়াস, ইট ইজ এ কেস অফ হোমিসাইড। প্রব্যবলি দ্য কজ মাইট বি ইনসুলিন”

এর আগে জানা ছিল না ইনসুলিন দিয়ে মৃত্যু হতে পারে। এটা দিলওয়ানের পুলিস জীবনে নতুন অভিজ্ঞতা।

যুগটা সত্যিই পালটে গেছে।

সতেরো

তখনও ভালো করে ভোরের আলো ফোটেনি। ভোরের কুয়াশা প্রথম আলোর অপেক্ষায়। মুম্বাই আরও কিছুক্ষণ মিঠে আমেজে আরেকটু ঘুমিয়ে নিচ্ছে। রোদ উঠলেই অসহ্য গুমোট। তার থেকে পরিত্রাণের জন্য শিরিন আধো ঘুমে পাশে শোয়া স্নেহাশিসকে জড়িয়ে ধরল। মোবাইলের আওয়াজে সেই রেশটা কেটে গেল। সাইড টেবল থেকে মোবাইলে নাম দেখে তিড়িং করে লাফিয়ে বিবস্ত্র শিরিন ছুটে গেল পাশের ঘরে। ছিটকিনিটা বন্ধ করে দিল। এত সকালে? দুরু দুরু বুকে সবুজ বোতাম টিপল।

"ও পোলিস অফিসার অভি তক তুমহারে ঘর মে কেয়া কর রহে হৈ? ইনভেস্টিগেশন ইয়া গুলছড়ি?" চতুর্বেদীর ধমকে বুক কেঁপে উঠল। স্বরে মদ্যপানের জড়তা থাকলেও দৃঢ়তা। সত্যি তো। সাত দিনের জন্য এসেছিল মেহুলির মৃত্যুর তদন্তে। সুনেত্রা আগারওয়ালের মৃত্যুতে ঠেকেছে চৌদ্দ দিনে। সাত দিন ছুটি নিয়েছিল। আবার কাজে বেরতে হচ্ছে। তাতে অবশ্য স্নেহাশিসের কোনও অসুবিধা নেই। যদিও ওকে ডুপ্লিকেট কি দেওয়া আছে, বেশিরভাগ সময় বাইরে। ফেরে সন্ধ্যায় বা রাতে। ওর উপস্থিতিতে লেট নাইট পার্টিগুলো বাদ। আরও কাজের ঢলাঢলি বন্ধ। বাড়তি কনট্র্যাক্টগুলো হাতছাড়া। রাতের আসরেই ওগুলো আসে। চতুর্বেদীর সঙ্গেও দেখা হচ্ছে না। তাই বোধহয় ভোর রাতে চতুর্বেদী। একা দেখা করতে চায় না। কে জানে? পেছনে আবার পুলিসের খোচর ঘুরছে কি না? পার্টির হুল্লোড়ে কথা বলে নেওয়া সহজ।

তন্দ্রা ভাঙা গলায় নিচুস্বরে চতুর্বেদীকে শান্ত করতে বলল "গুলছড়ি কেও মানাউঙ্গা চতুর্বেদীজি? ঘর মে মেহমান, তো জানে কৈসে বোলে? পুলিস অফিসার্স কোয়াটারমে ঠহরেগা। উসে জাদা সক"

যুক্তিটা বুঝল চতুর্বেদী। নরম হয়ে বলল "জইসে হো উসকো বাঙ্গাল লউটা দো। মুঝে সিরফ মালুম করনা থা মেরা সাথ মেহুলি কা তালুককে বারে কেয়া জানতা? হো গয়া। অব উসে ইধর জরুরত নেহি"

"ন যায় তো কেয়া করু?"

"রঙ্গালি মানানা তো ঔর কভি। টিকিট ভেজ দেতা। উসে লেকর বাঙ্গাল চলা যাও কুছ দিনোকে লিয়ে"

"ইধরকা কাম..." শিরিন বোঝাবার চেষ্টা করল।

"তুমহে ভওয়ানিশঙ্করজি বুলায়া"

ভওয়ানিশঙ্করের নামটা অচেনা নয়। তবে সাক্ষাৎ হয়নি। শুনেছে পুনের রাস্তায় একটা আশ্রম। গোঁড়া মুসলমান পরিবারের হয়েও সাবেকি ইসলামিক প্রথায় কখনও চলেনি। মুম্বাইতে এসে তো সব প্রথারই বিসর্জন সাপ-লুডোর খেলায়। জীবনযাত্রায় ভোগ-বিলাসিতা থাকলেও, আধ্যাত্মিকতার আশেপাশেও যায়নি। সে বয়সও হয়নি। ভওয়ানিশঙ্করের নাম শুনলেও ওখানে যাওয়ার তাগিদ অনুভব করেনি।

তাকে ডেকেছে শুনে আশ্চর্য "মুঝে কেও?"

ইন্ডাস্ট্রিতে অনেকেই যায়। কেন? প্রশ্নের উত্তর খোঁজেনি। যার যেখানে শান্তি।

"ম্যায় নেহি জানে। বাবাজি তুমহে ইয়াদ কিয়া"

ইতস্তত করছিল কী করবে? ভোরে চতুর্বেদীর ফোন পেয়ে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা সিরিয়াস। চতুর্বেদীকে চটালে মুম্বাইতে করে খেতে হবে না।

"আপ জো বোলে"

"শুটিং সিডিউল মে ফুরসত মিলে তো ফোন কর দেনা। ম্যায় লে যাউঙ্গা। জিতনা জলদি হো সকে। আউটডোর শুটিংকে বাহানা দিখা কর পুলিসকো লৌটা দে জলদি"

লাল বোতাম টিপে ফোনটা কেটে দিল। বিবস্ত্র শিরিন বিছানায় বসে, খাটের ওদিকে আয়নায় ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে। সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। ঘুমভাঙা মাথাটা ঠিক কাজ করছে না। জানলা দিয়ে ভেসে আসা ভোরের আলো। আয়নায় দেখল সুঠাম দেহকে নানা মেক-আপ লাগিয়ে, নতুন রূপে পেশ করছে কম্পিটিটিভ ইন্ডাস্ট্রিতে। নাম পেয়েছে। টাকা আসছে। তবুও সব-ই কৃত্রিম। মানুষ নেই। এত বছর পর যৌবনের না-পাওয়া আকাঙ্ক্ষা এত কাছে। এই মুহূর্তটাকেও সর্বগ্রাসী অজগর গিলতে চাইছে। এর নাম বুঝি জীবন? মন যা চায়, সমাজ চায় না। মনকে বাক্সবন্দি করে তালে তাল মেলানো, টিকে থাকা? ছিটকিনিটা খুলে দিল। স্নেহাশিস জাগলে অন্য কিছু ভাবতে পারে। যদিও খাটেই শুয়ে রইল। বারবার প্রশ্নের উঁকিঝুকি। উত্তর পায়নি। খোঁজার প্রয়োজনও বোধ করেনি। মেহুলির মৃত্যুর ব্যাপারে চতুর্বেদীর এত আগ্রহ কেন? চতুর্বেদী কী এর সঙ্গে জড়িয়ে?

স্নেহাশিস আধো ঘুমে হাতটা পাশে ফেলতেই বালিশটা ফাঁকা ঠেকল। পাশের বিছানা ফাঁকা। শিরিন নেই। হয়ত বাথরুমে বা রান্নাঘরে। সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে হিসেব মেলাবার চেষ্টা। মধুসূদন মুখুজ্জে ছবিটা ফ্যাক্স করে পাঠিয়েছে। আধছেঁড়া ছবি আর সুনেত্রার কম্পিউটারের ছবির মধ্যে সামঞ্জস্য আছে। কম্পিউটার এক্সপার্ট কম্পিউটার গ্রাফিক্সে সুপার ইমপোজ করে সেই মতামত দিয়েছে। লম্বাটে মুখ। পরিষ্কার কামানো গাল। চোখের মধ্যে নমনীয় রুক্ষতা। কে এই লোকটি? এই কী সে, যাকে স্নেহাশিস স্যনট্রো গাড়ি নিয়ে বেরতে দেখেছে? মুম্বাই পুলিসের চিত্রকার, কম্পপ্লেক্সের সিকিউরিটি গার্ডের বিবরণ নিয়ে ছবি আঁকবে কনফার্ম করতে। মেহুলি আর সুনেত্রার মধ্যে যোগসূত্র। মৃত্যুর, না মুম্বাইয়ের? না কী মৃত্যুর পেছনের মোটিভ? মেহুলি মুম্বাইয়ের উঠতি মডেলদের অন্যতম। ব্যান্ড্রা রিক্লেমেশনে বিলাসবহুল ফ্ল্যাট। সেই তুলনায় সুনেত্রা অত্যন্ত সাধারণ চাকুরে। মা উমাশশীকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গেছিল। পরপর দুটো মৃত্যু। বছর খানেক আগে স্বামী বিপিনের। তারপর একমাত্র মেয়ে মেহুলির। শোক কাটিয়ে উঠতে পারেননি প্রৌঢ়া। বিশেষ ফল মেলেনি।

মধুসূদন মুখুজ্জে রেকর্ড-কিপার অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিস কমিশনার হলেও পরিতোষ সেনকে দিয়ে অনেক তথ্য বার করে পাঠিয়েছে। অনাড়ম্বর সুনেত্রার অনেক তথ্য। সুনেত্রারা আগে শিয়ালদহ চত্বরে থাকলেও বড় হয়েছে কাঁকুরগাছির মধ্যবিত্ত রক্ষণশীল শিক্ষিত মারোয়ারি পরিবারে। বাবা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের দোরগোড়ায় না পৌঁছলেও, শেয়ার মার্কেটের ব্যাবসায় পারিবারিক সচ্ছল। কাঁকুড়গাছিতে ফ্ল্যাট কিনতেও সক্ষম। তখন সুনেত্রার মাত্র ছ-বছর বয়েস। বৌবাজারের লরেটো থেকে সায়েন্স কলেজ। শিক্ষার আলো দেখার সৌভাগ্য হয়নি বলে, ছেলে ও মেয়েকে উচ্চশিক্ষায় অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। তার ফল কেমেস্ট্রিতে মাস্টার্স। সুনেত্রা ঐত্রেয়ী যখন কেমেস্ট্রিতে মাস্টার্স করছে, সোহম মিলন তখন ফিজিক্সে। দুটি যুবক, দুই যুবতী।

গল্পটা সাদামাটা হতেই পারত। জীবনের অঙ্ক তো অত সহজ নয়। সুনেত্রা ভালোবেসে ফেলল সোহমকে। তা বিকশিত হতেই পারত, যদি সোহমও ভালোবাসত সুনেত্রাকে। ঈশ্বর সেখানেই বাধ সেধেছিল। মনকে হিসেবের গণ্ডির মধ্যে বন্দি করা যায় না, সোহম ভালোবেসে ফেলল ঐত্রেয়ীকে। এই ভালোবাসার টানাপোড়েনের নীরব সাক্ষী হতে পারত মিলন চ্যাটার্জি। মিলনও আকৃষ্ট হল শান্ত সুনেত্রার প্রতি। ত্রিভুজের জ্যামিতিক ব্যাখ্যা অন্য আকার নিল। বারবার প্রেম নিবেদনে ব্যর্থ সুনেত্রা যখন হতাশ, বন্ধু হিসেবে পাশে দাঁড়াল মিলন। সুপ্ত বাসনাকে কোনও আকার না দিতে পেরে, দরদি বন্ধু হয়ে সুনেত্রার পাশে।

দুঃখ করে সুনেত্রা বলত "কী করি মিলন? ওকে যে ভালোবেসে ফেলেছি। ভালোবাসা তো ভেতর থেকে আসে। আমার জীবন ব্যর্থ"

মিলন সান্ত্বনা দিত "ব্যর্থ কেন? ভালোবাসা পাওয়ার থেকে দেওয়াটাই বড়"

এমএসসি-র পর সোহম আর মিলন পিএইচডি-র পথে। ঐত্রেয়ী সায়েন্স কলেজে রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট। সুনেত্রা একা কাঁকুড়গাছির ফ্ল্যাটে। বাড়ি থেকে বিয়ের তাগাদা। সোহমের প্রতি অগাধ প্রেম। মিলনের থেকে সোহম আর ঐত্রেয়ীর নিত্যনৈমিত্তিক প্রেমলীলার ফিরিস্তি। জীবন দুর্বিষহ। পালাতে চাইছিল সেই পরিবেশ

থেকে, কলকাতা থেকে, চেনাজানা সব বাতাবরণ থেকে। অন্য কোথাও, অন্য কোনওখানে। এমন সময় সায়েন্স কলেজের এক অধ্যাপকের সাহায্যে দ্য নিউ এজের মুম্বাই অফিসে চাকরি। কেমিক্যাল রিপোর্ট ট্র্যান্সক্রিপশন দেখা। মুম্বাইতে পাড়ি।

শিরিনকে ঘরে ঢুকতে দেখে বলল "কোথায় ছিলে?"

"পাশের ঘরে আলমারি গোছাতে" শিরিনের বিবস্ত্র দেহটা জানলা দিয়ে আসা একফালি আলোর ঝলকে দেখে মনে হল, রাতের উন্মাদনা তো দেহকে অনুভব করার মধ্যে সীমাবদ্ধ। ভোরের আলোয় শিরিনের নগ্ন দেহকে দেখার মধ্যে স্নিগ্ধতার আমেজ। মনে করতে পারল না, এভাবে অভ্রদিতাকে শেষ কবে দেখেছে। ঋজু হওয়ার পর তো নয়ই। আগেও কী অভ্রদিতা এরকমভাবে দাঁড়িয়েছে ওর সামনে? মনে পড়ছে না। তার কত লজ্জা।

নিরাবরণ কার্ভের মধ্যে প্রকৃতির জীবন্ত রূপ। তাই তো শিরিন সেরা। বাজারের পসরা। শ্বেতশুভ্র দেহে সকালের আলো-আঁধারি পাল্লা দিচ্ছে।

ড্রেসিং গাউন জড়িয়ে প্রশ্ন "কী দেখছিলে?"

"তোমাকে"

"সে তো দেখলাম। আগের থেকে মুটিয়েছি?"

পিলের ওপর জীবন কাটালে একটু মেদ তো হবেই। এদের সবসময়ই ভয়। যে দেহকে সম্বল করে লাখ-লাখ কামাচ্ছে সেটা অটুট না রাখলে, লাখ টাকার মোয়া হাওয়ায় অদৃশ্য হতে বেশি সময় লাগবে না। সত্যি কী শিরিনকে দেখছিল? না ভাবছিল সুনেত্রার সঙ্গে শিরিনের সম্পর্কের কথা?

"চা না কফি?"

"যেটা সুবিধে"

শিরিনের দোদুল্যমান নিতম্বের দিকে এক পলক তাকিয়ে চোখ পড়ল জানলার বাইরে। পাশে পড়ে থাকা ইজেরটা গলিয়ে, পাজামায় দড়ি বেঁধে জানলার সামনে দাঁড়াল। ভোরের আকাশের রক্তিম ক্রমশ গ্রাস করছে কংক্রিটের বহুতলকে।

রোশন সুনেত্রার কম্পিউটারের ছবি আইডেন্টিফাই করেছে। কিছুদিন আগে ম্যাথেরনের পথে লরি দুর্ঘটনায় বেঁচে থাকা মেয়ের পরশু হুঁশ এসেছে লীলাবতী হাসপাতালে। নাম সন্নিধি। সন্নিধিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়ে স্নেহাশিসের দেখানো ছবিটা ভেসে উঠেছিল। জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছিল সন্নিধি দ্য নিউ এজে কাজ করে। যে কোম্পানিতে কাজ করত সুনেত্রা আগারওয়াল। ছ্যাঁত করে উঠেছিল রোশনের বুকটা।

একটা সূত্র খুঁজছে - সন্নিধি জখম, সুনেত্রা মৃত। কোথাও কী লিঙ্ক আছে? রোশনের থেকে স্নেহাশিস জানতে পারে সন্নিধি আর সুনেত্রার কর্মসূত্রের বাইরেও বন্ধুত্ব। দুই বিপরীতধর্মী চরিত্র যে কী করে এক মেরুতে ঠেকল - সেটাই পরখ করতে গিয়ে অনেক তথ্য বার করে এনেছে রোশন। ধর্মপরায়ণা একাকী সুনেত্রা সঙ্গ খুঁজছিল। কাজের মধ্যে ডুবে নিজেকে ভুলতে। কাজ তো জীবন-যাপনের অঙ্গ। সম্পূর্ণ জীবন হতে পারে না। এর বাইরেও মন অবকাশ চায়। সেই অবকাশের বার্তা এনেছিল সন্নিধি। একসঙ্গে ঋষিকেশ, হরিদ্বার, লছমনঝুলা। টাঙায় ঘুরে বেরনো। হার-কি-পৌরিতে প্রদীপ ভাসানো। ঈশ্বর পাওয়ার অভিপ্রায় নয়। বন্ধুত্বের আনন্দে।

কিন্তু কেন?

সন্নিধি খুব ভালো করেই বুঝেছিল সুনেত্রাকে কাছে পাওয়ার মন্ত্র। ধর্ম! ধর্মই তাদের যোগসূত্র গড়তে পারে। তাই সুনেত্রার ভালোলাগাকে এক্সকার্সনে রূপান্তর। বোঝা গেল কম্পিউটারে ওদের ছবিগুলোর কাহিনি। মুনি-ঋষিদের ছবিও নয় সন্নিধির দাক্ষিণ্যে শোভা পেতে পারে। কিন্তু ব্লু ফিল্ম?

রাতের জীবন্ত ব্লু ঘরে ঢুকল কফি নিয়ে "অ্যাট ইওর সার্ভিস স্যার"

শিরিনের হাত থেকে কফির কাপ নিয়ে বলল “মুম্বাইতে কলকাতার চেয়েও ভ্যাপসা গরম। হিউমিডিটি ভেরি হাই”

কফির কাপে চুমুক দিয়ে উত্তর “মুম্বাই আর ভালো লাগছে না? অভ্রদিতা আর ঋজুর কথা মনে পড়ছে?”

“অনেকদিন তো হল। এবার কলকাতা ফেরত। তোমারও তো আউটডোর বন্ধ আমার জন্যে। আর কদ্দিন আটকে থাকবে?”

“কবে যেতে চাও?”

“এটা যে রাজলক্ষ্মী আর শ্রীকান্তর ডায়লগ হয়ে গেল”

“বনের পাখিকে কদ্দিন খাঁচায় বন্দি করে রাখব? বনে ফিরিয়ে দেওয়াই শান্তি” যেন গভীর ভালোবাসার কথা অকপটে বলে ফেলেছে।

স্নেহাশিসের সেই মুহূর্তে বাংলার কথা মনে হল “তোমার সোনার ধান তো নিয়ে গেলাম। সারা জীবনের পাথেয় হয়ে থাকবে এ’কটা দিন”

“সত্যি! মনে রাখবে তো?”

শিরিনকে জড়িয়ে গালে চুমু খেয়ে বলল “কী মনে হয়?”

“কী জানি? পুলিসরা কাকে কখন মনে রাখে? বোধহয় চোর দাগি আসামিকে ছাড়া আর কাউকে মনে রাখতে পারে না”

“তুমি তো, তা নও”

ইতস্তত করে শিরিন বলল “এটুকু জান বলেই আমার ফ্ল্যাটের দরজা তোমার জন্য কোনোদিনও বন্ধ হবে না”

স্নেহাশিস বুঝতে পারছে না, কোন শিরিন সত্যি? এই মুহূর্তের, না কি, সুনেত্রার সঙ্গে সম্পর্কের মায়াজালে জড়ানো কম্পিউটারের ছবির হাসিখুশি কৃত্রিম ‘হায়-হ্যালোর’ আবরণে ঢাকা অন্য শিরিন?

আঠেরো

"দ্য চিফ সেক্রেটারিস সন মার্ডার্ড ইন হসপিট্যাল!"

ইলেকট্রনিক থেকে প্রিন্ট মিডিয়া চাঞ্চল্যকর খবর পেয়ে গেছে। মন্ত্রী থেকে বিধানসভা উত্তাল। মুখ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে দ্রুত তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। যেখানে স্বয়ং চিফ সেক্রেটারির ছেলের কোনও নিরাপত্তা নেই, সেই মুখ্যমন্ত্রীর রাজত্বে আম জনতা কতটা নিরাপদ? ঘন ঘন ডাক পড়ছে লেডি ফ্লোরেন্স হাসপাতালের দণ্ডমুণ্ডের কর্তাদের মুখ্যমন্ত্রীর পলিটিক্যাল সেক্রেটারির অফিসে।

এটা নিছক খুনের মামলা নয়। গোটা রাজত্বের আম জনতার নিরাপত্তার প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। মন্ত্রিসভার স্থায়িত্বের প্রশ্ন। মামলার দ্রুত কিনারা না হলে গদি নড়ে যেতে পারে, সেকথা বুঝতে পারছেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং।

দিলওয়ান সিংকে অন্য সব কাজ থেকে অব্যাহতি দিয়ে শুধু এই তদন্ত নিয়ে থাকতে আদেশ দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রসচিব। কোত্থেকে শুরু করবে? সিইও মেডিক্যাল ডিরেক্টর, ডাঃ স্বামীনাথন, নার্সিং সুপারিনটেনডেন্ট, চিফ অফ ফার্মেসি, হেড অফ হসপিট্যাল সিকিউরিটি সবাই অথৈ জলে। ডিউটি নার্স, আরএমও, বেয়ারা, ডায়েটিশিয়ান, প্যাথলজি টেকটিনিশিয়ান ও ফার্মাসিস্ট - একে একে সবাইকে জেরা করছে। কেউ কিছুই জানে না।

কিন্তু কেউ তো ইনসুলিন পুশ করেছে। সে কে? ভিজিটরদের তালিকা কোথাও নথিভুক্ত থাকে না। জিজ্ঞাসাবাদ করেও কোনও সুরহা হয়নি। রাত পর্যন্ত হয়রানি। উত্তর দূরের কথা, কোনও সূত্র পর্যন্ত মেলেনি।

দিলওয়ান সিং হাসপাতালের অটোম্যাটিক স্লাইডিং ডোর দিয়ে বেরিয়ে গাড়িতে উঠতে যাবে, এমন সময় একটা কণ্ঠস্বর। চোস্ত ইংরেজিতে কে যেন বলছে "দিস ইজ নট এ হসপিট্যাল। ইট ইজ এ মর্গ। পিপল কাম টু ডাই হিয়ার অ্যান্ড প্রে অ্যাট দ্য অল্টার অফ গড, টিল দ্য পোস্ট-মর্টেম এক্স্যামিনেশন অফ দ্য হসপিট্যাল ইজ ফিনিসড"

কে এই লোকটি?

ফিরে তাকাল দিলওয়ান। হাসপাতালের পেসিওর অন্যদিকে এক দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ নিজের মনে চিৎকার করে যাচ্ছে। মাঝারি গড়ন, সাদা প্যান্ট, সাদা সার্ট, হাই পাওয়ারের চশমা, চুলগুলো প্রায় সব সাদা।

ওসিকে প্রশ্ন "হু ইজ হি?"

"ডোন্ট নো স্যার। উইল ফাইন্ড আউট"

লোকটিকে গুরুত্ব না দিয়ে গাড়িতে উঠে পড়েছিল দিলওয়ান সিং। কী ভেবে নেমেই ওসিকে বলল "গেট মি দ্য পিআরও অফ দ্য হসপিট্যাল"

হাসপাতালের পিআরও ভিনু আদর করে বসাল দিলওয়ানকে। অনেকদিন লেডি ফ্লোরেন্স হাসপাতালে থাকায় অতিথি অপ্যায়নে চোস্ত "স্যার হোয়াট ডু ইউ প্রেফার? টি অর কফি?"

"নাথিং। হু ইজ দিস ম্যান সাউটিং আউটসাইড দ্য হসপিট্যাল?"

"দেয়ার ইজ এ লং হিস্ট্রি টু ইট। বাই প্রফেশন হি ওয়াজ অ্যান ইঞ্জিনিয়ার। আই হ্যাভ হার্ড হি হ্যাড লিভড ইন ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড ফর এ কনসিডারেবল টাইম। হি ওয়াজ ওয়ার্কিং উইথ এ বিগ মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানি হিয়ার ইন চেন্নাই। হি লিভড উইথ হিজ ওয়াইফ। দে হ্যাড নো ইসুস। থ্রি ইয়ার্স ব্যাক হিজ ওয়াইফ ওয়াজ অ্যাডমিটেড টু দিস হসপিট্যাল উইথ টার্মিন্যাল প্রিভিয়াসলি আন-ডায়গনোসড ক্যান্সার। আল্টিমেটলি সি সাকামবড। হি কুডন্ট অ্যাকসেপ্ট দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট হিজ ওয়াইফ ওয়াজ নো মোর। দেয়ার আফটার হি লস্ট মেন্টাল ব্যালেন্স। ফ্রম দেন অন হি কামস হিয়ার এভরি মর্নিং, সিটস কোয়াটলি।

সামটাইমস ব্ল্যাবারিং আউট সেন্সলেস জারগন অ্যান্ড রিটার্নস হোম ইন দ্য ইভিনিং। ইনিশিয়ালি উই ট্রায়েড টু শাভ হিম অফ। বাট হি উড কাম ব্যাক এগেইন। ইন দ্য এন্ড উই রিয়েলাইজড হি ওয়াজ হার্মলেস। মে বি হি ফাইন্ডস পিস ইন দ্য ভিসিনিটি অফ দিস হসপিট্যাল। উই লেট হিম বি অ্যাস হি ইজ"

"ডস হি এভার ইন্টারফিয়ার ইন ইওর এভরিডে অ্যাকটিভিটিস?"

ভিনু সবুজ শাড়ির আঁচল ঠিক করল "নো। হি ইজ হার্মলেস। ইফ হি ফাইন্ডস সোলেস ইন বিয়িং উইদিন দ্য প্রেমিসেস অফ লেডি ফ্লোরেন্স, লেট হিম সো। উই সেলডম গিভ হিড টু হোয়াট হি সেইস"

"ডস দ্যাট এফেক্ট ইওর বিজনেস ইন এনি ওয়ে?"

"নট ইন দ্য লিস্ট। দিস ইজ টু বিগ অ্যান অর্গানাইজেশন। পিপল কাম হিয়ার বাই ইটস সিয়ার নেম। পিপল ইজিলি রিয়েলাইজ দ্যাট হি ইজ ম্যাড। দে অলসো পে লিস্ট অ্যাটেনশন"

ভিনুর ঘর থেকে বেরিয়ে ভাবছিল হঠাৎ একটা পাগলের কথায় এত গুরুত্ব দিচ্ছে কেন? হয়ত মন বলেছে - তাই। পুলিসে কাজ করে বলে সব কিছু বাজিয়ে নেয়। হোক না পাগল। বাজাতে দোষ কোথায়?

গোধূলির শেষ রশ্মি তখন উত্তপ্ত চেন্নাইয়ের মিরিয়াম বিচে রঙের ছটা ছড়িয়েছে। বিলুপ্ত দিনের মুছে যাওয়া শেষ রেখাগুলোকে ক্রমশ আঁধারের প্রলেপে মিশিয়ে দিচ্ছে। কাল আবার প্রখর দীপ্তিতে ঝলমলিয়ে উঠবে। কিছুদিনের মধ্যেই হারিয়ে যাবে আজকের আলোড়নকারি হেডলাইনস। অন্য কোনও চাঞ্চল্যকর খবর জায়গা করে নেবে একটা বাসি মৃত্যুর জায়গায়। পড়ে থাকবে বুকভরা হাহাকার নিয়ে দুই বৃদ্ধ। সর্বচ্চ গদিতে বসেও নীরব অলক্ষ্যে একাকী মনটা কেঁদে উঠবে একমাত্র সন্তান নীলকান্তের জন্য। কে মারল? কেন মারল? এসব অবান্তর প্রশ্ন নিয়ে মাঝেমধ্যে দু-কলম লেখা হবে। শূন্যতার গভীর অন্ধকারে জুড়ে থাকবে বাকি জীবনের অংশ। হারানোর ব্যথায় গ্রাস করে থাকবে তাদের জীবন। সেখানে কোনও মন্ত্রী আমলা নেই। সরকারের ক্ষমতার মারপ্যাঁচও নেই। আছে পুত্রশোকের বোঝা বুকে দুই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা।

মন ডাকছে তাকে। সেই অচেনা পাগলের সুরে। সেই বা কী জানে? তবুও... মন তো। মনের ডাকে সাড়া না দিয়ে পারছে না। দিলওয়ান সিং পুলিসের ইউনিফর্ম ছেড়ে পুলিসের গাড়ি বিসর্জন দিয়ে, নিজের মারুতি নিয়ে ফিরে এসেছে লেডি ফ্লোরেন্স হসপিট্যালে। দেখল শিথিল পায়ে ওই মানসিক ভারসাম্যহীন লোকটি গেট দিয়ে বেরিয়ে হেঁটে চলেছে বাস স্ট্যান্ডের দিকে।

কিছু দূরে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে ওর পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলল "গোয়িং হোম?"

"আই ফিল লাইক ওয়ান হু ট্রেডস্ অ্যালোন

সাম ব্যাঙ্কয়েট হল ডেসার্টেড

হুস লাইভস্ আর ফ্লেড

অ্যান্ড গারল্যান্ডস্ ডেড

অ্যান্ড অল... ডিপার্টেড"

"হু সেইড সো? আই হ্যাভেন্ট ডিপার্টেড ইয়েট?"

"ইউ উইল। সুনার অর লেটার। লাইফ ইজ জাস্ট এ বিজনেস ইকোয়েশন। অল উইল গো। লাইক জয়মতি। সি প্রমিসড সি উড নেভার লিভ। ইয়েট সি লেফট্"

"হু ওয়াজ জয়মতি?"

"মাই ওয়াইফ"

"হোয়াট হ্যাপেন্ড?"

"সি ডায়েড অ্যাট দিস হসপিট্যাল থ্রি ইয়ার্স ব্যাক"

ভিনুর কথাটা মনে পড়ল 'থ্রি ইয়ার্স ব্যাক হিজ ওয়াইফ ওয়াজ অ্যাডমিটেড টু দিস হসপিট্যাল উইথ টার্মিন্যাল প্রিভিয়াসলি আন-ডায়গনোসড ক্যানসার। আল্টিমেটলি সি সাকামবড' তাহলে এই লোকটি সময়জ্ঞান হারায়নি। সব কথা অর্থহীন নাও হতে পারে? তাই কী মন ফিরিয়ে এনেছে এই লোকটির কাছে?

“সরি টু হিয়ার দ্যাট। আর ইউ ইন এ রাস?”

“হোয়াট রাস? হোম ইজ জাস্ট অ্যান এপিটোম অফ মেলাঙ্কলি”

“ক্যান উই সিট ডাউন সামহোয়ার। ওয়ান্ট টু নো মোর অ্যাবাউট ইওর ওয়াইফ”

“হু উইল পে দ্য বিল?” প্রশ্নে চমকে উঠল “আই হ্যাভ নো মানি”

“ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট। আই উইল স্ট্যান্ড দ্য বিল। হোয়াট ডু ইউ প্রেফার? কফি অর ড্রিঙ্কস্?”

ফিরে তাকাল। কেউ তো এমন আদরে কখনও খেতে বলেনি। একদিকে আনন্দ, অন্যদিকে একটা সন্দেহ। কেন যেচে খাওয়াচ্ছে? দেখাই যাক না কেন।

“উডন্ট মাইন্ড এ ড্রপ অফ হুইস্কি”

বাসস্ট্যান্ড ছাড়িয়ে উলটো দিকের গলিতে সস্তার বারে বসল। দিলওয়ান জানে দু-পেগ পেটে পড়লে ভেতরের কথা হুড়হুড় করে বেরিয়ে আসে।

ঢকঢক করে দু-পেগ একসঙ্গেই গিলে ফেলল। দিলওয়ান বেয়ারাকে ইঙ্গিত করল আরও দু পেগ দিতে। বউয়ের সঙ্গে প্রেম-বিয়ে থেকে মৃত্যু - লম্বা সফরের ইতিহাস বলে চলেছে বৃদ্ধ। নিঃশব্দে শুনছে দিলওয়ান।

বিরতিতে যখন পঞ্চম পেগে চুমুক দিতে উদ্যত, দিলওয়ান বলল “হোয়াট ইজ ব্যাড অ্যাবাউট দিস হসপিট্যাল?”

“ব্যাড? এভরিথিং... হোয়াট ডু ইউ নো অ্যাবাউট দিস হসপিট্যাল? লাস্ট ইয়ার এ ইয়ং গার্ল ওয়াজ অ্যাডমিটেড উইথ বার্নস। সি ডায়েড। ইট ওয়াজ ওয়ান অফ দোস... মাদার-ইন-ল্য কিলিং দ্য ডটার ইন ল্য। নট ওনলি দে হাসড আপ দ্য মিডিয়া, বাট অলসো দে হাসড আপ দ্য পুলিস”

“হাউ আর ইউ সো সিওর?”

“আই ওভারহার্ড দ্য মিডিয়া পিআরও ট্রাইং টু নেগোশিয়েট উইথ দ্য মিডিয়া”

হয়ত কথাটা সত্যি কিংবা নয়। দিলওয়ান সিং শুনে যাচ্ছে।

“দিস ইজ এ ব্লাডি মর্গ” লোকটি নেশায় বলে চলেছে।

“বাট লট অফ পিপল রিটার্ন হোম বিইং ওয়েল ট্রিটেড?”

“দে আর ফুলস। দে স্পেন্ড মানি। ইন লিউ অফ দ্যাট দে গেট আ সেন্স অফ ওয়েল বিয়িং” অসংলগ্নতা থাকলেও দিলওয়ান তা নিয়ে ভাবছে না। শুধু শুনে যাচ্ছে।

“ওয়ান ইনসিডেন্ট, অ্যান্ড ইউ আর কনভিনসড?” উসকে দিল।

“ইট ইজ নট ওয়ান অফ ইনসিডেনট। টু ইয়ার্স বিফোর এ ইয়ং ম্যান কেম উইথ সাম হ্যান্ড ইনজিউরি। হি ডায়েড টু। দে সেইড দ্য কস ওয়াজ আননোন”

লোকটি কী সত্যি বলছে? যদি কথাগুলো সত্যি হয়, তাহলে ব্যাপারটা ভাবার। কাল নাইয়ারকে এসবের সত্যতার সন্ধানে লাগিয়ে দিতে হবে। নেশা ধরে গেছে লোকটির।

“হোয়াট ইজ ইওর নেম?”

“জয়ন্ত রাজা। আই অ্যাম হাঙ্গরি”

জয়ন্ত রাজাকে খাইয়ে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ দিলওয়ানের দিকে ফিরে বলল “হোয়াট ইজ ইওর নেম?”

“দিলওয়ান সিং”

“ওকে। বা... ই...”

নায়ার তদন্ত করে জানাল কথাগুলো মিথ্যে নয়। হ্যান্ড ইনজিওরি থেকে বার্ন। প্রত্যেকটা ঘটনাই ঘটেছে। সে ঘটনাগুলোর মীমাংসা আজও হয়নি। যে কারণে ও বলেছে সেটাই কী আসল, না অন্য কোনও কারণ আছে, সেটা তদন্তসাপেক্ষ। এটা বুঝতে পারছে লোকটার কথা অসংলগ্ন নয়। কথার ভেতরে অনেক সত্য লুকিয়ে। অস্বীকার করা ঠিক হবে না। আগে কী ঘটেছে, সেটা তার তদন্তের এক্তিয়ার নয়। কিন্তু এই

লোকটার কথার ভিত্তি করে যদি কোনও সূত্র মেলে... দুদিন পরে ঠিক ওই সময় দিলওয়ান আবার জয়ন্ত রাজার পাশে পথিক। মন টানছে ওই লোকটির দিকে।

"ইউ আর রাইট"

"হোয়াট?" রাজা ফিরে তাকাল।

"আই গেভ ইট এ থট ফর লাস্ট টু ডেইজ। দো আদার্স মাইট থিংক ইট আদার ওয়াইজ, আই ক্যান সি সেন্স"

"এভরিওয়ান থিংকস আই অ্যাম ম্যড" হেসে উঠল জয়ন্ত রাজা।

"আই ডোন্ট থিংক সো। শ্যাল উই হ্যাভ কফি টুডে ফর এ চেঞ্জ"

"ইউ উইল পে?"

"আই উইল। লাইক দ্য লাস্ট টাইম"

দিলওয়ান নেশায় জয়ন্ত রাজার এই কাহিনির প্রেক্ষাপট শুনতে চায় না।

"হোয়াট অ্যাবাউট দ্য লাস্ট ডেথ?" দিলওয়ান কফিতে চুমুক দিল।

"আই ডোন্ট নো"

"এনিথিং আনিউসুয়াল?"

"নাথিং টু মাই নলেজ।... আই সি ফ্যামিলিয়ার ফেসেস এভরিডে। দে কাম, গেট অ্যাডমিটেড, দে গো। দ্যাট ডে আই স্য অ্যান আনফ্যামিলিয়ার ফেস এন্টারিং। ইয়ং লেডি ইন হার মিড টুয়েন্টিস। নট সিওর হু সি ওয়াজ। বাট আই রিমেম্বার সি কেম ইন এ ক্যাব। সি ফিশড আউট সাম মানি হোয়াইল দ্য ক্যাব ওয়াজ পার্কড ইন দ্য পেসিও। দ্য পার্স হ্যাড এ এয়ারলাইন ট্যাগ। প্রব্যাবলি ইন্ডিগো, ইফ আই ক্যান রিকল কারেক্টলি। হোয়াইল ট্রাইং টু পে মানি, এ স্লিপ ফেল অফ হার ব্যাগ"

"হোয়ার ইজ দ্য স্লিপ?"

"আই পিকড ইট" একটু ভরসা।

"হোয়ার ইজ ইট?"

"আই স্য অ্যান্ড থ্রু ইট" দিলওয়ান হতাশ।

"ওহ মাই গস! ডিড ইউ নোটিস হোয়াট ইট কনটেন্ড?"

"লেট মি থিংক"

জয়ন্ত রাজা মাথায় হাত বোলাতে লাগল। এক-একটা সেকেন্ড যেন এক-একটা ঘণ্টা। দিলওয়ান অধীর আগ্রহে বসে। হয়ত একটা সূত্র মিলতে পারে। জয়ন্ত রাজা মাথা চুলকে যাচ্ছে। কিছুতেই মনে করতে পারছে না। জয়মতির মৃত্যুর পর অনেক কিছু মনে রাখতে পারে না। কী হবে মনে রেখে? জয়মতি যখন নেই, বাকি পৃথিবীতে হাওয়ার শূন্যতা। কিছুক্ষণ পরে হাল ছেড়ে বলল "স্যরি কান্ট"

দিলওয়ান সিং সূত্রের সামনে এসেও হারিয়ে ফেলল। অন্তত একটা সূত্র তো মিলেছে। একটি মেয়ে ট্যাক্সি করে এসেছিল। হ্যান্ডব্যাগে এয়ারলাইনের ট্যাগ, কেন?

"হোয়াই ডিড সি ক্যাচ ইওর অ্যাটেনশন?"

"সি ওয়াজ ওয়েরিং এ চেইন লকেট সিমিলার টু ওয়ান মাই ওয়াইফ জয়মতি ইউজ টু ওয়ার"

"হোয়াট কাইন্ড অফ চেইন লকেট?"

"গোল্ড ওয়ান উইথ অ্যান এম্বলেম অফ তিরুপতি। মাই ওয়াইফ বিলিভড ইন লর্ড ভেঙ্কাটেশ্বরা"

"হু ইজ সি?"

জয়ন্ত বিরক্ত "হাউ ডু আই নো? আমি অ্যাম নট পেইড টু বি দ্য সিকিউরিটি গার্ড অফ দ্য হসপিট্যাল। সি এন্টার্ড দ্য হসপিট্যাল, জাস্ট বিফোর দ্য এন্ড অফ ভিজিটিং আওয়ার্স। অ্যাট দ্য টাইম অল ওয়ার লিভিং। আই টু লেফট আফটার সি হ্যাড গন ইন"

এবার যেন একটা সূত্র পাচ্ছে। কোনও অজ্ঞাতপরিচয় যুবতী তাহলে এসেছিল। ঠিক ভিজিটিং আওয়ার শেষ হওয়ার আগে। দিনের নার্স বলছিল লিপিড প্রোফাইলের জন্য নীলকান্থকে আর্লি ডিনার দেওয়া হয়েছিল। এই মেয়েটি যদি ওই ইনসুলিন পুশ করে থাকে তো, ডিনার খাওয়ার ঠিক পরেই। কে এই মেয়েটি? কী করেই বা খুঁজে পাবে কে এই মধ্য-কুড়ির মহিলা? একমাত্র সূত্র ইন্ডিগো এয়ারলাইনস। জয়ন্ত রাজাকে বাড়িতে নামিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ পেছন থেকে জয়ন্তর কণ্ঠস্বর "ওয়েট। জাস্ট রিমেমবারড। ইট ওয়াজ এ রিসিট ফ্রম সাম ফার্মেসি ইন ব্যাঙ্গালুরু"

হঠাৎ প্রাণ খুঁজে পেল দিলওয়ান সিং। গাড়িটা ব্যাক করে বলল "আর ইউ সিওর?"

"পসিটিভ। ইট ওয়াজ অফ এ ডিসপেন্সারি ইন ব্যাঙ্গালুরু"

"ওকে। থ্যংকস্"

বাড়ি ফিরতে মাথায় বারবার ঘুরছে, কে এই ব্যাঙ্গালুরু থেকে আসা মেয়েটি? তার ইনভেস্টিগেশনের খলনায়িকা?

উনিশ

“আবার একটা খুন” শঙ্করদয়াল পল্টুর দোকানের কাঠের চেয়ার টেনে বসল “দেশটা যে কোথায় যাচ্ছে?”

তাপস টিপ্পনি কাটল “কবে খুন হয়নি? রামরাজত্ব, মহাভারত থেকে আমাদের ছোটোবেলা। সেই ট্র্যাডিশন আজও চলিয়া আসিতেছে”

লেটলতিফ তড়িৎ আজকে লেট করেনি। জমজমাট ডিসকাশনের রিপ্লে সর্টে শুনবে না।

“ইনসুলিন দিয়ে খুন। এ তো ভাবাই যায় না। রামায়ণ মহাভারত থেকে আজ পর্যন্ত। এরকম কখনও শুনেছ?”

মাথা নাড়ল কুঞ্জবিহারী “না ভায়া, আগে শুনিনি। আগে পিস্তল, ছুরি, বোমা দিয়ে খুন হত। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সজারুর কাঁটা দিয়ে খুন দেখিয়েছিলেন। হারকুল পায়রোঁ সাইকোলজিক্যাল ব্ল্যাকমেলিং। অ্যালফ্রেড হিচকক হাইট ফোবিয়া। এই প্রথম শুনলাম ডাক্তারি পদ্ধতিতে খুন। যুগ এগিয়ে চলেছে। প্রগতির পথে”

“প্রগতিটা কোনদিকে?”

তাপস টিপ্পনি কাটল “সায়েন্টিফিক প্রগ্রেস। শুধু চাঁদে যাওয়া নয়। সুপারসোনিক জেটে ওড়া নয়। খুনের মেকানিজমগুলো অনেক বেশি সায়েন্টিফিক হচ্ছে”

মধুসূদনের অস্বস্তি লাগছিল। গিন্নি বাপের বাড়ি। বাবা মারা গেছে। মায়ের বয়স পঁচাশি। যাওয়ার আগে বলে গেছে “তোমার তো শনি-রোব্বার তেমন কোনও কাজ থাকে না। রান্না করে ফ্রিজে রেখে গেলাম। গরম করে নিও। ভাতটা করে নিও”

শুধু ভাত নয়। চা থেকে বাড়ির সব কাজ তাকেই এখন করতে হবে। চারদিন আগে খবরটা টিভিতে দেখেছে। চেন্নাইয়ে চিফ সেক্রেটারির ছেলে লেডি ফ্লোরেন্স হাসপাতালে রুটিন চেক করাতে গিয়ে মারা যায়। সেই নিয়ে হাসপাতালে তুমুল হট্টগোল। হোম সেক্রেটারির বিবৃতিও টিভিতে শুনেছে ‘উই আর ক্যারিং দ্য নেসেসারি ইনভেস্টিগেশনস’ করবেই তো। চিফ সেক্রেটারির ছেলে বলে কথা। কোনও ত্রুটি থাকতে পারে না। দায়সারা ভাবেও হতে পারে না। ওরা সকলেই জানে।

পরের দিন গিন্নির চিনি ছাড়া চা খেতে গিয়ে খবরের কাগজেও রোমহর্ষক খবর পড়েছে। আজকের খবরের কাগজে পোস্ট-মর্টেম রিপোর্টটাও। তাই এই চাঞ্চল্যকর আলোচনা। অস্বস্তি ঠিক পুরোপুরি মৃত্যু নিয়ে নয়। গিন্নি থাকলে হাজারও গঞ্জনার মধ্যেও কিছুই করতে হয় না। এখন না থাকাতে গিন্নির অভাবটা স্পষ্ট। আড্ডা শেষে রাতের ভাতটা নিজে হাতেই করতে হবে। সেটাই সব থেকে বেশি বিরক্তিকর। সে নীরব শ্রোতা।

তাপস কথাটা ঘোরাচ্ছে দেখে তড়িৎ ডিসকাশনের টপিকে ফিরিয়ে আনল “ইনসুলিন দিয়ে খুন। নিশ্চয়ই একজন ডাক্তার ইনভলভড”

শুভঙ্কর মাথা নাড়ল “সেটা অবভিয়াস। কিন্তু কে? খবরে যা লিখেছে, ওর ট্রিটিং ফিজিশিয়ান ডাঃ স্বামীনাথন বলেছে ও কিছুই জানে না”

তড়িৎ চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল “কী বলবে? আমি জানি। আমি ইনসুলিন পুশ করেছি। আমিই খুনি। কী যে বল না? ডাঃ স্বামীনাথন জড়িত কি না জানি না। তবে ডেফিনেটলি হাসপাতালের কোনও ডাক্তার জড়িয়ে”

“কে হতে পারে?” শুভঙ্করের সিঙারায় কামড়।

এতক্ষণ শঙ্করদয়াল চুপ করেছিল। পকেটের নস্যির ডিবে থেকে এক চিমটে নাকে গুঁজে বলল “বলা মুস্কিল। তবে যেই করে খাকুক না কেন, সে পেশেন্টের চিকিৎসায় ডিরেক্টলি ইনভলভড নয়। তা হলে, সে জানে ধরা পড়বে। হয়ত হাসপাতালের অন্য কোনও ডাক্তার যার সঙ্গে পেশেন্টের সম্পর্ক নেই বা তখন ডিউটিতে ছিল না”

তড়িৎ বলল “সেটা হওয়া মোস্ট লাইকলি। এত বড় হাসপাতালে কত ডাক্তার-নার্স...”

তড়িৎকে থামিয়ে শুভঙ্কর বলল “ঠিক বলেছ তড়িৎ। ডাক্তারের বদলে নার্সও তো হতে পারে?”

শঙ্করদয়াল বলল “হতে পারে। কিন্তু বুদ্ধি কোনও ডাক্তারের”

কথাটা টেনে তড়িৎ বলল “ঠিক বলেছ। ডাক্তারি থেকে ছোটো এরিয়া। হাসপাতালের ডাক্তার বুঝলে কী করে?”

“নইলে ভিজিটিং আওয়ারসের বাইরে পেশেন্টের কেবিনে সিকিউরিটি ভেদ করে কী করে ঢুকবে?”

“এও তো হতে পারে ডাক্তার বাইরের। যাকে দিয়ে করিয়েছে সে হাসপাতালের নার্স?”

“তাও হতে পারে। যে খুন করাবে, সে নার্সের হাতে দায়িত্ব ছেড়ে বাইরে থাকবে না। যদি নার্স ঠিকমতো দিতে না পারে বা ঠিক ডোজে না দেয়। নার্সিং সিস্টেম এত এফিসিয়েন্ট ভাবাটা অন্যায়”

“হাসপাতালের কোনও জুনিয়র ডাক্তার। সেদিন হয়ত ডিউটি ছিল না”

“যে কেউ হতে পারে”

মধুসূদন এতক্ষণ চুপ ছিল। এবার বলল “খুনটা কে করেছে, কীভাবে করেছে, সেটা সেকেন্ডারি। যেই হোক না কেন, মোটিভ না জানলে ক্লোজ-ইন করা যাবে না। কোনও মোটিভই দেখতে পাচ্ছি না। সূত্র চিফ সেক্রেটারির ছেলে, হাসপাতাল নয়। হাসপাতাল শুধু মোটিভকে এক্সিকিউশন করার ক্ষেত্র মাত্র”

সত্যি তো। মধুসূদন ঠিক কথাই বলছে। এমন কিছু যা চিফ সেক্রেটারি মিঃ রঙ্গনাথন ছেলে সম্বন্ধে জানে না। চিফ সেক্রেটারি কত কাজে ব্যস্ত। শিক্ষিত রুচিবান চাকুরে ছেলের সব গতিবিধির ঠিকানা রাখা সম্ভব?

আশাও করে না দিলওয়ান সিং। নীলকান্থের কলেজ জীবন ছানবিন করেছিল আইআইটি থেকে আহমেদাবাদ। কোনও উপরি তথ্য পায়নি। ভালো ছেলে, পড়াশোনায় ভালো। আর পাঁচটা ছেলের মতো পড়াশোনা, খেলাধুলা, সিনেমা দেখা - এই নিয়ে কাটিয়েছে। সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে। আইআইএমে বৈচিত্রহীন অধ্যবসায়। তিরুপতি ইনকরপোরেশনের কর্মীরা জানাল, নীলকান্থ কর্মসচেতন, ভালো কর্মী। তবে কাজের বাইরে অফিসের লোকের সঙ্গে মিশত না। বাবা চিফ সেক্রেটারি বলেই দূরত্ব। যদিও অহং বা দুর্ব্যবহার ছিল না। এও জানতে পারল রাজাপ্পা বলে ছোটবেলার বন্ধুর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা। বি ভি রাজাপ্পা। ব্যাঙ্গালোর ভেঙ্কটেশ রাজাপ্পা। দক্ষিণী নামকরণ - ব্যাঙ্গালুরু থেকে আসা ভেঙ্কটেশের ছেলে রাজাপ্পা। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল রাজাপ্পা ‘দ্য হেরাল্ড অফ ইন্ডিয়া’ র সাদার্ন জোনের চিফ।

দিলওয়ান সিং রাজাপ্পার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দেখা করতে গেল।

“সরি টু বদার ইউ। সিন্স নীলকান্থ ওয়াজ ইওর ফ্রেন্ড, থট ইউ মাইট থ্রো সাম লাইট অন দ্য সাবজেক্ট” বন্ধুত্বের আবেগে নাড়া দিতে চাইছে।

“আই ওয়াজ সকড। হাউ কুড এনিওয়ান কিল সাচ এ নাইস সোল লাইক নীলকান্থ? উই হ্যাভ গ্রোন-আপ টুগেদার। আই ওয়াজ এক্সপেক্টিং ইউ এনিওয়ে। আদারওয়াইজ আই উড হ্যাভ গন টু ইউ। নীলকান্থ ওয়াজ ভেরি ক্লোজ অ্যান্ড ডিয়ার টু মি”

“দ্যাটজ দ্য রিজন আই কেম টু ইউ। আই হ্যাভ ডান দ্য প্রিলিমিনারি ইনভেস্টিগেশনস। সো উই নিড নট গেট ইনটু দোজ ডিটেলস। ডিড হি হ্যাভ এ গার্লফ্রেন্ড? ওয়াজ হি ইনভলভড উইথ সামবডি?”

“আই ডু নট নো হোয়েদার দ্যাট ওয়াজ এন ইনভলভমেন্ট। ইয়েস, হি ওয়াজ সিইং এ গার্ল নেমড সোফি ফ্রম মুম্বাই”

“হোয়াট ডস সি ডু?”

“নথিং মাচ। অকেশনল মডেলিং নাউ অ্যান্ড দেন। হি মেনশন্ড হার ফাদার ওয়াজ এ ডায়েমন্ড মার্চেন্ট”

“মাস্ট বি রিচ?”

“অবভিয়াসলি”

“হাউ ডিড হি নো হার?”

"হোয়েন ইন আহমেদাবাদ হি ওয়েন্ট অন এ এডুকেশনাল লেকচার টু মুম্বাই। হি মেট হার অ্যাট দ্য পার্টি। আই হ্যাভ এ ফিলিং সোফি প্রকিওরড দ্য মডেলিং অ্যাসাইনমেন্ট থ্রু হিম ইউটিলাইজিং দেয়ার রিলেশনসিপ। আফটার অল, নীলকান্থ ওয়াজ দ্য মার্কেটিং ডিরেক্টর”

“হাউ মাচ ইমোশনলি ওয়াজ হি ইনভলভড?”

“কোয়াইট এ বিট। নাথিং টু ডু উইথ হার ফাদার্স প্রপার্টি অর দ্য অ্যাফ্লুয়েন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড। আই ডু নট নো হোয়াই"। আই সাপোস লাভ অর লাইকিং ইজ বিয়ন্ড অল রিজন্স অ্যান্ড থটস”

“লাভ অর লাইকিং?”

“হনেস্টলি আই ডু নট নো দ্য ডিফারেন্স। আই সাপোস, উই ট্রাই টু ব্রিং ইট টু এ স্পিয়ার অফ নোন ডেফিনিশনস। লাভ, লাইকিং, লিভিং টুগেদার, ম্যারেজ আর অল সোশাল ফর্মস অফ দ্য সেম ইকোয়েশন। প্রব্যাবলি ম্যারেজ ইজ নট। দেন এগেন দিস আর আরবিটারি থিংস”

“হাউ ফার?”

রাজাপ্পা হাসল “ইফ এ ইয়ং ম্যান টেকস্ এ গার্ল টু বেড, ডস হি লেট দ্য ওয়ার্ল্ড নো? হাউ ডু আই নো? ফ্রম আউটসাইড ইট সিমড দে ওয়ার প্রিটি ক্লোজ”

“হোয়াটজ হার ব্যাকগ্রাউন্ড?”

“হ্যাভেন্ট এ ক্লু। বাট নীলকান্থ ডিড মেনশন দিস ওয়াজ দ্য ওনলি গার্ল হি হ্যাড এভার ফ্যানসিড ইন হিজ লাইফটাইম”

কে এই সোফি? মুম্বাইতে খোঁজ নিতে হবে। সোফির চরিত্রটা অস্পষ্ট, ধোঁয়াশা। তবে কী নীলকান্থের মৃত্যুর সঙ্গে সোফির কোনও যোগসূত্র আছে? পরে খুঁটিয়ে দেখা যাবে।

“মে আই আস্ক ইউ এ ভেরি পার্সন্যাল কোয়েশ্চেন?”

“বাই অল মিন্স। গো অ্যাহেড”

“ডিড হি এভার হ্যাভ এন অ্যাফেয়ার উইথ এনি আদার গার্ল?”

“নট টু মাই নলেজ। রিসেন্টলি হি ওয়াজ গেটিং লট অফ ফোন কলস ফ্রম এ গার্ল নেমড আন্দ্রেয়া”

“হু ইজ সি?”

“সাম মডেল ফ্রম ডেলহি। হি টোল্ড মি সি হ্যাড কাম টু ডু সাম মডেলিং অ্যাসাইনমেন্ট ফর দেয়ার কোম্পানি তিরুপতি ইনকরপোরেশন। জাস্ট এ পাবলিসিটি শুট। ইভেন আফটার দ্য শুট ওয়াজ ওভার সি কনটিনিউড কলিং হিম”

এই মেয়েটার সম্বন্ধেই রঙ্গনাথন বলছিল। কেন লাইন মারত চিফ সেক্রেটারির ছেলেকে? কোন ধান্দায়? নাকি, ব্যাঙ্গালুরু থেকে ফ্লাইটে আসা জয়ন্ত রাজার মেয়েটাই আন্দ্রেয়া?

“ডিড হি টেল হোয়াই?”

“নট কোয়াইট। বাট হি ডিড মেনশন সি ওয়াজ রিঙ্গিং হিম উইথ ইন এ টোন অফ লাভ। ইট ওয়াজ অ্যান এমব্যারাসমেন্ট ফর হিম অ্যাজ হি ওয়াজ মেন্টালি ইনভলভড উইথ সোফি”

“ডোন্ট কোয়াইট আন্ডারস্ট্যান্ড” দিলওয়ান দ্বিধাগ্রস্ত।

“হোয়াট আই গট ফ্রম হিম, সি র‍্যাং অ্যাট অড হাওয়ার্স কনফেসিং হার লাভ। বাট দ্য ইউসুয়াল ওয়ারমথ অফ লাভ ওয়াজ ল্যাকিং... আই ফরগট টু টেল। হি কনফেসড হি ওয়াজ আন্ডার প্রেশার টু ম্যারি

অ্যান অ্যাকট্রেস অফ চেন্নাই। ডিডন্ট সে। হি ডিড সে দ্যাট ওয়াজন্ট পসিবল আফটার ইনভলভমেন্ট উইথ সোফি। নাইদার দিস গার্ল আন্দ্রেয়া নর দ্য অ্যাকট্রেস"

"হু ওয়াজ প্রেসারাইজিং হিম?"

"হি সেড হি উড টক টু মি ইন ডিটেইল ওভার এ ড্রিংক অ্যাট উইকএন্ড। বাট হি ডায়েড বিফোর দ্যাট"

"স্ট্রেঞ্জ"

"স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন। বাট দ্যাট ইজ দ্য ফ্যাক্ট"

এতগুলো নাম ঘুরপাক খাচ্ছে। সোফি, আন্দ্রেয়া, অ্যাকট্রেস। কে-ই বা ওরা?

জয়ন্ত রাজার কথায় ব্যাঙ্গালুরু থেকে মেয়েটাকে লেডি ফ্লোরেন্সে ঢুকতে দেখেছে। সেই মেয়েটা কী এদের দুজনের মধ্যে কেউ? লাভ ট্রায়াঙ্গেল? এখন বুঝতে পারছে, এটা ব্যাঙ্গালুরুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ব্যাঙ্গালুরু, মুম্বাই থেকে দিল্লি। সূত্রগুলো ব্যাপ্ত চক্রজালে। এটা আর নিছক চেন্নাইয়ের ঘটনা নয়। আরও অনেক সূত্র লুকিয়ে। সেগুলো খতিয়ে দেখতে হবে।

এই তদন্তের সামাধান তাড়াহুড়ো করে করা যাবে না।

কুড়ি

রঙ্গনাথন সেক্রেটারিকে জিজ্ঞেস করল “হোয়াই ডাস সি ওয়ান্ট টু মিট মি?”

“স্যার সি ওয়ান্টস টু মিট ইউ অ্যান্ড সিএম রিগার্ডিং এ নিউ প্রজেক্ট”

“হোয়াটস দ্য নেম অফ হার কোম্পানি?”

“দ্য নিউ এজ”

“আই হ্যাভ হার্ড দ্য নেম। আই থিঙ্ক দে আর ইনটু আইটি। গিভ দেম অ্যান অ্যাপয়েন্টমেন্ট টুমরো অ্যাট টু। আই শুড বি ফ্রি বাই দেন। সিএম ইজ কোয়াইট ইন্টারেস্টেড ইন আইটি প্রজেক্টস”

পরের দিন রঙ্গানাথনের ঘরে ইন্দ্রাক্ষি। সাদা স্ল্যাকস, সাদা টপস। মুখে হাল্কা নো-মেকআপ পাউডারের প্রলেপ। পাতলা লিপস্টিকের ছোঁয়া। সানগ্লাসটা চুলের ওপরে। হাতে লেদার ব্যাগ। “প্লিজ অ্যাকসেপ্ট মাই হার্টফেল্ট কনডোলেনসেস অন ইওর রিসেন্ট বিরিভমেণ্ট”

রঙ্গনাথন উলটো দিকের চেয়ারে ইঙ্গিত করল “ওয়েল...” হাতটা হাওয়ায়। ছেলের মৃত্যু নিয়ে অচেনা অতিথির সঙ্গে কী বলার? মুহূর্তের স্তব্ধতা। বিনা বাক্যব্যায় ছেলের মৃত্যুশোকের নীরবতা।

বসতে ইঙ্গিত করে রঙ্গনাথন “ইয়েস মিস রায়চৌধুরী, হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ?”

ইন্দ্রাক্ষি কোনও ভণিতা না করেই বলল “ইউ প্রব্যাবলি আর অ্যাওয়ার উই আর এ ডেলহি বেইসড ফার্ম উইথ ব্রাঞ্চেস অলওভার ইন্ডিয়া। মেনলি ইনটু আইটি, মেডিক্যাল ট্রন্সক্রিপশন অ্যান্ড ইন্টারন্যশনাল আউটসোর্সিং। নাউ উই আর থিংকিং অফ এক্সপ্যান্ডিং ইনটু প্রাইমারি প্রজেক্টস”

“লাইক?” চোখ তুলে রঙ্গানথন।

“উই ওয়ান্ট টু স্টার্ট অ্যান ইনস্টিটিউশন দ্য নিউ এজ ইনস্টিটিউট অফ ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড হিউম্যান পোটেনশিয়াল”

“গুড আইডিয়া। হোয়াট আর ইউ এমিং অ্যাট? ক্যান ইউ এনলাইটেন মি অন দ্য সাবজেক্ট”

রুমালে মুখ মুছল “উই ফিল অ্যাস এ রেস উই আর নো ওয়ে ইনফিরিয়র টু এনি আদার রেসেস। ইফ দ্য ইয়ং জেনারেশন ক্যান বি ট্রেইন্ড ইনটু অল কোয়ালিটিস অফ দিস, সুপ্রিমেসি ইন অল পসিবল র্ফমস, উই কুড ইমার্জ অ্যাস এ রুলিং নেশন”

“আই ডিডন্ট কোয়াইট আন্ডারস্ট্যান্ড” এসি ঘরেও বিন্দু বিন্দু ঘাম।

নীলকান্ত মারা যাওয়ার পর থেকে ব্লাড প্রেসার হঠাৎই বেড়ে গেছে। এতদিনের কনট্রোলের ডায়েবেটিসটাও তিনশোর ঘরে, বেশ বুঝতে পারছে এই স্ট্রেস থেকে। কয়েকদিন বিশ্রাম, সুইচ অফ করে ঘুরে এলে ভালো হত। কিন্তু চিফ সেক্রেটারির পোজিশনটা এমন যে ঝট করে রেহাই নেই। ঘুরতে গেলেও মোবাইলে অফিসের তাড়া। ছুটি তো হবেই না। উলটে পাশের লোকটাকে ডেকে যে কাজ এক মিনিটে করিয়ে নেওয়া যায়, সুদূরে বসে দশটা ফোন কল করে সে কাজ করাতে হবে। তার থেকে এখানেই ভালো। ছেলের মৃত্যুর ইনভেস্টিগেশন মনিটার করতে পারবে। এমনিতেই একমাত্র ছেলে মারা যাওয়ায় ভেঙে পড়েছে, তার ওপর এই ছুটির নাম করে অ্যাডিশনল স্ট্রেস নেওয়া শরীরের পক্ষে আরও ক্ষতিকারক। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে দৈনন্দিন কাজের মধ্যেই ভুলিয়ে রেখেছে নিজেকে।

“ইট ইজ ভেরি টেকনিক্যাল। আই থিংক, ইফ আই অ্যাম স্পেসিফিক ইউ উড আন্ডারস্ট্যান্ড। থ্রু সাইনটিফিক ফিজিওলজি উই নো দ্যাট হিউম্যন মাইন্ড ক্যান বি কন্ডিশনড। ডিপেন্ডিং অন দ্য এনভায়রনমেন্ট দে আর নার্চারড। ইফ দ্যাট কন্ডিশনিং ক্যান বি প্রপারলি নার্চারড ইন এ সাইনটিফিক ওয়ে,

ইট ক্যান প্রডিউস এ ব্রিড অফ জেনারেশন, হু উইল থিংক অ্যাহেড অফ টাইম অ্যান্ড বি দ্য আরকিটেক্ট অফ টুমরো। আই মিন, কন্ডিশনিং দ্য কন্ডিশন্ড রিফ্লেক্স ইন এ গাইডেড ওয়ে”

রঙ্গনাথন আইএএসের সেরা ছাত্র। ধরতে বিশেষ অসুবিধা হল না। ওর মনে হল ইন্দ্রাক্ষি ভবিষ্যতের কথা বলছে। কোয়াইট প্রোগ্রেসিভ থটস। ইন স্পাইট অফ আওয়ার পোটেনশিয়াল, উই আর স্টিল ল্যাকিং প্রায়রিটি ইন দ্য ইন্টারন্যাশনাল এরিনা। ইভেন টুডে, আওয়ার বয়েজ অ্যান্ড গার্লস আর কিন অন গোয়িং টু ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড মেকিং ইট দেয়ার। দো দে দেমসেলভস হ্যাভ এ হিউজ পোটেনশিয়াল। মুহূর্তের জন্য, আদরের নীলকান্তের কথা মনে পড়ল। ছেলেকে দেখে মনে হয়েছে দ্যাট পোটেনশিয়াল হ্যাসন্ট বিন ফুললি এক্সপ্লয়েটেড। নিজের ছেলেকে ধরে রাখার জন্য ওদের দুজনকে এত কসরত করতে হত না। যে ভাবেই মৃত্যু হোক, সে আর ফিরবে না। আগামী প্রজন্মের মধ্যেও তো হাজারো নীলকান্ত লুকিয়ে থাকতে পারে। তাদের যদি গোলাপের পাপড়ির মতো লালন করা যায়, দেশের প্রগতির অনেক সুযোগ। পুত্রহারা বাবার বুকে হাজারও তরুণ-তরুণীর আগামীর স্বপ্ন। সত্যি যদি কিছু করা যায়, অসংখ্য গুণী ছেলেমেয়েদের জন্য...

ইন্দ্রাক্ষিকে দেখল। মহিলার চোখ ঠিকরে বেরোচ্ছে আগামীর বুকভরা স্বপ্ন।

“অফ অল প্লেসেস হোয়াই তামিলনাড়ু?”

ইন্দ্রাক্ষি চশমা লেদার ব্যাগে ঢুকিয়ে বলল “ইন ডেলহি দেয়ার ইজ নো স্পেস। ইভেন গুরগাঁও ইজ ওভারক্রাউডেড। আই হ্যাড এ ফিলিং, ইউ কুড প্রোভাইড দ্য রিকুইজিট ভ্যালু ফর মানি স্পেস ইন তামিলনাড়ু। আফটার অল উই আরেন্ট মাল্টি-মিলিয়নেয়ার্স। অ্যান এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন লাইক দিস ইজ টু বি বিল্ট উইথ এ স্পেসিফিক পারপাস। দ্য কমারশিয়াল আসপেক্ট ইন দ্য স্ট্রিক্টেস সেন্স উইল বি মিসিং। অ্যাট লিস্ট দ্য ইনভেস্টমেন্ট হ্যাস টু ব্রেক ইভেন। ইট উইল বি মোর অফ এ ড্রিম ফর সোশাল কস, দ্যান এ বিজনেস এস্ট্যাবলিসমেণ্ট”

রঙ্গনাথন মাথা নাড়ল “দো থিওরিটিক্যালি ইন প্রিন্সিপ্যাল আই অ্যাম উইথ ইউ, ইন রিয়েলিটি আই হ্যাভ টু ডিসকাস দিস উইথ সিএম অ্যান্ড হিস পলিটিক্যাল সেক্রেটারি। আই হ্যাভ এ ফিলিং হি উড লাভ টু গো অ্যাহেড। কুড ইউ প্রোভাইড মি এ প্রজেক্ট সামারি অ্যাট সাম স্টেজ?”

লেদার পার্স থেকে কাগজের প্যাকেট দিল “আই হ্যাভ অলরেডি ব্রট ইট উইথ মি ব্রিফ নিটি-গ্রিটিস অফ দ্য প্রজেক্ট। অন অ্যাপ্রুভ্যাল আই উইল প্রোভাইড দ্য ডিটেলস অফ দ্য প্রোজেক্ট প্রোপোসাল”

প্রফেশনাল মহিলা। না হলে এত সাকসেসফুল? রঙ্গনাথন প্রজেক্ট সামারি ড্রয়ারে রাখল। দেখা যাক সিএম কী বলে? প্লিজ লিভ ইওর কার্ড। আই উইল গেট ব্যাক টু ইউ আফটার এ ডিসকাশন উইথ দ্য সিএম। উইল ইউ বি ইন টাউন ইন দ্য কামিং ডেইস?”

“নো। আই অ্যাম টেকিং দিস ইভিনিংস্ ফ্লাইট টু ডেলহি। শুড সিএম অ্যাপ্রুভ অর ওয়ান্ট টু ডিসকাস জাস্ট গিভ মি এ টিংকল। আই ক্যান টেক দ্য নেক্সট ফ্লাইট ব্যাক অ্যাকরডিংলি”

ইন্দ্রাক্ষি উঠে দাঁড়াল। রঙ্গানাথনের সঙ্গে হ্যান্ডসেক করে বলল “থ্যাংকস ফর ইওর টাইম”

ইন্দ্রাক্ষি বেরিয়ে যেতে মনে পড়ে গেল অক্সফোর্ড দিনের কথা। পলিটিক্যাল সায়েন্সে পিএইচডি করছে। শিক্ষক-গাইড ডক্টর জেফারসন বলেছিলেন “ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সাকসিড ইন লাইফ, বি প্রফেসনাল উইথ এ ভিশন”

ইন্দ্রাক্ষিকে দেখে সেই কথাই মনে পড়ে যাচ্ছে। এ টোটালি প্রফেসনাল লেডি উইথ এ নিউ ভিশন। গ্রুমড ইনটু দ্য এটিকেটস অ্যান্ড প্রফেশনালিজম। অনেক স্বপ্ন দেখা লোক দেখেছে। সবাই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে পারে না। এই মহিলার মধ্যে দম আছে, যে করেই ছাড়বে, যদি সুযোগ পায়।

ট্যাক্স পেয়ারের টাকায় ইনস্টিটিউটের জমি। তাই অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে চিফ মিনিস্টারকে প্রোপোজাল দেওয়া যায় না। কোম্পানি সম্বন্ধেও আরও জানতে হবে। প্রজেক্টের ভায়াবিলিটি, কত রিসোর্সেস

আছে। এই পলিটিক্যাল ডিসিশন বিধানসভায় আলোড়ন তুলবে। টেকনিক্যাল টিম অফ এক্সপার্টস্ দিয়ে ভায়াবিলিটি স্টাডি করাতে হবে। চিফ মিনিস্টারের অত সময় নেই ডিটেলসে যাওয়ার। কম্প্রিহেনসিভলি সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে চিফ মিনিস্টারের পলিটিক্যাল সেক্রেটারি, ফাইন্যান্স সেক্রেটারিকে দেখিয়ে ফাইনাল স্টেজে সকলকে নিয়ে সিএম, ফাইন্যান্স মিনিস্টার, হায়ার এডুকেশন মিনিস্টার মিটিং করে ফাইনালি জাজমেন্ট আসবে। প্রজেক্টকে লাল সুতোর ঘেরাটোপ পাস করাতে গেলে অনেক তথ্য লাগে। শেষে সিএমকে বিধানসভায় প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। শেষ বিচারটাও তারই।

রঙ্গনাথন সেক্রেটারিকে বলল "গেট মি অল দ্য ডিটেলস অফ দিস কোম্পানি দ্য নিউ এজ"

স্বপ্ন অনেকদিনের!

নতুন প্রজন্মের ব্যুৎপত্তির জন্য অনেক পড়াশোনা - বই, ইন্টারনেট, আরও কত কী। শব্দগুলো বারবার বুকের মধ্যে তোলপাড় করে। ছোটবেলার স্বপ্নহারা জীবনটাকে নতুন রঙে সাজাতে চাইছে। নতুন ছন্দে। মানুষের মধ্যে নিজেকে উজাড় করে দিতে। নব্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গড়ে তোলা নতুন প্রজন্মের স্বপ্ন। অরক্ষিত জীবনের বলয়ে কোনওদিন স্বপ্ন দেখার সুযোগ পায়নি। চাকরির সময়ও নয়। যখন দ্য নিউ এজ প্রতিষ্ঠার পথে, মনে হয়েছিল কিছু একটা করা দরকার। অতীতকে মুছে আগামী প্রজন্মের জন্য। কালের স্রোতে সেও হারিয়ে যাবে। স্বপ্নের বাস্তব থেকে যাবে যুগ-যুগান্ত ধরে। কোনও পাগল যদি এভাবে স্বপ্ন না দেখে, পৃথিবীতে নতুন কিছু হবে না। সোশাল ইনটেলিজেন্ট কোসেন্ট, ইমোশনল কোসেন্ট, কমিউনিকেশন স্কিলস অ্যান্ড রিলেটেড পারফরম্যান্স। সেক্সচুয়াল পারফরম্যান্স কোসেন্টকেও অস্বীকার করা যায় না। আগামী প্রজন্ম যাতে ভালোবাসার আচ্ছাদনে প্রস্ফুটিত হতে পারে ন্যূনতম স্বাভাবিক পরিবেশে, যা সে কোনওদিনও পায়নি। এই স্বপ্ন নিয়েই একটা প্রতিষ্ঠান - আগামীর পথপ্রদর্শক। এসব গুরুগম্ভীর শব্দের জৈবিক রূপায়ণে গড়ে উঠবে আগামীর সুর, নতুন পৃথিবীর না-শোনা গান, না-দেখা সভ্যতার বুনিয়াদ। যা কোনও ঈশ্বর সৃষ্ট ভিত নয়। তার কাঠামো মানুষের মধ্যে, ঈশ্বরদত্ত। গান না শিখলে যেমন গাওয়া যায় না, লেখাপড়া না করলে বুদ্ধির বিকাশ হয় না, তেমনি এই জন্মগত ক্ষমতাকে ভালোবাসা দিয়ে ঠিকপথে চালিত না করতে পারলে, যথাযথ আগামী প্রজন্ম তৈরি হয় না, ইন্দ্রাক্ষি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে।

আশিস ঠাট্টা করে বলেছিল "তোমার এটা অদ্ভুত ক্ষমতা। হাওয়ার মধ্যেও স্বপ্ন দেখ"

"বাস্তবের মধ্যে স্বপ্ন নেই, একঘেয়েমি। গতিময় হাওয়ার মধ্যেই স্বপ্ন লুকিয়ে। না-দেখাকে নতুন করে দেখা, না-পাওয়াকে পাওয়া। তারই যুগলবন্দি যখন পদক্ষেপ রাখে, সেটাই বিকাশ। তাকে দেখতে হয় মনের জানলায়"

আশিসের মনে হয়েছিল, যতই পুঁথিগত বিদ্যা মুখস্ত করে সে স্বনামধন্য ডাক্তার হোক না কেন, চিন্তাশীলতার দিক দিয়ে ইন্দ্রাক্ষি তার থেকে অনেকটাই এগিয়ে। তাই তো ম্যান্ডেভিলা গার্ডেন্সের ছোট্ট ফ্ল্যাট থেকে দ্য নিউ এজের বিশাল সাম্রাজ্য। আশিস দাবার গুটি ঠিকভাবে খেলে প্র্যাকটিস গুছিয়ে নিতে পেরেছে। ইন্দ্রাক্ষি শুধু স্বপ্নই দেখেনি। বাস্তবে কার্যকর করতেও সক্ষম। যত ইন্দ্রাক্ষির কাছে এসেছে, তত বুঝতে পেরেছে, অসম্ভব জেদ নিয়ে এগিয়ে চলেছে। লক্ষ করেছে এই ক'বছরে জেদটা দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছে। ভালো না মন্দ? সময়ই বলবে। আশিস সব-সময়ই তার পাশে, সব কাজে, শুধু তার জন্য।

এয়ারপোর্টে যেতে আশিসকে ফোন করল "প্রজেক্ট দিয়ে এলাম। দেখি কী হয়?"

"দেখ এটাও হয়ে যাবে। তোমার কোনও কিছুই আটকায় না। কপাল নিয়ে এসেছ"

এই জন্যেই ওকে এত ভালো লাগে। যা করছে, না-বুঝলেও পাশে ভরসা। হাজার হোক মানুষ তো। মন চায় কাউকে আঁকড়ে রাখতে সর্বক্ষণ। ভেতরের মানুষটার জীবনে এত অসম্পূর্ণতা বলেই পরিপূর্ণতার স্বপ্ন দেখতে ভুলে গেছে। ছোটবেলার ধোঁয়াশা ভরা জীবনটা এখনও জ্বলছে তুষের আগুনের মতো। আশিস সেই তুষাগ্নির দাবানলে নিশ্চিন্ত নিস্তেজ প্রলেপ। ভেতরের মানুষ একটা নীড় খোঁজে। স্বপ্নের নীড় না হলেও

সান্ত্বনার আশ্রয়। তার জীবনে সম্পর্কহীন আশ্রয়। সারা জীবন ধরে নীড়টাই সে খুঁজেছে। ঘরেও পায়নি, বাইরে তো নয়ই।

"তুমি কী দিল্লি ফেরত যাচ্ছ?"

"হ্যাঁ। উইকেন্ডে আসছ তো? তখন সব কথা হবে" ফোন কেটে দিল ইন্দ্রাক্ষি।

এয়ারপোর্টের সিকিউরিটি কাউন্টার পার হয়ে প্লেন বোর্ড করার জন্য লাউঞ্জে বসে আছে। হঠাৎ আবার মোবাইল বেজে উঠল "ম্যাডাম সব কিছু প্ল্যান মতো চলছে। দিল্লি গিয়েই খবর পাবেন" মুচকি হেসে, ফোনটা কেটে দিল ইন্দ্রাক্ষি।

ইন্ডিগো বিমান তখন চেন্নাইয়ের মাটি থেকে ডিভোর্স নিয়ে শূন্যে। সন্ধে গড়াচ্ছে রাতে। অন্ধকার পৃথিবীটাকে জানলা দিয়ে দেখছিল ইন্দ্রাক্ষি। কোথায় ছোটোবেলার না-পাওয়া সাধারণ সংসার? কোথায় তার রসদপূর্ণ যৌবনের সার্বিক দৈহিক স্ফুরণ? তার যৌনাঙ্গে মিশে পৌরুষের শ্রেষ্ঠত্বর শেষ আস্ফালন। তবুও নিজেকে সংযত করে, গড়তে চেয়েছিল নতুন বুনিয়াদ। অতীত ভুলে 'বিউটি অ্যাট ইটস বেস্ট'-এ চাকরির সময় আত্মসমর্পণ করেছিল সৌভিকের কাছে। ঘর, সংসার, বহুদিনের না-পাওয়ার স্বপ্নের হাতছানি। গলদটা কোথায় আজও জানে না ইন্দ্রাক্ষি। সৌভিকও আর পাঁচটা বাঙালির মতো বক্তব্য সমৃদ্ধ সত্তা, যে ইন্দ্রাক্ষিকে অন্য পাঁচটা গৃহবধূর মতো ইচ্ছের লক্ষ্মণরেখায় বাঁধতে চেয়েছিল। রুদ্ধ করতে চেয়েছিল বহুমুখী ইন্দ্রাক্ষির মানসিক বৈচিত্র্যের ধারা, নিজের সীমিত চিন্তাধারায়। সামাজিক সংকীর্ণতার নিরাপদ বেষ্টনীতে। সম্পর্কটা টিকল না। ইন্দ্রাক্ষি চাইলেও, সৌভিক একদিন তাকে ছেড়ে চলে গেল নিজের পৌরুষের আস্ফালনে ব্যর্থ খোঁজে। ফেলে গেল তাকে, একাকী। সীমাহীন অনির্দিষ্ট বৃত্তের মধ্যাকর্ষণহীন শূন্য পরিমণ্ডলে। লিভিং টুগেদার সৌভিকের আশ্রয় থেকে বিতাড়িত। মাথা গোঁজার জায়গা নেই। প্রথম কয়েকদিন কোম্পানির গেস্ট হাউসে। তারপর ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে উঠে এল ম্যান্ডেভিলা গার্ডেন্সের ফ্ল্যাটে।

চিনি শেষ হওয়া থেকে তার জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু।

এয়ারহস্টেসের দেওয়া সুগন্ধি নাতিশীতোষ্ণ তোয়ালেটা মুছে দিল ফেলে আসা শূন্যতাকে। সেদিন থেকেই রেড রাইডিং হুডের মতো অশ্রুসিক্ত একাকিত্বকে মুছে দিতে পেরেছিল উলটো ফ্ল্যাটের ডাঃ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। আশিস সৌভিকের থেকে কত আলাদা। বলতে ভালোবাসে না, শুনতে চায়। এই নিঃশব্দ শ্রোতার মধ্যে ইন্দ্রাক্ষি খুঁজে পেয়েছিল শান্তি ও পূর্ণতার নীরব আচ্ছাদন। অজান্তে তার আত্মার সারকে অলক্ষ্যে গ্রাস করেছে ওই মানুষটা। অবচেতনে তার নারীত্বের, আত্মার, সমস্ত সত্ত্বার সুরকে চেনা হারমনিতে বেঁধে দিয়েছে। কলরবের মধ্যে এক না-পাওয়া ছন্দের তরঙ্গে।

আশিস যখন দ্বিতীয়বার মেখলাকে বিয়ে করছে, ইন্দ্রাক্ষির মন বলেছিল - এ বিয়ে তো হওয়ার নয়। তবে কেন করছে? ইজিপশিয়ান মিথলজিতে পড়া 'কসমিক পার্টনারশিপ'-এর অঙ্কটা আদি অনন্তকালের, সময়হীন সময়ের গণ্ডিতে বাঁধা পড়ে গেছে। তার থেকে পালাবে কোথায়? তারই প্রমাণ মেখলার চলে যাওয়া থেকে আজ পর্যন্ত ইন্দ্রাক্ষির সঙ্গে আশিসের কসমিক বিটস। প্রতিটা মুহূর্তে মানুষটাকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে আছে।

ঘোর কাটল এয়ারহস্টেসের গলায় "প্লিজ ফাস্টেন ইওর সিট বেল্টস। উই উইল বি সর্টলি ল্যান্ডিং অ্যাট দ্য ডেলহি এয়ারপোর্ট। দ্য গ্রাউন্ড টেম্পারেচর ইজ..."

একুশ

দিনের মতো প্যাক আপ। সারাদিনের ব্যস্ততায় একটুও অবসর মেলেনি। আউটডোরে বিরামহীন কাজ। নো ব্রেক্স। সিড্যুল বাড়লে মিটার হুড়হুড় করে চড়ে। তাই ডিরেক্টর যতটা সম্ভব খাটিয়ে নিতে চায়। মেক-আপের সময়ও ফুরসত নেই। অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর স্ক্রিপ্ট নিয়ে নেক্সট সিকোয়েন্সের ডায়লগ কাটা রেকর্ডের মতো উগলে যাচ্ছে। অন্য কিছু ভাবার সময় নেই পৌরভির।

কয়েক কোটি টাকার প্রজেক্ট। হিট না করলে রাস্তায়। সারাদিন ধরে ড্রেস চেঞ্জ করে, নতুন মেক-আপ লাগিয়ে, কখনও হিরোকে জড়িয়ে রোমান্টিক ডায়লগ আওড়াচ্ছে, কখনও মন্দিরের ফাঁকে ইতিহাসের পাতায় হারিয়ে যাচ্ছে। পরমুহূর্তেই বিকিনিতে সমুদ্রের জল থেকে উঠে আসছে রূপ-লাবণ্যময় দেহ-সম্ভারে। ব্রা আর প্যান্টির মাঝেও ওয়াটার প্রুফ মেক আপ। দেহের সব কিছুই আবরণে জড়ান। সে ডিজাইনার জামা বা স্বল্প বসনা অনাবৃত দেহে মেক-আপের প্রলেপ। এই আর্টিফিশিয়াল ভারচুয়াল রিয়ালিটির বাইরে মন পালাতে চায়, নৈসর্গিক মহাবালিপুরমের সৈকতে। সামুদ্রিক লাবণ্যকে নিজের করে পেতে।

অত সহজ? পৌরভির মুখ কে না চেনে এই দক্ষিণে? জনপ্রিয় নায়িকাদের মধ্যে অন্যতম। সে কি শ্যামলা মুখের মিষ্টিমধুর হাসিতে? না কি কাজলকালো চোখের চাহনিতে? না কি প্লাস্টিক সার্জারি করা দেহের মনমোহিনী আকর্ষণে? দর্শকরা না জানলেও, সে জানে। অভিনয় দক্ষতায় দর্শককে মুহূর্তে কাঁদাতে পারে। সেটাই তাকে দক্ষিণী নায়িকাদের সাম্রাজ্ঞী করে রেখেছে। রেট প্রচুর। খাটনিও ততোধিক। প্রডিউসাররা ডেট পাওয়ার আশায় লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তার বিশাল বাঙ্গালুরুর প্রাসাদের ড্রয়িং রুমে। যদি সেক্রেটারি একটু...। পৌরভি মানেই হিট। ওরা জানে মোটা টাকা নিলেও তা উঠে আসবে।

এবার টানা এক উইকের শুটিং মহাবালিপুরমে। বে অফ বেঙ্গলের করমণ্ডল কোস্টে পল্লভা রাজত্বে সপ্তম থেকে দশম শতক, পল্লভাদের দ্বিতীয় রাজধানী, সুপ্রতিষ্ঠিত সি-পোর্ট। নামটা ইতিহাসের পাতা থেকেই। এক সময় এক দোর্দণ্ডপ্রতাপ দুষ্ট রাজা মহাবালি এর অধিপতি ছিলেন। বিষ্ণুর সঙ্গে যুদ্ধে মৃত্যু। সেই থেকে নাম মহাবালিপুরম। মামাল্লাপুরমের নৃপতি, দারুণ কুস্তিবিদ নরসিংহ বর্মন জায়গার নাম পরিবর্তন করেন। গুপ্ত ডিন্যাস্টির পতনে, তৃতীয় শতাব্দী থেকে পল্লভা ডিন্যাস্টি এর অধিকার অর্জন করে। পল্লভা রাজত্বে, বিশেষ করে মধ্য-অষ্টম থেকে মধ্য-নবম শতাব্দিতে মহাবালিপুরমের বিকাশ। কবি, সাহিত্যিক, ভাস্কর, শিল্পী, বিদগ্ধ পণ্ডিতদের মধ্যে নতুন রেনসাঁর শুরু। তাই স্থাপত্যের কারুকার্য, সমুদ্রতটের মাধুর্য, সৃষ্টিশীল লোকেদের এখানে টেনে আনে। সে প্রকৃতি পিপাসু টুরিস্টই হোক কিংবা কম বাজেটের ফিল্ম ডিরেকটর। যাদের বাজেটে সুইজারল্যান্ড ধরাছোঁয়ার বাইরে। এহেন ইউনিটকে নিয়ে তো জনবহুল মহাবালিপুরম শহরে শুটিং করা যায় না। তাই মহাবলিপুরম থেকে বাইশ কিলোমিটার দূরে এই কোয়ালিটি ইন বিলাসবহুল এমজিএম বিচ রিসর্ট।

ইউনিটের বেশিরভাগ নিজের ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছে। কেউবা সারাদিনের ক্লান্তির পর ইউনিটের ভাড়া গাড়ি নিয়ে শহর ঘুরছে। কাল সকাল থেকে আবার হাড়ভাঙা খাটুনি।

সব থেকে বিলাসবহুল স্যুটের বেল টিপতেই বেয়ারা "মেমসাহাব?"

"স্ক্রুড্রাইভার ককটেল"

কী বুঝল কে জানে? সেলাম ঠুকে বেরিয়ে গেল। বিবস্ত্র পৌরভি ঘাগরা চোলি ফেলে, প্যান্টি-ব্রা ছুড়ে বাথরুমে। বাথটবের ফেনার সাবানে মুছতে মেকি দুনিয়াকে। সারাদিন তার পেশা। এখন নিজের নেশায় সন্ধে। নাতিশীতোষ্ণ বাথটবের জলে নিজেকে ডুবিয়ে রিল্যাক্সেশনের স্বাদ। শুটিং শেষে তার নিত্যনৈমিত্তিক অভ্যাস। গা মুছে ঝাপসা হওয়া বাথরুমের আয়নায় দেহটাকে দেখল। স্তনের উচ্চতার পরিমাপ। পশ্চাতের

গাঢ়ত্ব, কোমরের মেদ। স্যালাড আর পিলে দেহকে আটুট রাখা। সামান্য মেদ জমেছে। আরেকবার লাইপোসাকশন কারাতে হবে। ক্যামেরায় ধরা না পড়লেও, ক্লোজ-আপে প্রকট। বিশেষ করে, বিকিনিতে বা রাজস্থানি ড্রেসে। এই টুকরো মেদগুলো দর্শকদের যৌন পিপাসার পরিপন্থী। তার সাম্রাজ্ঞীর আসনকে যে কোনও মুহূর্তে ধসিয়ে দিতে পারে, তা পৌরভির থেকে ভালো কেউ জানে না।

ভাবছিল মধুস্করার পরিচিত ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আবার ফিরে যাবে কি না। বেলটা বাজতেই, বাথরোব জড়িয়ে ঘরে। সোফার সেন্টার টেবলের দিকে ইঙ্গিত "কিপ ইট দেয়ার"

"এনি ফুড ম্যাডাম?"

"নো"

হিরোইনদের খাওয়া সবসময় সংযমের মধ্যে রাখতে হয়। বেয়ারাকে কটাক্ষ "হোয়াই ওয়ান গ্লাস? ব্রিং এ বিগ জার অ্যান্ড লিভ ইট হিয়ার। অ্যান্ড আনাদার গ্লাস প্লিজ"

"ইয়েস ম্যাম" বেয়ারা বেরিয়ে গেল।

হিরোইন হওয়ার অনেক সুবিধে। প্রডিউসার দেখভালের কার্পণ্য করে না। আতিথেয়তায়ও লাগাম নেই। যা চাও, তাই পাবে। একটাই কামনা - ছবিকে হিট করাও। অর্থের বন্যা।

মাত্র এক চুমুক দিয়েছে, ফোন বেজে উঠল "আর ইউ ফ্রি, অ্যালোন?"

"ইয়েস। কাম অ্যালং"

হেয়ার ড্রেসার মধুস্করা। ছোটবেলার বন্ধুও। দুজনের সাকসেস সমসাময়িক। মধুস্করা খুব কম-ই আউটডোর শুটিঙে যায়। চেন্নাইয়ের মাউন্ট রোডের বিউটি পার্লার নিয়ে ব্যস্ত। পৌরভির ব্যাপারে স্বতন্ত্র।

মধুস্করা স্ক্রুড্রাইভারে চুমুক দিল "ইট হ্যাস বিন এ হেকটিক ডে টুডে"

"টু" সায় দিল পৌরভি "ওয়াজ দ্য বিকিনি সট ওকে? ইউ স্য ইট ইন দ্য মনিটর?"

"পার্ফেক্ট। ইউ লুকড গরজিয়াস"

"ডোন্ট ফ্ল্যাটার মি। ইটজ অল ইওর গুড ওয়ার্ক"

"ইফ ইউ ডিডন্ট হ্যাভ এ লাভলি বডি, হাউ কুড আই ব্রিং আউট দ্য বেস্ট ইন ইউ?"

"দ্য বেস্ট ইজ ইন এভরিওয়ান। ইট জাস্ট হ্যপেনস আই অ্যাম দ্য হিরোইন"

"মি টু? ইওর পুওর হেয়ার-ড্রেসার?"

"পুওর? ইউ মাস্ট বি জোকিং। হু নোস হু ইজ পুওর? হু নোস হু ইজ দ্য বেস্ট?"

পৌরভি সোফা ছেড়ে উঠে দরজাটায় ছিটকিনি লগিয়ে বলল "হ্যাভেন্ট উই এঞ্জয়েড ইচ আদার্স পভার্টি অ্যান্ড দ্য বেস্ট টুগেদার? স্ট্রিপ অফ। ইউ হ্যাভ গিভেন মি মাই বেস্ট ইন দ্য সটস। নাউ আই উইল সো ইউ ইওর বেস্ট"

মধুস্করা বুঝল পৌরভি কী চাইছে। এ তো প্রথম নয়। প্রথম জীবনে বন্ধুত্বের ঘনিষ্ঠতা থাকলেও, দেহের ঘনিষ্ঠতার ছোঁয়া তখনও পায়নি। পৌরভি তখন হিরোইন নয়, শুধুই বান্ধবী। আর পাঁচটা বান্ধবীর মতো। যতই খ্যাতির শিখর চূড়ায় উঠেছে, বান্ধবীর সংখ্যা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়েছে। মধুস্করা রেগুলার হেয়ার ড্রেসার নয়। শুধু পৌরভি ছাড়া কয়েকজন বাদে কাজ করে না। সময় কোথায়? মাউন্ট রোডে নিজের বিউটি পারলার চালাতে হয়।

পৌরভি হিরোদের সঙ্গে প্রফেশনাল দূরত্ব বজায় রাখে। বিশেষ করে আউটডোরে। গসিপে জড়াতে চায় না। হিরোরা গুণে অনেকটাই নিকৃষ্ট, সম্পর্কে জড়িয়ে সাম্রজ্ঞীর পোজিশন নষ্ট করতে চায় না।

তবুও মানুষ তো।

খ্যাতির স্বর্ণশিখরে সব মানুষই একা। সারাদিনের ক্লান্তির ফাঁকে এমনি কোনও নিরালা বনাঞ্চল খুঁজে পেয়েছিল পাড়ার বন্ধু মধুস্করার মধ্যে। অন্য রূপে। তন্বী, যৌবনা। মুখশ্রী অপরূপা না হলেও দেহে যৌবনের আহ্বান। শরীর পুরুষের বুকে হিল্লোল তুলতে পারে।

ডোর লক করে ফিরে দেখল, মধুস্করার ঢিলেঢালা পায়জামা-কুর্তা মাটিতে। অন্তর্বাসহীন ঘন অরণ্যের দিকে চেয়ে সুপ্ত কামনা পেখম মেলছে।

মনে পড়ে গেল চেন্নাইয়ের ঝুপড়ির দিনগুলো। অভাবের তাড়নায় কার্ড-রাইস জোটে না। বাবা মারা গেছেন। মায়ের রোজগার করার ক্ষমতা নেই। ছোটভাইটার স্কুলের ফিস দেওয়াও স্বপ্নের অতীত। পাড়ার রকবাজ মুনিয়া এসে বলেছিল "কামানে মাঙ্গতি?"

"কৈসে?"

"ফিল্ম করকে"

কী ফিল্ম? কী করতে হবে? কিছুই জিজ্ঞেস করার অবকাশ হয়নি। টাকা চাই। খাওয়ার জোগাড় চাই। দেহ, বস্ত্র, আচ্ছাদনের ন্যূনতম সংস্থান। সংসার বাঁচাতে হবে।

মুনিয়া নিয়ে গেছিল ভিলেজ রোডের এক সাধারণ বাড়িতে। পৌরভি জানত শুটিং স্টুডিওতে হয়। বাড়িতে আবার কীসের শুটিং?

শঙ্কর পিল্লাই পৌরভিকে বলেছিল "টেক অফ ইওর ক্লোদস। মেক লাভ টু দিস গার্ল" চমকে উঠেছিল। এ যে ব্লু-ফিল্ম। ইতস্তত করতে দেখে শঙ্কর বলেছিল "উই উইল নট শো ইওর প্রাইভেট পার্টস। ইট ইজ সফটকোর"

তবুও দ্বিধা। বাঁচার জন্য এও করতে হবে? টাকা না হলে বাঁচা সমস্যা।

শঙ্কর পিল্লাইয়ের প্রলোভন "টেন থাউজেন্ড। টেক ইট অর লিভ ইট"

মন বলছে না। সামনে দশ হাজারের কড়কড়ে বান্ডেল। শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে গেছিল। উলঙ্গ হয়ে তো স্নান করে। কেউ টাকা দেয় না তার জন্য। ভিডিওতে এক-আধবার হলে ক্ষতি কী?

টেন থাউজেন্ড। সেই শুরু। জীবনের একমাত্র নগ্ন দৃশ্যের রুপালি চিত্রায়ন। যার একমাত্র কপি পৌরভির সিন্দুকে। অনেক টাকার বিনিময়ে কিনেছে বিগত ইতিহাসের নগ্ন সত্য মুম্বাইয়ের চতুর্বেদী বলে এক শো-বিজ ডনের কাছ থেকে। বিক্রি করতে চায়নি চতুর্বেদী। শেষে পৌরভির কন্ট্যাক্টসের চাপে নতি স্বীকার। সে নিয়ে ওর এখনও রাগ। সরিয়ে দিয়েছে সাম্রাজ্ঞী হওয়ার শেষ কাঁটা।

দশ হাজার টাকা নিয়ে ফিরেছিল বটে। সঙ্গে বুকভরা স্বপ্ন। ঝুপড়িতে শুয়ে আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রের নয়, বাস্তব আঙিনার। যদি ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালেই দশ হাজার, হিরোইন হলে না জানি কত? তাকে বাস্তবে পেয়েছে তিলতিল করে এতদিন ধরে। পরিণতি আজ মহাবালিপুরমের ডিলাক্স সুটের উন্মুক্ত টেরেস। তবু স্বপ্ন অন্তহীন।

জড়িয়ে ধরে চুমু খেল মধুস্করাকে। তন্বী দেহকে গ্রাস করল লাখো ফ্যানের মাদকতা। মধুস্করার মধ্যে এমন জাদু, যা সুপ্ত কামনাকে বাইরে আনতে পারে। কাঁপিয়ে দিতে পারে দেহের অণু-পরমাণু। ছন্দের আবেগে নারীর পুরুষহীনতার অভাব ভরিয়ে দিতে পারে। স্ক্রু ড্রাইভার মাথায় চড়েছে। চাই, শুধু চাই, দৈহিক মুক্তি। এখানে। এই মুহূর্তে... দেহ মিশে গেল দেহে। আবেগ মিশে গেল আবেগে। উচ্চাঙ্গ দীর্ঘশ্বাস নিম্নাঙ্গ জলপ্রপাতে। কাজের সিড্যুলের ফাঁকে সুপ্ত কামনা বহুদিন পরে সজাগ। মুক্তি দুজনের তৃষ্ণার। বাকি স্ক্রু ড্রাইভারের জার ভাগাভাগি করে শেষ করতে উদ্যত।

"হোয়াট সট হ্যাভ ইউ টুমরো?"

"আই অলমোস্ট ফরগট। ডান্সিং সিকোয়েন্স উইথ অফ এ সং। ফরগট টু লিসেন টু দ্য সং। থ্যাঙ্কস ফর রিমাইন্ডিং"

নগ্ন পৌরভিকে মধুস্করা বাধা দিল "পুট অন ইওর পাজামাস। উই উইল গো টু দ্য বিচ ফর এ স্ট্রল"

"অ্যাট দিস আওয়ার?"

"হোয়াই নট? লাভলি ওয়েদার আউটসাইড"

অন্তর্বাসের প্রয়োজন নেই। ঢিলেঢালা পাজামা ফতুয়া পরে পৌরভি বলল “লেট মি টেক দ্য মোবাইল” মোবাইলটা বার করতে গিয়ে হাতে ঠেকল এমপিথ্রি প্লেয়ার “হিয়ার ইজ দ্য রেকর্ডেড সং হুইচ গোস উইথ দ্য ডান্স সিকোয়েন্স টুমরো”

মধুস্করাও ততক্ষণে জামাকাপড় পরে ফেলেছে। আয়নায় চুল আঁচড়াতে দেখে পৌরভি এমপিথ্রি প্লেয়ারটা পাজামার পকেটে গুঁজে বলল “হেয়ার ড্রেসার্স ক্যান নেভার ইভেন লিভ দেয়ার হেয়ার অ্যালোন। লেট অ্যালোন প্রফেশনালি। কাম, লেটস গো টু সি দ্য মুন”

কোয়ালিটি ইন এমজিএম রিসর্টের প্রাইভেট বিচটা রাতে সত্যিই মনোরম। স্ক্রু ড্রাইভারের নেশার মাদকতায় ঘরে বসে গান শোনার মানেই হয় না। মধুস্করা ঠিকই বলেছে। বাইরেটা অনেক আকর্ষণীয়। দু-পাশে নারকেল গাছের নীচে সবুজের সমারোহ। দিনের বেলায় ফুলের গালিচার ফাঁকে অনেক প্রজাপতি উড়তে দেখেছিল। এখন সন্ধের অন্ধকারে ফিরে গেছে আশ্রয়ে। মৃদু চাঁদের আলোর স্নিগ্ধতায় সমুদ্রের ঘুমপাড়ানি গান। কিনারে হাল্কা ঢেউ আছড়ে পড়ায় চাঁদের আলোয় জোনাকির ঝিলিক। সাগরের দখিনা বাতাসের স্পর্শ। নেশাগ্রস্ত, পরিতৃপ্ত, দুজন। মন খুলে প্রকৃতিকে উপভোগ করার সময়। ঝুপড়ির স্মৃতি মুছে প্রকৃতির কোলে ভাসিয়ে দেওয়া। অনেক হারনোর মধ্যেই মুহূর্তটুকু নিজের করে পাওয়া।

পৌরভি মধুস্করাকে বলল “লাভলি। ইজন্ট ইট?”

চাঁদের আলোর দিকে তাকিয়ে মধুস্করা “লাভলি। বিউটি ইজ এভরিহোয়ার। ওনলি নিডস দ্য রাইট মুড টু হিয়ার ইটস মেলডি”

মুড মানে গান। মুড মানে ছন্দ। প্রকৃতিকে উপভোগ করতে কিছুটা বিচ্ছিন্ন ওরা দুজনে। দূর থেকে পৌরভি শুনতে পেল মধুস্করার মোবাইলের আওয়াজ। কারও সঙ্গে কথা বলছে। হঠাৎ মনে পড়ল এমপিথ্রি প্লেয়ারের গানটা এখনও শোনা হয়নি। কালকে সট ভোর ছটায়। একবার শুনে রাখলে ভালো। সুরের সঙ্গে মুড আর পোজগুলো ঠিক করে নিতে পারলে বেস্টটা দিতে পারবে। স্ক্রুড্রাইভারের নেশা শিথিল হচ্ছে। পৌরভি প্রফেশনাল। কাজের ব্যাপারে একশো ভাগ। কালকের সটের সিকোয়েন্সগুলো আন্দাজ করতে অসুবিধা হবে না। যতক্ষণ না ঘুম চিন্তাকে ঢেকে ফেলে। ফতুয়া থেকে প্লেয়ার বার করে ইয়ারফোনটা কানে লাগাল।

সুইচ অন করতেই... সব অন্ধকার!

মোবাইল অফ করে পকেটে রাখতে গিয়ে মধুস্করার কানে এল প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। দেখল পৌরভির দেহ জ্বলছে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চারদিকে ছিটকে পড়ছে। ছিন্নভিন্ন দেহের অংশগুলো। লুটিয়ে পড়েছে জ্যোৎস্নাভেজা বালুকাবেলায়। ছুটে গেল ওর দিকে। কাছে যাওয়ার আগেই বুঝতে পারল সব শেষ। বালুচরে পৌরভির দেহ ভস্মীভূত। রক্তমাংসের টুকরো। কোনও অংশ ইন্ট্যাক্ট নেই।

সমুদ্রের মৃদু জলরাশির শব্দ, চাঁদের স্নিগ্ধতার মৃদু আলোক স্বশব্দে ঘোষণা করছে নৈসর্গিকের সঙ্গে জৈবিকের তফাত। প্রকৃতির কোলে ডোবা পৌরভিকে নিজের কোলে টেনে নিয়েছে।

হল কী করে? মধুস্করার স্বপ্নেরও বাইরে...

বাইশ

শীত শেষের আবছা আলোয় হাউস খাস এনক্লেভের দোতলার বারান্দার রকিং চেয়ারে, পড়ন্ত বিকেলে লাইম কর্ডিয়াল মেশান ভডকা খাচ্ছিল ইন্দ্রাক্ষি। রাস্তার ওপারে মাঠের দিকে চেয়ে মনে শীতের রেশটুকু মাদকতা ছড়িয়েছে। পাশ থেকে ভেসে আসছে গৌড়ীয় মঠের সান্ধ্যবন্দনা ‘ভজ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে’। ভডকায় আরেক চুমুক।

ভাগ্যিস বাড়িটা জলের দামে পেয়েছিল। একটা বইয়ের ফার্ম, শরিকি কলহে তাড়াতাড়ি বিক্রি করতে চাইছিল। দিল্লির পশ পাড়া। অনেক প্রোমটারের চোখ ছিল এই দোতলা বাড়িটার ওপর। দিল্লি মিউনিসিপালটির নিয়ম অনুসারে হেরিটেজ সাইট চোরমিনারের কাছে কোনও ফ্ল্যাট কমপ্লেক্স করা যাবে না। পঞ্চশীলে ফ্ল্যাট কেনা ঠিক। বাড়ির বদলে সাউথ দিল্লিতে ফ্ল্যাট? উত্তরটা মূর্খও দিতে পারে।

সারাজীবন এই ঘরটাকেই খুঁজেছে বারবার। হারিয়েছে, লড়েছে, জিতেছে, আবার হেরেছে, আবার জিতেছে। এই হার-জিতের সওনায় অনুভব করেছে, সংসারের বন্ধন তার ভাগ্যে নেই। সৌভিকের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদের পর ঘর বাঁধবার স্বপ্ন কেউ দেখায়নি। দু-বার বিবাহ বিচ্ছেদের পর আশিসও বিবাহবন্ধনে জড়াতে চায়নি ‘আমার বিয়ে টেকে না। কপাল নিয়ে এসেছি। তোমাকে বিয়ে করলেও হারাব। তোমাকে হারাতে চাই না।’ ভালোবাসার পাত্রীকে দূরে ঠেলা দেওয়া। আশিস ছাড়া কারও কথা ভাবতে পারে না ইন্দ্রাক্ষি। তাই শুধু মনের বন্ধনে জড়িয়ে এতটা বছর। বিয়ে করলে সংসার হত, ছেলেপুলে হত। সে সামলে দ্য নিউ এজের বিশাল সাম্রাজ্য তৈরি হত না। দুঃখের সঙ্গী পেতে পারে, ঘর নয়। দ্য নিউ এজ-ই তার ঘর। তার স্বপ্নই জীবন। বেঁচে থাকার রসদ।

মরেই যেতে চেয়েছিল যৌবনে পা দিতে। রাগে, দুঃখে, বেদনায় মন ডুকরে কেঁদেছিল আশ্রয়ের খোঁজে। ভয় ছিল, সে আশ্রয় পাবে কি না। প্রতিটা ইন্দ্রিয় অনুভূতিহীন অস্তিত্বে, নিরাশায়।

মনে পড়ল বাবার বন্ধু সুব্রতকাকুর কথা। প্রায়শই বাড়ি আসত বাবার সঙ্গে আড্ডা মারতে। মা তো রাতের পাখি। ওদের আড্ডার ফাঁকে ডেকে নিত তাকে।

“বোস। না কি, পড়তে বসবি?”

অষ্টাদশী ইন্দ্রাক্ষি রাত নটার পরে পড়বে কী? বসে পড়ত আড্ডায়। গল্প শুনতেও ভালো লাগত। সিনেমা থেকে পলিটিক্স। ওদের আড্ডায় থেকে সেই বয়সেই অনেক কিছু জেনে ফেলেছিল। শিক্ষা কী শুধু বইয়ের পাতায়? সুব্রতকাকুর কথায় কত জীবন তত্ত্ব। কম কী?

সেদিন বেশ জোরেই বৃষ্টি পড়ছিল। কলকাতায় যেন প্লাবন। সন্ধ্যা থেকেই আকাশ কালো। সুব্রতকাকু বাড়িতে ঢোকার পরেই শুরু অশ্রুসিক্ত আকাশের অবারিত প্লাবন। ইন্দ্রাক্ষি ঘরে খাটে শুয়ে পড়ছিল। পাশের ঘরে সুব্রতকাকুর গলা “রুদ্রনীল দিনটা মাল খাওয়ার পক্ষে আইডিয়াল। বাড়িতে কিছু আছে?”

“দেখছি” বাবার চটির আওয়াজ। ড্রয়িং রুম থেকে ডাইনিং রুমে মাল খুঁজতে। আলমারি থেকে বোতল বের করার শব্দ। আবার চটির আওয়াজ।

“বাকার্ডি। চলবে?”

“যা দিবি। সফট্ ড্রিংকস্?”

“দেখছি” চটির শব্দ। ফ্রিজ খোলার আওয়াজ। বাবার গলা “ট্যাঙ্গো চলবে?”

“দৌড়বে” গ্লাসে ঢালার শব্দ। ট্যাঙ্গো মেশানোর আওয়াজ। “চিয়ার্স” গ্লাসের ঠোকাঠুকিতে বুঝতে অসুবিধা হয়নি সান্ধ্য আসর জমতে বসেছে। এ ছাড়া বাবার তো আর আসর নেই। সবসময় একা ঘরে বই পড়ছে,

নয়ত ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্যাল বা ঘুম। ইন্দ্রাক্ষির ব্যাপারে হুঁশ নেই।

ইন্দ্রাক্ষির জীবনটা ছোটোবেলা থেকেই একা। ট্যালেন্টেড নিশাচর মায়ের সময় ছিল না ওর কথা ভাবার। মা নিজের পৃথিবীতে বয়ফ্রেন্ডদের নিয়ে শিল্পসৃষ্টির নিত্যনতুন বিন্যাসে।

ওরা থাকুক ওদের আসরে। ইন্দ্রাক্ষি পড়ায় মন দিল। সামনে উচ্চ মাধ্যমিক। ভালো রেজাল্ট করতে হবে। নইলে বাইরেও শূন্যতা। শূন্যতায় ভাসতে চায় না। পৃথিবীর বুকে দৃঢ় পদক্ষেপে হাঁটতে চায় নিজস্ব অস্তিত্ব সম্বল করে। ছোটবেলার কথা খুব একটা মনে নেই। মা-ই হাঁটতে, পড়তে, নিজেকে ভালোবাসতে শেখায়। মায়ের অদম্য জেদ। মায়ের কাছেই শুনেছে এমএতে শুধু প্রথমই হয়নি, দাদুর দোমনা সত্ত্বেও পিএইচডি করেছে। ভালো ছবিও আঁকত মা রত্নাবলি রায়চৌধুরী। সাত বছর বয়েসে মায়ের হাত ধরে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে ছবির প্রদর্শনীতে গেছে। কত পুরুষকে বাহাবা দিতে দেখেছে 'ম্যাডাম আপনি দারুণ আঁকেন'

কেউ ঠাট্টা করত 'রূপ আর গুণের যুগলবন্দি'

মা সুন্দরী কি না জানে না। স্বাস্থ্যবতী তো বটেই। তারই উত্তরাধিকার ইন্দ্রাক্ষির গড়ন। চুম্বকের মতো পুরুষকে আকর্ষণ করার ক্ষমতাটাও জেনেটিক। মায়ের আকর্ষণে মৌমাছির মতো চারপাশে ঘুরঘুর করবে, আশ্চর্য কী? নিশীযাপনে সক্ষম হবে, এ আর এমন কী? অবাক হয়েছিল বাড়ন্ত ইন্দ্রাক্ষি, মায়ের উচ্ছল জীবন বাবার ওপর প্রভাব ফেলেনি। বাবা সব সময়ই একা, নিজের দুনিয়ায়। বন্ধুদের দেখে ভাবত, তার জীবন ওদের থেকে কত আলাদা। এই জীবন তার কল্পনার বাইরে।

মনে আছে একজন বলেছিল "অ্যাট্র্যাকশনটা গুণ থেকে রূপে"

ব্যাপারটা বোঝেনি। চিত্রকলা থেকে কর্মক্ষেত্র, কোথাও বাবা-মাকে একসঙ্গে দেখেনি। মা সবসময় অন্য পৃথিবীতে। সেখানেও সে ছিল না। ছিল একাকী নিভৃতে। রাতের পর রাত বিনিদ্র কাটিয়েছে মায়ের প্রতীক্ষায়, কখন মা আসবে? কখন বুকে টেনে শোনাবে ঘুমপাড়ানি গান। কেউ ঘুম পাড়ায়নি। কাঁদতে কাঁদতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, নিজেও বোঝেনি। রাত কখন গড়িয়ে বৈচিত্রহীন সকাল। উঠে দেখেছে, মা তখনও বাড়ি ফেরেনি। শূন্যতায় বেঁচেছে। না-পাওয়া মাতৃত্বের স্নেহ আছে, তবু নেই। পেয়েও না-পাওয়া। সব থেকেও জীবন ফাঁকা। ছোট বয়সে সব বোঝার ক্ষমতা ছিল না। মন কাঁদত চাওয়ায়। হারিয়ে যেত একাকী।

আর পড়তে ইচ্ছে করছে না। বই বন্ধ করে খোলা জানলার পাশে। বৃষ্টির ছাঁট গায়ে। ভালোই লাগছে ভিজতে। মা আজও অন্য রাতের মতো ফিরবে না। প্রথমে বুঝতে পারত না। মা কোথায় রাত কাটায়? বাবাকে ছাড়া কেন? এগারো বছর বয়সে মাসিক শুরু। শুধু বসন্তের হদিস দেয়েনি, মায়ের রঙিলা ছোঁয়াও দিয়েছিল। ঘরের বাইরেই মায়ের রঙিন বসন্ত। আস্তে আস্তে সব পরিষ্কার। ঘরের বাইরেও অনেক না-জানা না-বলা ঘর আছে। সেখানেই মায়ের নিত্য বিচরণ। কেনই বা সে ওর চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে জড়াবে? শিক্ষিত পূর্ণযৌবনা সুদর্শনা চিত্রশিল্পীর জন্যে কলকাতার অনন্ত অবকাশ।

"মেমসাহেব কিছু খাবেন?" কাজের মেয়ে ইরার কথায় ফিরে তাকাল।

"গরম পেঁয়াজি করতে পারবি? সিগারেটের প্যাকেট লাইটারটা দিয়ে যা"

ভডকায় চুমুক। সিগারেটে অগ্নিসংযোগ। নিভে যাওয়া সূর্যের রশ্মিতে খোলা মাঠের দিকে তাকাল। গৌড়ীয় মঠের স্তোত্র থেমে গেছে। খঞ্জনির আওয়াজও কানে আসছে না। চোখে নেশা। মিঠে আমেজে এক তীব্র ব্যাথার আলোড়ন। বেহাগের না-চেনা সুর। শীতের আমেজ মিশেছে অন্তরের দুঃখ স্রোতের প্লাবনে।

সেদিনও জানলার ধারে বৃষ্টির ছাঁটে এমনই আমেজ। খাবার খেয়ে ঘুমোতে যাবে ভাবছিল। লক্ষ করেনি পেছনের কায়া, ছায়ার মতো এগিয়ে আসছে। হঠাৎ দুটো হাত জাপটে ধরল বাড়ন্ত স্তন। গালে ঘষে দিল মুখ। বোঝার আগেই সুব্রতকাকু আঁকড়ে ধরেছে। সমস্ত শক্তি দিয়ে ঠেলে ফেলে দিতে চাইল প্রৌঢ়ের দেহটা। সুব্রতকাকুর শক্তি বুঝিয়ে দিল সে নাবালিকা।

"বা... বা..." আঁতকে চিৎকার। কোথায় বাবা?

আবার ডাকল “বা... বা...” কোনো উত্তর এল না ওঘর থেকে।

বাবা হারিয়ে গেছে বাইরের ঝরা প্লাবনের আঁধারে। ঘরে থেকেও নেই। ছোটবেলা থেকে উত্তাপহীন বাবাকে কাছে পাওয়ার আশা বৃথাই। কোনও সাড়া নেই। বাকার্ডির নেশায় স্নেহহীন মানুষটা পাশের ঘরের বিছানায়।

সুব্রতকাকু ওকে খাটে ফেলল। জোর করে তুলে দিল নাইটি। ব্রায়ের হুক শিথিল। হাত প্যান্টির ফাঁকে। শুনেছে বহুবার। দেখেনি। দেখতে হবে ভাবেনি। না-দেখা, না-চেনা, না-পাওয়া যৌবনে করাঘাত প্রৌঢ়ের। বিলীয়মান যৌনতার অন্তিম আস্ফালন। অগ্নিদগ্ধ করছে অসহায় অস্ফুরিত আগ্নেয়গিরি।

শেষবারের মতো ডাকল “বাবা...”

নিষ্পেষণে রক্তে ভিজে গেছে প্যান্টি। ব্যাথায় কাতর। পারছে না সহ্য করতে। যে করেই হোক মুক্তি। মুক্তি চাই এই অবাঞ্ছিত আক্রমণ থেকে। মা নেই। বাবা আসবে না।

কাতর মিনতিতে অনুনয় “প্লিজ সুব্রতকাকু... প্লিজ...”

অনেক কসরতে বিদ্ধ করতে সক্ষম যৌবনের প্রথম আচ্ছাদন। এখন থামা? ভাবতেও মানা।

“আজ তোর কোনও কথাই রাখতে পারলাম না। কাল যা বলবি, রাখব”

পরে, অনেকদিন পরে, ব্যাপারটা স্বচ্ছ হয়েছিল। কেন জ্ঞানত বাবাকে দেখেনি মায়ের ঘরে? কেনই বা, মা আসক্ত টেকিলার রসে? কেনই বা মাকে দেখেছে ডেনড্রাইট শুঁকে মুহূর্তে পালটাতে রূপ? এ তো দশভুজা দুর্গার ভিন্ন রূপ। অনেকদিন পরে, মায়ের অনুপস্থিতিতে ড্রয়ারে অদ্ভুত ওষুধ পেয়েছিল। মিথাইল ফেনিডেট। এটা কী কাজে লাগে?

ছুটেছিল ডাঃ অশোক রায়ের কাছে “নন সিনড্রোমাল মুড সুইংস”

“এটা কী সাইকিয়াট্রিক ডিসঅর্ডার?”

“না। ক্রিয়েটিভ লোকেদের নর্মাল ফেনমেনন। এদের একটা অদ্ভুত ক্যারেক্টারিস্টিক্স। ফ্রাস্ট্রেশন টলারেন্স ভীষণ কম”

ইরা পেঁয়াজি নামিয়ে বলল “আরও ভাজব?”

“ভাজ”

কামড় দিয়ে মনে পড়ল বাবা রুদ্রনীল রায়চৌধুরীর কথা। পেশায় ব্যবসায়ী। নামেই রত্নাবলির স্বামী। কখনও দেখেনি বহুলোকের ভিড়ে। পায়নি তাকে পিতৃত্বের নরম স্পর্শে। সেদিনও ছিল না, কোনওদিনও নয়। সেদিনের পর আর কখনও দেখেনি সুব্রতকাকুকে বাড়ির চৌহদ্দিতে।

সুব্রতকাকু এসেছে। সুব্রতকাকু গেছে।

দেবাশিসকাকু এসেছে। দেবাশিসকাকু গেছে।

অসীমকাকু এসেছে। অসীমকাকু গেছে।

বাবার বন্ধুর সংজ্ঞা খুঁজতে সংজ্ঞাহীন। বন্ধনের অভাব। নির্লিপ্ত বাবা শুধু একটা নাম। ধূসর তার অবয়ব। ধূসর পিতৃত্ব। নামেই শুধু কায়া রুদ্রনীল রায়চৌধুরী। মানুষটাকে খুঁজেছে বারবার। হাজার চেষ্টা করেও পায়নি একবার। মায়ের যদি হাজার ছেলেবন্ধু থাকতে পারে, সুপুরুষ বাবার কেন নেই? প্রশ্নটা বারবার উঁকি দিলেও কোনও সদুত্তর পায়নি। কেনই-বা মা রাত কাটায় অন্যখানে? কেনই-বা বাবা অন্ধ বিভোরে? বই আর সঙ্গীতে একাকী?

বোঝার বয়স হয়েছে। জানতে তো হবেই। আবার ডাঃ অশোক রায় “কেন এরকম?”

ডাঃ অশোক রায়ের পাল্টা প্রশ্ন “বাবাকে কখনও মায়ের সঙ্গে থাকতে দেখেছ?”

“না”

“বাবার কোনও গার্লফ্রেন্ড? মায়ের সঙ্গে অন্য পুরুষকে দেখেছ?”

"দেখিনি। মনে হয় অনেক"

"কী করে বুঝলে?"

"মা রাতে বাড়িই ফেরে না। নিশ্চয়ই পুরুষের সঙ্গে কাটায়..." বলতে লজ্জাই করছিল। হাজার হোক, মা তো। তবুও ডাক্তারের কাছে লুকনো যাবে না।

"বাবাকে কখনও আবেগাপ্লুত দেখেছ?"

"বাবার কোনও কিছুতেই আসে যায় না - না প্রশংসায়, না বিদ্রুপে। পড়ে আছে নিজের দুনিয়ায়"

ডাঃ অশোক রায় টাইয়ের নট ঠিক করে বলেছিল "তুমি ওনার মেয়ে। এসব তোমায় বলা ঠিক?"

"আই অ্যাম অ্যান অ্যাডাল্ট। আমায় বলতে পারেন"

কয়েক সেকেন্ড। কিছু ভাবছিল ডাঃ রায় "ওয়েল ইফ ইউ ওয়ান্ট টু নো দ্য ট্রুথ হিয়ার ইট ইজ। ইওর ফাদার প্রব্যাবলি হ্যাস সিজয়েড পারসোনালিটি ডিসঅর্ডার"

"সেটা কী?"

"ক্যান আই বি ফ্র্যাঙ্ক উইথ ইউ?"

"অফ কোর্স ইউ ক্যান"

"ডিড ইওর ফাদার এভার হ্যাভ এ গার্লফ্রেন্ড অর এ রিচ সোশাল লাইফ?"

"নট টু মাই নলেজ"

"হ্যাভ ইউ এভার সিন ইওর মাদার উইথ আনাদার পার্সেন? ইউ নো হোয়াট আই মিন"

"ইয়েস... অ্যান্ড... বাট..."

"প্লিজ ডোন্ট হেসিটেট। হোয়াটেভার ইউ সে উইল বি দ্য বেডরক অফ বোথ মাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড ইন্টারভেনশন অফ ইওর প্রবলেমস"

"আই উইল ট্রাই টু বি অফ হেল্প অ্যাস মাচ অ্যাস আই ক্যান"

"ইয়েস। ইটজ ক্রুশিয়াল" ডাঃ রায় টেবলের ওপর পেনটা ঠুকে বলেছিলেন।

"আই হ্যাড ওয়ান্স ওভারহার্ড মাই মাদার ওভার দ্য ফোন ডেসক্রাইবিং মাই ফাদার টু সামোয়ান অ্যাস সেক্সচুয়ালি সেলফিস। আই ইভস ড্রপড"

"কান পেতে কী শুনলেন?"

"মাই মাদার সেড সি ইজ সেক্সচুটালি হ্যাপিয়ার আউটসাইড ম্যারেজ দ্যান ফরনিকেটিং ইন অবলিভিয়ান উইথ ল্যফুলি ওয়েডেড হাসব্যান্ড। মা খুব কুৎসিত ভাষা ইউজ করেছিল। আই ওয়াজ সারপ্রাইজড"

"আপনি নির্দ্বিধায় বলতে পারেন। এই চিকিৎসায় কাজে লাগবে"

"মা বলেছিল, কিছু মনে করবেন না, রুদ্রনীলের নিম্নাঙ্গের স্পর্শের চেয়েও আমার কড়ে আঙুল ক্লাইটরিসকে বেশি সুখ দেয়"

"এবার ব্যাপারটা ক্লিয়ার"

"প্রব্যাবলি আপনার বাবার প্রিম্যাচিওর ইজ্যকুলেশন হত। যার জন্যে বাবা-মায়ের সেক্সচুয়াল ইন্টারকোর্সে বাবার অরগ্যাজম অনেক আগে হয়ে যেত। আপনার মা ক্ষুধিত পাষাণের মতো অতৃপ্ত"

"মা তো অভুক্ত থাকতেন না। পাষাণ তো নয়-ই। মাঝরাতে মায়ের দরজা খোলার শব্দে যখন আমি চমকে ছুটে যেতাম, তখন মায়ের চোখে দেখতাম সব-পেয়েছির পরিতৃপ্তি!"

গা ঘিন ঘিন করছে। এও শুনতে হয়? বাবার ইজ্যাকুলেশনের ইতিহাস। কটা মেয়েকে দেখতে হয়েছে মায়ের স্বেচ্ছাচারিতা? কটা মেয়েকে শুনতে হয়েছে, বাবার ব্যর্থতা? তবুও তো এই স্বেচ্ছাচারিতা, এই ব্যর্থতার মধ্যে কোথাও প্রেম ছিল। না হলে, ইন্দ্রাক্ষি কী করে হল?

প্রেমহীন রুগ্ন সংসারের কারাগার ভেদ করে আজ যে সে দ্য নিউ এজের স্বপ্ন রচনা করতে পেরেছে, এটাই সার্থকতা। এখন পেছন ফিরে তাকানো নয়, এগিয়ে যাওয়া। যা ছোটবেলায় পায়নি, তাই যেন খেলে

তার নতুন স্বপ্নে, আগামীর মধ্যে।

"ইরা আজ কিছু খাব না। আরেকটু ট্যাঙ্গো দিবি?"

ইরা ট্যাঙ্গোর আরেকটা বোতল নামিয়ে রাখতেই ফোন "কেমন আছ?"

"হঠাৎ?"

"মন কেমন করছিল। মনে হল তুমি ঠিক নেই। তাই ফোন করলাম" আশিসের গলা।

কী করে আশিস বোঝে ইন্দ্রাক্ষির মনের ব্যথা? নিছক টেলিপ্যাথি? না, জন্ম-জন্মান্তরের অজানা মিলন ঘটিয়েছে দুই অতৃপ্ত আত্মায়।

তেইশ

কাভিয়া অনেকদিন ধরেই একটা স্কুপ খুঁজছিল। জার্নালিজমে মাস্টার্সের পর আরও অনেক রিপোর্টারের মতো 'দ্য হেরাল্ড অফ ইন্ডিয়া'-তে যোগ দিলেও নবাগতাদের মতো ফরমায়েসি লেখায় সীমাবদ্ধ। ইচ্ছে থাকলেও প্রকাশের সুযোগ খুঁজে পায়নি। যখন পৌরভির মৃত্যুর খবর পেপারে, চ্যানেলে ফলাও করে দেখানো হচ্ছে, রাজা আন্নামালাইপুরমের স্টুডিও ফ্ল্যাটে বসে ভাবছিল, দু-দিনের মাদকতা তো চারদিনের মধ্যেই হারিয়ে যাবে।

বাড়ি কুন্নুর। চাকরির জন্য চেন্নাইতে। ভাড়ার স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্টে একলা টিভি দেখে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছিল। দ্য হেরাল্ড অফ ইন্ডিয়ার সাব-এডিটর রামাসোয়ামি তাকে আর পাঁচটা রিপোর্টারের মতো টম, ডিক অ্যান্ড হ্যারির দলে ফেলে দিয়েছে। তাকেও একদিন বরখা ডাট, করণ থাপার, অর্ণব গোস্বামী হতে হবে। কিন্তু চেন্নাই ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হওয়া কাভিয়াঞ্জলি রঙ্গবাসমকে সে সুযোগ কে দেবে?

রামাসোয়ামি তাকে গুরুত্বই দেয় না। গতানুগতিক লেখার ফরমায়েস দিয়ে বলে "বাই টুডে ইভিনিং গেট ইট রেডি। দেয়ার ইজ অ্যান এম্পটি স্লট। দে ওয়ার সাপোসড টু গিভ অ্যান অ্যাড। বাট মিডিয়ানেট ইনফরমস মি দে হ্যাভ ব্যাকড আউট। সো উই হ্যাভ টু ফিল দ্য স্পেস"

অ্যাডের বদলে লেখা! মনে হয় জার্নালিজমে কেন? সব কিছুই কী পণ্য? হয়ে গেল। কী লিখতে হবে সেটাও বলে দেওয়া। মাছি মারা কেরানির মতো শব্দ গুনে অর্থহীন কিছু লিখে দেওয়া। সেখানে ভাবনার অবকাশ নেই, চিন্তাধারার বিকাশ নেই। এর নাম চাকরি। সাব-এডিটর যা ভাববে, তাই করতে হবে। তার চিন্তাধারা অর্থহীন প্রলাপ হলেও বাধ্য মেয়ের মতো বেদবাক্য মেনে, বিলাপ-বন্যা বইয়ে চাকরি বজায় রাখা। নইলে কভিয়ার বদলে অন্য কেউ সেই জায়গায়। অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে একটা খবরের কাগজ থেকে অন্যের দোরগোড়ায়।

পরের দিন রামাসোয়ামির ঘরে ঢুকে আমতা করে বলল "স্যার, আই হ্যাভ এ রিকোয়েস্ট"

রামাসোয়ামি কম্পিউটারে ডিটিপি গ্রাফিক্স দেখছিল। কালকের এডিশনের কভার। কাভিয়ার দিকে ফিরে বলল "হোয়াট?"

"আই ওয়ান্ট টু মেক এ স্টোরি অন দ্য ডেথ অফ পৌরভি"

আকাশ থেকে পড়ল রামাসোয়ামি। যেখানে পুলিস, মিডিয়া হিমসিম, হাজারও লোকের ইন্টারভিউ নিয়ে কারণ বার করার চেষ্টা করছে, সেখানে বাচ্চা মেয়েটা পৌরভির মতো সুপারস্টারকে নিয়ে স্টোরি লিখবে। বলে কী?!

"আর ইউ আউট অফ ইওর মাইন্ড?"

ক্ষুব্ধ হলেও সারল্যে ভরা অনুনয় "প্লিজ স্যার"

কাভিয়ার দিকে তাকিয়ে মায়া হল। নীল জিনস, বেগুনি টপস, বব চুল, টমবয় কাভিয়ার চোখে করুণ মিনতি "প্লিজ স্যার... গিভ মি দ্য চান্স"

"হাউ আর ইউ সো সিওর?"

"মাই হার্ট সেস"

নিঃশব্দ কয়েক মুহূর্ত। রামাসোয়ামি অঙ্ক করছিল। মিডিয়ানেটের দৌলতে অ্যাডের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ। মেয়েটা যখন চাইছে, টাকা ঢাললে এডিটর কিছু মনে করবে না। অভানি হলে, বোনাস হিসেবে রাতের উত্তেজনা সওদা করতে পারত। জার্নালিজম জানে কি না অবান্তর। উপচে পড়া শ্যামলা স্তনযুগল রাতের

উত্তেজনাকে সন্তুষ্ট করার পক্ষে যথেষ্ট। সাধারণ বৈচিত্রহীন মেয়েটাকে দেখলে মনে হয়, উত্তেজনা বাড়াবার বদলে, নিভে যাবে।

"সো, হোয়ার ডু ইউ ওয়ান্ট টু স্টার্ট?"

"সিন্স দ্য ডেথ হ্যাপেন্ড ইন মহাবালিপুরম আই হ্যাভ টু স্টার্ট ফ্রম দেয়ার"

"ইফ ইউ ফেইল?"

"ইউ ক্যান কিক মি আউট অফ দ্য জব"

কাভিয়া ভাবতেও পারেনি এত বড় বাজি হঠাৎ খেলে ফেলবে। দ্য হেরাল্ড অফ ইন্ডিয়ার মতো নামি কাগজে চাকরি পাওয়া চারটিখানি নয়। চেন্নাই থেকে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের জার্নালিজমের ছেলে-মেয়েরা এরকম কাগজে চাকরির জন্যে পাগল। নেহাত ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছিল, তাই চাকরিটা পেয়ে গেছে। সেই চাকরিকে না-ভেবে হঠাৎ দাঁওতে। এখন ফেরার উপায় নেই।

"ওয়েল দেন গো অ্যাহেড"

ভাউচার সই করে কাভিয়াকে দিল "কলেক্ট দ্য মানি ফ্রম দ্য অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট। আই ওয়ান্ট এ সেনসশনাল স্টোরি। হুইচ ক্যান ব্রিং অ্যাস্টাউন্ডিং রেভিনিউ"

"থ্যাংক ইউ স্যার। আই উইল ট্রাই মাই লেভেল বেস্ট। দ্যাটস এ প্রমিস"

যদিও রামাসোয়ামিকে মহাবালিপুরমের কথা বলেছে, কাভিয়ার মনে হল আসল কারণটা ফিল্ম ইউনিটে। কী ভাবে শুরু করবে?

সেনসশনাল খবর বাজারে খেলেও, ইউনিটের সবার মুখে কুলুপ। খুন, পুলিস বলে কথা। কী বলতে কী বলে বিপাকে না পড়ে। যাকেই ফোন করে, একটাই বুলি 'আই ডোন্ট নো'। কথা না বাড়িয়ে কেটে দেয়। প্রডিউসার বোধহয় গোটা ইউনিটকে সেই ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে। কিপ মাম্ব। মিডিয়ার উৎপাতে, পুলিসের জেরায় সবাই মৌন। অনেক ভেবে ঠিক করল পৌরভির প্রাক্তন ইতিহাস ঘাঁটাই শ্রেয়। পৌরভিকে না জানলে, খুনের কিনারা করবে কী করে? বিভিন্ন ম্যাগাজিন, পেপার কাটিং ও অন্যান্য ইন্টারভিউ চাই।

পৌরভি নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের। বাবা মারা যাওয়ার পর সংসার প্রায় অচল। কয়েকটা খুচরো কাজ করেছিল, যদিও কোথায় জানতে পারল না। মা আর ছোটভাই। একদিন সংসারের তাগিদে চেন্নাইয়ের আঠেরো বছরে বিউটি কন্টেস্টে অ্যাপ্লাই। শ্যামলা হলেও দেখতে মন্দ নয়। নিম্নবিত্ত ঘরের পিতৃহারা মেয়ে কেন বিউটি কন্টেস্টে, কোনও কারণ খুঁজে পেল না। আত্মপ্রকাশেই হিরের মুকুট। যেখানে দু-বেলা খাবার জোটে না, সেখানে হিরের মুকুট না-দেখা স্বপ্নের বাস্তব পরিণতি। তাই নিয়ে শো-বিজে পদার্পণ। কয়েকটা অ্যাড। হঠাৎ হাসির ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ - 'ভায়ামরু ভিল্লেপো'। বিশেষ চলেনি। কিন্তু অভিনয় প্রশংসা পেয়েছিল। তার পর সাকসেসের ভাটা। হাতে কাজ নেই। স্বপ্ন তখন বাস্তবের মাটিতে। এখানেই টাকা। মডেলিং, সিনেমা করে যে টাকা পেয়েছিল, তার কিছুটা নিয়ে পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউটে অ্যাক্টিং শিখতে। সসম্মানে প্রথম স্থান অধিকার করায় ক্যাম্প্যাস থেকে তুলে আনলেন অবনিরতনাম, নতুন ছবির নায়িকার ভূমিকায়। 'থড়ুবনাম' ছবিটা জাতীয় পুরস্কারই শুধু পায়নি, পৌরভি সেরা অভিনেত্রীর শিরোপা পাওয়ার পর, আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। হিট থেকে সুপারহিট। স্টার থেকে সুপারস্টার। হঠাৎ ছোটবেলার অন্ধকার আকাশে তারার রোশনাই।

সেই পৌরভি আর নেই। বিস্ফোরণে হারিয়ে গেছে অবয়ব। হারিয়ে গেছে চাওয়া-পাওয়া, উত্থান-পতনের ইতিহাস। কেন এমন হল?

মাউন্ট রোডে ওরায়ন বিউটি সেলুন। ভালো লোক্যালিটি, রমরমা ব্যবসা, প্রচুর ক্লায়েন্টেল। চিত্রতারকা, বড়লোক গৃহিণী, মডেল থেকে মধ্যবিত্ত বাসিন্দা - কেউ বাদ নেই। অনেকদিন চুল ঠিক করা হয়নি। শীততাপনিয়ন্ত্রিত পারলারে ঢুকে কাভিয়া ভাবল চুল ঠিক করা ছাড়াও মালকিনের সঙ্গে আলাপ জমাতে হবে।

মালকিন আর কেউ নয়, পৌরভির হেয়ার ড্রেসার মধুস্করা। শুনেছে মহাবালিপুরমের অঘটনের পর সিনেমায় হেয়ার ড্রেসিং থেকে সরে এসেছে। ওটা তার আসল পেশা নয়। পৌরভি আর সেই মার্গের কয়েকজন হিরোইনের সঙ্গে ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের জন্যই ছবিতে কাজ। তবে পৌরভির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাটা বেশি। শুনেছে, যখন পৌরভি হিরের মুকুট পরে তারকা হওয়ার চেষ্টায় নিমগ্ন, তখন পাড়ার হেয়ার ড্রেসিং সেলুনে মহিলা নাপিতের কাজ করত। সেই সূত্রেই দুজনের আলাপ। সেখান থেকে হৃদ্যতা। দু-জনেরই সমসাময়িক উত্থান। তাইতো পৌরভি কাছের। যেমন পৌরভির নামডাক বেড়েছে, সেজেগুজে বড় হয়েছে মাউন্ট রোডের এই শীততাপনিয়ন্ত্রিত ওরায়ন বিউটি পার্লার।

কাভিয়ার বব চুল ট্রিম করছিল সুন্দরী। এক মহিলাকে আসতে দেখে একটু থেমে কাজে মন দিল। স্মিত হেসে মহিলা কাভিয়াকে পেশাদারি কেতায় বললেন "ইজ এভরিথিং ফাইন?"

কাভিয়া ঘাড় ঘোরাল "হোয়াট কাইন্ড অফ কাট উইল লুক রাইট অন মাই ফেস?"

কাভিয়ার দিকে তাকাল। কয়েক মুহূর্ত "এ বিট সর্ট, আপটু দ্য নেক। নট রোল্ড ইনওয়ার্ডস্"

"এভরিবডি কমপ্লেন্স আই অ্যাম নট গুড লুকিং"

মহিলার মায়া হল "লুকস আর নট ইন র্বন। ইউ হ্যাভ টু কালটিভেট ইট"

"হাউ?"

"লেট হার ফিনিশ ইওর হেয়ার। আই উইল গিভ ইউ সার্টেন টিপস। বাই দ্য ওয়ে, আই অ্যাম মধুস্করা রামানন। মিট মি বিফোর ইউ গো"

চুলের বিন্যাস শেষ করে মধুস্করা রামাননের খোঁজ করল। মধুস্করার তন্বী দেহে সুপ্ত মাদকতা। সুন্দরী না হলেও, সৌন্দর্যকে দেখার দৃষ্টি দিয়েছেন তিরুপতিশ্বর। যা দিয়ে অনেক কিছু দেখতে পারে, যা অন্যরা পারে না। সেই দৃষ্টিই রামধনু ভাঙার পণে আকৃষ্ট করে। এখানেও বুঝিয়ে দিচ্ছে মধুস্করাই সোনার চাবিকাঠি।

"ম্যাডাম নাউ দ্যাট আই হ্যাভ ফিনিশড কুড ইউ সাজেস্ট সাম বিউটি টিপস দ্যাট উইল মেক আদার্স বিলিভ আই অ্যাম নট আগলি?"

"ইউ আর নট। নোবডি ইস। আই সাপোস ইওর ইনোসেন্স ইস পুট ইন দ্য ফোরফ্রন্ট বিফোর অ্যাসেসিং ইওর বিউটি। ডু ইউ ওয়ান্ট টু বি ইনোসেন্টলি বিউটিফুল অর নটিলি বিউটিফুল?"

"ইফ ইউ থিংক ইনোসেন্স ইজ মাই অ্যাসেট, আই উড প্রেফার টু বি ইনোসেন্টলি বিউটিফুল"

"নট মেনি হ্যাভ দ্য ইনোসেন্স লাইক ইউ। ইফ ইউ ওয়ান্ট মাই হনেস্ট অ্যাডভাইস, এ চায়েল্ডিস লুক উড সুট ইউ বেস্ট। এ বেবি ফেস লুক। ব্রিজিট বার্ডট ইন হার হে ডেইস। অর প্রীতি জিন্টা অ্যাস সি ইস"

"দ্যাট সাউন্ডস্ ইন্টারেস্টিং। ম্যাম, ক্যান ইউ স্পেয়ার মি অ্যান ইভিনিং সো দ্যাট আই ক্যান নো বেটার? ইউ আর বিসি নাউ"

ডায়েরির পাতা উলটে বলল "হাউ অ্যাবাউট সানডে ইভিনিং? আর ইউ ফ্রি?"

"সানডে আই অ্যাম ফ্রি"

কার্ডটা দিয়ে বলল "কল মি অন সানডে। উই উইল মিট সামহোয়ার"

কার্ডটা ব্যাগে ঢুকিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। পেছন থেকে মধুস্করা বলল "হোয়াট ডু ইউ ডু?"

"ওয়ার্ক ইন অ্যান আইটি ফার্ম" ফিরে জবাব।

রবিবার সকালে মধুস্করাকে ফোন "ডোন্ট ফিল লাইক গোয়িং আউট। ইট হ্যাস বিন এ বিজি উইক। পপ ইনটু মাই প্লেস, উইল ইউ?"

বোট ক্লাবের বাংলোর ঠিকানাটা লিখে জিজ্ঞেস করল "অ্যাট হোয়াট টাইম?"

"সিক্স উড বি ফাইন"

এ যেন স্বপ্নপুরী।

গেটের সিকিউরিটি পার করে বিরাট লন। তার পাশ দিয়ে এলোমেলো রাস্তা চলে গেছে দোতলা বাংলোয়। সিঁড়িতে মধুস্করা হাসিমুখে আপ্যায়ন করল।

কুন্নুরে বাবার মাঝারি ফ্ল্যাট। রাজা আন্নামালাইপুরমে ভাড়া স্টুডিও। কাভিয়ার মধ্যবিত্ত জীবন। প্রবেশ করেছে স্বপ্নরাজ্যে। এই কম বয়সেও এত টাকা লোকে করতে পারে? এ যদি মধুস্করার বাড়ি হয়, পৌরভির বাড়ি কত না বড়। বুঝতে পারে শিক্ষাদীক্ষা ছেড়ে কেন লোকে তারকার লোভে ছোটে। স্বপ্ন, ঘরে বসে তারা দেখা নয়, মর্ত্যে তারা হওয়া।

তারকার বান্ধবীর ড্রয়িং রুমে পা দিয়ে মনে হল, তিরুপতিশ্বর অতটা দয়াহীন নয়। না হলে, সে আজ এখানে?

"হোয়াট উড ইউ প্রেফার? টি অর কাফি?"

"হোয়াটেভার"

সোফায় বসে কাজের মেয়েকে বলল "কাফি। ইউ লুক লাইক মাই ইয়ং সিস্টার"

"হোয়ার ইস সি?"

"সি ডায়েড ইন বম্ব ব্লাস্ট ইন দ্য ট্রেন কপল অফ ইয়ার্স ব্যাক"

এবার বুঝতে পারছে কেন মধুস্করা এত ক্লায়েন্ট সত্ত্বেও সময় দিয়েছে। স্মৃতির আঙিনায় কাভিয়ার উপস্থিতি তাকে নাড়া দিয়েছে।

"সরি টু হিয়ার দ্যাট"

"সি ওয়াজ মাই ওনলি ইনোসেন্ট সিস্টার"

"ক্যান আই কল ইউ পরিয়া আক্কা?"

মধুস্করা চুপ করে বসে। বুঝতে পারছে ভেতরে আলোড়ন। অর্ধ-বিস্মৃত ঢেউ আড়াল করা পাহাড়ের বুকে আছড়ে পড়ছে। কয়েক মুহূর্ত। সামলে নিয়ে বলল "সিওর। বাই অল মিনস"

কাভিয়া বলল "ইউ ওয়ার টকিং অফ এ ইনোসেন্ট বিউটিফুল লুক"

মধুস্করা হারিয়ে গিয়েছিল বোনের মৃত্যুর স্মৃতিতে। সম্বিত ফিরল কাভিয়ার কথায় "বেবি ফেস হ্যাস ইটস ওন ইনোসেন্স। লার্জ হেড উইথ কার্ভড ফোরহেড। লার্জ রাউন্ড আইজ, স্মল সর্ট নোস, রাউন্ড চিকস, স্মল চিন... অ্যাম আই ডেসক্রাইবিং ইওর ফিচারস রাইটলি?"

কাভিয়া মুগ্ধ। এসেছিল খুনের উৎস খুঁজতে। নিজের মুখের নিঁখুত বর্ণনায় অভিভূত।

"নোবডি হ্যাস ডেসক্রাইবড মি সো অ্যাকুরেটলি"

"ইউ রিসেম্বল মাই সিস। হু সেইড ইউ আর আগলি?"

"এভরিওয়ান। প্রব্যাবলি আই ল্যাক দ্য অ্যাট্রাকশন"

"আই উইল গিভ ইউ এ লুক হুইচ ইভেন হোরোইনস উড এনভি। লিভ ইট টু মি, মাই লিটল সিস"

কিছু বলতে যাচ্ছিল। এমন সময় মধুস্করার মোবাইল "হ্যালো, ইয়েস রভি?"

ওপাশে কী বলছে শুনতে পাচ্ছে না। এপাশে মধুস্করা বলে চলেছে "আই অ্যাম সিওর। সি ওনলি হ্যাড হার মোবাইল অ্যান্ড দ্য এমপিথ্রি প্লেয়ার। নাথিং এলস্"

বেরবার আগে পৌরভিকে ও দুটো জিনিসই সঙ্গে নিতে দেখেছে ফতুয়ায়। ওপাশে ফোনে রভি কিছু বলছে। মধুস্করার উত্তর "ইউ আর সিওর ইট কেম ফ্রম দ্য মিউজিক অ্যারেঞ্জার দাক্সি? আই হ্যাভ টু টক টু রুক্সা টুমরো"

ফোন কেটে দিল। ইনোসেন্ট বিউটি নিয়ে কী বলছিল, সে খেয়াল নেই কাভিয়ার। মাথায় কতগুলো নাম ঘুরপাক খাচ্ছে - রভি, দাক্সি, রুক্সা। বুঝতে পারছে পৌরভির বম্ব ব্লাস্ট এমপিথ্রি প্লেয়ার থেকে।

মধুস্করার সঙ্গে লেগে থাকতে হবে। ওর কাছেই পৌরভি খুনের চাবিকাঠি।

চব্বিশ

খুনের পর খুন!

যদিও দিলওয়ান সিং নীলকান্থের মৃত্যুর কিছু লিডস পেয়েছে, অবচেতনে সন্দেহ, এই যুবকের মৃত্যু পলিটিক্যাল ইস্যু নয় তো? নির্বুদ্ধিতায় মাথা চাপড়াল। পলিটিক্যাল হলে, চিফ সেক্রেটারির ছেলেকে খুন করবে কেন? হোক না রঙ্গনাথন চিফ মিনিস্টারের পেয়ারের। সে কোনও ব্যবসায়ীকে অসন্তুষ্ট করে থাকতে পারে। তাই এই জিঘাংসা। রাজাপ্পার থেকে নীলকান্থের সঙ্গে সোফির হৃদ্যতার কথা শোনার পর, চিন্তা নতুন মোড় নিয়েছে। জয়ন্ত রাজার কথামতো ব্যাঙ্গালুরু থেকেই অপারেশনটা। খুনের আসল সূত্র ব্যাঙ্গালুরুতে নয়, মুম্বাইতে।

মুম্বাই পুলিসের ডিজিকে সোফির বিষয়ে জানাতে উদ্যোগী হল। উত্তর আসার সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা খুন। যে সে নয়, দক্ষিণের খ্যাতনামা অভিনেত্রী পৌরভি। ঘটনাটা মহাবালিপুরমে ঘটলেও মেয়েটা চেন্নাইয়ের। শেষ পর্যন্ত মহাবালিপুরম থেকে তদন্তের ভার দিলওয়ানের ওপরই পড়বে। একজন নামজাদা লোকের ছেলে, অন্যজন নামী হিরোইন। মিডিয়া আবার ছেঁকে ধরবে। হোম সেক্রেটারি থেকে ঘনঘন ফোন আসবে। বিধানসভায় রাজ্যের নিরাপত্তা নিয়ে ঝড় বয়ে যাবে। একাংশ যে দিলওয়ানের ওপর ঝাপটে পড়বে না, সে কথা ভাবাও বাতুলতা। তার আগেই আদা-জল খেয়ে নামতে হবে। না হলে পদচ্যুতি অনিবার্য। এতদিনে বুঝেছে কাজ যাই করুক, রুলিং পার্টি বিপদে পড়লে, তার ঝড় সেক্রেটারিয়াল ও আইপিএস লেভেলে পড়তে বাধ্য। ওদেরও দোষ দেওয়া যায় না। গদি রক্ষা করতে হবে।

মুম্বাই থেকে ফোন "দিস ইজ রোশন, অ্যাডিশনাল কমিশনার অফ পুলিস, মুম্বাই। আর ইউ দ্য এসি অফ চেন্নাই?"

"ইয়েস?"

"দ্য ডিজি হ্যাস পাসড অন দ্য ইনফরমেশন, ইউ আর ইন্টারেস্টেড ইন এ গার্ল নেমড সোফি। হোয়াই?"

"ইউ প্রব্যাবলি নো আওয়ার চিফ সেক্রেটারিস সন নীলকান্থ ওয়াজ সাইলেন্টলি মার্ডারড ইন লেডি ফ্লোরেন্স হসপিট্যাল। ইন দ্য প্রসেস অফ ইনভেস্টিগেশন, আই হ্যাভ কাম টু নো, নীলকান্থ হ্যাড এ ক্লোজ অ্যাসোসিয়েশন উইথ এ গার্ল ফ্রম কোলাবা হুজ ফাদার ইজ এ ডায়মন্ড মার্চেন্ট"

"ইফ আই অ্যাম নট মিস্টেকেন, দিস ইস দ্য সেম গার্ল। হার পারটিকুলার্স ম্যাচ ইওর কোয়ারিস"

"হোয়াট ডু ইউ নো অ্যাবাউট হার?"

"সি ইজ ডেড"

বিস্ফোরণটা মহাবালিপুরমে বিচে নয়, দিলওয়ানের উর্বর চিন্তায়।

"হো... য়া... ট?"

"সি ডায়েড ইন এ লরি অ্যাক্সিডেন্ট নিয়ার ম্যাথেরন, এ ফিউ কিলোমিটার্স ফ্রম মুম্বাই"

"অ্যাকসিডেন্ট?" প্রশ্ন ছুড়ল দিলওয়ান সিং।

"ইনিসিয়ালি উই থট ইট ওয়াজ অ্যান অ্যাকসিডেন্ট। ফোর ওয়্যার ইন দ্য কার। ওয়ান নেমড সন্নিধি সারভাইভড। সি ওয়াজ ইন কোমা, সো লং। উই কুডন্ট গেট দ্য প্রপার স্টোরি। রিসেন্টলি সি রিগেইনড্ কনশাসনেস। ইন হার কনফেশন, সি কমিটেড ইট ওয়াজ নট অ্যান অ্যাকসিডেন্ট। ইট ওয়াজ ডেলিবারেট। হুইচ পুটস দিস আন্ডার ৩০২ আইপিসি"

যা বাবা। কেঁচ খুড়তে সাপ!

দিলওয়ান ভাবছে, নীলকান্থ কী সোফির মৃত্যুর খবর জানত? বাবাকে না জানানো স্বাভাবিক। বলেইনি সোফির সঙ্গে হৃদ্যতার কথা। কিন্তু রাজাপ্পা? তাকেও জানায়নি। ব্যাপারটা সন্দেহজনক। এমন কিছু কী ভেতরে চলছিল, যা গোপন করেছে। গোপন তথ্যটাই হতে পারে খুনের রহস্য। কী সেই তথ্য? যে জবাব দিতে পারত, সেই সোফি বেঁচে নেই।

"হোয়াই ওয়ার দে গোয়িং টু ম্যাথেরন?"

"টু মিট এ প্রিস্ট নেমড ভওয়ানিশঙ্কর"

"হু ইজ হি?"

"হি রানস অ্যান আশ্রম ইন ম্যাথেরন। ওয়েল রেস্পেক্টেড। উই হ্যাভ অলরেডি ইনটারোগেটেড হিম। হি সিমস টু বি লাইক এনি আদার প্রিস্ট"

দিলওয়ান সিং ভওয়ানিশঙ্করকে নিয়ে ভাবছে না। মাথায় সন্নিধির নাম। অগতির গতি, এখনও বেঁচে থাকা সন্নিধি।

"আই হ্যাভ টু ইনটারোগেট সন্নিধি এএসএপি। আফটার অল, ইটস চিফ সেক্রেটারিস সন। লট অফ থিংস টু আন্সার ইন দ্য অ্যাসেম্বলি"

"হোয়েন আর ইউ কামিং?"

"টুনাইট। আই ওয়ান্ট মিট হার টুমরো মর্নিং"

পরের দিন সন্নিধির বেডের পাশে। আগে রোশনকে বলে রেখেছে "আই ওয়ান্ট টু টক উইথ হার অ্যালোন। সিন্স ইউ হ্যাভ অলরেডি ইন্টারোগেটেড হার, ইফ ইউ আর অ্যারাউন্ড সি মে নট টক। আই উইল অ্যাপ্রোচ হার অ্যাস নীলকান্থস ফ্রেন্ড, এ ফ্রেন্ড অফ রাজাপ্পা অ্যাজ ওয়েল ইন সিভিলিয়ান ড্রেস"

"অ্যাস ইউ প্লিজ" রোশন হাসপাতালের বাইরে তাকে নামিয়ে চলে গেল।

সন্নিধিকে দেখে মায়া হল। ফ্যাকাসে মুখ। চাদরে ঢাকা সাদা গাউন পরে শুয়ে। একটুও উত্তাপ নেই। প্রাণহীন জীবন্ত কায়া হাসপাতালের বেডে। পায়ে প্লাস্টার, হাতে ব্যান্ডেজ। বহুদিন ভেন্টিলেটারের জন্য ট্র্যাকিওস্টমি এখন বন্ধ, সেলাই করা। বেডের কাছে বসে বলল "লেট মি ইনট্রোডিউস মাইসেলফ। আই অ্যাম দিলওয়ান সিং। এ কমন ফ্রেন্ড অফ নীলকান্থ অ্যান্ড রাজাপ্পা। ডু ইউ নো নীলকান্থ?"

অতীতের স্মৃতি হাতড়াচ্ছে। নীলকান্থ? নামটা চেনা চেনা। কোথায় শুনেছে?

সন্নিধিকে ভাবতে দিয়ে বসে রইল। অঙ্কুরের মৃত্যুর বিষণ্ণতা এখনও আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে। দেহ দেওয়া যায় অনেককে। মন কী দেওয়া যায়? অঙ্কুর যখন নেই, কী হবে লুকিয়ে? সেও মারা যাতে পারত? মনে হয়েছিল এটা অ্যাকসিডেন্ট নয়। ডেলিবারেট অ্যাকসিডেন্ট। মানে পরিকল্পিত খুন। যে বা যারা এটা করেছে, তারা ক্ষমার অযোগ্য।

ফ্যাকাসে চাহনি "নীলকান্থ? দ্য নেম রিংস এ বেল" মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে।

"আই হ্যাভ হার্ড দ্য নেম ফ্রম সোফি। ইজ হি দ্য সন অফ সাম সেক্রেটারি ইন চেন্নাই?"

"ইয়েস" মাথা নাড়ল দিলওয়ান সিং।

"সোফি ইউসড টু সে দে ওয়ার স্টেডি। আই গ্যাদার সি ডায়েড ইন দ্য অ্যাকসিডেন্ট। আই শুডন্ট বি সেইং দিস, দো সোফি ওয়াজ মাই ফ্রেন্ড। সি হ্যাড সো মেনি ফ্লিংস, ইটজ ডিফিকাল্ট টু সে হু সি ওয়াজ স্টেডি উইথ? এভরি ইয়ং গাই হু কেম অ্যাক্রস হার থট, হি ওয়াজ দ্য ওনলি ওয়ান। হ্যভিং নোন হার, সি কুড নেভার বি ফর ওয়ান"

"নীলকান্থ?"

"ওয়ান অফ হার মেনি ফ্লিংস। ডিড নীলকান্থ সে হি ওয়াজ ইন লাভ?"

"ইয়েস" মিথ্যে বলল।

"হি মাস্ট হ্যাভ বিন ইন এ ফুলস প্যারাডাইস। দো সোফি ওয়াজ ফ্রম এ রিচ ব্যাকগ্রাউন্ড, হ্যাভিং লস্ট হার মাদার অ্যাট এ ভেরি টেন্ডার এজ অ্যান্ড ফাদার বিয়িং আওয়ে মোস্ট অফ দ্য টাইম, সি হার্ডলি গট এ টাচ অফ লাভ। ফরগেট নোয়িং হোয়াট ইট মেন্ট। হোয়াই ডোন্ট ইউ আস্ক নীলকান্থ?"

"নীলকান্থ ইজ নো মোর। হি ইজ ডেড। হি ওয়াজ মার্ডার্ড"

সন্নিধি বাক্যহীন। ভাবছে এবারে বেঁচে গেছে, পরে কী পারবে? অঙ্কুর মৃত, সোফি মৃত, এখন এ বলছে নীলকান্থও মৃত। এরপর নিশ্চয়ই তার পালা। কবে? মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচেও মৃত্যুপ্রতীক্ষা।

কোনো চক্রে জড়িয়ে সে?

কী ভাবেই বা পরিত্রাণ?

পঁচিশ

“আবার খুন?” নস্যি শুঁকে শঙ্করদয়াল বলল।

“হওয়ারই তো ছিল। নয় কী?” মধুসূদনের নির্বিকার জবাব।

“মানে?”

“নইলে অঙ্ক মেলে না”

“অঙ্কটা কী?” তড়িৎ অন্য কিছু ভাবছিল। মধুসূদনের দিকে ফিরল।

“মৃত্যুটা উপলক্ষ। কেন খুন, কোথায়, কীভাবে সেটা পুলিসের ব্যাপার। আমাদের আড্ডার নয়। কিন্তু মৃত্যু হয়েছে, আরও হবে। কেন হচ্ছে সেটাই বোঝার”

“বুঝব কী পল্টুর চায়ের দোকানে বসে?” শুভঙ্কর ব্যঙ্গ করল।

মধুসূদন কথাটা ঘোরাতে বলল “আজ সিঙারার বদলে মোগলাই পরোটা অর্ডার দিলে হয় না?”

এতদিন মধুসূদনকে দেখছে। সাহেবরা যেমন সেলিব্রেশনের সময় শ্যাম্পেন খোলে, মধুসূদন চাঞ্চল্যকর কিছু উন্মোচনের সময় মোগলাই অর্ডার দেয়।

তাপস হাঁকল “পল্টু চার প্লেট মোগলাই। টুকরো টুকরো করে কেটে দিস। মনে হচ্ছে একটা দিশা খুঁজে পাচ্ছ?”

“ঠিক দিশা নয়। একটা ধোঁয়াটে হিসেব মেলাবার চেষ্টা করছি। এই খুনগুলো নিয়ে যদি ভাব, কীভাবে হয়েছে ভুলে যাও, দেখবে যারা খুন হয়েছে তাদের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আছে”

“কী সামঞ্জস্য?”

“বিদ্বান ছেলে, সুন্দরী মেয়ে”

এতক্ষণ ওরা খুনের উপায় আলোচনায় ব্যস্ত ছিল, লিঙ্ক খোঁজার চেষ্টায়। লিঙ্কটা যে কোথায়, ঠিক ঠাহর করতে পারছিল না। কারা খুন করছে স্বতন্ত্র। কীভাবে করছে আরও স্বতন্ত্র।

কুঞ্জবিহারী বলল “এতক্ষণ আলোচনা করছিলাম কোনও ডাক্তার ইনভলভড কি না। দক্ষিণের হিরোইনটা তো বোমা ফেটে মারা গেছে। তাই ডাক্তারি থিওরিটাও ভুল। হয়ত মেন ইস্যু নয়”

“ভুল বলা ঠিক হবে না। বলা যেতে পারে, শুধু ডাক্তার নয়, আরও অন্য কেউ আছে”

মধুসূদন বলল “ঠিক বলেছ। একজনের কাজ নয়। পেছনে বিরাট চক্র”

“কীসের চক্র? কেনই বা খুন?”

“সেটাই তো বুঝতে পারছি না। তোমরা বলতে পারবে?”

শঙ্করদয়াল মোগলাইতে কামড় দিল “মনে হচ্ছে মানসিক ভারসাম্যহীন লোকের কীর্তিকলাপ”

“মানসিক ভারসাম্যহীন লোক এত নিখুতভাবে খুনগুলো করবে? বিশ্বাস হয় না” তাপস বাধা দিল।

“তাহলে কে বা কারা?” তড়িতের প্রশ্ন।

“ঠিক উলটো। বুদ্ধিমান লোকের কাজ। কিন্তু কেন?” শুভঙ্কর বলল।

“ওই কেনটাই তো আসল প্রশ্ন। উত্তর পেলে খুনের ঠিকানাও পাবে”

“গণিততত্ত্ববিদ খুনগুলো পাটিগণিতের অঙ্কের মতো খেলছে”

“কী গণিত?”

“দুটো খুন বাংলায়। দুটো মহারাষ্ট্রে...”

“দুটো নয় চারটে”

“বেশ মানলাম চারটে। এর মধ্যে কয়েকটা আনুষঙ্গিকও হতে পারে। সে প্রশ্নে যাচ্ছি না। দুটো দক্ষিণে”

“তুমি কি বলতে চাও এর পরের দুটো উত্তরে হবে?”

“হওয়াটাই স্বাভাবিক। নয় কি?” মধুসূদন ভাবছে।

তড়িৎ সিলিং ফ্যানের দিকে তাকিয়ে বললঃ

“কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, গুজরাট থেকে মণিপুর, বঙ্গোপসাগর থেকে আরবসাগর আমি ঘুরছি, শুধু ঘুরছি। ব্রেনের চাকা ঘুরছে না কেন?”

তাপস ঠাট্টা করল “পাখাটা এখনও ঘুরছে। ঠিক কুড়ি বছর আগের স্পিডে। যথেষ্ট হাওয়া খেলছে। মাথা ঠান্ডা রাখার পক্ষে কাফি। কিন্তু ব্রেন ওয়েভটা ঠিক খেলছে না”

শঙ্করদয়াল মাঝখানে টিপ্পনী কাটল “ব্রেন ওয়েভটা খেলতে শুরু করেছে”

“কী?” একসঙ্গে সকলের প্রশ্ন।

“একটা জিনিস কমন, সবাই উচ্চবিত্ত কিংবা বড়লোক। অথবা বড়লোকের ছেলে বা মেয়ে”

“সোহম মধ্যবিত্ত ঘরের” মাথা নাড়ল সবাই।

মধুসূদন শুনছে। ভাবছে মোগলাই পরোটা বেশি না খেয়ে ফেলে। রাতে অম্বল হলে গিন্নির কাছে ধাতানি। যদিও কাল রবিবার।

“র‍্যান্সমের ব্যাপার থাকতেও পারে। যারা মারা গেছে তাদের বাবার কাছে র‍্যান্সম কী দাবি করা হয়েছিল। সেটা তো আমরা জানি না। নন পেমেন্টে খুন”

“এরাই শুধু?”

“শুধু এরা নয়, আরও অনেকের কাছেও এই র‍্যান্সম দাবি করা হয়েছে। তারা হয়ত দিয়ে দিয়েছে। তাই বেঁচে গেছে। তাদের কথা আমরা জানি না”

কুঞ্জবিহারী বলল “হতে পারে। পেছনে টাকা লেনদেনের ব্যাপার। কারণ যাই হোক না কেন, এটা একজনের কাজ নয়। এর পেছনে গোষ্ঠী থাকাই স্বাভাবিক” মাথা নাড়ল মধুসূদন।

“দেখ তো মধুসূদন রিপোর্টের মধ্যে গোষ্ঠীর ইঙ্গিত পাও কি না? যদি পাও, তবে এই গোষ্ঠী চক্রে জড়িয়ে”

ততক্ষণে মধুসূদন চার টুকরো মোগলাই শেষ করে ফেলেছে। পেট ভরে গেছে। বাড়ি গিয়ে খেতে হবে। না খেলেই গিন্নির গঞ্জনা “সারাদিন এত কষ্টে রান্না করি। শেষে কি না বাবু বাইরে মোগলাই সাঁটিয়ে ফিরলেন। বাসি খাবারগুলো একাই খাব? বলি, বয়স হচ্ছে। সে ব্যাপারে বাবুর হুঁশ নেই। তোমার কিছু হলে, আমায় দেখবে কে?”

শুধু গিন্নির আশঙ্কা নয়, প্রত্যেকেরই মৃত্যু নিয়ে ভয়।

ছাব্বিশ

ভওয়ানিশঙ্কর অন্দরমহলের বসার ঘরে, চতুর্বেদীর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে, বলল “কেও বেটি? পুলিস অফিসার সে পেয়ার কেও? সারে সংসার মে পেয়ার কি কুছ কমি হ্যায়?”

শিরিন কী জবাব দেবে ভেবে পেল না। স্নেহাশিস কলকাতায় ফিরে গেছে। চতুর্বেদীকে অস্বীকার করার উপায় নেই। অনিচ্ছাসত্ত্বেও চতুর্বেদীর গাড়িতেই ম্যাথেরনে ভওয়ানিশঙ্করের আশ্রমে।

শিরিন বুঝতে পারছে না কোন চক্রে জড়িয়ে। মেহুলিও কী কোনও চক্রে জড়িয়ে পড়েছিল? তাই বারবার চতুর্বেদীর মেহুলির ব্যাপারে শিরিনকে ফোন, স্নেহাশিস কদ্দূর জানে? তারও কী মেহুলির মতো পরিণতি হবে? বুকটা ভয়ে কাঁপছে। পালাবার উপায় নেই। চতুর্বেদীর ফোনে মুম্বাইয়ের পাট নিমেষে চুকে যেতে পারে, অজানা নয়।

শিরিনকে চুপ থাকতে দেখে ভওয়ানিশঙ্কর সাদা ধুতির কোঁচাটা ঠিক করে বলল “ইস আশ্রম মে সিরিফ প্যার হি প্যার। ইয়ে দেখো রম্ভা, অনুস্কা কিতনি পেয়ার মহব্বৎ সে জি রহি ঈশ্বরকে চরণো মে” রম্ভা তিনজনকে ঘোলের শরবত দিতে, বাবা ওর কানে কিছু বললেন।

লস্যিতে কী কিছু মেশানো? গ্লাসের দিকে তাকিয়ে পুরনো স্মৃতি ঢেউ খেলে গেল। বাবাকে কোথায় দেখেছে। কোথায়? স্মৃতির পাতা হাতড়াচ্ছে শিরিন। বাবাকে দেখতেই অস্পষ্ট স্মৃতিটা আকার নিল। ভেসে উঠল বাবার ছবি। সুনেত্রার কমপিউটারে। যদি স্নেহাশিস একথা জানত, আরও কিছুদিন মুম্বাইতে থেকে যেত। থেকে গেলেই ভালো ছিল। তাকে আগলে রাখতে পারত এই অস্পষ্ট চরিত্রগুলো থেকে। তাহলে অবশ্য সুনেত্রার কথা খুলে বলতে হত। ভগবৎভক্ত সুনেত্রা কী ভাবে জড়িয়ে পড়েছিল সাধুসঙ্গে। ধর্ম অন্য বলে সাধুসঙ্গে জড়াতে শিরিন চায়নি, বিশেষ করে নিজে যখন কোনও ধর্মই প্র্যাকটিস করে না। দেহ বেচে যখন রোজগার, এ ধরনের হিপোক্রিসির মানেই হয় না। দেহ দেখিয়ে, বিক্রি করে তো নয়।

সুনেত্রা বলত “যৈসে হো হমে ঈশ্বর পানা হ্যায়”

শিরিন বুঝতে পারত না সুনেত্রার কেন এই তীব্র আকাঙ্ক্ষা? কোথায় যেন মানুষের প্রতি অবিশ্বাস, ক্ষোভ, বিদ্বেষ। প্রেমে আঘাত খেলে কী মানুষ ঈশ্বরমুখী হয়? শিরিনের তো হয়নি। বরং আরও জীবনমুখী হয়েছিল প্রমাণ করার নেশায়। কলকাতা থেকে মুম্বাই তারকা জগতে উত্তরণ। নইলে স্নেহাশিসের গিন্নি হয়ে পুত্র-কন্যা নিয়ে মেদিনীপুর কিংবা বালুরঘাটে জীবন কাটিয়ে দিত। একদিক থেকে ভালোই হত। অন্তত চতুর্বেদীর চাপে ভওয়ানিশঙ্করের সামনে দাঁড়াতে হত না।

শিরিনকে নীরব দেখে ভওয়ানিশঙ্কর বলল “কিতনে পেয়ার কা বাত হুয়া আসিকি কে সাথ?” শান্ত সৌম্য স্বরে ভওয়ানিশঙ্কর কথাগুলো পাড়লেও, শিরিনের মনে হল, পেছনে প্রচ্ছন্ন হুমকি।

নম্রভাবে বলল “কুছ নেহি। চতুর্বেদী সাবকা বারে মে কুছ ভি নহি। উসে কুছ মালুম নেহি”

“ফির উসে ঘর মে রখা কেও?”

চতুর্বেদীর দিকে তাকিয়ে বলল “চতুর্বেদী সাব সে পুছিয়ে”

ভওয়ানিশঙ্করের চতুর্বেদীকে প্রশ্ন “কেও চতুর্বেদী চক্কর কেয়া?”

চতুর্বেদী তুতলিয়ে বলল “মহারাজ, হমে জান না থা ইয়ে পুলিস মেহুলি ঔর মেরে বারে মে কিতনা জানে?”

ভওয়ানিশঙ্কর মাথা নাড়ল “সহি” শিরিনেরকে জিজ্ঞেস করল “কিতনা জানে?”

“কুছ ভি নেহি। নাম তক ভি নেহি”

"তুমহে কৈসে মালুম? কুছ বোলা?"

"কুছ জানে তো হামে জরুর পুছতা"

"তুম কিতনা বোলে?" ভওয়ানিশঙ্কর নম্র দৃঢ়।

"কুছ ভি নেহি। কেউ বলু?"

"সহি?"

"বিলকুল সহি মহারাজ" শিরিন দৃঢ়।

মহারাজের অস্পষ্ট ছবিটা আকার ধারণ করছে। সুনেত্রার কম্পিউটারে ছবি দেখে চমকে উঠেছিল। সুনেত্রা পাশের ফ্ল্যাটে ওঠার পরের দিন সন্ধেবেলায় কড়া নেড়েছিল শিরিনের ফ্ল্যাটে। "আই মুভড ইন দ্য ফ্ল্যাট নেক্সট টু ইউ। কেম টু নো ইউ"

"কাম ইন প্লিজ" ক্লিন্সার দিয়ে মেক আপ তুলে শিরিনের সোফার দিকে ইঙ্গিত "প্লিজ..."

"ইউ আর ফ্রম মহারাষ্ট্রা?"

"নো বেঙ্গল। ইউ?"

"ফ্রম কলকাতা" সুনেত্রা সোফায় বসল।

"তুমি বাঙালি?"

"না মারোয়ারি। জন্ম কলকাতায়। বড় হয়েছি কাঁকুরগাছিতে। বাংলা বলতে পারি"

একগাল হেসে শিরিন বলেছিল "ভালোই হল। এত বছর এখানে। বাংলা-মেশানো হিন্দি বেরচ্ছে। ভুলেই যাচ্ছিলাম কলকাতার মেয়ে"

সেই আলাপ। জেনেছিল দ্য নিউ এজ কোম্পানিতে চাকরি নিয়ে মুম্বাই পাড়ি। সায়েন্স কলেজের কেমেস্ট্রিতে এমএসসি। শিক্ষিত মেয়ে। শ্রদ্ধা বেড়ে গেছিল। যতই মডেল হিসেবে নাম থাক না কেন, সমসাময়িক শিক্ষিত মেয়ের সামনে এলে অজান্তেই শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। সুনেত্রার সূত্রেই সন্নিধির সঙ্গে পরিচয়। দ্য নিউ এজে কাজ করে। মডেল হতে চায়। শিরিন প্রতিষ্ঠিত মডেল। স্বাভাবিক ভাবেই হৃদ্যতা বেড়ে উঠেছিল। শিরিন সন্নিধির ওঠার সোপান। সুনেত্রা কলকাতার বাসিন্দা। দুজনের বন্ধুত্বে শিরিন গুছিয়ে নিয়েছিল দ্য নিউ এজ মডেলিং-এর সব হাই-প্রোফাইল কন্ট্র্যাক্ট। কে বেশি পাবে? শিরিন, না মেহুলি? বন্ধুত্বের নাগপাশে দুজনকে জড়িয়ে মেহুলিকে কোণঠাসা করে দিয়েছিল দাবার পাশায়। তাই মেহুলিকে অন্য রাস্তা ধরতে হয়েছিল খ্যাতির শিখরে থাকতে। মেহুলিকে টপকে কনট্র্যাক্টগুলো হাতিয়ে নিচ্ছিল শিরিন। দেঁতো হাসিতে অভ্যর্থনা করলেও, মেহুলি বুঝতে পারছিল, মুম্বাইয়ের ইঁদুর দৌড়ে শিরিন অনেক চোস্ত, পাক্কা, দক্ষ খেলোয়াড়। ইঁদুর দৌড় ছেড়ে ঘোড়দৌড় চতুর্বেদীর হাত ধরে। তার মৃত্যুর সঙ্গে চতুর্বেদী কতখানি জড়িত বোঝা যাচ্ছে না।

চাওয়া-পাওয়ার হিসেবে বন্ধুত্বের পরিধি ছুটি কাটানো, সিমলা বেড়ানো, হরিদ্বারের হর-কি-পৌরিতে স্নান। অন্য আনন্দের আকাশে। জীবন কাব্যময় ছন্দ। তখনও দিনের আলো মুছে যায়নি। গোধূলির শেষ রশ্মি বিদায় নেওয়ার আগে মানুষের গুঞ্জন শুনছে হর-কি-পৌরির ব্যস্ত, মুখর অস্থিরতায়। ভক্তদের নৈসর্গিক দান। সন্ধ্যা কালো আচ্ছাদনে ওড়না পরছে প্রদীপ ভাসাবার আয়োজনে, যা কলাপাতার ভেলায় ভেসে যাবে ভারত সেবাশ্রমের দিকে।

ওরা তিনজন চুপচাপ বসে সেই দৃশ্য উপভোগ করছিল। সুনেত্রা চেয়েছিল গেরুয়া জামা পরা সাধুবাবার দিকে। কিছুদূরে জলের ধারে বসে। খালি গা, জোড়াসনে ধ্যানমগ্ন। বাঁ দিকে রাখা একরাশ বইয়ের স্তূপ থেকে একটা একটা করে পুস্তক ছিড়ে ভাসিয়ে দিচ্ছে গঙ্গার জলে। অবাক হল সুনেত্রা। বারবার দেখছে সাধুকে। সাধু ধ্যান আর পুস্তক বিসর্জনে মগ্ন। অবাক সুনেত্রা উঠে পড়ল। এগিয়ে গেল সাধুটির দিকে। দূরে দাঁড়িয়ে দেখল পুস্তকগুলি বিভিন্ন ভাষার। হিন্দি লেখা দেখে বুঝতে পারল, সবগুলোই ধর্মগ্রন্থ। ধর্মগ্রন্থগুলো এভাবে জলে ভাসাচ্ছে কেন? সুনেত্রার কৌতূহল। নিবিষ্ট মনে দেখছে সাধুর কার্যকলাপ। এক সময়

পুস্তকগুলির বিসর্জন সমাপ্ত হল। সাধুরও ধ্যানের অবসান। শিথিল পায়ে হাঁটতে লাগল হর-কি-পৌরির সিঁড়ি ধরে। শিরিন আর সন্নিধি লক্ষ করল অন্ধ মাদকাতায় সুনেত্রা হাঁটছে সাধুর পেছনে। ডাকতে যাচ্ছিল সন্নিধি। শিরিন বাধা দিল। গোঁড়া মারোয়ারি পরিবারের মেয়ে। হতেই পারে। শিরিন গোঁড়া মুসলমান পরিবারের হয়েও যদি ভড়কা খায়, সবাই সংস্কার বিসর্জন দেবে, এমন ভাবাও ভুল।

কোথায় সুনেত্রা গেছিল জিজ্ঞেস করলেও এড়িয়ে গেছিল সুনেত্রা। ওরা আর ঘাঁটায়নি। পরে একদিন, সুনেত্রার ঘরে গল্প করতে করতে যখন ওদের বেড়ানোর ছবিগুলো দেখাচ্ছিল, শিরিন প্রশ্নটা আবার তুলেছিল "তোমার এখানে এত সাধু-সন্ন্যাসীর ছবি কেন?"

কফি এগিয়ে সুনেত্রা বলেছিল "আমার ভালো লাগে"

"তুমি কী খুব গোঁড়া মারোয়ারি পরিবার থেকে?"

"হ্যাঁ। বাবা-মা রোজ 'হনুমান চালিসা' পড়ে"

"তা বলে, এই বয়সে?"

বুঝেছিল শিরিন বিশ্বাস করতে পারছে না, কেন ওর সাধুপ্রীতি। ওদের তো বলা যাবে না। পেছনের ইতিহাস চেপে বলেছিল "ভগবান পাওয়ার কী কোনও বয়স আছে?"

শিরিন আল্লা রহিমের কথা শুনেছে। রমজানের পর ইদের চাঁদ দর্শনে মুবারকবাদ দিয়েছে। দুর্গাপুজোতেও সারারাত ঠাকুর দেখেছে। ভক্তিতে নয়। নিছক অনুষ্ঠান, সাবেকি রীতি। আনন্দ করাই প্রধান। শিরিন নয় দিনে পাঁচবার নমাজ পড়ে না। সুনেত্রা যদি শান্তি পায়, ক্ষতি কী?

সোহমের সঙ্গে অতীতের কাহিনি তো বলা যবে না শিরিনকে। তাই কথা ঘুরিয়ে বলেছিল "একটা ঘটনা কী রকম সব পালটে দিল"

"কী ঘটনা?"

"হর-কি-পৌরিতে বেড়াতে গেছিলাম, মনে আছে? ওখানে এক সাধুকে দেখলাম ধর্মগ্রন্থগুলো ছিঁড়ে জলে ভাসিয়ে দিচ্ছে। পেছন পেছন গেছিলাম ওনার ছাউনিতে। বাবাকে প্রণাম করে বলেছিলাম 'বাবা আপ কেও সব ধর্মকে কিতাব গঙ্গা মে ফেক রহা থা?' আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন 'সব পড় লিয়া বেটি। উসমে ধরম নেহি হ্যায়। ধরম বিসোয়াস মে'। আমার ব্যক্তিগত জীবনের অনেক কথা ঠিকঠাক বলেন। অবাক হয়েছিলাম শুনে। সেই থেকে বিশ্বাস করি"

সেখানে অনেক সাধুর ছবি - গৈরিক বসন পরিহিত, যোগী সাধু, শ্বেতবস্ত্র পরিহিত সাধু, নাগা সাধু, জৈবিক ক্রিয়ায় লিপ্ত সাধু। এখন মনে পড়ছে। ভওয়ানিশঙ্করের জৈবিক ক্রিয়ায় লিপ্ত ছবি। বুকটা ভয়ে শিউরে উঠল। এ কোন সাধুর আশ্রমে সে? মাঝে আবার চেলা চতুর্বেদী। কোনও বৃহত্তর চক্রে জড়াচ্ছে না তো?

রম্ভা আর অনুস্কা ভওয়ানিশঙ্করের দুপাশে বসল। ওদের দুজনের কাঁধে হাত রেখে ভওয়ানিশঙ্কর বলল "ঈশ্বর তো দূরকে অন্তিম সমাধি। জনম জনম কে প্রায়শ্চিত ঔর করমকে সাথ উসে প্রাপ্ত হোতা। জনম করম মে হি ধরম। করম হমারে হর রিপুকে উপাসনা। উসমে হি ঈশ্বরকা জ্ঞান প্রাপ্ত হোতা" রম্ভা আর অনুস্কার কোমরে হাত দিয়ে কাছে টেনে বলল "ইয়ে জো শরীর হ্যায় ইয়ে ঈশ্বরকে মর্ত্যরূপ। ইসে পা না, পুরে শক্তি সে নিভানে দিল মে তন্দুরুস্তি লাতি। ঈশ্বর হম নেহি, তুম নেহি, হামারে ছুপি হুই বাসনাকে পরিপূর্ণতা মে হি হ্যায়"

শিরিনের মাথায় ঢুকছে না, ভওয়ানিশঙ্কর ওকে দেহতত্ত্বের কাহিনি শোনাচ্ছে কেন? এই কাহিনিই কী সুনেত্রাকেও শুনিয়েছিল? হয়ত এই দর্শন শুনেই সুনেত্রা আকৃষ্ট হয়েছিল ওর প্রতি। এখানেই লুকিয়ে তার মৃত্যুর বীজ। শিরিন ঈশ্বরও চায় না, মরতেও চায় না। ভওয়ানিশঙ্করের থাবা থেকে নিস্তার চায়। চতুর্বেদী তাকে শুধু মেহুলির মৃত্যুর ইনভেস্টিগেশনে সে জড়িয়ে কি না, সেটুকুই জানাতে বলেছিল। এখন দেখছে চতুর্বেদী মহারাজের অনুগামী। তাহলে কী দেহতত্ত্বের মূল আঁকড়ে মেহুলি পৌঁছতে চেয়েছিল খ্যাতির স্বর্ণশিখরে? ভওয়ানিশঙ্করের ছত্রছায়ায়? তা কী সুনেত্রা জেনে গেছিল? তাই তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি?

মেহুলি সুনেত্রার মৃত্যুর সঙ্গে এরা জড়িয়ে নেই তো? যদি থাকে, পান থেকে চুন খসলে, তারও একই পরিণাম হতে পারে।

ভীষণ অসহায় লাগছে। এতদিন পর্যন্ত পার্টি, আড্ডা, একটু ঢলাঢলির মধ্যে কেরিয়ার সীমাবদ্ধ ছিল। এখন দেখছে, শুধু তা নয়। একবার যদি এ জালে জড়ায়, এই চক্রের দুটোই পরিণতি - মৃত্যু অথবা জেল। এখন মনে হচ্ছে স্নেহাশিসকে সুনেত্রার সঙ্গে সম্পর্কের কথাটা না চাপলেও পারত। বিচক্ষণ পুলিস অফিসার। উপায় বাতলাতে পারত। ইচ্ছাকৃতভাবেই কথাটা চেপে গেছিল। পাছে স্নেহাশিসের ছানবিন সাজানো বাগানে আগুন না জ্বালায়। ও তো আর জানে না, এখানের খ্যাতি কীভাবে? ফিরে গিয়ে স্নেহাশিসকে জানাতে হবেই। নইলে এ জাল থেকে বেরোবার পথ দেখছে না।

চতুর্বেদী বলল "কেয়া করে মহারাজ? ইয়ে লড়কি নাদান হ্যায়"

ধমকে উঠল ভওয়ানিশঙ্কর "নাদান নেহি। পুরানে আশিক কো ছোড়ো। ঔর আপনে জিন্দেগি চালাক কে মাফিক জিয়ো। কভি মন ঔর ভি কুছ চাহে, শরীর ঈশ্বর কে ওর ধায়ে, তো ইঁহা চলা আনা। লেকিন এক বাত... আজকে মুলাকাত কিসি কো পতা নেহি চলনা চাহিয়ে" দৃঢ়তার সঙ্গে ছুড়ে দিল। শিরিনের মনে হল এটা শুধু আদেশ নয়, হুমকিও বটে।

"আপকে আজ্ঞা ম্যায় মরতে দম ইয়াদ রখুঙ্গা। উসে জি ঔর জিগর সে মানুঙ্গা। জো কুছ হমে কিয়া ও চতুর্বেদী সাবকে ইশারে পে। আপ ঔর চতুর্বেদী সাব বোল দিয়া ওহি মেরে লিয়ে ঈশ্বরকে বাণী"

অনুস্কা ও রম্ভার কোমর ছেড়ে, ওদের হাত নাড়ল। একজন পাশের ঘর থেকে ফুলের থালা নিয়ে এল। বুঝতে অসুবিধা হল না ভওয়ানিশঙ্কর ওকে আশীর্বাদ করতে চাইছে। সোফা থেকে উঠে সষ্টাঙ্গ প্রণাম। ওর মাথায় ফুলের পরশ ঢেলে পরম স্নেহে বলল "ঈশ্বর তুমহারা ভলা করে। হম হ্যায় তুমহারে সাথ। কভি কুছ মুস্কিল হোয়ে তো হমে ইয়াদ করনা। করোগে তো?"

"জি মহারাজ" সায় দিল শিরিন।

"চতুর্বেদী মেরে নম্বর তুমহে দে দেগা" তাকাতে মাথা নাড়ল চতুর্বেদী।

ভওয়ানিশঙ্কর উঠে পড়ল "অব মেরা আরামকে ওয়াক্ত। যাও বেটি। কাম মে ঔর তরক্কি করো। ইয়ে সব ছোটিমোটি বাত ভুল যাও। জিন্দেগি মে বহত দূর জানা হ্যায়। জিয়ো, জি ভরকে জি লো"

আশ্রম থেকে বেরিয়ে কথাগুলোর মানে খোঁজার চেষ্টা করছে শিরিন। কী বলতে চাইছিল? শিরিনকে ভদ্র ভাষায় ধমক দিয়ে কী নাটকের যবিনকা টানল? না কি, পিছনে অন্য কোনও খেলা জড়িয়ে?

অসহায় লাগছে। বিশাল পৃথিবীর লড়াইয়ে সে একা। মনে হচ্ছে, আরেকজন পাশে থাকলে ভালো হত। স্নেহাশিস ছাড়া এই মুহূর্তে আর কে হতে পারে?

সাতাশ

"আমার ভীষণ ভয় করছে" ঐত্রেয়ী বলল।

"কেন? এখন তো আর কোনও চিন্তা নেই" মিলনের জবাব।

"চিন্তা আরও বেড়ে গেল। আমার ট্র্যান্সফার অর্ডার এসে গেছে। হেড কোয়ার্টার্স দিল্লিতে নিয়ে যাচ্ছে"

"ভালোই তো। এমনিতেই তোর ব্যাঙ্গালুরুর মেকানিক্যাল লাইফ ভালো লাগছিল না। দিল্লি অনেক কসমোপলিটান। ব্যাঙ্গালুরুতে এখন রেসিয়াল ডিসক্রিমিনেশন শুরু হয়ে গেছে। পরে ঝামেলায় পড়তিস"

আসল কথাটা বলতে পারছে না ঐত্রেয়ী। সেদিন রাতে মিলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মিলনের কথা। এ রকম তো আকছারই হয়। প্রতিদিন পৃথিবীর লাখো ঘরে মিলনের যজ্ঞ হচ্ছে। স্বামী-স্ত্রী, প্রেমিক-প্রেমিকা, পরস্ত্রী, বেশ্যা থেকে পাঁচতারা এসকর্ট সার্ভিস, কর্পোরেট থেকে শো-বিজ। এমনকী বিদেশে কর্মরত স্বামীর সৌভাগ্যবতী একাকী স্ত্রী। আমাদের ভাষায়, বৌদি। লিস্টের কী শেষ আছে? যদিও সেদিনের সন্ধেতে মিলনের সঙ্গে মিলন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

উদ্বিগ্ন ঐত্রেয়ী জিজ্ঞেস করল "পুলিস তোকে আর প্রশ্ন করেনি?"

"চেষ্টা করেছিল। তুই না থাকাতে বেশিদূর এগোয়নি। সোহম মারা যাওয়ার সময় তুই তো কলকাতায় ছিলি না। আর কী করবে?"

"সোহমকে নিয়ে তোকে?"

"নাঃ। সুনেত্রাকে নিয়ে" ছ্যাঁত করে উঠল ঐত্রেয়ীর বুকটা।

"সুনেত্রাকে এখানে এল কোত্থেকে?"

"তোকে বলাই হয়নি। সুনেত্রা মুম্বাইতে ওর ফ্ল্যাট থেকে পড়ে মারা গেছে। ওরা হোমিসাইড সাসপেক্ট করছে"

ভয়ে শিউরে উঠল ঐত্রেয়ী। মনে পড়ল কলেজের দিনগুলো, যখন ওরা চারজনে প্রিন্সেপ ঘাটে ফুচকা খেত। ঐত্রেয়ী ফুচকা খুব ভালোবাসত। সুনেত্রাও ছিল গোলগাপ্পার ভক্ত। সোহম আর মিলন থেমে গেলেও, ঐত্রেয়ী ও সুনেত্রা থামত না। যেরকম করেই হোক ঐত্রেয়ীকে গোলগাপ্পার কম্পিটিশনে হারাতে হবে। কম্পিটিশনটা শুধু গোলগাপ্পার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে আরও প্রকট হয়ে উঠেছিল। ঐত্রেয়ীর সঙ্গে পাল্লা দেওয়াটা সুনেত্রার খেলা। প্রথম প্রথম বুঝতে পারেনি। পরে বুঝেছিল, সোহমকে পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

সুনেত্রার থেকে মানিকতলার মধ্যবিত্ত পরিবারের ঐত্রেয়ী সোহমের বেশি কাছের। দুজনেই একই গোত্রের। বাবা রিটায়ার করছে। বোনের বিয়ে বাকি। সোহমের মাথায় তখন অনেক চিন্তা। কাঁধে অনেক দায়িত্ব। ভালোবাসাকে ধরে রাখতে চেয়েছিল ঐত্রেয়ীর হাত ধরে, যে নিজেকে মানাতে পারবে তার মধ্যবিত্ত পরিবারের বেষ্টনীতে।

সোহম বলত "সুনেত্রাকে ঘাড় থেকে কী করে নামাই বল দেখি?"

"চাকরিতে ঢুকতে যেও না। পিএইচডি কর"

"চার বছর কিংবা আরও বেশি"

"হোক না। ক্ষতি কী? আমি অপেক্ষা করব"

"রিটায়ার্ড বাবা টানতে পারবে? প্রিয়ানার বিয়েও তো বাকি"

“দেরি আছে। সবে তো উচ্চ-মাধ্যমিক পড়ছে। কলেজ ইউনিভার্সিটি শেষ করবার আগে তোমার পিএইচডি হয়ে যাবে। আমি অপেক্ষা করব তোমার জন্য”

“এতদিন কী করবে?” সোহম প্রশ্ন করেছিল।

“কোথাও চাকরি নিয়ে নেব” ঐত্রেয়ী উৎসাহ দিত।

“বাবা বিয়ের চাপ দিলে?”

“বলব কেরিয়ার করতে চাই। ও নিয়ে ভেবো না। ম্যানেজ হয়ে যাবে”

তাই দ্য নিউ এজে চাকরি। সোহমকে কাজে মন দেওয়ানোর জন্যই ব্যাঙ্গালুরুতে।

পরিতোষ সেনের জেরাকে বন্ধু হিসেবে ওড়ালেও, ভেতরে গভীর ব্যথা। জীবনের স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা ওকে ধরেই। বেঁচে ছিল ওর মুখের দিকে চেয়ে। যেদিন মারা যায়, সেদিনও কত কথা। কে মারল? কেন মারল মধ্যবিত্ত ব্রিলিয়েন্ট ছেলেটিকে? ভেবে পায়নি ঐত্রেয়ী। পরে ভেবে দেখেছে, বেশ কিছুদিন ধরেই সোহমকে উদাস দেখাচ্ছিল। জিজ্ঞেস করলে বলত “ও কিছু না। থিসিস নিয়ে নানা চিন্তা...”

ঐত্রেয়ী সোহমকে চেনে। এড়িয়ে যাচ্ছিল সোহম। কিছু একটা... কী? সুনেত্রা? মনে হয় না ওর সোহমকে বিচলিত করার এত ক্ষমতা। তবে কী অন্য কিছু? যা সোহম বলতে পারছিল না। ব্যক্তিগত আবেগকে পেছনে ফেলে ঐত্রেয়ীর মাথায় বেরোবে কী করে?

সোহমের মৃত্যুর পর ছুটি নিয়ে ছুটেছিল কলকাতায়। মিলনের সঙ্গে দেখা করতে। পরিতোষ সেন জানে না।

“ব্যাপারটা কী রে? পুলিস তোকে কতবার জেরা করেছে?” মিলনের পিজি অ্যাকমোডেশনে বসে প্রশ্ন।

“বেশ কয়েকবার। প্রথমবার সোহমের সঙ্গে কার চেনা জিজ্ঞেস করতে তোর নামটা বলতে বাধ্য হলাম। তোকে ফোন করেছিল?”

“হ্যাঁ। নন-স্পেসিফিক ভাবে উড়িয়ে দিয়েছি। তোকে?”

“বেশ কয়েকবার”

“এতবার কেন?”

“কী জানি। প্রথমবারের পর ধামাচাপা পড়লেও পরে বেশ কয়েকবার জেরা করে। বোধহয় ওপর-মহল থেকে চাপ এসেছে”

“আমার ভীষণ ভয় করছে রে” ঐত্রেয়ী ভীত হয়েই বলেছিল।

“কেন?” মিলনের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি।

ঐত্রেয়ী মিলনের পাশে বসল। মিলনের হাত চেপে কাঁপা গলায় বলল “আমাদের কিছু হবে না তো রে? খুনের মামলা। বড্ড ভয় করছে”

ঐত্রেয়ীর স্পর্শে মিলনের শরীরে ইলেকট্রিক কারেন্ট। আগেও তো ওর সঙ্গে কত আড্ডা-গল্প-সিনেমায় কাটিয়েছে। এমন তরঙ্গ তো আগে খেলেনি। এখন কী সোহম নেই বলে? নাকি, দুর্বলতম মুহূর্তে একে অপরের সঙ্গী। মনের নয়। ছ্যাঁক করা কারেন্ট মিলনের সুপ্ত চাওয়াকে অন্য মাত্রা দিচ্ছে। বহুদিন আগে ইচ্ছে হয়েছিল সুনেত্রাকে চুমু খেতে। দূরে সরিয়ে দিয়েছিল তখন, সোহমের প্রেমে হাবুডুবু। পথের কাঁটা ঐত্রেয়ীকে কী করে সোহমের মন থেকে মুছে ফেলা যায়, সেই চিন্তায় মগ্ন।

“আমারও” মিলনও ভীত।

আবেগে ঐত্রেয়ীকে জড়িয়ে চুমু খেল। ভয় একে অপরের উষ্ণতায় আশ্রয় খুঁজছে। শ্যামলা মুখ ফ্যাকাশে থেকে বেগুনি।

“কী করছিস? ছাড়” ইচ্ছা-অনিচ্ছা মেশানো ঐত্রেয়ীর দেহ কেঁপে উঠল। সুপ্ত কামনা সোহমের অনুপস্থিতিতে মিলনকে নাড়িয়ে দিয়েছে। তবুও... মধ্যবিত্ত সংস্কারে বিবেকের দংশন। দৈহিক আবেগ

ফুলশয্যার রাতের জন্য। এটাই প্রথা, মধ্যবিত্ত রীতি। আজ ভয় সব রীতিকে চুরমার করতে চাইছে।

ঐত্রেয়ীকে আরও নিবিড়ভাবে জড়িয়ে বলল "ভীষণ ভয় করছে রে। কোন চক্রে ফাঁসলাম। তুই আমার পাশে থাক"

ঐত্রেয়ীও উষ্ণ আলিঙ্গনের মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজছিল। সোহমের মৃত্যুর পর পুলিশি জেরায় নিজেও অসহায়। সম্বল খুঁজছিল। এখন মনে হচ্ছে মিলন সেই সম্বল। বাবাকে বললে হার্ট ফেল করবে। গোঁড়া ব্রাহ্মণ রক্ষণশীল পরিবার। নিতে পারবে মনে হয় না। ঐত্রেয়ী বিয়েতে সম্মতি দেয়নি বলে মনে দুঃখ। এখন যদি সোহমের মৃত্যুতে পুলিশি জেরায় পড়েছে শোনে, যেটুকু বিয়ের আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাও নিভে যাবে।

মিলন আঁকড়ে ঐত্রেয়ীকে। দেহে বয়ে চলেছে নিঃশব্দ লহরা। বুকে বাজছে ভয় মিশ্রিত চেনা না-জানা আশ্রয়ের স্পন্দন। কয়েক মুহূর্ত। মিলনকে সরিয়ে বলল "কী করি বল তো?"

"চল, কয়েকদিন কলকাতার বাইরে কেটে পড়ি। ভুলিস না, পুলিস কিন্তু আমাদের ওপর নজর রাখছে"

"কোথায় যাবি?"

"একটু ভাবি" ঐত্রেয়ীকে ছেড়ে মিলন ভাবছে। কোথায়? ঐত্রেয়ী ঘরের কোণে স্টোভ জ্বালিয়ে বলল "চা খাবি? করছি"

"বেশ কর" মিলনের মাথায় তখন অন্য চিন্তা।

ঐত্রেয়ীর থেকে চায়ের কাপ নিয়ে বলল "কাঁথিতে"

"হঠাৎ কাঁথি কেন?"

"ওখানে ছোটবেলার বন্ধু তরুণের পৈতৃক বাড়ি। ওরা কলকাতায় থাকে। মাসে একবার যায়। ওখানে বসে ছক কষে নিতে পারব, কীভাবে পুলিসকে ঘাড় থেকে নামানো যায়। হোটেলে গেলে পুলিস ট্রেস করতে পারে। ভাবিস না। একদিন থেকেই চলে আসব"

চিন্তা থেকে মুক্তি। যেখানে কোথাও। ঐত্রেয়ী পুলিস থেকে পালাতে চাইছে। যদি জানতে পারে কলকাতায় এসেছে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দেবে। তার আগে ছকটা তৈরি করা দরকার। এই দোলাচলে কলকাতায় সম্ভব নয়, তাই কাঁথি।

নন্দকুমারের ডানদিকে হলদিয়া এক্সপ্রেসওয়ে ছেড়ে বাস যখন রামনগরের রাস্তা ধরল, মুহূর্তের জন্য হলেও, বাঁ দিকের সবুজ ঘাসের গালিচায় তাকিয়ে অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান ভুলে গেছিল ঐত্রেয়ী। এই সবুজটা ব্যাঙ্গালুরুতে নেই। কাজের ফাঁকে শহর ছেড়ে বেরবার সুযোগ হয়নি। একাকিত্বে আশ্রয় খুঁজছিল দিল্লি যাওয়ার আগে। নিজের ভিটেমাটিতে। মিলনের ঠোঁটের উত্তাপে তার স্পর্শ। ওকে ঠিকভাবে চালাতে পারলে, পুলিস তাকে নাড়াচাড়া করবে না। এটা কাঁথি শহরে নয়। স্ট্যান্ডে নেমে জানল গ্রামটার নাম চাঁপাতলা। ট্রেকারে আট-দশ কিলোমিটার। ঐত্রেয়ী আগে ট্রেকার চাপেনি। ইতস্তত করছিল। অতটা ধকল। এখন কিছু করার নেই, যেতেই হবে। না হলে রাতে মাথা গুঁজবে কোথায়?

বুঝতে পেরে মিলন বলল "অত ঘাবড়াচ্ছিস কেন? গান গাইতে গাইতে সময় পার করে দেব"

পিচরাস্তা মিশে গেল গ্রামের মেঠ পথে। মোটরবাইকে নয়। এই পথ যদি না শেষ হয় গলা থেকে বেরচ্ছে না। আর কদ্দূর? কখন শেষ? একসময় থামল। ছিমছাম নীল রঙের একতলা তরুণদের বাড়ি। সামনে ছোট্ট বাগান। আগাছার সমারোহ। বোঝাই যায়, দেখভাল ঠিক মতো হয় না। দূরে মাঠ পেরিয়ে কয়েকটা মাটির বাড়ি। আসবার সময় দু-একটা পাকা বাড়ি চোখে পড়েছিল। চারদিকে ধু ধু মাঠ। জায়গাটা রোম্যান্টিক। তবে ভ্যানরিক্সার ধকলে ঐত্রেয়ীর রোম্যান্স ক্লান্তিতে। খাট আছে তো? না মাটিতে শুতে হবে? নীল দরজার তালা খুলল। ঢুকতেই বসার ঘর। বেতের সোফা। গদিগুলো বেশ পুরনো। পাশে ছোট্ট ডাইনিং স্পেস - প্লাস্টিকের টেবল, চারটে চেয়ার। পেছনের ঘরটা বোধহয় কিচেন। দু-পাশে দুটো ঘরে খাট, ড্রেসিং টেবল, আলনা। সংলগ্ন বাথরুম।

ঐত্রেয়ী বাথরুমে উকি মেরে আঁতকে উঠল "উফঃ"

“কী হল?” মিলন পেছন থেকে উঁকি মারল।
“আরশোলা”
“বুড়ো হতে চললি, এখনও আরশোলার ভয় গেল না?”
“খারাপ নয়” ঐত্রেয়ী খাটে পা দুলিয়ে বলল “একটু ডেসার্টেড। আশেপাশে বাড়ি ঘরদোর নেই” বিছানায় গা এলিয়ে দিল। সাড়ে চার ঘণ্টা বাস জার্নি। আরও ঘণ্টাখানেক ভ্যানরিক্সায়। পিঠে ব্যথা ধরে গেছে।
জানলা খুলে মিলন অবাক “দেখ দেখ। এদিকে আয়”
অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠল। পেছনে ছোট বাগান। ছোট ছোট ঘাস। বড় না হলেও ঘরের তুলনায় পরিষ্কার। কোণে একটা কুয়ো। ওপাশে পুকুর। চারদিকে নিচু নামকে ওয়াস্তে পাঁচিল। পাঁচিল ঘেঁষে ফুলগাছের সারি। এই অজানা সবুজ মরুভূমিতে কেই বা ঢুকবে?
“লাভলি। মাল খেতে খেতে ছক করে নেব। চল তো। খাবার হোটেল আছে কি না দেখি”
“তোর মাথা খারাপ? এই গ্রামে হোটেল খুঁজতে বেরচ্ছিস?”
“খেতে তো হবে। মালও কিনতে হবে”
ভুলেই গেছিল মফসসলের গ্রামে খাবারের বন্দোবস্ত থাকা স্বপ্নাতীত। যেখানে খাবার দোকান নেই, সেখানে মাল। মিলন কি রোম্যান্টিক স্বপ্ন দেখছে?
খাটে গা এলিয়ে ঐত্রেয়ী বলল “মাথা খারাপ। তোকে কাঁথিতে ফিরতে হবে। খাবার, মাল যা পারিস কিনে আন। বড্ড টায়ার্ড লাগছে। একটু স্নান করে ফ্রেস হয়ে নিই। আমার বেরতে ইচ্ছে করছে না। যাবার আগে কুয়ো থেকে দু-বালতি জল তুলে দিয়ে যাস”
ভর্তি বালতিগুলো কলঘরে রাখল “খাটিয়ে নিচ্ছিস। সুদে আসলে শোধ দিতে হবে বলে রাখলাম”
মিলন বেরিয়ে যাচ্ছিল। দরজা বন্ধ করবার আগে ঐত্রেয়ী বলল “হুইস্কি কিন্তু খাব না। ভডকা, না হলে বাকার্ডি। ট্যাঙ্গোর বোতলও আনতে ভুলিস না”
“দেখি কী পাওয়া যায়। নইলে কালিমার্কা তিন। আর খাবার?”
“যা পাবি। এখানে কি কোনও চয়েস আছে? তুই এখনও কলকাতায় পড়ে আছিস। আসার আগে তরুণকে জিজ্ঞেস করে নিলে পারতিস। কাঁথিতে নেমে কিনেই একবারে ঢুকতাম”
সত্যি তো। ভুল হয়ে গেছে। ঐত্রেয়ীকে নিয়ে আসার আনন্দে ভাবেনি। ঐত্রেয়ী দরজা বন্ধ করে ব্যাগ থেকে তোয়ালে কাফতান বার করে কলঘরে ঢুকল। সালোয়ার-প্যান্টি-ব্রা ছেড়ে ফেলেছিল। খেয়াল হল, সাবান আনতে ভুলে গেছে। নগ্ন অবস্থাতেই ঘরে থেকে সোপ-কেস নিয়ে কলঘরে। এখানে তো দেখার কেউ নেই। ঘুণাক্ষরেও আঁচ করেনি দু-জোড়া চোখ ওর ওপর নজর রাখছে।

“তুই আমার নামটা বলতে গেলি কেন?”
“না বললেও ওরা খুঁজে বের করত। কথায় বলে বাঘে মারলে দশ ঘা, পুলিসে মারলে একশো। তোর ফোন নম্বর না দিলেও ওরা ঠিক খুঁজে বার করে তোর বাড়িতে ধাওয়া করত। মেসোমশাইয়ের কথা ভেবেই দিয়ে দিলাম। পুলিস তোর বাড়িতে জেরা করতে এসেছে জানলে, তোর কী হত বল দেখি?”
ঐত্রেয়ী মাথা নাড়ল। ঠিকই বলছে মিলন। পাড়াপড়শি আছে। ওরা দুজনে ছাড়া তো আর কেউই কিছু জানে না। বৃহত্তর স্ক্যান্ডল থেকে ওদের দুজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ।
প্লাস্টিকের চেয়ার দুটো টেনে পেছনের বাগানে কথা বলছিল। বেশ হাওয়া দিচ্ছে। দক্ষিণ দিক বোধহয়। সূর্য পশ্চিমে আলো-আবছায়ার লুকোচুরি খেলছে। পাঁচিলের ওপারে বিস্তৃত ধু ধু মাঠ। বসতি খুবই কম, নেই বললেই চলে। একা প্রকৃতিকে উপভোগ করার জনহীন নৈসর্গিক নীরবতা। কোলাহল থেকে দূরে এই নীরব প্রকৃতির মধ্যে প্রাণভরে শ্বাস নিতে চাইছিল। মিলনের আনা সিঙাড়া আর পেঁয়াজি সম্বল।
“চা আনলাম না। ফ্লাস্ক নেই। ঠান্ডা হয়ে যাবে। একটু পরেই তো ভডকা। এখন পেঁয়াজি খা”

স্টিলের থালা এগিয়ে বলল "তোর চুলটা এখনও ভিজে"

শ্যামলা ঐত্রেয়ী কোনওকালেই সুন্দর ছিল না। সায়েন্স স্ট্রিমের মেয়েরা তেমন সুন্দর হয় না। হিউম্যানিটিজের মেয়েরা ইন জেনারেল অনেক বেশি সুন্দরী। সালোয়ার বা শাড়িতে ঐত্রেয়ীর শ্যামলা মাধুর্য আগে চোখে পড়েনি। বাংলার এই ছোট্ট গ্রামের একতালা বাড়ির বাগানে, কাফতান পরা ঐত্রেয়ীকে মধুময় লাগছে। সেটা কী ওর রূপের বাহার? না গোধূলির পড়ন্ত আলোয় ঔজ্জ্বল্য? শেষ প্রহরের রশ্মির মাখামাখিতে দেখতে পাচ্ছে ঐত্রেয়ীর আরেক রূপ। সুপ্ত কামনার অপূর্ণতায় লুকিয়ে থাকা পৌরুষকে নাড়িয়ে দিচ্ছে, জাগিয়ে দিচ্ছে, সুপ্ত রুদ্ধ চাওয়ার অভিলাষে। মিলন উঠে পড়ল।

"কোথায় যাচ্ছিস?"

"দাঁড়া আসছি"

ভডকা ট্যাঙ্গোয় মিশিয়ে বলল "পেঁয়াজি উইথ ভডকা ইন রুর‍্যাল বেঙ্গল। এ সুযোগ আর আসবে না। কাল নয় ভাবা যাবে, কী করব? আজকে এই মুহূর্তকে উপভোগ করি"

তখনও সূর্যের শেষ রশ্মি বিদায় নেয়েনি। দালানের পেছনের বাতি পড়ন্ত আলোয় ছন্দ মিলিয়ে প্রকট। মাঠের নির্জনতা আর ভডকার রেশ সুপ্ত পৌরুষকে বারবার নাড়া দিচ্ছে। উঠে ঐত্রেয়ীকে জড়িয়ে ধরে চুমু। ঐত্রেয়ীর মাথায় ভডকার কিক। সেও বহুদিন আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজছিল। মিলনকে জড়িয়ে চুমু খেল। ওর স্তন নিয়ে খেলছে। খেলুক। এই মুহূর্তে সে এটাই চায়। উন্মাদনায় ধরাশায়ী করে দিল। না... না... না। এভাবে নয়। কাফতানটা ঐত্রেয়ীর কাঁধের ওপরে তুলে ফেলে দিল ঘাসের ওপর। জিনসের বেল্ট খুলে বিবস্ত্র।

"কেউ যদি দেখে ফেলে?"

"এখানে কেউ নেই। শুধু তুই আর আমি"

সবুজ ঘাসের নরম গালিচায় বিবস্ত্র শুয়ে গোধূলির নেভা সূর্য, জ্বলা তারার দিকে তাকিয়ে, কজনেরই বা সৌভাগ্য হয়েছে প্রাকৃতিক ছন্দে সম্ভোগের আনন্দ? ঐত্রেয়ী মিলনকে আঁকড়ে ভাসতে চাইল গাঙচিলের মতো, সবুজ ঘাসের দেশে। নিম্নাঙ্গে কে যেন দামামা বাজাচ্ছে। ভিজিয়ে দিচ্ছে। জ্বলন্ত অঙ্গের অন্তরে লিখে দিতে চাইছে পৌরুষের রূপ। নগ্ন অঙ্গীকারে ঢেলে দিচ্ছে পুঞ্জীভূত আবেগ।

উন্মাদনায় বুঝতেও পারেনি, দু-জোড়া চোখ শুধু নয়, লেন্সের ঝুমও কাজ করছে যৌবনের উচ্ছ্বাসের আড়ালে।

সুনেত্রার মৃত্যুর সংবাদ বারবার কড়া নাড়ছে বুকে। কেঁপে উঠল ঐত্রেয়ী। কোথায় চলেছে সে?

মিলনকে ফোনে বলল "সুনেত্রা মারা গেল কী করে?"

"জানি না। তবে শেষ ফোনটা আমি করেছিলাম। তাই পুলিস আমায় বারবার জেরা করছে। আরও একটা জালে জড়িয়ে পড়লাম" মিলনের চিন্তিত স্বর বুঝিয়ে দিচ্ছে, সে এখনও পুলিসের স্ক্যানারে।

দম নিয়ে বলল "দিল্লি যাওয়ার আগে একবার কলকাতায় ঘুরে যা"

ফোন কেটে দিল ঐত্রেয়ী। বেশ বুঝতে পারছে তাকে কী করতে হবে।

আঠাশ

রোশনের ফোন পেয়ে অবাক হল স্নেহাশিস "অব মুঝে বাঙ্গাল মে তেরে পাস জানা পড়েগা"

"কোই নই খবর?"

"এক নেহি, বহত সারে"

"ফির চলা আ"

রোশনকে আনতে যাওয়ার সময় স্নেহাশিস ভাবছিল, কী এমন ব্যাপার, ফোন-ফ্যাক্স-ইমেল ফেলে রোশন কলকাতায় আসছে?

গাড়িতে রোশন বলল "কুছ গেহেরাই চক্কর হ্যায়"

"কিউ? বাত কেয়া হ্যায়?"

"লালবাজারকে অফিস মে বৈঠ কর সব বতাউঙ্গা। তেরা রিপোর্ট ফাইল মুঝে দেখনা হ্যায়"

লালাবাজারে মধুসূদন মুখুজ্জের ঘরেই স্নেহাশিস ঢুকল রোশনকে নিয়ে। ওখানেই সব রিপোর্ট।

ওদের ঢুকতে দেখে মধুসূদন বলল "কী ব্যাপার?"

রোশনকে মধুসূদন মুখুজ্জের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে স্নেহাশিস বলল "আমরা এখানেই বসে কথা বলব। আপনার অসুবিধা হবে না তো?"

"একেবারেই নয়। তবু আপনারা এলেন। এ ঘরে তো কোনও পুলিস অফিসার ঢোকেন না। আর্দালি দিয়ে ফাইল পাঠিয়ে দেন। আমি বেরিয়ে যাব?"

স্নেহাশিস চেয়ার বসে রোশনকে অন্যটা এগিয়ে দিল। মধুসূদনকে বাধা দিয়ে বলল "না, না। আপনিও বসুন। আপনার সাহায্য লাগবে। বাত কেয়া রোশন?"

"থোরা পানি" ঢকঢক করে জল খেল "ম্যায় সন্নিধি কো লিলাভতি মে পুছতাছ করনে কে লিয়ে গয়া থা। উসনে কহা ম্যাথেরনওয়ালা অ্যাকসিডেন্ট ডেলিবারেট থা"

মধুসূদন হাতে স্বর্গ পেল। যা ভাবছিল, সেটা ঠিক। লিঙ্ক আছে। সিবিআই-এর ডেপুটি কমিশনার অনঙ্গ দত্তের আশ্বাস সত্ত্বেও লাল সুতোর মারপ্যাঁচে যে খবর তার কাছে পৌঁছয়নি, সেই জলজ্যান্ত মানুষটাই ফার্স্ট হ্যান্ড ইনফরমেশন নিয়ে এসেছে। পল্টুর দোকানের আড্ডা কেমন উদ্দেশ্যহীন ধোঁয়ার দিকে যাচ্ছিল। এবার ধড়ে প্রাণ এল।

স্নেহাশিস জিজ্ঞেস করল "বাই হুম?"

"দ্যাটজ দ্য মিলিয়ান ডলার কোয়েশ্চেন। সন্নিধি কো পুছা 'উস রাত কাঁহা যা রেহে থে?' ও বোলা 'ভওয়ানিশঙ্করকা আশ্রম মে' ফির পুছা 'অঙ্কুর জিন্দা হ্যায়?'

"অঙ্কুর কৌন?"

"জো লড়কা উস রাত গাড়ি মে থা। ওহ লোগ মুম্বাইকে ইনসমনিয়া সে নিকল কর ভওয়ানিশঙ্করকে আশ্রম মে যা রহে থে। সবহি থোরা বহত পিয়ে হুয়ে থে। সোফি গাড়ি চলা রহি থি। পাস মে বৈঠা থা অঙ্কুর। পিছে শিবানী করঞ্জোয়ালা ঔর সন্নিধি" রোশন থামল।

"কেয়া সন্নিধি ঔর অঙ্কুর কা কোই চক্কর থা?"

"হাঁ। বাদ মে ঐসি হি কুছ শুনা। ঔর ইয়ে ভি শুনা তেরা সুনেত্রা আগারওয়াল সে ভি তালুক থা"

"উসকে পোস্ট মর্টেম সে কুছ মিলা?"

"সয়েদ খুদকুশি। উসকে ভিসেরা সে কই ড্রাগ মিলা। ইয়ে কমবক্ত মেডিক্যাল ড্রাগ ইয়াদ নেহি রহতা..." পার্স থেকে চিরকূট বার করে পড়ল "রোহিপনল ঔর মেটামফেটামাইন কে ট্রেস মিলা"

আকাশ থেকে পড়ল স্নেহাশিস। এ আবার কী? মধুসূদন তড়িঘড়ি কাগজে ওষুধের নামগুলো লিখছিল।

"ওহ কেয়া?"

"হমে পতা নেহি। ডক্টর লোগ সে পুছতাছ করনে কে বাদ মালুম চলা রোহিপনল আজকে বচ্চে পার্টি মে ইউজ করতে। পার্টি ড্রাগস। রোহিপনল বাজার মে রুফি ইয়া রসে নাম সে চলতি"

"কিসিকো খতম কর সকতা হ্যায়?"

"উনলোগ বোলে, নেহি। ইসকে কোই কলর ভি নেহি, টেস্ট ভি নেহি। কোক ইয়া পেপসি সে মিলা কর লেনে মে কনফিউশন হোতা হ্যায়"

"দুসরাওয়ালা?"

"মেটেমফেটামাইন বাজার মে চলতা 'স্পিড', 'আইস', 'চক', ইয়া 'মেথ' নাম সে। ইয়ে ড্রাগ লেনে সে ভায়োলেন্ট সাইকোটিক বিহেভিয়ার ঔর সোচনা বিগর সকতা"

"ফির তো ইয়ে সুইসাইড" স্নেহাশিস মন্তব্য করল।

নামটা কাগজে লিখে মধুসূদন শুনছে। কোনও মন্তব্য করছে না।

স্নেহাশিস "ইয়ে লড়কি সুনেত্রা কেয়া পার্টি মে যাতি থি?"

"কেয়া মালুম? পুছতাছ করনে মে কোই বোল নেহি সকা"

"উসকে কম্পিউটার মে সন্ত লোগকে পিকচার। লেকিন কোই পার্টিকে তসভির নেহি। হাঁ, কই ব্লু ফিল্ম ভি থা। হো সকতা। লড়কি একেলা মুম্বাই মে। উমর ভি জাদা নেহি। ব্লু ফিল্ম দেখনা কোই বড়ি বাত নেহি। সন্নিধি সে পুছা উনলোগ পার্টি মে যাতে থে ইয়া নেহি?"

"পুছা থা। সুনেত্রাকে বারে সন্নিধি ইনকার কিয়া"

মধুসূদনের অদ্ভুত লাগছে। যে মেয়েকে কেউ কোনও পার্টিতে দেখেনি, সে পার্টি ড্রাগ খেয়ে ঝাঁপ দিল - ঠিক মিলছে না। তার পরেও ওরা বলছে সুইসাইড। হঠাৎ সুসাইড করতেই বা যাবে কেন? মেয়েটি কী ডিপ্রেশনে ভুগছিল? পার্টি ড্রাগ খেয়ে সুসাইড করা যায়, জানবেই বা কী করে? হিসেবে ঠিক মিলছে না। এটা যদি হোমিসাইড হয়, কে করাল? তাহলে কী এটা আইসোলেটেড ইনসিডেন্ট? অন্য মার্ডারগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক আছে? সুনেত্রাকে অন্য মৃত্যুগুলোর সঙ্গে ফিট করাতে পারছে না।

স্নেহাশিস বলে চলেছে "লড়কি কো মালুম থা ওহ লোগ ম্যাথেরন যা রহে থে। ঔর কোই জানতা থা?"

"সন্নিধি বোলে, ঔর কিসে পতা নহি থা। শিরিফ ভওয়ানিশঙ্কর ঔর চতুর্বেদী। শিবানী করঞ্জোয়ালাকো ভওয়ানিশঙ্কর সে কুছ বাত হুয়া"

"শিবানী করঞ্জোয়ালা কৌন?"

"হাই সোসাইটি মৌসি"

"রাতকো মৌসি নাইট ক্লাব সে কুছ লড়কি লে কর ভওয়ানিশঙ্করকে আশ্রম মে যা রহি থি। ডাল মে কুছ কালা লাগতা হ্যায় রোশন"

"হো সকতা। ডেলিবারেট অ্যাকসিডেন্ট সে ইসকা রিস্তা এস্টাবলিস করু কৈসে?"

"ভওয়ানিশঙ্কর কো পুছতাছ কর"

"কিয়া থা"

"কেয়া বোলা?"

"ম্যাথেরনমে উসকা বড়া আশ্রম। ওহ বোলা উসে মালুম থা ওহ লোগ উধর আনেওয়ালে থে। বাদ মে অ্যাকসিডেন্টকে খবর শুনা"

"ইস মে ভওয়ানিশঙ্করকে কোই চক্কর নেহি তো?"

"কেয়া মালুম? সাধু-সন্ত আদমি। লাখো ভক্ত। হাজারো আশ্রম মে হর দিন আতে। উনলোগ ভি আনেকা ইচ্ছা প্রাকাশ কিয়া হোগা। ইসমে গলতি ইয়া বুড়াই তো নেহি"

"ভওয়ানিশঙ্কর কিসিসে ইয়ে কাম ভি করা সকতা"

"উসকে খিলাপ কোই এভিডেন্স নেহি"

"ইয়ে চতুর্বেদী কাঁহা সে আয়া?"

"পুছ তেরে শিরিনকো। ইসলিয়ে হমে ইহা আনা পড়া" আশিক বলতে গিয়েও থেমে গেল। পাশে যে মধুসূদন বসে! স্নেহাশিসের মাথায় বজ্রাঘাত। শিরিনও কী এই চক্করে? শিরিন কী পালটে গেছে? স্নেহাশিস কলেজ জীবনের স্মৃতি আঁকড়ে ওর যৌবনকে আলিঙ্গন করেছিল, যদি মেহুলির মৃত্যুর নতুন তথ্য পাওয়া যায়। মাথায়ও খেলেনি, শিরিনও চক্রের জড়িয়ে থাকতে পারে। ভুল একটা হয়েছে। সাহেবরা ঠিকই বলে 'নেভার মিক্স বিজনেস উইথ প্লেজার'। অজান্তেই ভুলটা করেছে।

মেহুলি বিজনেসের সঙ্গে শিরিনের হৃদ্যতাকে মিশিয়ে, প্লেজারে পুলিসি স্ক্যানারের বাইরে রেখেছে। কেন শিরিন অনেক কিছু চেপে গেছে? অনুমান করেছিল, সুনেত্রার কম্পিউটারে ওর ছবি দেখে। তবুও আসার আগে কেন প্রশ্ন করেনি। প্রশ্ন করলে যথোপযুক্ত জবাব পেত কি না সন্দেহ। আষাঢ়ে গল্প তৈরি করে বলত। বাস্তব প্রমাণ রোশন। শিরিনকে পুলিসের চোখে ছানবিন করতে হবে, ঘাঁটিয়ে দেখতে হবে, সে এই চক্রে কোথায়।

রোশন কিছু বলতে যাচ্ছিল, মধুসূদন বাধা দিল "থোরা চায় বোলে?"

"জরুর" রোশনের সম্মতিতে চায়ের অর্ডার "জো তুনহে সুনেত্রাকা কম্পিউটার মে দেখা, ওহ আদমি স্যানট্রো লে কর শিরিনকে উহা আয়া। উসিকে টুটি তসভির মেহুলিকে সিন অফ ক্রাইম সে মিলা। কম্পিউটার এক্সপার্ট গ্রফিক্স মে সুপারইমপোজ কর কে কনফার্ম কিয়া, দো পিকচার একহি আদমিকে। লেকিন মুম্বাইকে রেকর্ডস মে কুছ নেহি। ফির উধর কেয়া কর রহা থা?"

মধুসূদন কান খাড়া চোখ বড় করে শুনছে। মানে মেদিনীপুরের খুনের সঙ্গে মুম্বাইয়ের একটা যোগসূত্র আছে। আজ যদি রোশন না আসত, জানতেও পারত না। রিপোর্ট পড়ে কী সব তথ্য পাওয়া যায়?

রোশন বলে চলেছে "উস আদমিকে সিলসিলে মে ডিপার্টমেন্ট মহারাষ্ট্র ছান মারা। কহিঁ ভি ট্রেস নেহি"

"ফির ওহ কাঁহা সে আয়া?"

"সয়েদ বঙ্গাল সে। ইসলিয়ে ম্যায় ইহা"

"মধুসূদনবাবু, মেহুলি মার্ডার আর মানিকতালা খালের ধারের খুনের ফাইল দুটো বার করুন"

অনাদি চা রাখতে, মধুসূদন ওকে বলল "মেদিনীপুর মার্ডার কেস আর মানিকতলার মার্ডার কেসের ফাইল দুটো বার কর"

"চতুর্বেদী?"

"শিরিন সে পুছ। চতুর্বেদী শো-বিজ ওয়ার্ল্ডকা বড়া ডন হ্যায়" অ্যাটাচি থেকে একটা ছবি এগিয়ে বলল "ইয়ে আদমি কো পহেচানতা? ইসকে সাথ সুনেত্রাকে ডেথ কা গহেরা তালুক হ্যায়। এহি উসদিন স্যানট্রো মে আয়া থা। উসকা পতা লাগানা পড়েগা। ইয়ে আদমি মেহুলিকে মার্ডারকে টাইম উঁহা থা"

"পুছতাছ মে তো ঐসে কোই এভিডেন্স নেহি মিলা। কেয়েরটেকারকে রেজিস্ট্রি বিনা"

ফাইলের পাতা উল্টিয়ে মধুসূদন বলল "একটা কথা বলব স্যার। ভালো হিন্দি বলতে পারি না। বাংলায় বলব?"

রোশন সম্মতি দিল "হাঁ"

"রিপোর্টের ইন্টারোগেশনে অসিত বলে রিসর্টের ছেলেটি বলেছিল, ধুতি ফতুয়া পরা একজনকে ওখানে দেখেছিল। সে কে আমরা জানি না। যদিও মেহুলি টাটা ইন্ডিকা নিয়ে আসে, পরে কিন্তু গাড়িটা কেউ ক্লেম

করেনি। ড্রাইভারকেও খুঁজে পাওয়া যায়নি। গাড়ির মালিক কে সেটা কী খোঁজ নিয়েছিলেন মোটর ভেহিকেলস থেকে? কে ভাড়া নিয়েছিল ট্রেস করেছেন?”

সত্যি তো। স্নেহাশিসের ভীষণ ভুল হয়ে গেছে। শিরিনের ফোনের পর থেকেই শিরিনের সঙ্গে মেহুলির লিংক নিয়ে এত ভাবছিল, যে এটা দেখাই হয়নি। এখন বুঝছে, একটা বড় লুপহোল থেকে গেছে। যেহেতু মেহুলি মুম্বাইয়ের, মাথায় কেবল মুম্বাইয়ের চিন্তা। বেঙ্গলের কথা মাথায় আসেনি।

“আরও দুটো জায়গা আমাদের দেখা দরকার। থিয়েটার রোডের ক্যাশ টিল থেকে টাকা তোলা মানে মেহুলি থিয়েটার রোড চত্বরে ছিল। মেহুলি কবে কলকাতায় এসেছিল, ফ্লাইট রেকর্ড চেক করেছিলেন? কলকাতায় কোথায় উঠেছিল বা কার কার সঙ্গে দেখা করেছিল, সেটাও জানা দরকার”

বয়স মধুসূদনকে চিন্তাশীল করেছে। ফাইলের মধ্যে সারাদিন আর কিই বা করার আছে? রিপোর্ট পড়ে ভাবনা-চিন্তা শুরু করে দেয়। মধুসূদনের অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করা যায় না। বয়স মানুষকে অনেক কিছুই শেখায়। বাইরে দেখার আগে, ত্রুটিগুলো বিশ্লেষণ করা। সেলফ অডিট।

“আরেকটা ব্যাপার... রিপোর্ট অনুযায়ী, শের-ই-পাঞ্জাব ধাবার রিসিটে ডেট আছে ৯ মার্চ। অথচ মেহুলি রিসর্টে চেক ইন করেছিল ১১ মার্চ। মাঝের দুদিন কোথায় ছিল?”

“অব সমঝা কেঁও ম্যায় কলকাত্তা আয়া? ইহা ঔর ভি বহত লুজ এভিডেন্স হ্যায়। সয়েদ মেহুলিকে মার্ডারকে সাথ, পুনেওয়ালে অ্যাকসিডেন্ট, ইয়া সুনেত্রাকে খুদকুশিকা তালুক হ্যায়”

স্নেহাশিসের এতিদন ধারণা ছিল, সে একটা ইন্ডিভিজুয়াল মার্ডার কেসের ইনভেস্টিগেশন করছে। এখন মনে হচ্ছে, হয়ত ঠিক নয়। আইসোলেটেড খুন নয়। এই খুন কোনও বিশাল চক্রের বৃন্তে ফুলমাত্র। মালার মতো জড়িয়ে। অনেক কাজ এখনও অসম্পূর্ণ। সেগুলো গোছাতে হবে। এখন দেখতে পাচ্ছে সমস্যাটা অনেকটাই জটিল।

উনত্রিশ

কাভিয়া প্রিয়াঙ্কাকে বলল "ইউ মাস্ট হেল্প মি"

দুজন একই ব্যাচের। কাভিয়া ফার্স্ট হওয়ায় দ্য হেরাল্ড অফ ইন্ডিয়াতে চাকরি পেয়ে গেছিল। প্রিয়াঙ্কা সেকেন্ড ডিভিশন পাওয়ায় 'সিনে সাউথ'-এ একটা চাকরি পায়।

"দ্রক্সা?"

"ইয়েস, দ্য মিউজিক অ্যারেঞ্জার। জাস্ট নিড অ্যান অ্যাপয়েন্টমেন্ট। নট অ্যাস এ জার্নালিস্ট। বাট অ্যাস মিউজিক লাভার লুকিং ফর এ ব্রেক। আই অলসো হ্যাভ এ প্রাইমারি ডিগ্রি ইন কর্নাটকি মিউজিক"

"কান্ট প্রমিস। উইল ট্রাই"

'সিনে সাউথ' সিনেমার মাঝারি গসিপ ম্যাগাজিন। সার্কুলেশন থাকলেও তেমন কিছু নয়। প্রিয়াঙ্কা ফিল্মি দুনিয়ার মিউজিক উইং কভার করে। তিরুপতিশ্বর মুখ তুলে চাইলেন। দ্রক্সা কাভিয়ার সঙ্গে দেখা করতে রাজি হল।

"আই অ্যাম ফ্রম কুন্নুর। দো অ্যান আইটি প্রফেশনাল, আই অ্যাম অলসো ট্রেইন্ড ইন কর্নাটকি মিউজিক। আই নো ইটজ ডিফিকাল্ট। বাট আই সাপোস ইউ মাইট ট্রাই টু গিভ মি এ ব্রেক ইন ইওর ইন্ডাস্ট্রি"

"হোয়াই? হোয়েন ইউ আর ওয়ার্কিং ইন দ্য আইটি?

মিনতি করল "মিউজিক ইজ মাই প্যাশন"

দ্রক্সা অবাক "আই অ্যাম নট এ মিউজিক ডিরেক্টর। জাস্ট এ মিউজিক অ্যারেঞ্জার"

"স্টিল অল মিউজিক ডিরেকটরস রিলাই অন ইউ। ডোন্ট দে?"

"টু সাম এক্সটেন্ট। আই অ্যাম মাইসেলফ এ বিট ডিপ্রেসড নাউ"

"হোয়াই?"

"ওয়ান অফ মাই বেস্ট মিউজিক্যাল কম্পোজিশনস উড নেভার সি দ্য লাইট"

"হাউ কাম?"

"হ্যাভ ইউ হার্ড অফ দ্য রিসেন্ট ডেথ অফ পৌরভি, দ্য রিনাউন্ড হিরোইন?"

"আই থিংক স্য ইট ইন দ্য টিভি"

"রুক্সা কমপোসড এ লাভলি টিউন, এ ভেরি পেপি নম্বর হুইচ আই অ্যারেঞ্জড অ্যান্ড রেকর্ডেড সো ভেরি ওয়েল। নাউ উইথ পৌরভিস ডেথ, দ্য প্রোডাকশন হ্যাস কাম টু এ হল্ট। গড নোস হোয়েন, ইফ অ্যাট অল, দ্যাট নম্বর উড সি দ্য ডে লাইট?"

"হাউ ডিড সি ডাই?"

"ডোন্ট নো। সি ওয়াজ এ বিজি আর্টিস্ট অ্যান্ড ডিড নট হ্যাভ লট অফ টাইম। আই সেন্ট দ্য রেকর্ডেড কম্পোজিশন ইন এ এমপিথ্রি প্লেয়ার, সো দ্যাট সি কুড হিয়ার হোয়েন ফ্রি। দিস উড হ্যাভ বিন এ মেজর হিট"

"হাউ ডিড সি ডাই?"

"গড নোস। এ বম্ব ব্লাস্ট ইন মহাবালিপুরম হোয়াইল অন এ আউটডোর শুট। নাউ আই হিয়ার দ্য ব্লাস্ট কেম ফ্রম সুইচিং অন দ্য এমপিথ্রি প্লেয়ার। নো ক্লু হাউ ইট হ্যাপেন্ড"

"ইউ গেভ হার দ্য মিউজিক?"

"নট মি পারসোনালি। আই হ্যান্ডেড ইট ওভার টু দ্য প্রোডাকশন কনট্রোলার"

“প্রোডাকশন কনট্রোলার? হোয়াটজ দ্যাট?”

“চন্দ্র নাইডু ওয়াজ দ্য প্রোডাকশন কনট্রোলার ফর দ্য মুভি। আই আস্কড হিম টু পাস ইট টু হার” দীর্ঘশ্বাস ফেলল দ্রক্সা।

“ইউ আর দ্য অ্যারেঞ্জার অফ লট অফ আদার সংস ইন আদার মুভিস” কাভিয়া কথাটা ঘুরিয়ে দিল “কুড ইউ ট্রাই মি সামহোয়ার এলস?”

পার্স থেকে সিডি দিয়ে বলল “হিয়ার আর সাম অফ মাই রেকর্ডিংস। ইফ ইউ কাইন্ডলি লিসন”

“সিওর। জাস্ট রাইট ইওর নেম অ্যান্ড মোবাইল অন দ্য সিডি। আই সিম টু লুজ পেপারস”

লিখে বেরিয়ে এল দ্রক্সার স্টুডিওর সাইড রুম থেকে। লাইনটা বুঝে গেছে। রুক্সার সুরে দ্রক্সার মিউজিক অ্যারেঞ্জমেন্টে চন্দ্র নাইডুর হাত ঘুরে এমপিথ্রি প্লেয়ার পৌঁছেছিল পৌরভির কাছে।

এবারের গন্তব্য চন্দ্র নাইডু। খোঁজ নিয়ে জানা গেল চন্দ্র নাইডু চেন্নাইতে নেই। দিল্লি গেছে কাজে। হোম ওয়ার্ক করতে গিয়ে খোঁজ পেল, চন্দ্র নাইডু নতুন প্রোডাকশনে জয়েন করেছে। সেই কারণেই দিল্লি। প্রোডাকশনের নাম ‘অ্যাজ এন্টারটেনমেন্ট’। কিছুদিনের মধ্যেই কাজ শুরু হওয়ার কথা। জোগাড়যন্ত্র করে দিল্লি-মুম্বাই হয়ে অবশেষে চেন্নাই।

মধুস্করার ওরায়ন বিউটি পার্লারে সাজিয়ে চন্দ্র নাইডুর অফিসে “হার্ড ইউ আর মেকিং এ নিউ মুভি?”

“নট মি। ইটজ ‘এজ এন্টারটেনমেন্ট’। আই অ্যাম দ্য প্রোডাকশন কনট্রোলার"

“আই অ্যাম ইন্টারেস্টেড ফর অ্যাক্টিং ইন মুভিস”

“দ্যাটজ নট ইন মাই হ্যান্ডস। অল ডিপেন্ডস অন দ্য প্রডিউসার অ্যান্ড দ্য ডিরেক্টর”

“ডোন্ট মিসটেক মি। আই ডোন্ট হ্যাভ দ্য ক্যারিসমা অফ এ হিরোইন। নাইদার দ্য লুকস। মে বি এনি সাইড রোল?” মুখটা করুণ “প্লিজ”

চন্দ্র নাইডুর মায়া হল মেয়েটির প্রতি “হ্যাভ ইউ ব্রট ইওর পোর্টফোলিও?”

ব্যাগ থেকে ছোট্ট অ্যালবাম বার করে চন্দ্র নাইডুকে দিল। অ্যালবাম উলটে বলল “এ বেবিস লুক। আই হার্ড ফ্রম দ্য ডিরেক্টর দেয়ার ইজ এ ক্যারেক্টার। আই উইল টক উইথ হিম। ক্যান ইউ লিভ দিস উইথ মি?”

“সিওর”

“দিস ইজ এ নিউ প্রোডাকশন কোম্পানি। ডোন্ট নো হোয়েদার দে ক্যান পে ইউ এ লট। বাট... নেভারদ্যলেস... দ্য প্রিভিয়াস প্রোডাকশন ওয়াজ অফ হাই বাজেট। নাউ ইট হ্যাস স্টপড”

“হোয়াই?”

“ডিডন্ট ইউ সি ইট ইন দ্য নিউস? দ্য হিরোইন অফ দ্য মুভি পৌরভি ডায়েড?”

“হাউ?”

“হার্ড ইট ওয়াজ এ বম্ব ব্লাস্ট ফ্রম অ্যান এমপিথ্রি প্লেয়ার”

“বম্ব ইন অ্যান এমপিথ্রি প্লেয়ার!”

“দ্যাটস হোয়াট আই হার্ড। ইটস মোস্ট আনফরচুনেট দ্যাট আই হ্যাড পাসড দ্য এমপিথ্রি প্লেয়ার। ইফ ওনলি আই হ্যাড নোন। আই উডন্ট হ্যাভ”

“ইউ ইওরসেলফ গেভ ইট টু হার?”

“নো। হাউ কুড আই গেট দ্য টাইম? উই ওয়ার শুটিং ইন মহাবালিপুরম। ইট ওয়াজ আউটডোর অন এ টাইট সিডুল। আই হ্যাড টু অরগ্যানাইজ এভরিথিং টু ফিনিশ দ্য শুট ইন টাইম। এলস এ লট অফ প্রডিউসারস মানি উড হ্যাভ বিন ওয়েস্টেড। পৌরভি ইজ এ ভেরি বিজি হিরোইন। লুসিং এ ডে উড মিন এ হিউজ এক্সপেন্ডিচার টু দ্য প্রডিউসার। ইট উড হ্যাভ বিন ডিফিকাল্ট টু গেট পৌরভিস ডেইটস”

“হু গেভ হার দ্য এমপিথ্রি প্লেয়ার?”

“ডোন্ট নো। আই পাসড ইট অন টু দ্য বেল বয় কেষ্ট টু হ্যান্ড ইট ওভার টু হার”

“দ্যাটস পাস্ট। ইউ আর ব্যাক উইথ দিস নিউ ওয়ান। আই নিড এ রোল নো ম্যাটার হাউ ট্রিভিয়ল ইট মে বি”

“লিভ দ্য পোর্টফোলিও উইথ মি। ইওর নেইম অ্যান্ড নম্বর। লেটস সি হোয়াট আই ক্যান ড্যু ফর ইউ”

কাভিয়া উঠে পড়ল। যা জানার, জানা হয়ে গেছে। চন্দ্র নাইডু যদিও প্লেয়ারটা পাঠিয়েছে, ও ধরেই নিয়েছে রুক্সার গানটাই পাঠাচ্ছে। ওর ভেতর কী ছিল ও জানে না। একবার ভাবল। চন্দ্র নাইডুর হাতে আসার আগে কী বম্বটা ওখানে রাখা হয়েছে? ভাবতেই মনে হল, যে এ কাজ করিয়েছে সে এত কাঁচা কাজ করবে না। যদি পৌরভি টার্গেট হয়ে থাকে, এত হাত মারফত প্লেয়ারটা গেছে। যে কেউ সুইচ অন করলেই উদ্দেশ্য পন্ড। শেষ কিস্তিতেই এই খেলা।

কথা শুনে মনে হচ্ছে কেষ্টই শেষ কিস্তি।

মধুস্করার ফোন পেয়ে আশ্চর্য কাভিয়া। আশা করেনি তাকে ফোন করবে “ফ্রি টুনাইট?”

“ইয়েস”

“টুডে ইস মাই লেট সিস্টার্স বার্থডে। ইউ রিমাইন্ড মি অফ হার। মিস হার ভেরি মাচ। উইল ইউ হ্যাভ ডিনার উইথ মি?”

“সিওর”

“কাম ওভার টু মাই রেসিডেন্স অ্যাট দ্য বোট ক্লাব অ্যাট সেভেন ইন দ্য ইভিনিং। আই উইল কুক ফর ইউ। হোয়াট ডু ইউ প্রেফার? ফ্রেঞ্চ অর ইটালিয়ান?”

“হোয়াটেভার ইউ প্রেফার”

“মাই সিস্টার লাভড ফ্রেঞ্চ। সো ইট উইল বি ফ্রেঞ্চ টুনাইট”

“আইল বি রাইট দেয়ার”

বোট ক্লাবের বাড়িতে আসার পথে ক্রিস্ট্যাল গ্লাসের ফ্লাওয়ার ভাস কিনল। মধুস্করার হাতে দিয়ে বলল “ফর ইউ... ফ্রম ইওর আদার সিস্টার”

ফ্লাওয়ার ভসটা হাতে নিয়ে চোখ ছলছল “ওহ মাই! হাউ ক্যান দিস হ্যাপেন?”

“হোয়াট ম্যাম?” কভিয়া অবাক।

“মাই সিস গেভ মি এ সিমিলার ওয়ান অন হার বার্থডে, টু ডেইস বিফোর হার ডেথ?”

আবেগে বুকে জড়িয়ে ধরল কাভিয়াকে। ভাষাহীন অনুভূতিতে চোখে মুক্তোর কণা। নিঃশব্দ মুহূর্তগুলো অতীতের ফেলে আসা স্মৃতির শান্ত আশ্রয় নতুন ভাষা খুঁজে পাচ্ছে।

বেষ্টনী শিথিল। কাভিয়াকে সোফায় বসতে বলল “লাইক সাম ওয়াইন?”

কী করা উচিত বুঝতে পারছে না। মধুস্করা ততক্ষণে সেলার থেকে বোতল আনল। হাতে নিয়ে বলল “ভিনটেজ বরড্যু। ফ্রেঞ্চ ওয়াইন, উইথ ফ্রেঞ্চ ফুড”

ফ্রান্সের ভিনিয়ারডের অন্যতম বরড্যুর নাম শুনেছে। খাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি। ভিনটেজ মানে দামি। কাভিয়া ওয়াইনে চুমুক দেওয়ার আগে গ্লাস ঠেকিয়ে বলল “চিয়ার্স! ইফ আই কুড রিকিন্ডল ইওর সিস্টার্স মেমরি, ইট উড মেক মাই ডে”

“সি ওয়াজ দ্য ক্লোজেস্ট থিং ইন মাই লাইফ। আফটার হার ডেথ নাথিং ইজ দ্যাট ক্লোজ। সি ওয়াজ ভেরি ডিয়ার টু মি। আওয়ার মাদার ডায়েড হোয়েন উই ওয়ার ভেরি ইয়ং। সো সি ওয়াজ মাই অল - ফ্রেন্ড, ফিলসফার অ্যান্ড গাইড। আফটার হার ডেথ, আই হ্যাভ লস্ট মাই ওন লিটল ওয়ার্ল্ড। আই সিম টু বি কনফ্রন্টেড উইথ বম্ব ডেথস অল দ্য টাইম। ফার্স্ট দিস বম্ব ব্লাস্ট ইন ট্রেন। নাউ দ্য আদার ওয়ান উইথ পৌরভি।... উই ক্লাইমড টু সাকসেস টুগেদার”

“হাউ ডিড পৌরভি ডাই?”

“বম্ব ব্লাস্ট। আফটার দ্য প্যাক আপ উই ওয়ার চ্যাটিং ইন হার রুম। উই ডিসাইডেড টু টেক এ স্ট্রোল অন দ্য প্রাইভেট বিচ। অ্যাপ্রিসিয়েটিং দ্য বিউটি অ্যামিডস্ট দ্য মুনলাইট অ্যান্ড ফ্র্যাগনেন্স অফ দ্য সি ব্রিজ অ্যামিডস্ট নেচার। উই হ্যাড ড্রিফটেড এপার্ট। আই ওয়াজ অন দ্য ফোন হোয়েন আই স্য দিস ব্লাস্ট। ও মাই গস! ইট ওয়াজ হরেন্ডাস। দ্য থট অফ দ্য সিন, সেন্ডস চিলস ডাউন মাই স্পাইন”

“হাউ ডিড ইট হ্যাপেন?”

“সি হ্যাড ওনলি দ্য মোবাইল অ্যান্ড দ্য এমপিথ্রি প্লেয়ার, হুইচ আই স্য স্লিপ ইনটু পাজামা পকেটস ফ্রম দ্য লেদার পার্স। সি সেড সি ওয়ান্টেড টু হিয়ার দ্য সং। সি হ্যাড দ্য শুট নেক্সট ডে ফর দ্য সং সিকোয়েন্স। সি ওয়ান্টেড টু কম্পোজ ইট পারফেক্টলি”

কাভিয়া চুপচাপ শুনে যাচ্ছে। ওয়াইনটা সত্যি ভালো খেতে। এত দামি ওয়াইন খেতে পারবে আশাও করেনি। বেশি দেরি হলে ফিরতে মুস্কিল। কিছুক্ষণ পর মধুস্করা বলল “শ্যাল আই আস্ক দেম টু গেট দ্য ডিনার রেডি? স্পেশালি কুকড ফর ইউ”

“ইয়েস প্লিজ”

ডিনার দেখে চক্ষু চড়কগাছ। এলাহি আয়োজন। খেতে বসতে যাবে, এমন সময় মধুস্কারার ফোন। ওপাশ থেকে কেউ কিছু বলছে! কে? বোঝা গেল না।

মধুস্করার কণ্ঠস্বর “গ্রেট কেষ্ট। চালিয়ে যাও। রামালিঙ্গম ফিল্মস? ‘স্নেহাতিন্দে মাররাম’? গুড লাক”

অবাক হয়ে মধুস্করার দিকে তাকাল “হোয়াট ডিড ইউ সে?”

“ইট ওয়াজ ওয়ান অফ আওয়ার বেল বয়েস, ওয়ার্কিং উইথ আওয়ার ইউনিট ইন দ্য প্রিভিয়াস মুভি উইথ পৌরভি। এ বেঙ্গলি বয় কেষ্ট”

“ক্যান ইউ স্পিক বেঙ্গলি?’

“জাস্ট এ ফিউ ওয়ার্ডস”

“হোয়াটজ দ্য আদার ল্যাঙ্গুয়েজ ইউ সেইড?”

“মালায়ালি। ‘স্নেহাতিন্দে মাররাম’ মিনস ট্রি অফ লাভ। হি ওয়াজ আউট অফ জব আফটার ক্লোজার অফ দ্য ইউনিট। হি জাস্ট ইনফরমড দ্যাট হি হ্যাস নাউ গট এ জব ইন এ নিউ প্রোডাকশন অফ রামালিঙ্গম ফিল্মস, নেমড ‘স্নেহাতিন্দে মাররাম’। আই অ্যাম সো হ্যাপি। দিস পুওর পিপল লিভ অন এ মিগার ওয়েজ। ইফ এ প্রোডাকশন স্টপ্স, আনলেস দে গেট আনাদার জব, দেয়ার ব্রেড অ্যান্ড বাটার বিকামস এ বিগ কোয়েশ্চেন”

কোথা থেকে কোথাকার খবর বেরিয়ে এসেছে। পুলিসের বাপেরও ক্ষমতা ছিল না এই গল্প বার করে আনার। এত বড় ঝুঁকি নিয়ে রামাস্বামীকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে চাকরিটা দাঁওতে লাগিয়ে নেমে পড়েছে। সেনসেশনাল স্কুপ স্টোরি না দিতে পারলে চাকরি থাকবে না। তিরুপতিশ্বর রক্ষাকবচের মতো তাকে আগলে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। বুঝতে পারছে ভাগ্য তার পেছনে, সহায় হলে রোখে কে?

মধুস্করা হাতে করা এত রান্না পরম যত্নে বেড়ে দিচ্ছে। সেদিকে খেয়াল নেই। মাথায় একটাই চিন্তা। কী করে কেষ্টর দেখা পাবে ‘স্নেহাতিন্দে মাররাম’-এর সেটে?

ত্রিশ

"চাকরিটা ছেড়ে দিলি?"

তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে ঐত্রেয়ী বলল "ব্যাঙ্গালুরুতে একা একা ভালো লাগছিল না। এখন আবার দিল্লিতে গিয়ে থাকতে হবে"

"এখন কী করবি ঠিক করলি?" বাবা জিজ্ঞেস করল।

"একমাস ঘুমোব। তারপর ভাবব"

এই ফাঁকে মেয়েকে বিয়েতে রাজি করাতে হবে। পিসতুতো বোন ঊষার দেওরের ছেলের সঙ্গে আগেই সম্বন্ধ এনেছিল। ছেলে আইআইটি থেকে পাশ। অ্যামেরিকায় এমএস, এখন গ্রিন কার্ড হোল্ডার। মেয়েই এতদিন 'এখন বিয়ে করব না' বলে এড়িয়ে গেছে। এখন তো সোহম বেঁচে নেই। বিয়েতে বোধহয় এখন না করবে না। রাজি হয়ে যেতে পারে। সোহমকেই বিয়ে করতে চেয়েছিল। তাই সোহমের পিএইচডি শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা। যখন সোহম আর নেই, ঊষার দেওরের ছেলের সঙ্গে কথাটা আবার তুললেই হয়।

ডেকে বলল "এখানে আয় মা, বোস" বাবার উলটো খাটে বসল "জানি তোর মনের অবস্থা ভালো নয়। তবুও বয়েস তো হচ্ছে। সোহমও আর নেই। চাকরিটা ছেড়ে দিলি। ঊষার দেওরের ছেলে অ্যামেরিকায়। ওর সঙ্গে কথা পাড়ি?"

কয়েক মিনিট। ঐত্রেয়ী ভাবছিল। যে ঝামেলায় জড়িয়েছে, তার থেকে পরিত্রাণ বিদেশে পাড়ি দেওয়া। নয়ত এই চক্রের নাগপাশে জড়িয়ে পড়তে পারে। এই চক্র কোথায় নিয়ে যাবে, কে জানে? ভয় হচ্ছে। দিব্যচক্ষে দেখছে জাহান্নাম খুব দূরে নয়। দেশ থেকে পালানোই শ্রেয়।

মাথা নেড়ে, খাট থেকে উঠে বলল "তুমি যা ভালো বোঝ"

সুনেত্রার মৃত্যুর খবরে প্রচণ্ড ভয় ধরে গেছে। মনে হচ্ছে শুধু কলকাতার চক্র নয়, ভারত জুড়ে বিস্তার। সুনেত্রার মোবাইল থেকে মিলনের নামটাও অলরেডি জড়িয়ে। সুনেত্রার সঙ্গে বন্ধুত্বের কথা জানলে, পুলিস আবার তার ওপর চড়াও হতে পারে। চাকরিতে রেজিগনেশনটা সহজেই হয়ে গেল। দিল্লির ট্র্যান্সফার নিয়ে এমনিতেই দো-টানা। মন সায় দিচ্ছিল না।

ভাবতেই পারেনি, চাঁপাতলায় মিলনের সঙ্গে সঙ্গম ক্যামেরাবন্দি হয়ে যাবে। ভাগ্যিস সে কথা বাবা জানে না। জানলে বিয়ে তো দূর, হার্টফেল করত। প্রতি মুহূর্তে এরকম কতই দৈহিক মিলন হচ্ছে। কে খবর রাখে? তার এমনই পোড়া কপাল, মিলনের সঙ্গে মিলনটাই ভিডিওবন্দি হল। আগে আঁচ করতে পারলে, সে পথ মাড়াত? কী করে বুঝবে কেউ ওদের ফলো করছে? যখন ভিডিওটা দেখাচ্ছিল, রাগে, দুঃখে ঘৃণায়, মরে যেতে ইচ্ছে করছিল। ভাবা যায় না। সায়েন্স কলেজের স্নাতকোত্তরদের ওরা পর্নস্টার করে ফেলেছে। ভাবতেও গা শিরশির করছে। মানুষ নিজের স্বার্থের জন্য কী না করতে পারে? বেশ বুঝছে, দেশ থেকে না পালালে হাজতবাস নিশ্চিত।

বেরিয়ে যাচ্ছিল। ফিরে বাবার কথায় সায় দিল "যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বন্দোবস্ত করো। একা ভালো লাগছে না"

কলকাতায় আসার পর ব্যাঙ্গালুরুর মোবাইলটা সারেন্ডার করে কলকাতার নতুন কনেকশন নিয়েছে। এখনও কেউ নম্বরটা জানে না। ভাবছিল মিলনকে জানাবে কি না? যদি সুনেত্রার ইনভেস্টিগেশনে ওর নামটা বলে দেয় সর্বনাশ হবে। ওর নামটা সরিয়ে রাখতে বলতে হবে। নম্বর না দিলে পুলিস অনায়াসেই বাড়িতে হাজির হতে পারে। সেটা আরও বেশি মারাত্মক।

পাশের ঘরে মিলনকে ফোন “আমি এখন কলকাতায়”

“দিল্লি কবে যাবি?”

“যাব না। চাকরি ছেড়ে দিয়েছি”

“ব্যাপারটা কী?”

“তোর সঙ্গে আজকে দেখা করা যাবে? ধর সাড়ে পাঁচটায় দিলখুসাতে। কথা আছে। এটা আমার নতুন নম্বর। সেভ করে রাখ”

ইচ্ছে করেই কফি হাউসটা বাদ দিল। ওখানে অনেকে আড্ডা মারে। কে দেখছে হদিস রাখা যায় না। মিলনের পিজি অ্যাকোমোডেশন নিশ্চয়ই স্ক্যানারে।

“ঠিক আছে”

ওর মনেও বিরাট সংশয়। মৃত্যুর আগে ওর ফোনটাই নাকি সুনেত্রাকে শেষ ফোন। তাই পুলিসের সন্দেহ ওর দিকেই। ও একটা আশ্রয় খুঁজছিল। সেই আশ্রয়, এই মুহূর্তে, ঐত্রেয়ী ছাড়া আর কে? স্নেহাশিস ওকে ডেকে জেরা করেছে।

“সুনেত্রাকে কদ্দিন চেনেন?”

“একসঙ্গে পড়াশোনা করেছি। আমি পিইচডি করতে থাকি। ও চাকরি নিয়ে মুম্বাই চলে যায়”

“তারপর যোগাযোগ ছিল?”

“হ্যাঁ। ই-মেল কিংবা ফোনে”

“যেদিন ও মারা যায়, ফোন করেছিলেন?”

“হ্যাঁ। পরে পেপারে পড়লাম ও মারা গেছে”

“ফোনে কথার সময় কিছু অস্বাভাবিক দেখেছিলেন?”

“না। এক গল্প। চাকরি ভালো লাগছে না। মুম্বাইয়ের জীবন পোষাচ্ছে না”

“সেদিন কেন ফোন করেছিলেন?”

“বিশেষ কোনও কারণে নয়। প্রায়ই তো করি, সেদিনও করেছিলাম। ভাবিনি এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটবে”

“যখন ফোন করেছিলেন, কেউ ছিল?”

“কী করে জানব? আমার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই কথা বলল। তবে কথার মধ্যে অসংলগ্নতা ছিল। বলল চাকরি ছেড়ে দেবে। পরমুহূর্তেই বলল কোন এক সাধুবাবা বলেছে মুম্বাইতে থাকা ওর পক্ষে ভালো। তাই চাকরি ছাড়বে না”

“আর কিছু?”

“কলেজ জীবনের অনেক ঘটনা মনে করতে পারছিল না। যেমন, বন্ধের সময় কী করে হেঁটে মামিসে চাউ-মিন খেতে গেছিলাম, এক বৃষ্টির দিনে মেট্রো থেকে বেরিয়ে পা পিছলে পড়ে, বাড়ি যাওয়ার বদলে ইডেনে যেতে চেয়েছিল -এই সব”

“মানসিকভাবে কী ভারসাম্যহীন ছিল?”

“একদমই নয়। বরং সজাগ। বেশিক্ষণ কথা হয়নি। বলল, গা গুলোচ্ছে, পরে কথা বলবে”

“আপনার কী মনে হয় সুসাইড করতে পারে?”

“যেটুকু চিনি কখনই নয়। তবে, কার মনে কী থাকে, কী চলে, বলব কী করে? এতটা অন্তরঙ্গতা ছিল না”

“সোহম আর ঐত্রেয়ী সম্বন্ধে কিছু জানাতেন?”

“বারবার জানতে চাইত। তাই কিছু খবর জানাতাম”

“সোহমের মৃত্যুর খবর?”

“জানিয়েছিলাম”

“কী রিঅ্যাকশন?”

“প্রথমে চুপ। ফোন কাটার আগে বলেছিল পরে কথা বলবে”

“বলেছিল?”

“না। আমিও আর ঘাঁটাইনি। সোহমের প্রতি ওর দুর্বলতা জানতাম বলেই”

বুঝতে পারছিল না, মিলনকে জেরা করে লাভ হচ্ছে কি না? কিছুই তো বেরল না। অথচ অদ্ভুতভাবে দুটো মৃত্যুর সঙ্গেই জড়িয়ে। কিছু না পেলেও, স্ক্যানার থেকে ছাঁটতে পারছে না।

মিলন মটন কবিরাজিতে কামড় দিল “এখন কী করবি?”

ঐত্রেয়ী কবিরাজিটা কাটার চেষ্টা করছিল “বিয়ে”

বিষমের জোরে, কবিরাজিটা মুখে ঢুকল না। কী বলছে? ঐত্রেয়ী বিয়ে করবে? মুচড়ে উঠল বুকটা। চাঁপাতলার স্মৃতিটা এখনও বুকে। ওর দেহের নমনীয় ছোঁয়া এখনও আলোড়ন তোলে। সকালে ফোন পেয়ে ভেবেছিল, ঐত্রেয়ী যখন কলকাতায়, তখন আরকবার ওর ফল্গুসাগরে ভাসা যেতেই পারে। যদি জানত ওর পেছনে আরেক আলোড়নের কথা, দিলখুশা কেবিনে আড্ডা মারত না। ওর ত্রিসীমানা থেকে পালাত।

“আর ভালো লাগছে না। সোহমের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। যখন ও নেই অপেক্ষা করে কী হবে?”

“কাকে করবি ঠিক করেছিস?”

“অনেকদিন থেকেই বাবা, পিসির দেওরের ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধের কথা বলছিল। গা করিনি। এখন মত দিলাম”

“পাত্র কী করে?”

“অ্যামেরিকায় ইঞ্জিনিয়ার”

মিলন চুপ। ঐত্রেয়ীকে তো বিয়ে করতে চায়নি। পিএইচডি শেষ করার আগে সম্ভবও নয়। দেহকে কদ্দিন সংযমে রাখবে? চাঁপাতলার দিনটা যদি ফিরে আসত।

হঠাৎ ঐত্রেয়ী বলল “ভীষণ মোটা হয়ে গেছি। তাই না রে?”

“কে বলল?”

“কেউ বলেনি। সেদিন আয়নায় দেখছিলাম। মনে হল”

মনে পড়ল, যখন এমএসসি পাশ করে ঘরে বসে থাকত, এমনি আয়নায় রোজ দেখত। মনে হয়েছিল, মোটা হয়ে গেছে। খোঁজখবর নিয়ে হাজির হয়েছিল ডাঃ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেম্বারে।

ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় পরীক্ষা করে বলেছিল “লাইপোসাকশন”

তখন কি ছাই জানত, লাইপোসাকশন দিয়ে রোগা হওয়া যায় না।

“কত খরচ লাগবে?”

“আশি হাজার টাকা”

মুষড়ে বলেছিল “এখন তো চাকরি করি না। বাবার অত টাকা নেই। চাকরি পেলে করিয়ে নেব”

“কী চাকরি খুঁজছ?”

“যে কোনও চাকরি”

“তোমার কোয়ালিফিকেশন?”

“কেমেস্ট্রিতে এমএসসি”

“দেখি কিছু করতে পারি কি না”

ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টাতেই দ্য নিউ এজে আইটির চাকরি ব্যাঙ্গালুরুতে।

“বহুদিন আগে এক প্লাস্টিক সার্জেনকে দেখিয়েছিলাম। ডাঃ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেছিলেন লাইপোসাকশন করিয়ে নিতে। ভাবছি আবার দেখাব কি না?”

মিলন ঐত্রেয়ীর দিকে তাকাল। সেদিন মালের নেশায় কাফতান তোলা ঐত্রেয়ীকে সেভাবে দেখা হয়নি। শুয়ে থাকলে দেহের মেদ বোঝা যায় না। ওর উত্তেজনামূলক অংশগুলো নিয়ে খেলায় এতই ব্যস্ত, যে

দৈহিক ব্যাপ্তি নিয়ে ভাবার সময় ছিল না। রোগা না মোটা, না দাঁড়ালে বোঝা যায়? সেদিন শোয়া ঐত্রেয়ীকে উপভোগ করেছিল। আজ ইচ্ছে করছে দাঁড়ানো ঐত্রেয়ীকে দেখতে। ঐত্রেয়ী এমনিতেই ঢিলেঢালা পোশাক পরে। তাই দেহের মাপটা আঁচ করা যায় না। মোটাই মনে হয়।

মুচকি হেসে বলল "না দেখলে বুঝব কী করে?"

"ইয়ার্কি মারিস না। আরেকবার যাব ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে? তুই যাবি আমার সঙ্গে?"

"তোর কী চর্বি বেশি? না কার্ভগুলো ঠিক নেই?"

"মনে হয় কার্ভ"

জীবন্ত মটন কবিরাজির শেষ রেশ নেওয়ার ইচ্ছে বিলীন হয়নি। ওর স্তনের দিকে তাকিয়ে বলল "চল না। উনিই ভালো বলতে পারবেন। মাঝে তো দু-বছর পার হয়ে গেল"

ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐত্রেয়ীকে একজামিন করে বললেন "আগেই তো বলেছিলাম লাইপোসাকশন। এখনও তাই বলছি। তবে, কারণটা অন্য। পেটের ফ্যাট অনেক কমে গেছে। তবে ট্রোক্যানট্যারিক ফ্যাট, থাই-এর ফ্যাটের জন্য সেপ ঠিক লাগছে না। ব্রেস্টটাও ঝুলে পড়েছে। দু-বছরে টাকা জমেছে?"

মাথা নাড়ল ঐত্রেয়ী।

"তাহলে করিয়ে ফেল"

"দেখি। ভেবে জানাব"

ওরা বেরিয়ে এল চেম্বার থেকে। এখানেও যা ভেবেছিল কিছুই তা হল না। ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় একা ঘরে সিস্টারের সঙ্গে একজামিন করলেন। দেখা হল না ঐত্রেয়ীর দাঁড়ানো যৌবন।

ওরা বেরিয়ে যেতেই আশিস মোবাইলে "তোমার ব্যাঙ্গালুরুর মেয়েটা এসেছিল লাইপোসাকশন করাতে"

"কোন মেয়ে?" ইন্দ্রাক্ষির প্রশ্ন।

"আমার কথায় যে মেয়েটার চাকরির বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলে"

"কী নাম?"

"ঐত্রেয়ী মুখার্জি"

"শুনেছি চাকরি ছেড়ে দিয়েছে" ইন্দ্রাক্ষির আপটুডেট।

"তাই নাকি" আশিস অবাক।

"পরে কথা বলব। এখন মিটিং-এ"

ফোন কেটে আশিসের খেয়াল হল - ছেলেটার কথা তো ইন্দ্রাক্ষিকে বলা হল না। যাক-গে। হয়ত ওকেই বিয়ে করবে।

বিয়ের আগে শেষবারের মতো চাইছিল জীবন্ত মটন কবিরাজি। কিন্তু ঐত্রেয়ীর সায় নেই। এ কদিনে এমন কী ঘটল, যে ওর যৌন স্পৃহা, নিস্পৃহ হয়ে গেল? নিছক বিয়ের স্বপ্ন?

বুঝে উঠতে পারল না মিলন।

একত্রিশ

দিলওয়ান সিং নেটে সেদিনের ব্যাঙ্গালুরু-চেন্নাই ফ্লাইট রেকর্ড চেক করছিল। ইন্ডিগোর সব প্যাসেঞ্জারের নাম। বোর্ডিং পাস কী ভাবে ইশুড। সিনিয়র অফিসার-অন-ডিউটি নায়ারের সঙ্গে লিস্টটা কম্পিউটারে ক্রস ভেরিফাই করছে। চিফ সেক্রেটারির ছেলের ডেথ বলে কথা। ইন্ডিগোও যথাসম্ভব সাহায্য করছে।

নায়ার হঠাৎ বলল "স্যার, জাস্ট লুক হিয়ার"

মোবাইলে কথা বলছিল। নায়ারের কথায় 'টক টু ইউ লেটার' বলে ফোন কেটে দিল। নায়ার স্ক্রিনে পয়েন্টারটা নিয়ে বলল "দ্য ব্যাঙ্গালুরু-চেন্নাই আফটারনুন ফ্লাইট অ্যান্ড চেন্নাই-ব্যাঙ্গালুরু ইভিনিং ফ্লাইট হ্যাস এ কমন নেম"

ঠিক ধরেছে নায়ার। দুপুরে একজন ব্যাঙ্গালুরু থেকে চেন্নাই এসেছে। আবার সেদিন সন্ধেবেলাই চেন্নাই থেকে ব্যাঙ্গালুরু ফেরত চলে গেছে। কে? নামটা দেখল। বাঙালি - শঙ্খমালা মুখার্জি। এই কী সেই মহিলা যার কথা জয়ন্ত রাজা বলছিল? চান্স বেশি। যে টাইমে মহিলা লেডি ফ্লোরেন্স হসপিট্যালে ট্যাক্সি নিয়ে এসেছে, সেটা ফ্লাইট ল্যান্ডের দেড়-ঘণ্টা পর। মিলে যাচ্ছে। ভিসিটিং আওয়ার্সের একঘণ্টা পর ফ্লাইটে ব্যাঙ্গালুরু। তাহলে কী এই শঙ্খমালা মুখার্জি ইনসুলিন পুশ করার জন্যই ব্যাঙ্গালুরু থেকে চেন্নাই এসেছিল? একটু আলো দেখছে। দুটো বোর্ডিং পাস ইন্টারনেট থেকে প্রিন্ট, ব্যাঙ্গালুরু থেকে। আইপি অ্যাড্রেস থেকে খুঁজে বার করতে হবে, কোত্থেকে? এই মহিলা ব্যাঙ্গালুরু থেকে আসার আগেই রির্টান জার্নি প্ল্যান করে এসেছে। ওয়েল ক্যালকুলেটেড। এই সেই মহিলা যার কথা জয়ন্ত রাজা বলছিল। লোকটাকে পাগল মনে করলেও ওর সব কথা উড়িয়ে দেওয়ার নয়।

"ক্যান ইউ কনফার্ম হোয়ার দ্য বুকিং ওয়াজ ফ্রম?"

"জাস্ট এ মিনিট স্যার"

নায়ার যখন বুকিং ডিটেলস চেক করছে, দিলওয়ান সিং ভাবছে কীভাবে শঙ্খমালার হদিস বার করবে? বুকিং ডিটেলসে তো থাকার কথা।

কিছুক্ষণ পর নায়ার বলল "স্যার, গট ইট। দ্য বুকিং ওয়াজ ফ্রম ডেলহি আইপি অ্যাড্রেস"

দিল্লি থেকে কেন? শঙ্খমালা মুখার্জি ফ্লাই করল ব্যাঙ্গালুরু থেকে। বুকিং হল দিল্লি থেকে! গড়বড় ঠেকছে। খুঁটিয়ে দেখার জন্য দিলওয়ান সিং আইপি অ্যাড্রেসটা নিল। পরে হদিস বের করতে হবে কেন দিল্লি থেকে ফ্লাইটের বুকিং।

"ইজ দ্য অ্যাড্রেস অফ শঙ্খমালা মুখার্জি দেয়ার?"

"ইয়েস। প্লিজ মেক এ নোট অফ ইট"

ব্যাঙ্গালুরুর ঠিকানা লিখে নিল। ক্রস ভেরিফাই করতে হবে। উঠতে যাচ্ছিল। কী মনে হতে "ওয়াজ দ্য বুকিং ডান বাই কার্ড?"

"ইয়েস। ক্রেডিট কার্ড"

"ইন হুস নেম?"

"মেহুলি রায়"

নামটা চেনা চেনা। এই কী খুনের আসল পান্ডা? উঠে পড়ল। একটা দিক পাচ্ছে। ব্যাঙ্গালুরুতে গিয়ে শঙ্খমালা মুখার্জিকে খুঁজে বার করতে হবে। জয়ন্ত রাজাকে খুঁজে বার করার জন্য লর্ড ভেঙ্কটেশ্বরকে ধন্যবাদ জানাল। যদি এই খুনের ঠিকানা লাগাতে পারে, ডবল প্রোমোশন কে আটকায়? অফিসে ফিরে এসি ঘরে

ভাবছিল, ইনসুলিন দিয়ে খুন। ডাক্তার ছাড়া আর কার জানা সম্ভব? শঙ্খমালা মুখার্জি কি ডাক্তার? নাকি মেহুলি রায়? ফেরার পথে, জয়ন্ত রাজাকে ট্যাপ করলে যদি আরও নতুন হদিস মেলে...

জয়ন্ত রাজা বাসে উঠতে যাচ্ছিল। দিলওয়ানকে দেখে বলল "ইউ এগেন? ফরগট টু আস্ক ইউ হু আর ইউ?"

"ডোন্ট টেক দ্য বাস। আই উইল ড্রপ ইউ ইন মাই কার। আই অ্যাম দিলওয়ান সিং। অ্যাডিশনাল কমিশনার অফ পুলিস"

ঘাবড়ে গেল জয়ন্ত রাজা "হোয়াট রং হ্যাভ আই ডান? ইউ ওন্ট পুট মি টু প্রিজন, উইল ইউ?"

দিলওয়ান হেসে উঠল "নট অ্যাট অল। আই উইল ড্রপ ইউ ব্যাক হোম। জাস্ট হপ ইন মাই কার। ইউ হ্যাভ ডান মি এ গ্রেট ফেভার"

গাড়িতে বসে রাজা এদিক-ওদিক চাইছিল। একটা ওষুধের দোকান দেখে হঠাৎ বলে উঠল "অলমোস্ট ফরগট। আই ফাউন্ড দ্য রিসিট। আই হ্যাড নট থ্রোন ইট আওয়ে"

"হোয়ার ইজ ইট?" দিলওয়ান উৎসাহিত।

"অ্যাট হোম"

"হোয়েন আই ড্রপ ইউ, উইল ইউ গিভ ইট টু মি?"

"সিওর" মাথা নাড়ল জয়ন্ত রাজা।

জয়ন্ত রাজার বাড়িতে গাড়ি থেকে নামিয়ে চলে গেল না। উঠে এল তার দু-কামরার ফ্ল্যাটে। দুটো ঘরই অগোছালো। চারিদিকে কাগজের স্তূপ। একটা মোড়া টেনে বসল "ক্যান ইউ গিভ মি দ্য রিসিট?"

"লেট মি সি"

কাগজের স্তূপ তন্ন তন্ন করে খুঁজছে। দিলওয়ান চুপচাপ বসে ভাবছে, যদি পেয়ে যায়, অনেক তথ্য বার করতে পারবে রিসিটের ফার্মেসি নেম থেকে। প্রায় পনেরো মিনিট পর বিনে খুঁজে পেল "হিয়ার ইট ইজ"

দিলওয়ান দেখল ব্যাঙ্গালুরুর ফার্মেসির রিসিট। ক্যাশ ফার্মেসি, রেসিডেন্সি রোড, ব্যাঙ্গালুরু। পার্সে ঢুকিয়ে বলল "ইউ ডোন্ট নো হোয়াট হেল্প ইউ হ্যাভ ডান ফর মি। হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ?"

কান্নায় ভেঙে পড়ল "নাথিং। নোবডি ক্যান। ক্যান ইউ রিটার্ন মাই ওয়াইফ?"

দিলওয়ানের অনেক কিছুই জানা। এ প্রশ্নের উত্তর জানা নেই। জয়ন্ত রাজার পাশে বসে সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া।

চেন্নাই থেকে ব্যাঙ্গালুরুর ফ্লাইটে যেতে প্রফুল্লতা। পকেটে ক্যাশ ফার্মেসির রিসিট। ডায়েরিতে শঙ্খমালা মুখার্জির নাম, ঠিকানা, এমনকী বোর্ডিং পাস প্রিন্ট করা কমপিউটার থেকে আইপি রিসিট। এবার শুধু শঙ্খমালা মুখার্জিকে রাউন্ড আপ। কেল্লা ফতে।

আইপিএস পাশের পর দিল্লির ছেলে হয়েও, তামিলনাডু ক্যাডারে নাম লিখিয়েছিল। দিল্লিতে এত আমলা, উঁচু ক্যাচ। দিলওয়ান বারখাড়ার খুব সাধারণ পরিবারের। বুঝতে অসুবিধা হয়নি এসব রথী-মহারথীদের সঙ্গে কখনও পাল্লা দিতে পারবে না দৌড়ের মাঠে। যদিও বারখাড়াতে আদি বাসস্থান, বাবার চাকরির সূত্রে উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় লেখাপড়া, বড় হওয়া। দিল্লিতে খুব একটা বন্ধু-বান্ধব যে ছিল, তাও নয়। তাই দিল্লিও যা, তামিলনাডুও তাই। প্রমোশনের জন্য অবনীকান্ত এর নামও ঝুলছে। যদিও এক্সপিরিয়েন্সের দিক থেকে দুজনেই এক স্থানে - একই আইপিএস ব্যাচ, একই সঙ্গে চাকরিতে জয়েন। শেষ ডিসিশন সিএম-এর। চিফ সেক্রেটারির ছেলের মৃত্যুরহস্যটা বার করতে পারলে, চিফ সেক্রেটারি রঙ্গনাথন যে তার নাম কমিশনার অফ পুলিসের জন্য সুপারিশ করবেন, সেটা আন্দাজ করা মুস্কিল নয়।

ব্যাঙ্গালুরুর অ্যাডিশনাল কমিশনার অফ পুলিস কান্নন এয়ারপোর্টে রিসিভ করতে এসে হাত বাড়াল "ওয়েলকাম টু ব্যাঙ্গালুরু। আই উইল ট্রাই টু হেল্প ইউ অ্যাজ মাচ অ্যাজ আই ক্যান"

গাড়িতে ওঠার আগে কান্ননকে বোর্ডিং পাশ বুকিংয়ের প্রিন্ট আউটটা দিয়ে বলল “কুড ইউ আস্ক ওয়ান অফ ইওর অফিসার্স টু ট্রেস দিস আইপি অ্যাড্রেস ইন ডেলহি?”

ফোনে কথা বলে অ্যাড্রেসটা দিল “ডান। হোয়ার ডু ইউ ওয়ান্ট টু গো?”

শঙ্খমালা মুখার্জির ঠিকানাটা দিয়ে বলল “হিয়ার”

এত বছর ব্যাঙ্গালুরুতে। কান্নান মনে করতে পারল না ওই নামের কোনও রাস্তা আছে কি না। ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল। সেও মাথা নাড়ল। দিলওয়ানকে বলল “আর ইউ সিওর ইউ হ্যাভ দ্য কারেক্ট অ্যাড্রেস?”

“পসিটিভ। দিস ইজ অ্যাজ ইটস ডকুমেন্টেড ইন দ্য ইন্ডিগো বুকিং লগ। হিয়ার ইজ দ্য প্রিন্ট আউট। লুক...”

“হোয়ার ওয়াজ দ্য বুকিং ফ্রম?”

“ডেলহি। দ্যাটস হোয়াই আই আস্কড ইউ টু গেট ওয়ান অফ ইওর অফিসার্স টু ট্রেস দ্য আইপি অ্যাড্রেস”

“আই থিংক দে হ্যাভ মেড এ মিস্টেক। নট টু মাই নলেজ। নেভার দ্য লেস, উইল আস্ক মাই ডির্পাটমেন্ট টু ফাইন্ড আউট” আবার মোবাইলে ইন্সট্রাকশন “এনি আদার ক্লু?”

“আই হ্যাভ এ রিসিট অফ ক্যাশ ফার্মেসি”

“দ্যাটস মোর ডাউন টু আর্থ। ইটজ ইন রেসিডেন্সি রোড”

ক্যাশ ফার্মেসি, ব্যঙ্গলুরুর নামকরা ওষুধের দোকান। রেসিডেন্সি রোডের এই ফার্মেসি ক্যাশ নামক এক সাহেব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তারপর এমএন মহাদেবন তার স্বত্ব কিনে নেয়। এখন মনুমেন্টের মতো দাঁড়িয়ে। ২৫০০ স্কোয়ার ফিট বিস্তৃতি। শঙ্খমালা মুখার্জির ব্যাগ থেকে পড়া প্রেসক্রিপশনটা এখানকার। কান্নান ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করতে কম্পিউটার রেকর্ডস খুঁজতে বসল। শঙ্খমালা মুখার্জির নামে ইনসুলিন কেনার ইতিবৃত্ত আছে। ঠিকানাও ওই ফ্লাইট বুকিং অ্যাড্রেসের। যার অস্তিত্ব অজানা।

“ইস দেয়ার হার ফোন নম্বর?”

ম্যানেজার রেকর্ড দেখে বলল “নো”

ব্যাপারটা পরিষ্কার। যে খুন করিয়েছে সে কি ঠিক নাম ঠিকানা দিয়ে সূত্র রাখবে? এতটা বোকা ভাবা ভুল। ওষুধ দিয়ে যখন খুন।

“হু প্রেসক্রাইবড?”

“এ প্লাস্টিক সার্জেন নেমড আশিস ব্যানার্জি ফ্রম ক্যালকাটা”

মাথায় ঘুরছিলই ইনসুলিন দিয়ে খুনে ডাক্তারের হাত। এখন সূত্র পেয়েছে। কিন্তু প্লাস্টিক সার্জেন ইনসুলিনের প্রেসক্রিপশন লিখেছে কেন? তবে কী সে জড়িত? দিল্লি থেকে বুকিং, কলকাতার প্রেসক্রিপশন, ব্যাঙ্গালুরু থেকে ওষুধ কেনা আর চেন্নাইতে খুন! এ কোন চক্র? যেমন মাথায় ঘুরছিল দিল্লি থেকে বুকিং কেন, আবারও মাথায় কলকাতা থেকে প্রেসক্রিপশন কেন? দিলওয়ানের মাথায় ঢুকছে না। এটা কোনও ইনডিভিজুয়াল খুন নয়। বিরাট কোনও চক্রের অংশবিশেষ।

কী সেই চক্র?

চক্রের ভেতরে প্রবেশ করতে গেলে এই অংশের নায়িকা শঙ্খমালা মুখার্জিকে যে করেই হোক খুঁজে বার করতে হবে। নামটা যে ঠিক নয়, সেটা সুনিশ্চিত। বুঝতে পারছে না কী করে কর্পূরের মতো মিলিয়ে যাওয়া শঙ্খমালা মুখার্জিকে খুঁজে বার করবে? একমাত্র ওই ডাক্তারই তার সূত্র। মানে ইনভেস্টিগেশনের সূত্র কলকাতায়।

কান্নান ততক্ষণে কিছুটা খোঁজ করে ফেলেছে। দিলওয়ানকে বলল “ইউ সিম টু বি চেসিং এ ফলস ট্রেল। উই নো দ্য নেম অ্যান্ড অ্যাড্রেস হ্যাস বিন কনকর্টেড। বাট দ্য ডেলহি বুকিং ইস ফ্রম অ্যান ইন্টারনেট কাফে”

“ওহঃ মাই গস!”

“টু অ্যাড টু ইওর ফলস ট্রেলস উই হ্যাভ চেকড আউট দ্য ক্রেডিট কার্ড ডিটেলস। ইট ইজ মেহুলি রায়, দ্যাটস হোয়াট ইউ সেইড। ইজন্ট ইট? দিস লেডি লিভস ইন ব্যান্ড্রা রিক্লেমেশন এরিয়া অফ মুম্বাই। হিয়ার ইজ হার অ্যাড্রেস। সি হ্যাস বিন ইস্যুড দ্য কার্ড উইথ মডেলিং অ্যাজ হার প্রফেশন”

দিলওয়ান সূত্র একত্রিত করে বুঝেছে এটা একজনের খেলা নয়। যদি বা শঙ্খমালা মুখার্জি নামে কোনও মহিলা লেডি ফ্লরেন্স হাসপাতালে গিয়ে ইনসুলিন পুশ করেও থাকে, সে শুধু এই চক্রের অংশীদার মাত্র। পান্ডা কে? মেহুলি রায়? এখন তো শুধু দুটো সূত্রই পড়ে। ডাঃ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় আর মেহুলি রায়। দুটোকে ধরেই এগোতে হবে।

হায় রে! যদি সে জানত মেহুলি রায় অলরেডি মৃত, প্রোমোশনের শেষ আশাটুকুও যা অন্ধকারে ফ্ল্যাশের মতো জ্বলে উঠেছিল, নিভে যেতে মুহূর্তও লাগত না।

বত্রিশ

আগের চেয়ে এখন কাজ বেড়ে গেছে মধুসূদনের। আগে কাজ ছিল রিপোর্টগুলো পড়ে, নোট রেখে, অনাদিকে দিয়ে তাকে তুলে রাখা। এখন ঠিক উলটো। রিপোর্টগুলো তাক থেকে বারবার খুঁজে বার করতে হচ্ছে। খুন-রাহাজানি-রেপ-ছিনতাই তো লেগেই। এতদিন লাইনে থেকে বুঝেছে পৃথিবী যতদিন, মানুষের লোভ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অতৃপ্ত বাসনা থাকবে, ততদিন এ চলতেই থাকবে। মধুসূদন রিটায়ারের পর কোনও অপদার্থ পুলিস অফিসারের ঘাড়ে দায়িত্ব পড়বে। এর আগেও তো কত খুন হয়েছে। কিছুর কিনারা হয়েছে, অনেকের হয়ওনি। চাঞ্চল্যকর খুনের সমাধান উত্তেজনাময় খবর হয়ে বেড়িয়ে মাতিয়েছে মিডিয়ার অনেক খবরের মতো, চাঞ্চল্যপূর্ণ যুগান্তকারী সব নৃসংশতাকে। কিছু মহলে এই রিসেন্ট খুনগুলো সাময়িক আলোড়ন তুললেও, খবরের ঘনঘটায় শেষ পর্যন্ত হারিয়ে গেছে ফাইলের পাতায়।

ফোন বেজে উঠল। ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিস। চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল "ইয়েস স্যার"। নাম শুনেছে বটে। চাক্ষুষ করেনি। ফোন তো দূরের কথা।

"ডাঃ আশিস বন্দ্যোপাধায় সম্বন্ধে কোনও রেকর্ডস আছে কি না। দেখ তো। চেন্নাইয়ের হোম সেক্রেটারি আমাদের হোম সেক্রেটারিকে ফোন করেছিল। ওখানকার চিফ সেক্রেটারির ছেলে ইনসুলিন দিয়ে খুন হয়েছে। ওরা ইনভেস্টিগেশনে জেনেছে কোনও এক মহিলা ব্যাঙ্গালুরুর ক্যাশ ফার্মেসি থেকে ইনসুলিন কিনে চেন্নাইতে গিয়ে খুন করে এসেছে। প্রেসক্রিপশনটা ডাঃ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের, কলকাতা থেকে। আমি ডিসিডিডি ইন্দ্রজিৎ কর পুরকায়স্থকে ইনভেস্টিগেট করতে বলেছি। ওকে ডিটেলসগুলো দিয়ে দিও"

"নিশ্চয়ই স্যার। কোনও ডাক্তারের এরকম রিপোর্ট পড়িনি। তবুও আবার খুঁজে দেখব স্যার"

"ওহঃ আরেকটা কথা। ওরা বলছে মেহুলি রায় নামে মুম্বাইর মেয়ের ক্রেডিট কার্ড দিয়ে ওই মহিলার ফ্লাইট টিকিট কাটা হয়েছিল দিল্লি থেকে। এই কী সেই মেহুলি রায় যে মেদিনীপুরের রিসর্টে খুন হয়েছিল?"

"সেটা তো জানি না। মেহুলি রায়ের সব রিপোর্ট এখানে"

"কে ইনভেস্টিগেট করছে?"

"মেদিনীপুরের এসপি স্নেহাশিস চ্যাটার্জি"

"সব কেমন গোলমেলে। মৃত মানুষের ক্রেডিট কার্ড দিয়ে টিকিট কাটা হল কী করে? তাও আবার দিল্লি থেকে। ডিসিডিডি এসপিকে ডেকে পাঠাই। চেন্নাইয়ের হোম মিনিস্ট্রির চাপ..." ফোন কেটে দিল।

মধুসূদন অবাক। ভাবতেও পারেনি লিঙ্কের চিন্তাধারা এভাবে মিলে যাবে। আন্দাজ করেছিল লিঙ্ক আছে। ডিজির কথায় এখন স্পষ্ট। এখন সে ইনডিভিজুয়াল খুনের কথা ভাবছে না। যারা তদন্ত করছে, করুক। যদি কিছু মিস হয়ে যায়, বড়জোর মনে করিয়ে দিতে পারে। জানতে হবে মোটিভ কী? কোনও মানসিক বিকৃতি না গণিত তত্ত্ব? ওরা থাকুক ইনভেস্টিগেশনে। সে ছা-পোষা এসি, মাস-মাইনের কেরানি। রিপোর্টগুলোকে গুছিয়ে রাখা কাজ। এই রিপোর্টগুলোর সার আত্মস্থ করে একটা চক্রে গেঁথে ফেলতে পারলে, সারা জীবনের ব্যর্থতা ভুলে, রিটেয়ারমেন্টে আত্মতুষ্টির অবকাশ। ব্যর্থতাই স্পৃহা জাগাচ্ছে, কিছু করে দেখানোর। নইলে বাকি জীবন ব্যর্থ পুলিস অফিসারের তকমা নিয়েই বেঁচে থাকতে হবে, যার রেশ আছড়াবে গিন্নির গঞ্জনায়।

পল্টুর গরম চায়ের সঙ্গে আজকের আড্ডা বেশ গরমা-গরম। চায়ের বিক্রিও বেড়ে গেছে। বোনাস মোগলাই পরোটা, মটন কবিরাজি।

শঙ্করদয়াল কুঞ্জবিহারীকে বলল "এতদিনে ব্যাপারটা পরিষ্কার"

"কী?" কুঞ্জবিহারীর প্রশ্ন।

“ভওয়ানিশঙ্করই এসব খুনের হোতা”

“তাই তো মনে হচ্ছে”

মাঝ থেকে মধুসূদন টিপ্পনি কাটল “তর্কের ক্ষেত্রে মানাই যেতে পারে ভওয়ানিশঙ্কর পান্ডা। মোটিভ কিন্তু এখনও পরিষ্কার নয়”

কুঞ্জবিহারী শঙ্করদয়ালের দিকে চাইল। উত্তর আশা করছে। শঙ্করদয়াল মোগলাই পরোটাতে কামড় দিল। মিথ্যে বলেনি মধুসূদন। খুনি তো, বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু কোনও এভিডেন্স নেই। মোটিভও ধোঁয়াশা। হিসেবটা মিলেও মিলতে চাইছে না। চক্রের পান্ডাকে শনাক্ত করা গেলেও, কারণ অথৈ জলে।

“কোনও স্ক্যামে নিশ্চয়ই জড়িয়ে”

“মানতে পারলাম না। একটা ওয়ান অফ ইনসিডেন্ট হলে, স্ক্যাম বলা যেতে পারে। এতগুলো খুন স্ক্যাম নয়, অন্যকিছু”

মধুসূদন চুপচাপ শুনছিল। উপভোগ করছিল ওদের যুক্তি-তক্ক। এবার থাকতে না পেরে বোমা ফাটাল “আজ ডিজি ফোন করেছিলেন। ইনসুলিনের প্রেসক্রিপশন কলকাতা থেকে লিখেছিলেন একজন প্লাস্টিক সার্জেন। নাম ডাঃ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়”

“অ্যাঁ!!!” সবার মুখ থেকে একসঙ্গে বেরিয়ে এল। ওদের সশব্দ জাসুসিতে হঠাৎ মধুসূদন জল ঢেলে দিল।

“ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ভওয়ানিশঙ্করের যোগটা কোথায়?”

সবাই চুপ। কারও মুখে কথা নেই। অনেকক্ষণ কেটে গেল নীরবতায়। সবাই মোগলাই পরটা পেটে পুরে ঠান্ডা মগজকে সতেজ করতে চাইছে।

তাপস মিনমিন করে বলল “প্লাস্টিক সার্জেন। থাকতেই পারে”

শঙ্করদয়াল প্রতিবাদ করল “আর ডাক্তার পেল না? মুম্বাইতে এত ডাক্তার থাকতে ইনসুলিন লেখার জন্য কলকাতা থেকে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন লিখিয়ে, ব্যাঙ্গালুরু থেকে ওষুধ কিনিয়ে, চেন্নাইতে খুন। ব্যাপারটা গাঁজাখুরি হয়ে যাচ্ছে না?”

“সব ডাক্তার তো নাও লিখতে পারে?” কুঞ্জবিহারী বলল।

“ডাঃ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ই বা লিখবে কেন?”

“নিশ্চয়ই চক্রে জড়িয়ে”

শুভঙ্কর চুপচাপ কথা শোনে। বড় কিছু বলে না। এবার না বলে পারল না “শুনেছি ওনার পসার রমরমে। এত টাকা থাকতে, উনি কেন ভওয়ানিশঙ্করের সঙ্গে জড়াবেন?”

“লোভ ভায়া, লোভ। লোভ মানুষকে কোথায় নিতে পারে জান না। স্বর্গ থেকে নরকে”

“ধরা পরলে তো ইহলোক থেকে পরলোকে যেতে বেশি সময় লাগবে না। তোমার থেকে উনি বেশি জানেন” শঙ্করদয়াল গম্ভীর।

তড়িৎ হেসে বলল “কেন লিখেছেন, কাকে লিখেছেন, সেই প্রেসক্রিপশন দিয়ে কী করা হবে, নাও জানতে পারেন। আমার মনে হচ্ছে অযথা তোমরা একজনকে নিয়ে বেশি মাতামাতি করছ। ছাড় তো। কালকে পুলিস নিশ্চয়ই ওনাকে জেরা করবে। নিঃসন্দেহে সদুত্তর মজুত”

মধুসূদন চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে “কে কাকে খুন করছে কীভাবে, এ সবের মধ্যে না গিয়ে, কেন খুন করেছে সেটা ভাবলেই সদুত্তর পাওয়া যাবে। দুটো ব্যাপার পরিষ্কার। খুনগুলো একে অপরের সঙ্গে জড়িত। খুনগুলোর পেছনে একটা আলটিমেট মোটিভ আছে। যেটা আমাদের এখনও অজানা”

“এই খুনগুলো থেকে জানব কী করে?”

“কতগুলো অবভিয়াস জিনিস উঠে আসছে। এক খুনগুলো ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে হচ্ছে”

তাপস বাধা দিল “সাউথ ইন্ডিয়ান অ্যাকট্রেসের বোমা ফেটে মরা, ওই খুনটাও কী এর মধ্যে?”

সায় দিল মধুসূদন “হ্যাঁ, ওটাও। যদিও এখনও কোনও এভিডেন্স নেই। মনে হচ্ছে এখানেও যোগসূত্র আছে”

“কী যোগসূত্র?”

“জানি না। আমার ধারণা” মটন কবিরাজির টুকরো মুখে পুরল “যা বলছিলাম, কে খুন করেছে তা নিয়ে না ভেবে, কারা খুন হয়েছে নিয়ে ভাব। মনে হচ্ছে না একজনের কাজ”

ওরা হিসেব করল “মেহুলি, সোহম, অঙ্কুর, সোফি, সুনেত্রা, নীলকান্থ। এখন বলছ সাউথের হিরোইনটাও”

মধুসূদন চেয়ারে দেহটা এলিয়ে দিল “তোমারা তো খুনিকে ধরেই ফেললে। আমি বলছি, এখনও খুন শেষ হয়নি”

“মানে?” শঙ্করদয়াল অবাক।

“অঙ্কটা কষে দিলে। আমিও বলে দিচ্ছি, অঙ্ক এখনও শেষ হয়নি। আরও খুন হবে”

“কী করে বুঝলে?”

মুচকি হাসল মধুসূদন “এবারে নর্থ ইন্ডিয়ায়। দেখ, আমার কথা মেলে কি না?”

খুনের উপায় নিয়ে সময় নষ্ট না করে মধুসূদন ভাবছিল খুনের অঙ্ক। অস্পষ্ট আকার নিচ্ছে। যদিও পরিপূর্ণ অবয়বে রূপায়িত হচ্ছে না। অবয়বের পেছনের ধোঁয়াশা মানসিক অঙ্কের বীজ। নিরন্তর খুঁজে চলেছে। ধোঁয়ার আকাশে নয়, বাস্তবের গণিত তত্ত্বে।

তেত্রিশ

ভাবতে পারেনি ঐত্রেয়ীর বিয়েটা এত তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। মিলন ঐত্রেয়ীকে দৈহিকভাবে না পেয়ে বিষণ্ণ হলেও, ঐত্রেয়ীর বাবা হাতে চাঁদ পেলেন। কতদিন ভাবছিলেন কবে মেয়েকে পার করবেন। এতদিনের মনোবাঞ্ছা হঠাৎ পূর্ণ হল। ভাগ্য লাগলে এমনি ভাবেই। গ্রহচক্র গণনা, পাথর পরাবার আগেই মেয়ে পার হয়ে গেল। ঊষাকে কথাটা পাড়তেই খবর চলে গেল অ্যামেরিকায়। অ্যামেরিকান সিটিজেন ছেলে দু-সপ্তাহের ছুটি নিয়ে এল, দেখল, বিয়ে করল। ঐত্রেয়ীকে ওপারে উড়িয়ে নিয়ে গেল। বাবা দম ফেলার সময় পায়নি। মা আগে থেকেই মেয়ের বিয়ের গয়না গড়াচ্ছিলেন। ঝট করে বিয়ের আয়োজনে আর কিছু করে উঠতে পারলেন না।

ঊষার দেওর ঐত্রেয়ীকে পছন্দ হতে সম্মতি দিয়ে বলল "গয়না দিয়ে কী করব? ওগুলো তো আর অ্যামেরিকায় নিয়ে যাব না? বরং ওর যাওয়ার বন্দোবস্ত করি। ততক্ষণে আপনারা বিয়ের বন্দোবস্ত করুন"

ঐত্রেয়ী হাতে স্বর্গ পেল। সেও জানে, বিয়ে না হলে, ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার আশংকা। ঝামেলাটা অবশ্যম্ভাবী। রেজিস্ট্রেশনের পর বিয়ের পিঁড়িতে বসে একটাই ভয় - চাঁপাতলায় ওদের সঙ্গমের ভিডিও দেখিয়ে, বিয়েটা ভেঙে না দেয়। সম্বন্ধ করে বিয়ে তো। বিয়ে-বাসিবিয়ে-ফুলশয্যা শেষ না হওয়া অবধি আর ভাবার অবকাশ পায়নি। পলক না ফেলতেই সব কিছু শেষ হয়ে গেল।

ঠান্ডা মাথায় পরে ভেবে দেখল ওরা বিয়েতে ঝামেলা পাকাবে কেন? ঐত্রেয়ী বিয়ে করে অ্যামেরিকা পারি দিলে ওদেরই মঙ্গল। এখানে থাকলেই চিন্তার কারণ। কবে ঐত্রেয়ীর সূত্র ধরেই ওদের পেছনে পুলিস লেগে যায়। চেন্নাই খুনের জ্বলন্ত এভিডেন্স এভাবে সসম্মানে, এত তাড়াতাড়ি দেশ থেকে বিদায় নেবে, কল্পনাও করতে পারেনি।

কল্পনা করতে পারেনি মিলনও। আর একবার যদি চাঁপাতলার স্বাদ পাওয়া যেত। একবার যদি ঐত্রেয়ীকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখা যেত, সত্যি মোটা হয়েছে কি না। কামনার উচ্ছ্বাসে ঐত্রেয়ীর গভীরে ডোবা যেত। তা আর হল না। অতৃপ্ত রয়ে গেল। মাঝে শূন্যতা। সোহম, সুনেত্রা চলে গেছে। ঐত্রেয়ীও অ্যামেরিকায় চলে যাবে। সে পড়ে রইল থিসিস শেষের প্রতীক্ষায়।

ঐত্রেয়ীর লাইপোসাকশন হল না বটে, কিন্তু আশিস বন্দ্যোপাধায়ের ওপর নজর পড়ল ডিসিডিডি ইন্দ্রিজিৎ কর পুরকায়স্থর। চেন্নাই পুলিস থেকে শুধু নয়, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর আর্জি।

কলকাতার ব্যস্ততম প্লাস্টিক সার্জেন ডাঃ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের হদিস পেতে অসুবিধা হল না। ইন্দ্রজিৎ ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে ডানলপে চাকরি করত। কারখানা বন্ধ হয়ে গেল। সে সময়, কলকাতায় ইঞ্জিনিয়ারদের আর চাকরির খুব বেশি সুযোগ ছিল না। বাইরে যাওয়ার ইচ্ছেও নেই। তাই আইপিএস সেরে পুলিসে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি পুলিস লাইনে সজাগ। আশিসকে জেরা করতে গেলে বুদ্ধির দৌড়ে হেরে যেতে পারে, এই ভেবে, ওর সঙ্গে কথোপকথনে গেল না।

এক শনিবার সাধারণ পোশাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই আশিসের চেম্বারে।

"উনি নেই। দিল্লি গেছেন। উইক এন্ডে রুগি দেখেন না" রিসেপশনিস্ট রচয়িতা বলল।

"কবে দেখেন?"

"মানডে টু ফ্রাইডে। নাম বলুন, অ্যাপয়েন্টমেন্ট লিখে রাখছি"

"প্রতি উইকেন্ডে দিল্লি যান? ইমার্জেন্সি হলে দেখে কে?"

"উনি ইর্মাজেন্সি অপারেশন করেন না। রুটিন কোনও প্রবলেম হলে জুনিয়র হ্যান্ডেল করে"

"১০ মার্চ, বুধবার উনি কোনও অপারেশন করেছিলেন?"

"এসব প্রশ্ন আমায় করছেন কেন?"

আইডি কার্ড দেখাতেই ভয় পেয়ে গেল রচয়িতা। পুলিসের উচ্চপদস্থ অফিসার বলে কথা।

"এবার বল ১০ মার্চ, বুধবার, কোনও অপারেশন করেছিলেন?"

রচয়িতা ইন্দ্রজিৎকে ভেতরের লাউঞ্জে বসিয়ে বলল "কফি বলি স্যার? আমি রস্টারটা নিয়ে আসছি"

ইন্দ্রজিৎ কফিতে চুমুক দিচ্ছিল। রচয়িতা রস্টারে আঙুল বোলাল "১০ মার্চ, তাই না? ইউসুয়ালি বুধবার ওনার অপারেটিং ডে। বুধবার চারটে অপারেশন ছিল। মঙ্গলবার চেম্বারের পর উনি সেগুলো ক্যানসেল করে দেন"

"কেন?"

"তা বলতে পারব না" হঠাৎ বলল "মনে পড়ছে। ক্যানসেল করে বলেছিলেন, রাতের ফ্লাইটে দিল্লি যেতে হবে"

"কেন বলেছিলেন?"

"না, তা তো বললেনি"

"কবে ফিরেছিলেন?"

"ঠিক মনে পড়ছে না। বোধহয় বৃহস্পতিবার"

কফি শেষ করে উঠে পড়ল। আর ওকে প্রশ্ন করে লাভ নেই। এর বেশি উত্তর দিতে পারবে না। গাড়িতে উঠে দিলওয়ান সিংকে মোবাইলে ফোন "হোয়েন ওয়াজ দ্য প্রেসক্রিপশন এক্সিকিউটেড? আই মিন, হোয়েন ওয়াজ দ্য ড্রাগ বট?"

"ডোন্ট হ্যাভ দ্য প্রেসক্রিপশন উইথ মি। লেট মি চেক। উইল কল ইউ ব্যাক"

ইন্দ্রজিৎ ভাবছিল প্লাস্টিক সার্জেন ইনসুলিন লিখতে গেল কেন? তাও অজ্ঞাত পরিচয় ব্যাঙ্গালুরুর মহিলা শঙ্খমালা মুখার্জির নামে। যুক্তিতে মিলছে না। অঙ্কটা স্বাভাবিক নয়। প্লাস্টিক সার্জেন, ইনসুলিন, মাঝসপ্তাহে অপারেশন ক্যানসেল করে দিল্লি। এগুলোও চেক করতে হবে। সত্যি দিল্লি গেছিল? না কি ব্যাঙ্গালুরু? উত্তর লুকিয়ে আছে প্রেসক্রিপশনে। দেরি লাগল না উত্তর পেতে। পনেরো মিনিটের মধ্যে দিলওয়ান জানাল, প্রেসক্রিপশনটা শনিবার সকালে, মানে ১৩ মার্চ এক্সিকিউটেড। ওইদিন ক্যাশ ফার্মেসি থেকে ওষুধটা কেনা। সেদিনের দুপুরের ফ্লাইটেই শঙ্খমালা চেন্নাই পৌঁছয়।

কিন্তু বৃহস্পতিবার থেকে শনিবারের মধ্যে প্রেসক্রিপশনটা ব্যাঙ্গালুরু গেল কী করে? এত সিওর গ্যারান্টিড সার্ভিস কে দিতে পারে? একমাত্র ডিএইচএল ছাড়া। ইন্দ্রজিতের মাথা খুলছে। নেক্সট গন্তব্য ডিএইচএল। জানা যেতে পারে কুরিয়ার পোস্ট করা হয়েছিল কি না? যদি হয়ে থাকে, মহিলার আসল ঠিকানা পাওয়া যেতে পারে.... না হলে, ডাক্তার সাহেব নিজেই দিল্লির নাম করে ব্যাঙ্গালুরু গিয়েছিল। ডিএইচএলের স্টাফ ওই চারদিনের রেকর্ডস তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ডাঃ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও চিঠি পোস্টের রেকর্ড পেল না।

যারা এত কেয়ারফুলি প্ল্যান করে এ কাজ করেছে, তারা কী কুরিয়রে ট্রেস রাখবে? ঠিকানাটা তো ভুল দেওয়া যাবে না। নামটা ভুয়ো হলেও। অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারকে দমদম এয়ারপোর্টে পাঠিয়ে দিল। ১১ মার্চের সব কলকাতা-দিল্লি ও কলকাতা-ব্যাঙ্গালুরু ফ্লাইটের বুকিং-বোর্ডিং লিস্ট চেক করতে।

দিনের শেষ উত্তর "পেয়েছি স্যার"

"কোন ফ্লাইট? কোথায়?"

"রাত আটটার ইন্ডিগো ফ্লাইট। কলকাতা-দিল্লি"

সত্যি সত্যি তাহলে ডাক্তার সাহেব দিল্লি গেছিল। রিসেপশনের মেয়েটি মিথ্যে বলেনি। হঠাৎ অপারেশন সেডিউল ক্যানসেল করে মিড উইকে দিল্লি?

সেটা পরের কথা।

এখন মুখ্য কলকাতার প্রেসক্রিপশন ব্যাঙ্গালুরু গেল কী করে? মানে, এর মধ্যে আর কোন তৃতীয় ব্যক্তি জড়িয়ে। ভাবতেই সব পরিষ্কার। যারা এত প্ল্যান করে ব্যাঙ্গালুরু-চেন্নাইয়ের রির্টান ফ্লাইট শঙ্খমালার নামে বুক করেছে দিল্লির ইন্টারনেট কাফে থেকে মৃত মহিলার ক্রেডিট কার্ড দিয়ে, তারা কী কুরিয়ারের ওপর ভরসা করবে? এখানে কোনও তৃতীয় ব্যক্তি কাজ করেছে। কে সে? সে-ই প্রেসক্রিপশনটা কলকাতা থেকে ব্যাঙ্গালুরু পৌঁছে দিয়েছে শঙ্খমালার হাতে?

ইনভেস্টিগেশনের বিবরণ সহ নোট লিখে মধুসূদনকে পাঠিয়ে দিল। যদি রেকর্ড ঘেঁটে বার করতে পারে সন্দেহজনক এই ব্যক্তিটিকে।

চৌত্রিশ

দমদম এয়ারপোর্টের বাইরে ট্যাক্সিতে উঠে শিরিন ভাবছিল, এ ছাড়া তার অন্য কোনও উপায় ছিল না। মুম্বাইয়ের তেরো তলার ঘরে হাঁপিয়ে উঠছিল। ভয় ভেতরকে তোলপাড় করছে। মেহুলি গেছে, সুনেত্রাও। কবে তার সে হাল হয়। ওখানে কাউকে বিশ্বাস করা যায় না। কোথা থেকে কোথায় কথা ছড়িয়ে পড়ে। ভীষণ অসহায় লাগছিল। যে দুনিয়াকে বিজয়িনীর মতো এনজয় করেছে, আজ সেই পৃথিবী অচেনা। মেকি মুখোশে স্বার্থের সাগরে ভেসে বেরানো। ঝড় উঠলেই টালমাটাল, বেশি হলে ডুবে যেতে পারে। টাকা, গাড়ি, বাড়ি, রূপ যৌবন সব থাকা সত্ত্বেও খোলা হাটে বিকিকিনির পসরা। সাফল্যের চূড়া থেকে আরব সাগরে ভেসে যেতে সময় লাগবে না।

চতুর্বেদীর সঙ্গে ভওয়ানিশঙ্করের সংযোগে চিন্তা দ্বিগুণ। ভওয়ানিশঙ্কর ডেকে পাঠাল কেন? উপদেশের আড়ালে প্রচ্ছন্ন হুমকি। ভওয়ানিশঙ্করের উপস্থিতিতে অন্তর্মুখী ভাবনা। সংযোগ না বুঝলেও, গুরুত্ব স্পষ্ট। অজান্তেই কোনও অজানা চক্রে জড়িয়ে পড়েছে। চক্রটা কী বা সে কোথায় দাঁড়িয়ে। বোঝার বাইরে। তাই কলকাতায় পরামর্শ, মুক্তির উপায়ের সন্ধানে। স্নেহাশিস ছাড়া আর কারও কথা ভাবতে পারছে না। গতকাল শুট শেষে ঠিক করল, ইমিডিয়েটলি কলকাতায় স্নেহাশিসের থেকে পরামর্শ নেওয়া দরকার। পুলিসের লোক, অঙ্কটা আন্দাজ করতে পারবে। ওদের স্ক্যানারে থেকে কাজটাও সুস্থিরভাবে করতে পারছে না।

"মেমসাব কোথায় যাবেন?" অনেকদিন পর বাংলা কথায় ধড়ে প্রাণ এল।

"হায়াত রিজেন্সি"

হঠাৎ বেরিয়ে এসেছে। ঠিক করেনি কোথায় উঠবে। দরগা রোডের বাড়িতে উঠতেই পারত। সেখানে নিজের মতো করে সবকিছু করা যাবে না। হাজার চোখের দৃষ্টি। সে আজ মুম্বাইয়ের সেলিব্রিটি। মুম্বাইয়ের সেলিব্রিটিদের মায়ের কোমর পেঁচিয়ে ঝগড়া, মধ্যরাতে বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে হাতাহাতি, দিনে পাঁচতারা হোটেলে খাওয়া-দাওয়া। রাস্তায়-ঘাটে পাশের গাড়িটা যখন রেড লাইটে দাঁড়ায়, ফিরে দেখা। মুম্বাইয়ের লোকেরা সেলিব্রিটিদের গুরুত্ব দেওয়ার চেয়ে কেচ্ছা শুনতেই ব্যস্ত। কলকাতায় মুম্বাইয়ের সেলিব্রিটি। পাড়ার একজন। তাই দরগা রোড নয়। লোকচক্ষের আড়ালে, হোটেলের নিশ্চিন্ত এসি ঘরে লুকিয়ে উত্তাল মনের উত্তর খোঁজা। চতুর্বেদীর হাত এত লম্বা নয় যে কলকাতা চত্বরে পৌঁছতে পারে। জানতেও পারবে না। যদিও ভওয়ানিশঙ্কর বলেছিল কাউকে না বলতে, একা একা চাপা ভয় কদ্দিন বইবে? শেষে না মেন্টাল ব্রেকডাউন হয়।

"আমি কলকাতায়"

"কোথায়, কখন?" স্নেহাশিস হাতে চাঁদ পেল।

"হায়াতে। রুম নম্বর ২০৬"

"আমি এখন খড়গপুরে"

"চলে এস"

"কাল ঋজুর পরীক্ষা"

"অভ্রদিতা সামলাতে পারবে না? আমার ভীষণ দরকার"

দৈহিক প্রয়োজন হতে পারে। এই মুহূর্তে সেটা গৌণ। দেহের স্বাদ মিশেছে চিন্তার বিস্বাদে, অসমাপ্ত কাজের চিন্তায়। নয়া মোড় খোঁজা উদ্দেশ্য। ডিজির চাপ। রোশনের কথায় সে শিরিনকে নতুন করে দেখছে। এবার দেহ নয়, মনকে স্ক্যান করার সময়।

“দেখি, তোমায় জানাচ্ছি” ফোনটা কেটে দিল।

ফ্রেশ হওয়ার জন্য স্নান করতে যাবে ভাবছিল। দশ মিনিটে ফোন “আসছি। পৌঁছতে প্রায় আড়াই ঘণ্টা লাগবে। অভ্রদিতা ম্যানেজ করে নেবে”

“এখানে লাঞ্চ আমার সঙ্গে”

ফোন কেটে বাথরুমে শিরিন। বাথটবের কল চালিয়ে, বিজেটে ব্ল্যাডারের পরিত্রাণ। ফ্লাইট থেকে নেমে শুধু জমা পেচ্ছাপ নয়, অদৃশ্য চক্র থেকেও নিষ্কৃতি চাইছিল।

দুপুর একটা। “কলকাতায় ঢুকে পড়েছি”

“নীচের লা কুচিনিয়াতে চলে এস। খুব ভালো ইটালিয়ান ফুড করে”

ফোন কেটে ভাবল কতটা বলবে? সব, না রেখেঢেকে? মন দোটানায়। পুরোটা না বললে তো স্নেহাশিস সদুত্তর দিতে পারবে না। কোনও কিছু না ঢেকে সব কথা বললেই মুক্তি। নইলে নিষ্কৃতি নেই।

সানগ্লাসটা খুলে উলটো দিকে বসে স্নেহাশিস বলল “ভীষণ খিদে পেয়েছে”

“কী খাবে?” চিন্তায় খিদে উধাও।

“তুমি তো জান আমি কী ভালোবাসি”

মনে পড়ল কলেজ জীবনে স্নেহাশিস সামন খেতে ভীষণ ভালোবাসত। তখন টাকা ছিল না। আজও সরকারি চাকরিতে হায়াত রিজেন্সির সামন খাওয়ার ক্ষমতা নেই। ওর প্রিয় সামন-ই অর্ডার দেওয়া যাক। মাছের রাজা। আর্থিক দিক থেকেও বলের রাজা। আজ তো মনের রাজাকে মাছের রাজকোষ দেখাবার ক্ষমতা আছে। শুধু ক্ষমতা নেই বলার, সেদিন কেন অনেক কথা চেপে গেছিল।

“হঠাৎ কলকাতায় কিছু না বলে?”

“কাল রাতে ঠিক করেছি”

“জরুরি তলব কেন?”

“তোমায় কাছে পরামর্শ চাই”

“গ্রামের পুলিস মুম্বাইয়ের নামজাদা মডেলকে কী পরামর্শ দিতে পারে?”

“বাঁচার পরামর্শ”

চমকে উঠল! এ কী বলছে। সারা পথ ভেবেছে শিরিন আবার কোন রঙিন প্রস্তাব নিয়ে হাজির। কীভাবে তাকে এড়াবে। এ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত।

“আই অ্যাম ইন বিগ ট্রবল”

“কী হল?”

“আগে খেয়ে নিই। পরে বলব”

সামনটা দারুণ। বেকড মাশরুম স্যালাড। বয়েল্ড ভেজিটেবলস, মেয়নিজ দিয়ে খেতে ভয় করছিল। গরমকাল। পুরনো হলে পেট না খারাপ হয়।

শিরিনকে উদ্বিগ্ন দেখে বলল “খাবার নিয়ে চিন্তিত কেন?”

“মেয়নিজে বড় ভয়। পেট খারাপ হবে না তো?”

“পেটে খেলে পিঠে সয়” সামনের টুকরো মুখে পুরে বলল “চালিয়ে যাও। ভেবে কাজ নেই। কে সারা সারা। যা হবার তা হবে”

ঘরে বসে শিরিন বলল “বড্ড ঝামেলায় পড়েছি। সেদিন তোমাকে অনেক কথা বলা হয়নি।... ধীরে ধীরে বলছি”

স্নেহাশিসও রোশনের সঙ্গে কথা, সুনেত্রার কম্পিউটারে ওর ছবির কথা চেপে গেল। আগে ও বলুক। তারপর যা প্রশ্ন করার করবে।

"তোমাকে বলেছিলাম সুনেত্রার সঙ্গে আমার 'হায় হ্যালো' সম্পর্ক। ঠিক তা ছিল না। আমার মতো সুনেত্রাও কলকাতার। বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে সময় লাগেনি। ওর দ্য নিউ এজের কলিগ সন্নিধিও। ওদের ম্যাথেরনের কাছে কার অ্যাকসিডেন্ট হয়। অন্যরা মারা গেলেও, সন্নিধি বেঁচে। এখন লীলাবতী হাসপাতালে ভর্তি..."

শিরিন বলে চলেছে। এসব তো স্নেহাশিসের জানা।

"সুনেত্রা, সন্নিধি আর আমি অনেক জায়গায় একসঙ্গে বেড়াতে গেছি। সন্নিধি অঙ্কুর বলে একজনকে ভালোবাসত। শুনেছি সেই রাতে অ্যাক্সিডেন্টের সময় ওর সঙ্গে ছিল। শুনলাম সে-ও মারা গেছে"

সেন্ট্রাল এসিতেও বিন্দু বিন্দু ঘাম শিরিনের কপালে। স্নেহাশিসেকে বলল "একটা সিগারেট দাও তো। ... সুনেত্রার বেশিরকম সাধুপ্রীতি ছিল। কেন, বলতে পারব না। সাধু দেখলেই তার পেছনে ছুটত। গোঁড়া মারোয়ারি ফ্যামিলির মেয়ে কি না। সন্নিধি হাসপাতালে, সুনেত্রা মারা গেছে, এবার কী আমার পালা? ভীষণ ভয় করছে"

"বন্ধুত্ব থাকতেই পারে। ভয় কীসের?"

"আসল কথাটা ভয়ে বলিনি। শো-বীজ দুনিয়ার অলিখিত ডন চতুর্বেদী। আমাদের সবাইকে ওর ইশারায় নাচতে হয়। নইলে ইন্ডাস্ট্রিতে টেকা মুস্কিল। তোমাকে বলিনি কারণ তুমি বা তোমার মুম্বাইয়ের কলিগ ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে চতুর্বেদী মুহূর্তে ধরে ফেলত আমার কাছ থেকে জেনেছ। আমাকে আর মুম্বাইতে করে খেতে হত না"

সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে নিভিয়ে বালিশে দেহটা এলিয়ে দিল। ওর স্তনের খাঁজ প্রকাশিত। এখন আর স্নেহাশিস দেখছে না, শুনছে।

"চতুর্বেদীকে বরাবরই গুড হিউমারে রাখি। আমাদের লাইনে অনেক মেয়ে। সবাই বিভিন্নভাবে চেষ্টা করে। আমি আল্লার দিব্যি দিয়ে বলছি, ওর সঙ্গে শুইনি"

"তাহলে খুশি রাখলে কী করে?" স্নেহাশিস শিরিনের সেক্স লাইফ নিয়ে ইন্টারেস্টেড নয়।

"পার্টিতে ঢলাঢলি। তেল দিয়ে কথা বলে। ব্যাস ওটুকুই। মেহুলি মারা যাওয়ার পর চতুর্বেদী আমায় ঘন ঘন ফোন করতে থাকে"

"মেহুলির সঙ্গে ওর কী সম্পর্ক?"

"ওর একটাই প্রশ্ন, তুমি ওর সম্বন্ধে জান কি না। তুমি আমার ফ্ল্যাটে থাকার সময়ও বেশ কয়েকবার ফোন করে। বারবার বোঝাবার চেষ্টা করি তুমি কিছুই জান না"

"চতুর্বেদী মেহুলি সম্বন্ধে জানতে চাইছিল কেন? মেহুলির সঙ্গে কী ওর কোনও সম্পর্ক ছিল? ওর মৃত্যুর সঙ্গে কী কোনওভাবে জড়িয়ে?"

"বলতে পারব না। মেহুলির সঙ্গে সম্পর্ক তো ছিলই। আমাদের মডেলিং ইন্ডাস্ট্রিতে ওর সবার সঙ্গে সম্পর্ক। মেহুলির সঙ্গে না থাকার কোনও কারণ নেই। তবে কদ্দুর, জানি না। ইন্ডাস্ট্রিতে ডান কানও বাঁ কানকে কিছু বলে না। সবাই ইকোয়েশন কষতে ব্যস্ত"

"আন্ডারস্টুড"

বালিশটাকে জড়িয়ে, পায়ের ফাঁকে রেখে বলল "মেহুলির সঙ্গে ওর ব্যাপার কী, আমি কিছুই জানি না। তবে সেদিন হঠাৎ আমায় নিয়ে গেছিল ম্যাথেরনে, ভওয়ানিশঙ্করের আশ্রমে"

"হঠাৎ আশ্রমে কেন?"

"জানি না। মনে হল ভওয়ানিশঙ্কর চতুর্বেদীর গাইড, গুরু। গোঁড়া মুসলমান পরিবার থেকে এলেও ধম্ম-কম্ম বিশেষ করি না। আশ্চর্যই হয়েছিলাম। বুঝতে পারছিলাম না কেন?"

স্নেহাশিসের মনে পড়ল রোশনের কথা। সন্নিধি বয়ান দিয়েছে 'ইট ওয়াজ এ ডেলিবারেট অ্যাকসিডেন্ট' এও মনে পড়ল রোশন বলেছিল সন্নিধির সঙ্গে অঙ্কুরের ভাব-ভালোবাসা। ডবল কনফার্মড শিরিনের কথায়।

এও বলেছিল ওরা যে ম্যাথেরন যাচ্ছিল, চতুর্বেদী আর ভওয়ানিশঙ্কর ছাড়া কেউ জানত না। রহস্যের কিনারাটা কি ওখানেই? দেখা যাক শিরিন আর কী বলে। শিরিন বালিশটা পায়ের ফাঁক থেকে কোলের ওপর তুলে উঠে বসল।

"ভওয়ানিশঙ্কর সৌম্য সুপুরুষ"

"চতুর্বেদী তোমায় ওখানে কেন নিয়ে গেছিল?"

"ভওয়ানিশঙ্করের স্পষ্ট ভদ্র ভাষায় ওয়ার্নিং, আমি যদি তোমায় কিছু জানাই, পরিণাম ভালো হবে না"

"আমার নাম জানে?"

"নাম শুধু নয়, সম্পর্কটাও। আমার তো কাউকে বলার নেই। মুম্বাইতে ওদের চর সব জায়গায়। নিশ্চয়ই আমার ওপরও চোখ রাখছে। ওরা জানবার আগেই কাল রাতে হঠাৎ ঠিক করে চলে এলাম"

"দরগা রোডের বাড়ি যাবে না?"

"মাথা খারাপ! বাড়ি গেলে কলকাতায় আসা জানাজানি হয়ে যাবে"

"ভুলেই গেছিলাম। তুমি তো সেলিব্রিটি"

"সেলিব্রিটি না ছাই। তুমি সাহায্য না করলে ছবি হয়ে দেওয়ালে ঝুলতে সময় লাগবে না। বাবাঃ, যে চক্করে পড়েছি। বুঝতে পারছি না এর থেকে কী করে উদ্ধার পাব?"

স্নেহাশিস সিগারেট ধরিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল। শিরিন বাধা দিয়ে বলল "আরেকটা কথা বলতে ভুলে গেছিলাম। ভওয়ানিশঙ্করকে দেখে মনে হল, কোথায় যেন আগে দেখেছি। প্রথমে মনে করতে পারছিলাম না। পরে মনে পড়ল সুনেত্রার কম্পিউটারে। ওকে দেখেছিলাম সেক্সচুয়াল ইন্টারকোর্স করা কিছু ব্লু ফিল্মের ভিডিওতে"

স্নেহাশিসেরও মনে পড়ে গেল। সেক্সচুয়াল ইন্টারকোর্স ও কামসূত্রের বিভিন্ন লীলার ভিডিওগুলো সুনেত্রার কম্পিউটারে। জানত না সেই পুরুষ ভওয়ানিশঙ্কর। এখন জানল, ওর নাম ভওয়ানিশঙ্কর।

রোশনের কথা মনে পড়তেই জিজ্ঞেস করল "সুনেত্রা কী সেক্সচুয়ালি খুব অ্যাকটিভ ছিল?"

"কখনও বাড়িতে বয়ফ্রেন্ডকে দেখিনি। রাত কাটানো দূরের কথা"

"পার্টি-ড্রাগ এসবে ছিল?"

"তাও দেখিনি কখনও। খালি চাকরি নিয়ে মাঝে-মধ্যে আক্ষেপ। বলত চাকরিটা ভালো লাগছে না। আরেকটা পেলে ছেড়ে দেবে"

যদি শিরিনের কথা সত্যি হয়, তবে তেরো তলা থেকে লাফ দেওয়ার আগে, পার্টি ড্রাগস খেয়েছিল কেন? তাহলে কী সুনেত্রার মৃত্যু আত্মহত্যা নয়? হত্যা! কে ওই লোকটি, যে সেদিন স্যানট্রো নিয়ে বেরিয়ে গেছিল? সেই কি ওই ড্রাগগুলো ওকে খাওয়ায়? একটা কথা স্পষ্ট, যদি ওই লোকটা সুনেত্রাকে পার্টি ড্রাগস দিয়ে থাকে, সে নিশ্চয়ই ওর চেনা। নইলে ঘরে ঢুকতে দেবে কেন? অনেক প্রশ্ন। উত্তর জানা নেই, শিরিনও দিতে পারবে না।

তবুও বাজাবার জন্য বলল "তুমি কী সিওর, সুনেত্রা সেক্স-ড্রাগসে জড়িয়ে ছিল না?"

"কী করে বলব? সারাদিন কাজের ধান্দায় ব্যস্ত। সময় কোথায় অত ডিটেলস জানার? যতটুকু জানি, মনে হয়নি। তবে কার মনে কী, বলব কী করে?"

সত্যি তো। আমরা শুধু বাইরেটাই দেখি। কজনের সময় আছে ভেতরকে পরখ করার, বোঝার, চেনার? দ্রুতগতি আধুনিক মুম্বাই শহরে নিজের বাইরে পৃথিবীটাকে দেখার সময় কোথায়? থাকলেও, ইচ্ছেই বা ক'জনের। ওরা বলবে, ইনফিলট্রেটিং অন প্রাইভেসি। মেকি সভ্যতা বিচ্ছিন্ন আত্মকেন্দ্রিক করে দিচ্ছে।

এখন মনে হচ্ছে, ভওয়ানিশঙ্কর নিছক সাধু নয়। এই চক্রের সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে পারে। বিশেষ করে চতুর্বেদীর মতো সেডি ক্যারেক্টারদের সঙ্গে যার ওঠাবসা। মহিলা পরিবেষ্টিত ভওয়ানিশঙ্কর দেহতত্ত্ব আর ঈশ্বরতত্ত্বের যুগলবন্দি চালিয়ে যাচ্ছে, না দেখলেও অনুমান করা যায়। কিন্তু চতুর্বেদী ও মেহুলি খুনের

যোগসাজস বোঝা যাচ্ছে না। হয়ত বা, সুনেত্রা বা লরি অ্যাক্সিডেন্টের সঙ্গেও। এভিডেন্স নেই। তবুও মন বলছে মিল থাকলেও থাকতেও পারে। যদি তাই হয়, মোটিভ কী?

সাধু মহিলা নিয়ে ফুর্তি করতেই পারে। অনেক সাধুই করে। নতুন কিছু নয়। কম বয়েসে ব্রহ্মচর্যে বেঁধে দিলেও জৈবিক কামনা মরে যায় না। আত্মপ্রকাশের পথ খোঁজে। প্রচলিত ঈশ্বর সাধনায় করাঘাত করে। ভোগের মধ্যেই ত্যাগ। ভোগ না করলে কি ত্যাগ করা যায়? আর্থিক, দৈহিক লোভ সুন্দরীদের শয়নকক্ষে আনার চ্যানেল হিসেবে চতুর্বেদীর সঙ্গে ভওয়ানিশঙ্করের সর্ম্পক অস্বাভাবিক কিছু নয়, কিন্তু খুন করতে যাবে কেন?

দিন দুপুরে মাল না খেয়ে মাথাটা ঘুরপাক খাচ্ছে। মনে হচ্ছে সে খুনের কিনারায় নামেনি। সেও শিরিনের মতো এক বিশাল চক্রের নাগপাশে জড়িয়ে। অভিমন্যুর মতো হায়াত রিজেন্সির ২০৬ নম্বর ঘরে বসে মনে হল তার আর শিরিনের মধ্যে কার্যত অনেক ব্যবধান থাকলেও, দু-জনে একই নাগপাশে বন্দি। শিরিন মুখ বন্ধ রাখার জন্য, স্নেহাশিস বুঝেও। আসল সত্যটা ফাঁস না-করার জন্য। মুখ খুললে তার পরিণাম যে কী হবে, নিজেও জানে না। তবে এটা বুঝতে পারছে, পেছনে এক বিরাট চক্র। এই চক্রের নাগপাশ লুকিয়ে মেহুলির খুনের অভ্যন্তরে। যে লুপহোলসগুলো সেদিন মধুসূদন মুখুজ্জে মনে করিয়ে দিয়েছিল, এবার সেই সূত্রগুলোই ছানবিন করতে হবে। ওখানেই আসল মোটিভ। শিরিনের কাছে নয়।

শিরিনেকে বলল “অত ভেব না। আমরা দুজনেই একই চক্রে বন্দি। যদি মুক্তি হয়, দুজনেরই একসঙ্গে হবে”

শিরিন জবাব দিল না। বালিশ সরিয়ে, মাথাটা এলিয়ে দিল স্নেহাশিসের বুকে। একটু সান্ত্বনা খুঁজছে।

পঁয়ত্রিশ

শেষ পর্যন্ত মহাবলিপুরম না গিয়ে হায়দরাবাদের ট্রেন চেপে বসল কাভিয়া। রামালিঙ্গম ফিল্মসের ‘স্নেহাতিন্দে মাররাম’-এর শুটিং রামোজি ফিল্ম সিটিতে চলছে। পুরো ইউনিট ওখানেই কাজ করছে। সূত্র যখন হায়দরাবাদে, মাহাবালিপুরম গিয়ে কাজ নেই। হায়দরাবাদ স্টেশনে নেমে শুনল, রামোজি ফিল্ম সিটি প্রায় ১৬ মাইল। কোটির উইমেনস কলেজ বাস স্টপ থেকে ২০৬ নম্বর বাস ধরে পৌঁছে গেল। রিসেপশন থেকে টিকিট। দ্য হেরাল্ড অফ ইন্ডিয়ার রিপোর্টারের কার্ড দেখিয়ে জানাল, ইন্টারভিউ নিতে এসছে।

রামোজি ফিল্ম সিটিতে প্রি-ডিসাইনড সেট আছে। ভাড়া নিলে সেট ডিসাইনিং খরচ বেঁচে যায়। ‘স্নেহাতিন্দে মাররাম’-এর ভিলেজ সিকোয়েন্সের শুটিং। সরু রাস্তা। দু-পাশে টালির চালের একতালা বাড়ি। তিনটে লাল সিঁড়ি উঠে দরজায় ঢুকেছে। ক্যামেরা, রিফ্লেক্টর, লাইট, সব সেট করে, শুটিংয়ের প্রস্তুতি চলছে। গ্রামের সিকোয়েন্স নিশ্চয়ই। সিনেমা যতই ইন্টারেস্টিং হোক না কেন, শুটিং ততটাই বোরিং। প্রত্যেকটা সিকোয়েন্স তিনবার তিন অ্যাঙ্গেল থেকে। সেটাও শট ওকে হলে। নইলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আগে শুটিং কভারেজ করতে গিয়ে বুঝেছে। যতক্ষন না শুটিং শেষ হল, বসে রইল কাভিয়া।

শেষ হতে বেল বয়কে জিজ্ঞেস করল “কেষ্ট”

“ইল্লে” মাথা নেড়ে চলে গেল।

অনেক খোঁজের পর কেষ্টর হদিস পাওয়া গেল। শট হয়ে গেছে। কেষ্ট বিশ্রামের জন্য উলটো দিকের টালির বাড়ির সিঁড়ির ওপর বসে জিরচ্ছে। কাভিয়া পাশে গিয়ে বসল।

“বাঙ্গাল কা?”

মাথা নাড়ল।

“কাঁহা সে?”

“বাঙ্গাল, মেদিনীপুর”

“ইতনা দূর কাম করনে কেও?”

“কেয়া করে মেমসাব? রোটিকে সিলসিলে মে। উধর সে ইধর কাম করনে মে জাদা তংখা মিলতা”

“কিতনে দিন ইয়ে লাইন মে?”

“চার সাল”

“পহলে কোই সিনেমা মে কাম কিয়া?”

“হাঁ। মহাবালিপুরম মে কাম কর রহা থা। পরন্তু উসকে হিরোইন পৌরভি ম্যাডাম মরনে কে বাদ সিনেমা বন্ধ হো গয়া”

“তব কেয়া করতে থে?”

“কুছ নেহি। বহতদিন কোই কাম নেহি থা। এক হপ্তে ভর খানা ভি মুস্কিল। সোচা থা, বাঙ্গাল লৌট যাউ। ফির ভগওয়ান কালীকে আশীর্বাদ মিলা। ইয়ে নয়ে সিনেমা মে কাম মিল গয়া”

“কোন ইউনিট আচ্ছা?”

“আগে ওয়ালে। মেমসাব লোগ দেখভালো করতে থে। থোরা-বহত রূপয়ে ভি দেতা থা”

“হিরোইন?”

“নেহি। ওহ লোগ তো বড়ে আদমি। উসকা বাল দেখনেওয়ালে মেমসাব মধুস্কারাজি। বহত আচ্ছে থে। মুঝে বহত পেয়ার করতে থে। মেরা দোস্তকো ভি উনহে নোকরি দিয়া”

“পৌরভি কৈসে আদমি থে?”

“বহত বড়া হিরোইন। উসে কাঁহা ফুরসত মেরে মাফিক ছোটামোটা নৌকর কে লিয়ে?”

“কভি ভেট হুয়া?”

“ঐসে তো কাম কে ওয়াক্ত চায় ওয়াগারা লা দেতা থা। পরন্তু একবারই হি করিব সে দেখা”

“কব?”

“প্রোডাকশন কন্ট্রোলার চন্দ্র নাইডু সাব উনহে গানেকে প্লেয়ার দেনে বোলা”

“দে আয়ে?”

“হাঁ। তভি তো উসে করিব সে দেখা। বহত বড়িয়া দেখনে”

“অপনে হাত সে প্লেয়ার দিয়া?”

“হাঁ, কেঁও? ইসলিয়ে উসকে নজদিক যা সকা”

“ঔর কোইকো শুননে নেহি দিয়া?”

মনে করার চেষ্টা করল “দিয়া থা। মেরে দোস্ত গোবিন্দ কো। উসে গানা শুননে কে বড়া শখ। পহলে তো ইনকার কিয়া। মেরে জিম্মেদারি পৌরভিজি কো দেনে। ফির ওহ জিদ করনে মে শুননে কে লিয়ে দিয়া। এক হি মুলুককে। না নেহি কর পায়ে”

“কৈসে গানা থা?”

“মালুম নেহি। হিরো চায় দেনে কে লিয়ে বোলা। চায় দে কর, লৌট আনে মে, প্লেয়ার লৌটা দিয়া। মালুম নেহি শুনা কেয়া? পুছনে কা ওয়াক্ত নেহি মিলা”

“কেয়া নাম উসকা?”

“গোবিন্দ”

“ওহ কাঁহা হ্যায়?”

“উসে নৌকরি নেহি মিলা। ইসলিয়ে বাঙ্গাল মে লৌট গয়া”

“মালুম কাঁহা রহতে হ্যায়?” মাথা নাড়ল কেষ্ট “মধুস্করা মেমসাব উসে নোকরি মে লায়া থা। সয়েদ জানে”

অ্যাসিস্ট্যান্ট কনট্রোলারের ডাক এসেছে। উঠে পড়ল। কাভিয়া ওর হাতে দুশো টাকা গুঁজে দিল “তুমহারে লিয়ে” পকেটে টাকা গুঁজে কাভিয়াকে সেলাম ঠুকে বেরিয়ে গেল।

ব্যাপারটা এখন পরিষ্কার। চন্দ্র নাইডু এমপিথ্রি প্লেয়ার কেষ্টকে দিয়েছিল, পৌরভিকে দেওয়ার জন্য। মাঝে কিছুক্ষণের জন্য গোবিন্দ নিয়েছিল। যখন কেষ্ট হিরোকে চা দিতে গেছিল, সেই সময় যা কিছু ঘটেছে। গোবিন্দর কাছে এমপিথ্রি প্লেয়ার বদলে বম্ব দেওয়া প্লেয়ার পালটে দেওয়া হয়েছে। মানে যে ধরনের এমপিথ্রি প্লেয়ার চন্দ্র নাইডু ওকে দিয়েছিল, একই রকমের প্লেয়ার বদলে দেওয়া। না হলে, কেষ্টর সন্দেহ হত। শুধু গোবিন্দ নয়, ওই ইউনিটে এমন কেউ যে শুধু গোবিন্দকে প্লেয়ার পালটে দেয়নি, প্লেয়ারের আকারও জানা। এমনকী ইউনিটের গতিবিধিও। যাতে নিশ্চিতভাবে পৌরভির কাছে পৌঁছয় তাও মনিটার করছিল। কে সে? কীভাবে হল? একমাত্র গোবিন্দই বলতে পারবে। গোবিন্দকে পাবে কোত্থেকে? মধুস্করাই বলতে পারবে।

মধুস্করাকে ফোন করতেই হাইহাই করে উঠল “হোয়ার হ্যাভ ইউ বিন?”

“আউট অন ওয়ার্ক। ক্যান আই মিট ইউ ওয়ান অফ দিস ডেস?”

“সিওর। আই ডোন্ট হ্যাভ মাই ডায়রি উইথ মি। আই অ্যাম ইন দ্য বাথ। কুড ইউ কল মি ইন হাফ অ্যান আওয়ার”

“বাই অল মিনস”

আধ ঘণ্টা পরে যখন ফোন করল, মধুস্করা বলল “স্যরি। চক আ ব্লক আনটিল স্যাটারডে। সানডে উড বি ফাইন। হ্যাভ সানডে লাঞ্চ উইথ মি”

ফোনটা রেখে বুক দুরু দুরু। এবার আসল পরিচয় দিতে হবে। নইলে মধুস্করা থেকে গোবিন্দ সম্বন্ধে কিছু বার করতে পারবে না। কী ভাবে? মধুস্করাই বা কী ভাবে নেবে? কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। গোবিন্দর হদিস না পেলে, কার এই হাতসাফাই বোঝা যাবে না।

কনটিনেন্টাল লাঞ্চ। সুপ উইথ ব্রেড। চিকেন আউ-গ্র্যাটিন উইথ স্যালাড। কাভিয়া কনটিনেন্টাল প্রিয়।

মধুস্করা বলল "আই ইউসুয়ালি হ্যাভ এ লাইট লাঞ্চ। কনটিনেন্টাল ইজ মাই ফেভারিট। ডু ইউ লাইক ইট?"

মাথা নাড়ল কাভিয়া। লাঞ্চের চিন্তা বাইরে। মাথার মধ্যে কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছে, কী ভাবে কথা পাড়বে?

"আন্না, ক্যান আই কল ইউ আন্না?"

"ইউ আর মাই সিস। হোয়াই উইল আই কল ইউ নাউ অ্যান দেন?"

এতক্ষণ কাভিয়াকে দেখেনি। কাভিয়ার দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠল। মুখটা কালো, দুশ্চিন্তায় ভরা। বর্ষার কালো মেঘ মুখে ছেয়ে। কোথাও নিশ্চয়ই প্রব্লেম...

চেয়ার ছেড়ে কাভিয়ার পাশে "হোয়াটস দ্য ম্যাটার ডিয়ার?"

কাঁপছে। মাথায় হাত, কান্নায় ভেঙে পড়ল কাভিয়া। মধুস্করা বুঝতে পারছে না, কাঁদছে কেন?

"আই হ্যাভ লায়েড টু ইউ। আই ডু নট ওয়ার্ক ফর এ আইটি ফার্ম। আই অ্যাম এ ভেরি জুনিয়ার জার্নালিস্ট অফ দ্য হেরাল্ড অফ ইন্ডিয়া"

কোনও কথা নেই। কাভিয়া খাবার টেবলে মুখ নিচু করে বসে। মধুস্করা সোফায় বসল। খাবার ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। নীরবতা ভেদ করে দেয়ালের কাকু ক্লক জানান দিল ওয়ান ও'ক্লক।

এক সময় মধুস্করা বলল "বাট হোয়াই?"

কাভিয়া ডাইনিং টেবল ছেড়ে মধুস্করার পাশে সোফায় "আই ওয়ান্টেড টু রাইট এ স্টোরি অন দ্য ডেথ অফ পৌরভি"

কিছুক্ষণের নিস্তব্ধতা। মধুস্করা বুঝতে পারছে কাভিয়া কেন মিথ্যে বলেছে। এ ছাড়া ওর কীই বা করার ছিল? জার্নালিস্ট বললে, মধুস্করা কী তাকে এনট্রি দিত? হারিয়ে যাওয়া বোনটিকে কি আবার ফিরে পেত? ছোট বোনকে সব সময়ই ক্ষমা করা যায়। নিজের বোন বেঁচে থাকলে তাকে কী সে ক্ষমা করত না? সত্যি চাই মিথ্যে, অজান্তে, কাভিয়া হারিয়ে যাওয়া বোনের জায়গা নিয়ে ফেলেছে। অস্বীকার করে কী করে?

"অ্যান্ড ডিড ইউ গেট দ্য স্টোরি?"

কাভিয়ার মুখ নিচু। মধুস্করার কথায় প্রাণ পেল। মধুস্করা তাকে ক্ষমা করে দিতেও পারে।

"ওয়েল সর্ট অফ... ইয়েস... ওনলি দ্য লাস্ট বিট ইজ মিসিং"

"হোয়াট ইজ দ্য স্টোরি?"

"পৌরভি ডায়েড অফ এ বম্ব ব্লাস্ট ফ্রম এ এমপিথ্রি প্লেয়ার। দ্য ফ্যাক্ট ইজ চন্দ্র নাইডু, দ্য প্রোডাকশন কনট্রোলার হ্যান্ডেড দিস প্লেয়ার টু এ বেল বয় নেমড কেষ্ট হু হ্যান্ডেড ইট ওভার টু পৌরভি"

"ইউ মিন চন্দ্র নাইডু প্লান্টেড দ্য বম্ব?"

"নট অ্যাট অল। দ্য প্লেয়ার হি গেভ টু কেষ্ট ওয়াজ দ্য ওয়ান উইথ দ্য সং। কেষ্ট ইজ নো ওয়ে রেসপনসিবল। ইন বিটুইন গিভিং দ্য প্লেয়ার, গোবিন্দ আনাদার বেল বয় অ্যান্ড এ ফ্রেন্ড অফ কেষ্ট, ওয়ান্টেড টু লিসন টু দ্য সং। হোয়াইল কেষ্ট ওয়েন্ট টু ডেলিভার টি টু দ্য হিরো, হি গেভ গোবিন্দ দ্য প্লেয়ার। ইট ইজ ডিওরিং দিস টাইম দ্যাট সামথিং মাস্ট হ্যাভ হ্যপেনড। সাম ওয়ান প্লেড ফাউল উইথ দ্য প্লেয়ার"

"বাট হাউ?"

“ওনলি গোবিন্দ ক্যান আন্সার। হি হ্যাস গন ব্যাক হোম। ইট মে বি, দ্যাট দ্য প্লেয়ার মে হ্যাভ বিন চেঞ্জড্ অ্যান্ড সাবস্টিটিউটেড উইথ এ সিমিলার বম্ব লেডেন প্লেয়ার”

“ওহ মাই গস! বাট হোয়াই উইল হি ডু দ্যাট?”

“হি ডিডন্ট। হি হ্যাস ডন দ্য যব অ্যাট দ্য ইন্সট্রাকশন অফ সাম ওয়ান আই ডোন্ট নো। বাট ইট ইজ অবভিয়াস, হি ওয়াজ দেয়ার ইন দ্যাট ইউনিট টু। হু ওয়াজ সাইলেন্টলি মনিটরিং দ্য প্রগ্রেস অফ দ্য প্লেয়ার অ্যান্ড লুকিং ফর দ্য ওপারচুন মোমেন্ট টু চেঞ্জ দ্য প্লেয়ার। সো দ্যাট ইট ডেফিনাইটলি রিচেস পৌরভি অ্যান্ড নো ওয়ান এলস। ওনলি গোবিন্দ ক্যান আইডেন্টিফাই হিম। আই গ্যাদার ইউ প্রকিওর্ড দ্য যব ফর হিম?”

পৌরভির বন্ধুত্বের স্মৃতি, একসঙ্গে বড় হওয়া, একসঙ্গে ভাগাভাগি করে নেওয়া, এমনকী সেদিনের সন্ধের স্মৃতিও ভেসে উঠল। বন্ধুকে হারনোর আবেগ ছাপিয়ে গেছে মেয়েটার মিথ্যেকে। মধুস্করা অবাক। ভাবতে পারছে না মেয়েটা এত কাজ করে ফেলেছে। এ কাজ, কোনও পুলিস বা অন্য কেউ করতে পারত কী? অ্যামেজিং গার্ল! একটুও রাগ হচ্ছে না। চোখের সামনে ভেসে উঠল পৌরভির মুখ। কতদিনের বন্ধু, কত সুখ-দুঃখের সহচর। তার অর্ধসমাপ্ত নারীত্বের মধ্যেও মিশে পৌরভির দেহের স্পন্দন।

কাভিয়াকে জড়িয়ে ধরে বলল “মারভেলাস। ইউ হ্যাভ ডান হোয়াট মাই হার্ট অলওয়েজ ওয়ান্টেড। ইফ মাই সিসটার ওয়াজ অ্যালাইভ সি উড হ্যাভ কনগ্র্যচুলেটেড ইউ ফর দিস। কাম, লেটস হ্যাভ লাঞ্চ। দ্য ফুড ইজ গেটিং ফ্রোজেন”

ঠান্ডা চিকেন আউ গ্র্যাটিনটা চিবিয়ে বলল “মাই গস, ইটস কোল্ড। শ্যাল আই আস্ক দেম টু ওয়ার্ম ইট আপ ইন দ্য মাইক্রোওয়েভ?”

মাথা নাড়ল কাভিয়া “দ্যাটস ফাইন” ন্যাপকিন দিয়ে মুখ মুছে বলল।

মধুস্করা ফর্ক দিয়ে আউ-গ্র্যটিনটা মুখে পুরল “গোবিন্দা ওয়াজ রেফার্ড টু মি বাই মাই প্লাস্টিক সার্জেন ফ্রেন্ড ইন বেঙ্গল ডাঃ আশিস ব্যানার্জি । হি সেইড দিস ওয়াস এ পুওর নিডি বয় ফ্রম বেঙ্গল। আই টোল্ড চন্দ্র নাইডু। হি গেভ হিম এ ব্রেক”

“হোয়ার ইজ হি নাউ?”

“নো ক্লু”

“দ্যাটস হোয়াই আই সেইড ওনলি দ্য লাস্ট বিট ইজ মিসিং হুইচ ইউ ক্যান আন্সার”

“আই কান্ট। আই সাপোস ডাঃ ব্যানার্জি মে। বাট আই হ্যাভ এ ফিলিং ইভেন হি কান্ট। হি ক্যান গিভ এ ট্রেস অফ হিস হোয়ার-অ্যাবাউটস। ডু ইউ ওয়ান্ট দ্য নম্বর অফ ডাঃ ব্যানার্জি?”

“ইট ইজনট মাই পেরগেটিভ। আই উইল পাস ইট অন টু দ্য পুলিস টু টেক ইট ফ্রম হিয়ার। আই অ্যাম হ্যাপি আই ওন্ট লুজ মাই জব”

“হোয়াট হ্যাস ইওর জব গট টু ডু উইথ ইট?”

কাভিয়া আউ-গ্র্যাটিনটা চেটেপুটে খেয়ে বলল “হোয়েন আই টুক দিস অ্যাসাইনমেন্ট মাচ এগেনস্ট দ্য উইশ অফ মাই এডিটার, আই থ্রু এ চ্যালেঞ্জ, ইফ আই ডোন্ট কাম উইথ এ স্টোরি, হি ক্যান ভেরি ওয়েল কিক মি আউট অফ মাই যব। থ্যাংক গুডনেস আই ওন্ট লুজ মাই জব। ইটজ অল বিকজ অফ ইউ”

“ইউ ওন্ট। ইফ ইউ লুজ, ইট উইল বি এ বিগ লস নট ওনলি ফর ইওর পেপার, বাট অলসো ফর দ্য সোসাইটি”

ডেসার্টে ক্যারামেল কাস্টার্ড। দুজনে ভাবছে, কে এই বেল বয় গোবিন্দকে হাত করে বম্ব দেওয়া প্লেয়ার পালটাল?

ছত্রিশ

আজ ওদের সেলিব্রেশনের দিন। আশিসের কলকাতার ফ্লাইট আগেই পৌঁছে গেছে। কিছু করার না পেয়ে, গ্রেটার কৈলাসের ফ্ল্যাটে ডিনার তৈরিতে ব্যস্ত। প্রায় শেষ। সারাদিন মিটিং করে ইন্দ্রাক্ষি ক্লান্ত হয়ে আসছে। আজ তার কালিনারি স্কিলস দেখাবে।

ইন্দ্রাক্ষি ফ্ল্যাটে ঢুকে ডম পেরিডনের বোতলটা আশিসের হাতে দিল "ফ্রিজে রাখ, আমি স্নান সেরে আসছি। পথে ভসন্ত ভিহার থেকে শ্যাম্পেনটা কিনলাম"

চেন্নাইতে সিএম ও অন্যান্যদের সঙ্গে একটানা দু-ঘণ্টা মিটিং সেরেই ফ্লাইটে দিল্লি পৌঁছল। ভ্যাপসা গরমে গা টা চ্যাটচ্যাট করছে। আগে ওয়েদার অনেক ড্রাই ছিল। লক্ষ করছে, রিসেন্টলি হিউমিডিটা অনেক বেড়ে গেছে। জামাকাপড়গুলো ড্রেসিং টেবলের স্টুলে ছুড়ে বিবস্ত্র, বাথরুমে। সি নিডস এ ওয়ার্ম ফোম বাথ। বাথে জল ভর্তি করতে দিয়ে দাঁত মাজায় মন দিল। দিনে দুবার দাঁত মাজার অভ্যাস। বহুদিনের স্বপ্ন সফল হতে চলেছে বাস্তবে। চেন্নাই-এ গড়ে উঠবে স্বপ্নের 'ইনস্টিটিউট অফ ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড হিউম্যান পোটেনশিয়াল'। নতুন যুগের বীজ। আগামী প্রজন্মের বুনিয়াদ। আগামী ভারতবর্ষ। বাথটব ভরে গেছে। নগ্ন দেহকে নাতিশীতোষ্ণ জলে চুবিয়ে লিকুইড বাথ সোপ ঢেলে দিল।

১৯৪৭-এর স্বাধীনতার পর এতদিন পর্যন্ত শুধু সাহেবদের শেখানো প্রথায় নেতারা এক্কা-দোক্কা খেলে গদি বজায় রাখতে গিয়ে, ভুলে গেছে প্রাচীন সভ্যতার বুনিয়াদ ভারতবর্ষ। মহেঞ্জদারো হারাপ্পার আর্কিয়লজিক্যাল এক্সকাভেশন ছাড়া, সেই সভ্যতার প্রগতি বিগত ৫০০০ বছর ধরে ইতিহাসের পাতায় বন্দি। বাইবেলের থ্রি ওয়াইজ মেন ফ্রম দ্য ইস্ট এখান থেকেই। এখানেই যিশুর শিক্ষা লাভ, রোজাবলে জীবনের পঞ্চাশ বছর ও মৃত্যু। ভুলে গেছে কবির সুর 'ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে'। প্রাচীন ঐতিহ্য শুধু দেশাত্মবোধক গানে আর গোলামির নাগপাশে সীমাবদ্ধ। সীমার বলয় ছেড়ে সময় হয়েছে নতুন ভারতবর্ষ দেখার, স্বপ্ন দেখার, বাস্তবে রূপায়িত করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। একদিন যেমন ম্যান্ডেভিলা গার্ডেন্সে দ্য নিউ এজের স্বপ্ন দেখেছিল। সঙ্গে আরেকটা স্বপ্ন। স্থান-কাল-পাত্র-সময়ের বাইরে বেরিয়ে অতীত ভুলে চিন্তার বিকাশের মধ্যেই জীবনের সার্থকতা।

বোর্ডরুমে সিএম প্রশ্ন করেছিলেন "হোয়াই চেন্নাই?"

"হোয়াই নট? ফ্রম দ্য ডেজ অফ রামায়ণ, ইটজ দ্য এরিয়ান কালচার হুইচ হ্যাস ডমিনেটেড ইন্ডিয়া ফর ডিকেডস। দো উই আর এ কসমোপলিটান কান্ট্রি, ইন রিয়েলিটি, দ্য এরিয়ান সিভিলাইজেশন স্টিল ডমিনেটস দ্য ইন্ডিয়ান এরিনা। ফ্রম দ্য ডেজ অফ রামায়ণ উই হ্যাভ এপিটোমাইজড রামা অ্যাজ দ্য এপিটোম অফ গুডনেস অ্যান্ড রাভানা অ্যাজ দ্য সিম্বল অফ ইভিল"

"ইউ আর গোয়িং ব্যাক টু দ্য হেরিটেজ"

"ইটস ট্রু আওয়ার কান্ট্রি ইজ বিল্ট অন হেরিটেজ। ওল্ড হেরিটেজ হ্যাস টু বি রি-থট। রামা অ্যান্ড রাভনা হ্যাভ স্প্লিট ইন্ডিয়া ইনটু টু বেসিক কালচার্স - দ্য রুলিং এরিয়ান কালচার, সিমবলাইজড বাই রামা অ্যান্ড দ্য ড্রাভেডিয়ান কালচার, সিম্বলাইজড বাই রাভনা, হুইচ স্টিল রিমেইনস সেকেন্ডারি"

সিএম এই দীর্ঘ পলিটিক্যাল জীবনে অনেক যুক্তি-তর্ক-বন্ধুতা-শত্রুতা-আপস নিয়ে খেলেছে। সীমিত ক্ষমতার মধ্যে গদি বজায় রেখে কিছু উন্নতি করার চেষ্টাও করেছে। পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠতা মাথায় রেখে দেশের জন্য নিঃস্বার্থভাবে এমন করে কিছু ভাবতে পারেনি। যত শুনছে, অবাক, এই বিচক্ষণ মহিলার নিঃস্বার্থ দূরদৃষ্টি। এমন মহিলা আগে দেখেনি।

“ইন দ্য মিথলজি অল অফ আস ফ্যান্সি রামা। বাট ইন দিস টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি উই হ্যাভ টু রি-থিংক দ্য মিথ ইন রিয়ালিটি”

স্তনে সাবান বুলিয়ে নিজেকে বাহবা দিল। জানত না, এত ফ্লেয়ারিং ভাষা ব্যাবহার করতে পারে। নিজেকে নতুন করে চিনল।

“ইফ ইউ আস্ক মি মাই হনেস্ট ভিউস আই ফ্যান্সি রাভনা দ্যান রামা, বিকজ হি ইজ নট ওনলি এ মিথলজিক্যাল ফিগার, হি সিম্বলাইজেস দ্য এপিটোম অফ দ্য ড্রাভেডিয়ান কালচার। আই ফাসটেড ফর ওয়ান উইক হোয়েন দেয়ার ওয়াজ টামিল জেনোসাইড অ্যাট জাফনা। আই বিলিভ চেন্নাই ক্যান বি দ্য আউটলেট অফ কনফাইনমেন্ট অফ রিবার্থ অফ দ্য সার্ভার্স অফ দ্য কসমস”

“হাউ ডু ইউ প্রোপস টু ডু দ্যাট?” সিএমের প্রশ্ন।

“দ্য ক্রিয়েটিভ পোটেনশিয়াল অফ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল ইস পার্টলি বেসড অন জেনটিক ইনফ্লুয়েন্স অ্যান্ড কনডিশনিং দ্য মাইন্ড ইন এ মেথডিক্যাল অ্যান্ড গ্র্যামাটিক্যাল ওয়ে। দ্য ফার্স্ট ওয়ান উইল ম্যানিফেস্ট থ্রু দ্য নেক্সট প্রোজেনি, দ্য সেকেন্ড ওয়ান ক্যান বি কালটিভেটেড থ্রু দিস ইনস্টিটিউট ইন এ স্ট্রাকচার্ড মেথডিক্যাল ওয়ে। বিকজ হিউম্যান মাইন্ড ক্যান বি গাইডেড অ্যান্ড কনডিশনড টু থিংক নিউ, প্রোভাইডেড দ্য ইনহেরেন্ট পোটেনশিয়াল ইজ দেয়ার। টু বি প্রেসাইস পিকিং আপ দ্য ক্রিম অফ দ্য সোসাইটি”

সিএম অবাক হয়ে শুনছেন। অনেক জ্ঞানী-গুণী-বিদ্বজ্জনের সঙ্গে মিটিং করে নতুনের প্রচেষ্টায়। এই প্রথম একজনের সঙ্গে কথা বলছেন, যে স্থান-কাল-পাত্রের ঊর্ধ্বে উঠে গোটা ড্রাভেডিয়ান প্রজন্মের ভবিষ্যৎ চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে। বোর্ডে অনেকেই - চিফ সেক্রেটারি রঙ্গনাথন, ফাইনান্স মিনিস্টার ও সেক্রেটারি, আর্বান ডেভেলপমেন্ট মিনিস্টার ও সেক্রেটারি, হায়ার এডুকেশন মিনিস্টার ও সেক্রেটারি, পলিক্যাল সেক্রেটারি। ওদের দিকে তাকাল। কেউ মাথা নেড়ে, কেউ বা ভাষায় সম্মতি জানাল।

সিএম বললেন “উই হ্যাড ইওর প্রজেক্ট স্টাডিড ইন ডিটেল বাই এ টিম অফ এক্সপার্টস। উই হ্যাভ সিঙ্গল্ড আউট এ ল্যান্ড। বাট ওয়ান্টেড টু হিয়ার ফ্রম ইউ দ্য ভিশান বিহাইন্ড ইওর প্রোজেক্ট। উই দ্য বোর্ড মেম্বারস ইউন্যানামাসলি এগ্রি টু ইওর প্রপোজাল। উই উইল গো অ্যাহেড”

হ্যান্ডসেক করে বেরবার আগে বলল “আস্ক ইওর স্টাফ টু লিয়েস উইথ মাই অফিস। দে উইল ফরম্যালি পুট ইট ইন রাইটিং অ্যান্ড প্রোসিড উইথ দ্য এগ্রিমেন্ট”

“থ্যাংকস ফর লেটিং মাই ড্রিম কাম ট্রু”

বোর্ডরুম থেকে বেরিয়ে সিএম ভাবছিলেন, এটা করতে পারলে যা পলিটিক্যাল মাইলেজ পাবেন, এর আগে কোনও চিফ মিনিস্টার পায়নি।

ফেরার পথে আশিসকে জানাল। আশিস তখন সবে দিল্লি এয়ারপোর্টে।

“হয়ে গেছে?” আশিস মোবাইলে।

“হ্যাঁ। সিএম প্রজেক্টটা অ্যাপ্রুভ করেছেন। তুমি ফ্ল্যাটে গিয়ে রিল্যাক্স কর”

“আজকে তো সেলিব্রেট করার দিন”

“করবই তো। আগে দিল্লি পৌঁছই”

প্লেনে বসে পাওয়ার আনন্দের থেকে বেশি না-পাওয়ার শূন্য অতীত ফিরে আসছে। কোথায় পায়নি? কোথায় হারিয়েছে? ছেলেবেলার না-পাওয়া পৃথিবীকে সারাজীবন খুঁজে বেরিয়েছে। হারিয়েছে, পেয়েছে, আবার হারিয়েছে, আবার পেয়েছে। এই পাওয়া-হারানোর মধ্যে ইন্টেলেকচুয়াল অরগ্যাজম খুঁজেছে। শুধু দেহে নয়, মনেও। অতৃপ্ত ক্ষুধায় পুরুষের সেক্সচুয়ালিটি নিয়ে খেলা করেছে, নাড়া দিয়েছে তাদের জৈবিক আবেগে, যা এর আগে কেউ কখনও এত সক্ষমভাবে করতে পারেনি। চিফ মিনিস্টারই বা বাদ কেন?

প্রতি শিবরাত্রিতে শিবলিঙ্গের পুজো হয়। যদি পুরাণের সময় জন্মাত দলে দলে মানুষ, বিশেষ করে সক্ষম কর্মঠ যুগান্তকারী দ্রষ্টা তার নিম্নাঙ্গের মৃত্তিকাতে ষষ্টাঙ্গে প্রণাম করত। পুরুষের মাংসপিণ্ডের ঔদ্ধত্য তার জীবনে কখনও দুষ্প্রাপ্য ছিল না। সেসব যৌবনাসক্ত পুরুষরা তার সব রকমের মানসিক চাওয়ার পথিকৃৎ হয়েছে বিভিন্ন রূপে, ছন্দে, বর্ণে, ভঙ্গিতে, তার সব কামনার কাছে নতজানু হয়ে। কিন্তু এই দৈহিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে তো মানুষটাকে খুঁজে পায়নি। যৌবনের উচ্ছ্বাসকে পেছনে ফেলে, সে শুধু অন্তরের গভীরে শুনতে পেয়েছে বিজয়ের জয়ধ্বনি। ভায়েগ্রা নিঃশেষিত প্রতিটা বয়সের পুরুষ তার যোনিতে বহু জন্মের পুঞ্জিভূত কামরস ঢেলে তাদের তীর্থস্নান পূর্ণ করেছে। এমনও হয়েছে, সে যখন পুরুষসঙ্গীকে প্রিম্যাচিওর ইজ্যাকুলেশনে সেক্সচুয়ালি ভেঙে পড়তে দেখেছে, তখনও সে থেকে গেছে অপরিচিত অতৃপ্ত নারী রূপে।

এই পুরুষ সঙ্গীদের মধ্যে সব থেকে সবল মানুষটাও তার অনন্ত চাওয়ার আলোকে থেকে গেছে। বিরাট স্ফুরণে না-পাওয়ার অঙ্গীকার। ওয়ার্ডসওয়ার্থের দ্য ইয়ারো ভিসিটেড চিরকালই রয়ে গেছে দ্য ইয়ারো আনভিসিটেড, জীবনের একাকী অন্ধকারে। এখন বুঝতে পারছে, তার জীবনের আসল ওয়ার্ডসওয়ার্থ আর কেউ নয়, তার বড় কাছের ডাঃ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়।

সূর্য যখন আকাশে বিদায়ের মালা পরাচ্ছে, সেই অনন্তে শুনতে পারছে ইন্দ্রলোকের সাম্ভা নৃত্য হাইপোথ্যালামাসের উচ্চতা থেকে নিম্নাঙ্গের বিলুপ্ত হাইমেনের নিস্তেজ ছন্দের বন্দনা। জীবনে অনেক ঘুরেছে। না না... দূরত্বের পরিমাপ দিয়ে বিচার করা বাতুলতা মাত্র। এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে তার শেষ মেন্সট্রুয়াল পিরিয়ড মিলে গেছে থার্ড ট্রাইমেস্টারের শেষ দিনের সঙ্গে।

প্লেন যখন দিল্লিতে নামছে, তখন সন্ধে রাতের মুখোশের সাজে। এই প্রথম তার চুয়াল্লিশ বছর বয়সে ইন্দ্রাক্ষি বুঝতে পারল সে প্রেগন্যান্ট। এত বছর পরে সে সত্যি সত্যি গর্ভবতী, তার কসমিক সঙ্গীর যুগলবন্দিতে। তার সমস্ত সত্ত্বাকে আঁকড়ে, না-পাওয়া সংসারের মায়ায় ফিরিয়ে আনতে চাইছে, বাঁধভাঙা অনুভূতির বাধাহীন নিষ্পেষণে। আবার নিজেকে খুঁজে পাচ্ছে না-পাওয়া ইনটেলেকচুয়াল বন্ডেজ অফ হিউম্যান রিলেশনশিপের মধ্যে।

মনে পড়ল অলিভার গোল্ডস্মিথ লিখেছিলেন 'হ্যান্ডসাম ইস দ্যাট হ্যান্ডসাম ডাস' সেখানেই তার জীবনে আশিস। হাজার পুরুষের মধ্যে সে-ই একমাত্র পুরুষ, যে তাকে বিশ্বাস করে, অনুভব করে। দিস ওয়াজ জাস্ট এ ফিকান্ডেশন অফ ফিলিং। ইন্দ্রাক্ষি বুঝতে পারল না, এর আগে পৃথিবীতে কেউ কখনও অনন্তকাল ধরে প্রেগন্যান্ট থেকেছে কি না? ওর জানা নেই।

হাউসকোট জড়িয়ে ভেজা চুলে ড্রয়িংরুমে বেরিয়ে এল। আশিস পাজামা-পাঞ্জাবি পরে সোফায় টিভি দেখছে। ইন্দ্রাক্ষিকে দেখে বলল "রান্না করে রেখেছি। শ্যাম্পেনটা ফ্রিজে"

ভেজা চুল পেছনে ঠেলে বলল "ভালোই করেছ। এই ধকলের পর রান্না করতে ইচ্ছে করছিল না। ভাবছিলাম খাবার কিনে আনি"

"কী হল?"

"দু-ঘণ্টা ধরে মিটিং। সিএম অনেক প্রশ্ন করলেন। জবাব দিলাম। বোর্ডে অনেকে ছিলেন। চিফ সেক্রেটারি রঙ্গনাথন, ফাইনান্স মিনিস্টার ও সেক্রেটারি, আর্বান ডেভেলপমেন্ট মিনিস্টার ও সেক্রেটারি, হায়ার এডুকেশন মিনিস্টার ও সেক্রেটারি, পলিটিক্যাল সেক্রেটারি। সবাই প্রজেক্ট শুনে একসঙ্গে রাজি"

সোফায় গা এলিয়ে বলল "তুমি পারও বটে। সবাইকে কনভিন্স করে এলে?"

"যখন হাত দিয়েছি ফেরার পথ নেই। যা করার তা তো করতে হবেই"

আশিস ইন্দ্রাক্ষিকে চুমু খেতে যাচ্ছিল। ইন্দ্রাক্ষি বাধা দিল "ইস ঘেমো গাটা আমার ওপর লেপটো না। এই ধুয়ে এলাম। যাও গিয়ে স্নান করে এস"

অনিচ্ছায় টিভি বন্ধ করে বাথরুমে ঢুকল। সত্যি তো, রান্না করতে গিয়ে ভুলেই গেছিল। কিচেনের ভ্যাপসা গরম এসির হাওয়ায় পুষিয়ে নিচ্ছিল। স্নান করার সময় ভাবছিল, চিনির আবশ্যকতা জীবনের মোড় কীভাবে ঘুরিয়ে দিল। সেদিন বোঝেনি। শুধু তার পৌরুষ নয়, মনও অন্তরে দেবী আরাধনায় নিমগ্ন। অনুভব করেছে, পুরুষ শুধু পুরুষাঙ্গে নয়, অন্তরের নিভৃত কলরবের আত্মপ্রকাশে, মস্তিষ্ক থেকে হৃদয়ে। সেই থেকে যাত্রা শুরু। এত বছরে চিনেছে অন্তরের বনলতাকে, একান্ত ইন্দ্রাক্ষি।

ড্রয়িং রুমে ফিরে দেখল, ইন্দ্রাক্ষি ডম পেরিডনের বোতল নিয়ে বসে "হু উইল ওপেন দ্য বটল, ইউ অর মি?"

সোফায় বসে বলল "তুমি"। নিজের মনে গেয়ে উঠল 'মুক্তা যেমন শুক্তির বুকে তেমনি আমাতে তুমি আমার পরাণে প্রেমের বিন্দু তুমিই শুধু তুমি'

গ্লাসে গ্লাস ঠেকিয়ে চলল চিয়ার্স, শ্যাম্পেনে চুমুক।

"তোমার পাশে আমি সবসময়"

ইন্দ্রাক্ষি অনুভব করছে আশিস ইয়ারো আনভিসিটেড নয়, তার জীবনের ওয়ার্ডসওয়ার্থ। অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ। জীবনছন্দের পেছনে বাকহীন নীরব প্রেরণা। তার বহুমুখী বিচ্ছুরণের আসল কবি।

সাঁইত্রিশ

মধুসূদন রোশনের রিপোর্টটা ফাইল করার আগে আরেকবার পড়ে দেখছিল। রোশন থ্রু প্রপার চ্যানেল সুনেত্রার মৃত্যু, তার পোস্ট মর্টেম রিপোর্টের কপি, মুম্বাইয়ের ইনভেস্টিগেশন, পুনের ইনভেস্টিগেশন, ভওয়ানিশঙ্কর ও চতুর্বেদীর জেরার রিপোর্ট, সন্নিধির স্টেটমেন্ট সব ডিটেলসে পাঠিয়েছে। সঙ্গে সুনেত্রার হার্ড ডিস্কের শিল্ড কপি। শিবানী করঞ্জওয়ালার কথাও লেখা। ওই অজ্ঞাত লোকটির আধছেঁড়া ছবির সঙ্গে সুনেত্রার কম্পিউটারে পূর্ণ ছবির মিলের কমপিউটার এক্সপার্টের রিপোর্টটাও অ্যাটাচ করে দিয়েছে। সুনেত্রার বাড়িতে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি যে শিরিনের সঙ্গে দেখা করবে বলেও দেখা না করে স্যানট্রোতে বেরিয়ে গেছে তার উল্লেখ আছে। ওখানকার কেয়ারটেকারের বয়ানে পুলিস আর্টিস্টের আঁকা ছবির সাদৃশ্যর কথা। ওই লোকটা সিন অফ ক্রাইমে ছিল। কিন্তু মহারাষ্ট্র তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ওকে আইডেন্টিফাই করা যায়নি। এও ইঙ্গিত করেছে এই লোকটির সঙ্গে মেহুলি ও সুনেত্রার মৃত্যুরও কোনও তালুক থাকতে পারে। কিন্তু কীভাবে?

সেকথার কোনও উল্লেখ নেই রিপোর্টে। এই উত্তরের মধ্যেই লুকিয়ে আছে খুনের মোটিভ। লোকটিকে শনাক্ত করা না গেলে তো মোটিভও অস্পষ্ট। শেষে এও প্রশ্ন তুলেছে, যেহেতু সুনেত্রা ও মেহুলি অরজিন্যালি বাংলার লোক, খুনের সূত্র এখানে। এখানেই আরও বিস্তৃত তদন্ত হোক। মেহুলির মৃত্যুর ডিটেল্ড রিপোর্ট, যেহেতু সুনেত্রার সঙ্গে সোহমের যোগাযোগ, ওর মৃত্যুরও ডিটেল্ড রিপোর্ট চেয়েছে। মানিকতলা খুনের তত্ত্ব যদিও পরিতোষ সেন মধুসূদনকে দিয়েছে মুম্বাইয়ের ক্রাইম ব্রাঞ্চে পাঠাবার আগে। রোশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে। মানিকতলার বড়বাবুকে আরেকটা ডিটেল্ড রিপোর্ট দেওয়ার জন্য নোট দিয়ে ডিসিডিডি ইন্দ্রজিৎ কর পুরকায়স্থকে নোট দিয়ে চিঠি লিখল।

সে তো ফাইলিং অফিসার মাত্র। তার কী ক্ষমতা মানিকতলার বড়বাবুর সেকেন্ড রিপোর্ট চেয়ে পাঠানোর? একমাত্র বড়সাহেবই পারেন।

বাংলার দুটো খুন নিয়ে পল্টুর দোকানে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। যদিও আংশিকভাবে স্নেহাশিস আর রোশনের কথোপকথন শুনেছে, এই প্রথম সব তথ্য হাতে পেল। শিবানী করঞ্জওয়ালা মুম্বাইয়ের এলিটদের মৌসি। তার সঙ্গে অবশ্য চতুর্বেদীর সম্পর্ক থাকতে পারে। যেহেতু চতুর্বেদী সো-বিজ ওয়ার্ল্ডের ডন, কিন্তু ম্যাথেরনের সাধু ভওয়ানিশঙ্করের সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিটা এখনও বোধগম্য হচ্ছে না।

সব কথাই পুঙ্খানুপুঙ্খ লিপিবদ্ধ। রোশন শুধু একটাই ইচ্ছে করে উহ্য রেখেছে। ওদের কথার মধ্যে মধুসূদন ধরতে পেরেছিল, স্নেহাশিস সুনেত্রার মৃত্যুর সময় শিরিনের ফ্ল্যাটে ছিল। অবশ্য সে কথা কোথাও উল্লেখ করেনি। হাজার হোক, অনেকদিনের বন্ধু। একসঙ্গ পাশ, ট্রেনিং। স্নেহাশিস বেঙ্গল ক্যাডারে, রোশন মহারাষ্ট্র। স্নেহাশিসের নাম জড়ালে ও শুধু বিভাগীয় তদন্তেই জড়াবে না, স্ক্যামও হেডলাইনস হতে পারে। হাজার হোক, বউ-বাচ্চা আছে। আশিকির সঙ্গে যদি দু-এক রাত কাটিয়েও থাকে, ক্ষতি কী? মধুসূদন জানে না শিরিনের সঙ্গে এসপির সম্পর্ক কতদূর? স্নেহাশিসকে অপ্রীতিকর অবস্থায় ফেলতে চায়নি রিপোর্টে।

চতুর্বেদীর বয়ানটা মন দিয়ে পড়ছিল।

"আপকে সাথ ভওয়ানিশঙ্করকে কেয়া রিস্তা?"

"সাধু-সন্তকে সাথ কেয়া রিস্তা হো সকতে? মনকে, শান্তিকে রিস্তা"

"উসকে আশ্রম মে যাতে থে?"

"জরুর। উসকে বাণী মেরে লিয়ে ঈশ্বর মাফিক। সিরফ মেরে লিয়ে কেও, সবকে লিয়ে"

"আপ শো-বিজ দুনিয়েকে বড়ে আদমি। সভি আপকো পহেচানতে। ইধরকে কিসিকো আশ্রম মে লে গয়ে?"

"হাঁ। ইস দুনিয়া মে বহত ইনসিকিওরিটি। হর কোই লড়কি ইনসিকিওরিটিকে কিরদার। কিসিকো শান্তি কা আবশ্যকতা হো, উসে হম উসকে পতা দে দেতা থা। সিরফ শান্তিকে লিয়ে"

"উসদিন উনলোগ ম্যাথেরন যা রহে থে, আপ জানতে?"

"হাঁ। উসমে সে এক লড়কি সোফি, পহলে কইবার আশ্রমমে গিয়ে থে। ও ফোন মে বতায়া কোই দোস্তকো লেকর ভওয়ানিশঙ্করকে পাস যা রহে হ্যায়। গুরুদেবকো থোরা ম্যায় বোল দু"

"দিয়া?"

"হাঁ। কেও নেহি? লোগ শান্তিকে লিয়ে উসকে পাস যানে মাঙ্গতা তো ম্যায় কৌন হু উসে রোখনে?"

"শিবানী করঞ্জওয়ালকো জানতা?"

"নেহি তো। কৌন হ্যায়?"

"ওহ ভি উস গাড়ি মে থে"

"সয়দ সোফিকে পহেচান। মুঝে মালুম নেহি"

"সন্নিধি বোলা ও ঐসে অ্যাকসিডেন্ট নেহি থে। ইট ওয়াজ এ ডেলিবারেট অ্যাকসিডেন্ট। আপকা কুছ কহেনা হ্যায়?"

"কেয়া বলু? ম্যায় ওঁহা নেহি থা। সন্নিধিকে আপনা সোচ ভি হো সকতা। ইয়ে ভি হো সকতা, গাড়ি মে জো থে উসকে সাথ দুশমনি। হোনে তো বহত কুছ সকতা। আপ পুলিস। ইয়ে দেখনা আপকে কাম। মুঝে সিরফ অপনে ধন্দে চলানা হ্যায়। ইয়ে মত বোলিয়ে আপ নেহি জানতে ম্যায় কেয়া করতা?"

"ফির ভি আপ সে শুনে"

"জো আপ জানে ওহি। মেরা এক এজেন্সি হ্যায়। যব ভি কোই প্রডিউসার ইয়া ডিরেক্টর অ্যাড এজেন্সি সে কোই হিরোইন ইয়া মডেল মাঙ্গে তো উসে ম্যায় সহি আদমি দেতা। আচ্ছে কমিশন মিলতা। হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট"

রোশন বয়ানের শেষে লিখেছে 'হি ওনস অ্যান এজেন্সি নিয়ার ব্যান্ড্রা রিক্লেমেশন। দ্য নেম অফ দ্য কোম্পানি ইজ 'এন্টারটেনমেন্ট আনলিমিটেড'। হি অলসো হ্যাস এ ব্রাঞ্চ ইন মাহেম অ্যান্ড ওয়ান ইন চেম্বুর। ইট ইজ এ রেজিস্টার্ড কোম্পানি। আই অ্যাম আনেবেল টু ফাইন্ড এনি ইরেলেভ্যান্স ইন হিস স্টেটমেন্ট'

হয়ত এই মৃত্যুর চক্রের সঙ্গে ওরা জড়িয়ে। কিন্তু মোটিভ এখনও বোঝা যাচ্ছে না। ওদের এগেনস্টে কোনও ডিরেক্ট এভিডেন্সও নেই। মধুসূদনের মনে হল, এভিডেন্স না থাকলেও ওরা গভীর জলের মাছ।

গিন্নির চেয়ে দ্বিগুণ সাইজের মেয়ে টেপির বিয়ে হচ্ছিল না। মেয়ের মানসিক বিষাদ কাটাতে মধুসূদন তাকে নিয়ে গিয়েছিল সাইকিয়াট্রিস্ট ডাঃ অনঙ্গ দত্তর কাছে। কিছুদিনের চিকিৎসায় টেপিকে ভালো করে তোলে অনঙ্গ দত্ত। টেপির বিয়ের নেমতন্ন খেতেও এসেছিল। কি জানি এতদিন পরে মনে আছে কি না? সাহস সঞ্চয় করে ফোন করল। টেপির রেফারেন্স দিতে চিনতেও পারল ডাঃ অনঙ্গ দত্ত।

"একটু দেখা করার দরকার"

"কাল বিকেল সাতটায় আসুন"

মধুসূদনকে দেখে একগাল হেসে ডাঃ অনঙ্গ দত্ত বলল "মেয়ে কেমন আছে?"

কাঁচুমাচু করে বলল "আপনাদের আশীর্বাদে ভালোই। বছর দুয়েক হল ছেলে হয়েছে"

"আপনি এখন দাদু। মিষ্টি কই?"

"ভুল হয়ে গেছে স্যার"

মুচকি হাসলেন অনঙ্গ দত্ত। পেশেন্ট ভালো হয়ে সুখে-শান্তিতে ঘর করছে এ কথা শুনলে কোন ডাক্তারের ভালো না লাগে?

“এখন কী করছেন?”

“লালবাজারে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার”

“প্রমোশন হয়েছে। খুব ভালো কথা”

“সবই আপনাদের আশীর্বাদে। এবার অন্য কারণে এসেছি” পকেট থেকে চিরকুট বার করে বলল “রোহিপনল আর মেটামফেটামাইন-এর কম্বিনেশনে কী হতে পারে?”

অবাক অনঙ্গ দত্ত তাকাল মধুসূদনের দিকে “নামগুলো জানলেন কী করে?”

আমতা আমতা করে বলল “একটা মৃত্যুর ইনভেস্টিগেশন করছিলাম। সেখানে পোস্ট মর্টেমে মৃতের ভিসেরা থেকে ওই দুটো ড্রাগের ট্রেস পাওয়া গেছে”

“রোহিপনল নিলে ভুলে যায় সেই মুহূর্তে কী ঘটছে। ব্লাড প্রেসার কমিয়ে দিতে পারে। ঘুম ঘুম ভাব আসতে পারে। মাথাও ঘুরতে পারে। কনফিউশনও হতে পারে। আবার পেটের গন্ডগোলও”

“সেই মুহূর্তে তাহলে স্থান-কাল-পাত্র জ্ঞান থাকবে না?”

“নাও থাকতে পারে”

“আর মেটামফেটামাইন?”

“সেটাও মানসিক ভারসাম্যে বিঘ্ন ঘটাতে পারে। অ্যাগ্রেশন সাইকোটিক বিহেভিয়ার। অনেক সময় হার্টেও প্রবলেম করে। কেসটা কী বলুন তো?”

“একটি মেয়ে মুম্বাইতে চাকরি করত। মেয়েটার ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে যদ্দুর জেনেছি ঈশ্বরভক্ত, গোঁড়া মারোয়ারি ফ্যামিলির। এক সন্ধেতে তেরো তলার ফ্ল্যাট থেকে লাফ দিল। ওরা বলছে আত্মহত্যা। ভিসেরা রিপোর্টে দুটো ড্রাগ পাওয়া গেছে। আমার মন মানছে না। রক্ষণশীল পরিবার থেকে আসা সাধুভক্ত মেয়ে এসব ওষুধ খেয়ে হঠাৎ আত্মহত্যা করতে যাবে কেন? এসব ওষুধের নামই বা জানবে কী করে?”

ডাঃ অনঙ্গ দত্ত চশমা খুলে বলল “এগুলোকে বলে পার্টি ড্রাগস। যারা ক্লাব পার্টি করে, তারা ব্যাবহার করে। উইসুয়ালি কোকে মিশিয়ে খায়”

“সারকামস্টেন্সিয়াল এভিডেন্সে কোনও প্রুফ পাওয়া যায়নি। যদিও ডাইনিং টেবলে খালি গ্লাস ছিল”

“ওটার কেমিক্যাল এক্সামিনেশন হয়েছে?”

“হ্যাঁ। কিছু পাওয়া যায়নি। দুটোকে মেশালে কী সাইকোটিক কনফিউশনে বারান্দা থেকে লাফিয়ে পড়া সম্ভব?”

“সম্ভব”

চমকে উঠল মধুসূদন “কতক্ষণ লাগে এফেক্ট হতে?”

“ওরাল ড্রাগ তো। পনেরো মিনিট থেকে আধ ঘণ্টা কিংবা একটু বেশি”

“তার মানে কেউ যদি ওকে খাইয়ে চলে যায়, সে সিন অফ ক্রাইমে নাও থাকতে পারে সেই মুহূর্তে?”

“যদি এই টাইমের মধ্যে বেরিয়ে যেতে পারে। আপনারা অবশ্য ভালো বুঝবেন। যে ক্রাইম করে, তার রেজাল্ট না দেখে ইউসুয়ালি যায় না”

ফিস দিতে যাচ্ছিল। জিভ কেটে ডাঃ দত্ত বলল “এ মা, ছিঃ ছিঃ। মেয়েকে দেখাতে এনেছিলেন, তখন ফিস নিয়েছি। ভালো কাজের জন্য ইনভেস্টিগেশন করতে এসেছেন। ফিস নেব কেন? সবই কী ব্যবসা?”

চেম্বার থেকে বেরিয়ে মনে হল, স্নেহাশিস আর রোশন সুনেত্রার মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলছে। এটা আত্মহত্যা নয়, হত্যা! আততায়ী সুনেত্রাকে ড্রাগ খাইয়ে চলে যাওয়ার পর সে বারান্দা থেকে ঝাঁপ দেয়। কে এই আততায়ী? কেনই বা সুনেত্রাকে হত্যা করল? সুনেত্রা কি তবে ভওয়ানিশঙ্কর আর চতুর্বেদী চক্রে জড়িয়ে? তাই বেঘোরে প্রাণ দিতে হল। সেই লোকটি, যে শিরিনের নাম লিখে কমপ্লেক্সে ঢুকেছিল অথচ

শিরিনের কাছে যায়নি, সে কি তবে সুনেত্রাকে ওই ড্রাগ খাওয়াতে এসেছিল? নিশ্চয়ই সুনেত্রার পরিচিত, তাই ঘরে ঢুকতে দিয়েছিল। ভওয়ানিশঙ্করের সঙ্গে সুনেত্রার আধ্যাত্মিক সংযোগ। তবে কী ভওয়ানিশঙ্কর ওকে পাঠিয়েছিল? মাথায় ঢুকছে না শিরিনের নাম লিখল কেন? শিরিনকে অ্যালিবি রাখতে চেয়েছে। শিরিন হয়ত এই চক্রে নেই। হায় রে মধুসূদন। যদি একবার জানত, সেই মুহূর্তে স্নেহাশিস শিরিনের ফ্ল্যাটে তাহলে চিত্রপট সম্পূর্ণ হত। ওবভিয়াস অ্যালিবি পুলিস অফিসার স্বয়ং। নিঃসন্দেহ সুনেত্রার মৃত্যু আত্মহত্যা নয়, হত্যা। কে এই লোক যার ছবি নিয়ে এত খোঁজাখুজি?

সে কী ভওয়ানিশঙ্করের লোক? মনে তো হচ্ছে। তাই সুনেত্রার ফ্ল্যাটে তার অবাধ প্রবেশ। প্রশ্নটা অন্য। তবে কী ওই লোকটি কোক খায়নি? যদি সুনেত্রাই কোক খেয়ে থাকে, সে অতিথি হয়েও কোক না খেয়ে, চলে গেল কী করে?

আটত্রিশ

স্নেহাশিস মধুসূদনের ঘরে ঢুকে বলল “সিন অফ ক্রাইমে মেহুলির ঘরে যে ছেঁড়া ছবিটা পাওয়া গেছিল, সুনেত্রার কম্পিউটারেও। কম্পিউটার এক্সপার্টের রিপোর্টটা দিতে পারবেন? আমারটা আর মেহুলির পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট”

ফাইল বার করে মধুসূদন বলল “এগুলো রেকর্ড ডকুমেন্টস। একটু বসুন, আমি কালার জেরক্স করিয়ে আনাচ্ছি” অনাদিকে জেরক্স করতে পাঠিয়ে দিল।

“চা খাবেন?”

“হলে মন্দ হয় না” বসে স্নেহাশিস বলল।

মধুসূদন কাউকে চা আনার কথা বলতে গেছে। ঘরের চারদিকে দেখল। ফাইল, ফাইল আর ফাইল। লোকটা এই ফাইলের মধ্যে বাঁচে কী করে? এটাই ওর চাকরি। এছাড়া ওর কীই বা করার আছে? ফাইলের স্তূপের দিকে চেয়ে। কত কেস ঝুলে। কটা কেসের কিনারা হয়েছে? আরও কুড়িটা বছর ঝুলে থাকবে। অনেক কেসের কিনারাও হবে না। কোর্টের নাগপাশে এ বেঞ্চ থেকে ও বেঞ্চ, লোয়ার কোর্ট থেকে হাই কোর্ট সেখান থেকে সুপ্রিম কোর্টে পৌঁছতে গোটা জীবন পার হয়ে যাবে। বিচারের বাণী নিভৃতে বসে কাঁদবে এই ফাইলের অন্তরালে।

মধুসূদন ফিরে বসে বলল “ছবি নিয়ে আপনারা যে মানুষটিকে খুঁজছেন, ডিসিডিডি ইন্দ্রজিৎ কর পুরকায়স্থও চেন্নাইয়ের খুনের কেসে এমনই একজনকে খুঁজছে। এই লোকটি সেই লোকটিও হতে পারে। একটু কথা বলে নেবেন”

“নিশ্চয়ই। আপনার কী মনে হয় একই মানুষ?”

“কী করে বলব? আপনারা ইনভেস্টিগেশন করেন। আপনারাই উত্তর দিতে পারেন। তবে রিপোর্টগুলো এখানে আসে। লিঙ্ক থাকলেও থাকতে পারে। আমি শুধু ফাইলপত্র ঘাঁটাঘাটি করি। যে নম্বরটা ট্রেনের টিকিটে মেহুলির সিন অফ ক্রাইম থেকে পেয়েছিলেন, ওটা একজন মৃত ছেলে সোহম সান্যালের নম্বর। পরিতোষ সেনের ইনভেস্টিগেশন রিপোর্টে উল্লেখ আছে। রিপোর্টটা পড়ে দেখবেন?”

“দিন” চায়ে চুমুক দিয়ে রিপোর্ট পড়ছিল। ডায়রিতে নম্বরটা লিখল, ৯৪৩২২ ৫১২৬০। এই নম্বরই তো পেয়েছিল মেহুলির ইনভেস্টিগেশন করতে গিয়ে ট্রেনের টিকিটে। রিপোর্ট পড়া শেষ হওয়ার আগে চা শেষ “রিপোর্টে তো বলছে ওই মোবাইলের ট্রেস পাওয়া যায়নি”

“মোবাইল নম্বরটা ট্র্যাক করলে হদিস পেতে পারেন”

“বিএসএনএল থেকে কল রেকর্ডসের কপি জোগাড় করতে হবে। সঙ্গে লিঙ্কড ল্যান্ডলাইন নম্বরও”

মধুসূদন তার ডায়রি থেকে বলল “যদি সেই সঙ্গে আরেকটা নম্বরের একটু খোঁজ দিতে পারেন...” নম্বরটা চিরকুটে লিখে দিল স্নেহাশিসকে।

“এটা কার নম্বর?”

“জানি না। সোহমের পকেট থেকে এএসআই পরিতোষ সেন পেয়েছিল। রিপোর্টে মেনশন করা আছে। মৃত্যুগুলোর সঙ্গে লিঙ্ক থাকতেও পারে”

জেরক্স এসে গেছে। নিয়ে, চিরকূট পকেটে পুরে উঠে পড়ল স্নেহাশিস।

শের-ই-পাঞ্জাবের রিসিটটা ৯ নভেম্বরের। অথচ মেহুলি ‘দ্য হেভেনে’ চেক-ইন করেছিল ১১ নভেম্বর। বাকি দুদিন কোথায় ছিল? মেদিনীপুরের সব হোটেলের বুকিং রস্টার চেক করে কপি জোগাড় করতে

শুভাশিসকে লাগিয়ে দিয়েছে। মেহুলি রায়ের নামে বুকিং ছিল কি না? কোর্টে কেস উঠলে এভিডেন্সের প্রয়োজন।

ইন্দ্রজিৎ কর পুরকায়স্থকে লালাবাজারেই পাওয়া গেল। স্নেহাশিস তার থেকে অনেক জুনিয়র "একটু বিরক্ত করলাম স্যার"

"আইপিএসের পর আমার প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট মেদিনীপুরে। আপনার জন্য কী করতে পারি?"

"আমি মুম্বাইয়ের মডেল মেহুলির মার্ডার কেস ইনভেস্টিগেট করছি। সিন অফ ক্রাইমে একটা ছেঁড়া ছবি পাই। পরে আমাদের মুম্বাইয়ের কাউন্টারপার্ট রোশন ওখানে একজন সুনেত্রা আগারওয়ালের ডেথ ইনভেস্টিগেট করতে গিয়ে ওই মেয়েটির কম্পিউটারে একজনের ছবি পায়। কম্পিউটার এক্সপার্টরা সুপার-ইমপোস করে কনফার্ম করে দুটো ছবি একই লোকের"

"আমার কাছে কেন?"

"রেকর্ড সেকশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার মধুসূদন মুখার্জির কাছে ওই ছবি আর রিপোর্ট কালেক্ট করতে গিয়েছিলাম। উনি বললেন, চেন্নাইয়ের কোনও মার্ডারের ব্যাপারে আপনি একজনকে খুঁজছেন। হয়ত এই সে হতে পারে"

"হতে পারে। ওখানকার চিফ সেক্রেটারির ছেলে খুন হওয়ায় ওরা ইনভেস্টিগেট করে পায় ইনসুলিন দিয়ে তাকে খুন করা হয়েছে। ব্যাঙ্গালুরুর ক্যাশ ফার্মেসি থেকে কেনা। ক্যাশ ফার্মেসি থেকে জানা যায় প্রেসক্রিপশনটা একজন কলকাতার প্লাস্টিক সার্জেন ইসু করেছিল। থিয়েটার রোডে ডাঃ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেম্বার। খুন হয় ১৩ মার্চ। প্রেসক্রিপশন ১১ মার্চের। দ্যাট মিনস দ্য হোল থিং ওয়াজ প্ল্যান্ড। কুরিয়ারে চেক করেছি। কুরিয়ারে পাঠানো হয়নি। ইট মাস্ট হ্যাভ বিন বাই হ্যান্ড, ক্যারেড বাই সাম ওয়ান"

মেহুলিও থিয়েটার রোডের ক্যাশ টিল থেকে টাকা তুলেছিল। তবে কী সে ডাক্তার দেখাতে কলকাতায় এসেছিল? মেহুলির ভিসেরা রিপোর্টে তিনটে ড্রাগ পাওয়া গেছে - টলবিউটামাইড, গ্লেনেসারাইড আর অ্যালজোলাম। এখন ইন্দ্রজিৎ স্যার বলছেন, চেন্নাই মার্ডারও ইনসুলিন দিয়ে। ডাক্তারি মগজ না থাকলে এভাবে মেডিক্যালি মার্ডার সম্ভব? ডাঃ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কেও ক্রসচেক করতে হবে।

"ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় তো নিজেই ব্যাঙ্গালুরুতে দিয়ে আসতে পারতেন"

"পারতেন। বাট হি ওয়াজ ইন ডেলহি। ওনার ফ্লাইট ডিটেলস চেক করেছি। মানে অন্য কেউ ডেলিভার করেছিল। আপনার কী মনে হয়, দুজন একই লোক?"

"হতে পারে স্যার। ইনভেস্টিগেট করছি"

"পজিটিভ কিছু পেলে জানাবেন"

"থ্যংক ইউ স্যার" স্নেহাশিস উঠে পড়ল। আজকে আর সময় হবে না। মেদিনীপুর ফিরতে হবে।

শনিবারে ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের থিয়েটার রোডের চেম্বারে যখন স্নেহাশিস পৌঁছল, রিসেপশনিস্ট জানাল "উইক এন্ডে চেম্বার করেন না"

"রস্টার দেখে বলতে পারেন ৮ কিংবা ৯ নভেম্বর মেহুলি রায় নামে কেউ দেখাতে এসেছিল?"

"কফিডেনশিয়াল ইনফরমেশন। দেওয়া যাবে না" কাট কাট উত্তর রিসেপশনিস্ট রচয়িতার। আইডি কার্ড দেখাতেই স্বর পালটে গেল "দেখছি স্যার। ৮ বা ৯ নভেম্বর?... হ্যাঁ, ৯ সকাল দশটায়"

"ওই পেজের জেরক্স কপি দিতে পারবেন?"

"দিচ্ছি স্যার। আপনি বসুন"

জেরক্স কপি নিয়ে বেলতলা মোটর ভেহিকেলসে। জানতে হবে ওই ভাড়া ইন্ডিকা গাড়ির মালিক কে? খোঁজ মিলল, পাইকপাড়ার বাসিন্দা জনৈক অমিত কিরণ দেব মালিক। গাড়ির নম্বর বলতেই খাতা দেখে অমিত কিরণ দেব বললেন "গাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন মুম্বাইয়ের একজন মিঃ চতুর্বেদী"

চমকে উঠল স্নেহাশিস! এখানেও চতুর্বেদী!

"ক'দিনের জন্য?"

"সাত দিনের বুকিং। পুরো অ্যাডভান্স পেমেন্ট করেছিলেন"

"গাড়িটা ফেরত পেয়েছিলেন?"

"এখনও পাইনি। সাতদিন পরে চতুর্বেদীর নম্বরে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি। নট অ্যাভেলেবল। পাইকপাড়া থানায় ডায়রি করি। অনেকবার গেছি। হদিস দিতে পারছে না"

"নিজে খোঁজার চেষ্টা করেননি?"

"অনেকবার করেছি। ড্রাইভারেরও পাত্তা নেই। বিহার থেকে এসেছিল। মনে হয় গাড়ি নিয়ে বিহারে ভেগেছে"

"না যায়নি। গাড়িটা দ্য হেভেন রিসর্ট থেকে উদ্ধার করি। ওটা এখন আমাদের থানায়"

অমিত কিরণ দেবের মুখে হাসি "তাহলে গাড়িটা শেষ পর্যন্ত পাব? আমি তো আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম"

"রেজিস্ট্রেশন কার্ড দেখালে নিশ্চয়ই পাবেন। চতুর্বেদীর মোবাইল আর ড্রাইভারের নাম-ঠিকানা-লাইসেন্স নম্বর দিতে হবে"

ড্রয়ার খুলে বলল "বসুন স্যার। এখনি দিচ্ছি"

নাম-ঠিকানা-নম্বর নিয়ে ফিরে এল ডিসিডিডির কাছে "স্যার আবার একটু বিরক্ত করছি"

"বিরক্ত কীসের?"

"বিহারে একজন ড্রাইভারের হদিস লাগাতে হবে" নাম-ঠিকানা-ড্রাইভিং লাইসেন্স নম্বর দিয়ে বলল "এই লোকটির"

"ঠিক আছে। আমি পাটনার আইজি পাবলিক ট্র্যান্সপোর্টকে ফ্যাক্স করছি"

ইতিমধ্যে শুভাশিস মোবাইলের হদিস জোগাড় করেছে "স্যার ওই প্রি-পেড কার্ডটা দমদম এয়ারপোর্ট থেকে ৯ নভেম্বর সকালে কেনা। কিনেছিলেন মুম্বাইয়ের এক বিজনেসম্যান চতুর্বেদী। এর বেশি ওরা বলতে পারল না"

"লোকাল অ্যাড্রেস দিয়েছিল?"

"না স্যার। মুম্বাইয়ের অ্যাড্রেস-পাসপোর্ট নম্বর-বাড়ির ঠিকানা-ছবির জেরক্স এনেছি"

"ওয়েল ডান" সাধুবাদ জানাল।

ফ্যাক্স করতে রোশন জানাল চতুর্বেদীর সব ডিটেলস ঠিক। কোনও গড়বড় নেই যে চতুর্বেদী কলকাতায় এসেছিল, কেন? তবে কী চতুর্বেদী আর মেহুলি এক সঙ্গেই এসেছিল? তাই তো মনে হচ্ছে। গাড়িও ভাড়া করে চতুর্বেদী। ওরা কী একসঙ্গেই মেদিনীপুর গিয়েছিল? কোথায় ছিল? মেহুলি ১১ নভেম্বর ওই গাড়ি নিয়ে দ্য হেভেনে একলাই চেক-ইন করে। চতুর্বেদী তো মেহুলির সঙ্গে তখন ছিল না। সে কোথায় গেল?

অফিসে বসে স্নেহাশিস হোটেলের লিস্টগুলো দেখছিল।

শুভাশিস পাশ থেকে বলল "স্যার পুরো চেক করেছি। মেহুলি রায় নামে কোনও হোটেলে কেউ চেক-ইন করেনি। দীঘা, শঙ্করপুর, মন্দারমণি, তাজপুর কোথাও নেই স্যার"

ডবল ভেরিফাই করতে চোখ বোলাচ্ছে। বিশেষ করে দামি হোটেলের রস্টারে। এক জায়গায় থেমে গেল "এই তো মেহুলি রায়। তিনবার দেখেছি"

"না না, চতুর্বেদী। নিউ দীঘার হোটেল অঞ্জলি রিসর্টে চতুর্বেদীর নাম। চেক-ইন করেছে ৯ নভেম্বর। ওই শের-ই-পাঞ্জাবের রিসিটটা যেদিনের। দেখ, লেখা আছে মিস্টার অ্যান্ড মিসেস চতুর্বেদী। নিশ্চয়ই মেহুলি ওখানে ওর সঙ্গে ছিল"

হোটেল অঞ্জলি রিসর্টের ম্যানেজার বলল "মনে আছে স্যার। এত দামি সুটে তো এখানে কেউ সচরাচর বুক করে না। তাই ওনাকে মনে আছে। সঙ্গে ছিলেন এক সুন্দরী মহিলা। কোথায় যেন আগে দেখেছি।

সিনেমা বা টেলিভিশনে হবে”

“ক’দিন ছিলেন?”

“দু-দিন স্যার”

“কীসে করে এসেছিলেন?”

“বলতে পারব না। রিসেপশনে খোঁজ নিয়ে বলছি”

রিসেপশনিস্ট অবন্তিকা বলল “মনে আছে স্যার। নামকরা মডেল মেহুলি রায়। টিভিতে প্রায়ই অ্যাড দেখি। চিনতে অসুবিধা হয়নি”

“কীসে করে এসেছিলেন?”

“গ্রে রঙের টাটা ইন্ডিকা। ভাড়া গাড়ি। হলুদ নম্বর প্লেট ছিল”

ছবিটা এখন পরিষ্কার। চতুর্বেদী আর মেহুলি ৯ নভেম্বর সকালের ফ্লাইটে কলকাতায় আসে। এয়ারপোর্ট থেকে একটা প্রি-পেড মোবাইলের সিম কার্ড কেনে। তারপর অমিত কিরণ দেবের কোম্পানি থেকে ইন্ডিকা ভাড়া নেয়। ডাঃ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে মেহুলি কনসাল্ট করে। পরে শের-ই-পাঞ্জাবে দুপুরে খেয়ে বিকেলে নিউ দীঘার হোটেল অঞ্জলি রিসর্টে চেক-ইন করে।

তারপর?

এই তারপরটাই ধোঁয়াশায়। চতুর্বেদী কোথায় যায়? কেনই বা মেহুলি দ্য হেভেনে একা চেক-ইন করে?

এখনও অনেক কিছুই অজানা। তবুও তো কিছু জানা গেল। তবে কী মেহুলি হত্যার সঙ্গে চতুর্বেদী জড়িত? চতুর্বেদী আগে থেকে মেহুলিকে একলা ছেড়ে সিন থেকে সরে যায়!

ঊনচল্লিশ

কে খুন করেছে, ক'টা খুন করেছে, কীভাবে খুন করেছে, সে নিয়ে মধুসূদন ভাবছে না। ভারতের প্রত্যেকটি শহরে বাঘা বাঘা পুলিস অফিসারের কমতি নেই। তাদের দক্ষতা ও চাতুর্য মধুসূদনের চেয়ে অনেক বেশি। তাইতো তারা উন্নতি করেছে। সে হিসেবে, মধুসূদন কিছুই করতে পারেনি। না চাকরিতে, না গিন্নিকে খুশি করতে, না পেরেছে বসদের সন্তুষ্ট করতে। তাইতো তাকে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পদবি দিয়েও, দূর বিভুঁইয়ে কাজে না পাঠিয়ে লালবাজারে বন্দি করে রেখেছে কমিশনার-ভূষিত কেরানির কাজে। তার স্বল্প ক্ষমতার মধ্যে, একমাত্র দশাসই টেপিকে পার করতে পেরেছে। রিটায়ারের সময় এগিয়ে আসছে। জীবনের সন্ধ্যায় নতুন আলো জ্বালার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। এতদিন পল্টুর দোকানের শনিবারের আড্ডাই বেঁচে থাকার সম্বল ছিল। এখন এই চক্রকায় মাকড়শার জালে একটু ছন্দ খুঁজে পাচ্ছে। এই ছন্দই তো আসল আনন্দ। বেসুরা রাগ আবার নতুন করে সুর খুঁজে পেয়েছে। আবছা ধোঁয়াশায় ভরা হলেও নতুন ঐকতান। তাকে শুধু সিম্ফনিতে বাঁধতে হবে। একই তালে, সুরে।

খুনগুলোর মধ্যে লিঙ্ক থাকলে কেন করছে? অজানা অঙ্ক? না কি, উন্নত বুদ্ধির সুপরিকল্পিত মানসিক রসায়নের নির্মম বাস্তবায়ন? এর জবাব হয়ত দিতে পারে ডাঃ অনঙ্গ দত্ত। ফোন করল "মধুসূদন। চিনতে পারছেন স্যার?"

"কেন চিনব না? খুনের কিনারা হল?"

"না। ওই জন্যেই আপনাকে বিরক্ত করছি। স্যার, আর একটু সময় দিতে পারবেন?"

"কাল চেম্বারে আটটা-সাড়ে আটটায়"

"একটু সময় লাগবে স্যার"

"চলে আসুন না সাড়ে আটটায়। তখন চেম্বার শেষ হয়ে যাবে"

রাত সাড়ে আটটায় মধুসূদন যখন চেম্বারে হাজির তখনও শেষ পেশেন্টের সঙ্গে কথা বলছে। রিসেপশনে বসে রইল, চার-পাঁচজন মেডিক্যাল রিপ্রেসেন্টেটিভের সঙ্গে। আরও এক ঘণ্টা পরে এলেই হত। মিনিট পনেরো লাগল শেষ পেশেন্টের বিদায় নিতে। দশ মিনিটে মেডিক্যাল রিপ্রেসেন্টেটিভদের পাট চুকিয়ে ডাঃ দত্ত কনসালটিং রুম থেকে বেরিয়ে ডাকল "অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম। ভেতরে আসুন"

সিগারেটের প্যাকেট টেনে বলল "একটা সিগারেট খাই। অনেকক্ষণ খাইনি। হঠাৎ খুন নিয়ে মাতলেন কেন?"

"স্যার আমি রিপোর্টিং সেকশনে ছাপোষা চাকরি করি। ফাইলগুলো তাকে সাজিয়ে কোন কেসের কতদূর গতি হয়েছে, সেই রিপোর্ট লেখা ছাড়া আর বেশি কাজ নেই। সময় কাটাবার জন্য ইনভেস্টিগেশন রিপোর্টগুলো খুঁটিয়ে পড়ি"

"সে তো অনেকদিন থেকেই করছেন। হঠাৎ এই কেসটা আপনার মন কাড়ল?"

"রিপোর্টগুলো পড়ে মনে হল কোথাও এই মৃত্যুগুলোর সংযোগ আছে। যারা ইনভেস্টিগেশন করছে তারা তো নিয়ম মাফিক ঠিকই করছে। আমি কোনও ইন্ডিভিজুয়াল খুন নিয়ে ভাবছি না। এগুলোর মধ্যে লিঙ্ক আছে, কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য"

"আমার কাছে কী জানতে চান?"

"মোটিভটা। ক্যান দেয়র বি এ কমন মেন্টাল সাবস্ট্রেট টু দিজ কিলিংস?"

সুখটান দিল "আমরা শ্রমিক মানুষ। রোজ সকাল আটটা থেকে রাত আটটা প্র্যাকটিস করি। অনেক সময় মনে হয়, আমি কী শুধুই সাইকিয়াট্রিস্ট? না সাইকোফার্মাকোলজিস্ট? এখন চেম্বারের দরজা দিয়ে কেউ ঢুকলেই, প্রবলেমটা বুঝে যাই। মনে মনে চলে নানান নিউরোট্র্যান্সমিটারের সিগন্যাল ক্যাসকেডের অঙ্ক"

"আপনি আপনার কথা বলুন। শুনতেই তো এখানে এসেছি। হয়ত আপনার কথার মধ্যে সূত্রটা খুঁজে নিতে পারব"

সিগারেটের শেষ অংশ অ্যাশট্রেতে ফেলে বলল "চা খাবেন?"

"মন্দ হয় না"

রিসেপশনিস্ট তখনও বসে। স্যার না বেরলে চেম্বার বন্ধ করে যাওয়া হবে না। রাত হলে স্যার নিজেই গাড়িতে পৌঁছে দেন। মাঝে-মধ্যে ফেরার পথে ভালো রেস্তরাঁয় খাইয়েও দেন। ঘরে ফিরে রান্না করতে হয় না। যদিও সে পিজি অ্যাকোমোডেশন, প্রায়শই ফিরতে রাত হয় বলে মালকিন ঘরে রান্নার অনুমতি দিয়েছে। মফসসলের মেয়ে, রাতে ফিরে কোথায় খাবে? সারাদিন খাটাখাটনির পর রাতের রান্নাটাও নিজেই করতে হয়। সেটাতেও কুঁড়েমি।

ডাঃ অনঙ্গ দত্ত ইন্টারকমে বলল "মিতালি দু কাপ চা কর"

"আনছি স্যার"

বুঝল আলোচনা বেশ কিছুক্ষণ চলবে। স্যার খাইয়ে বাড়ি পৌঁছে দিতে পারে। মুড হলে স্যারের গোপন ফ্ল্যাটে নিশিযাপনও। যদি অবশ্য ইচ্ছে হয়। মন্দ লাগে না। দুর্গাপুরে পৈতৃক বাড়ি, লেখাপড়া, বড় হওয়া। কলকাতায় বেশি বন্ধু-বান্ধব নেই। এই স্বল্প মাইনের চাকরিতে বিনোদনের অবসরও নেই। মনকে নিজের অবস্থার সঙ্গে বশ করলেও, দেহ মানে না। উঠতি বয়সের চাওয়াও তো আছে। অস্বীকার করবে কী করে?

ডাঃ দত্ত বলল "হ্যাঁ, যা বলছিলাম। আমি তো আর ফরেনসিক সাইকিয়াট্রিস্ট নই। ফরেনসিক সাইকিয়াট্রি, চায়েল্ড সাইকিয়াট্রির মতো অ্যামেরিকান বোর্ড কোয়ালিফিকেশন। কলকাতায় যেমন অনেক সেলফ-স্টাইল্ড চায়েল্ড সাইকিয়াট্রিস্ট আছে, ভারতেও অনেক কিছু সেলফ স্টাইল্ড ফরেনসিক সাইকিয়াট্রিস্ট পেতে পারেন। আপনার পক্ষে আইডিয়াল হত মুম্বাইয়ের মাধুরী মিত্তাল। যে দুটো মালবরোর প্যাকেট ফুঁকে নিহারি-কাণ্ড সলভ করে দিল। সে তো এখন ভারতে নেই। মাস ছয়েকের জন্য মেলবোর্ন ও অন্যান্য জায়গায় লেকচার দিতে গেছে। কলকাতায় এলে আমার বাড়িতেই ওঠে। আপনার সঙ্গে পরিচয়ও করিয়ে দিতাম"

"মাধুরী মিত্তালকে যখন পাওয়াই যাবে না, আপনি কি সাহায্য করতে পারবেন না?"

"মুখার্জিদা, আপনি 'প্রোফাইলার' সিরিয়লটা দেখেছেন? আমি যখন অ্যামেরিকাতে সাইকিয়াট্রিক কনফারেন্সে যাই, আমার বউ তনুকার জন্য সব টিভিশোগুলো কিনে নিয়ে আসি। পর্নি থেকে প্রোফাইলার, স...ব...। প্রোফাইলারে এমন সুন্দরী আছে যাকে দেখে এই বয়সেও আপনার জিভে জল এসে যাবে। তাকে কিন্তু আমি ফরেনসিক সাইকিয়াট্রিস্ট মনে করি না"

"আমার তো অন্য কোনও গতি নেই। আপনিই হচ্ছেন এখনকার রক্ষাকর্তা"

"এই হচ্ছে নন সাইকিয়াট্রিস্ট আর আর সাইকিয়াট্রিস্ট-এর মধ্যে পার্থক্য। আই কনসিডার দ্যাট লেডি ইন 'প্রোফাইলার' দো ফিক্টিশিয়াস সি মে বি, এ ফরেনসিক অ্যাস্ট্রলজার। উনি কেস সায়েন্স দেখে শুধু বাইরের অনুমানে আপনার ফ্যমিলি ট্রি, লাইকস অ্যান্ড ডিসলাইকস, সামনে ফেলে দিতে পারেন। ফরেনসিক সাইকিয়াট্রি ইজ ইন্টারেস্টিং বাট ইকুয়ালি ডিফিকাল্ট সাবজেক্ট"

ততক্ষণে মিতালি চা করে এনেছে। মধুসূদন মিতালির দিকে তাকাল। দেখতে খারাপ নয়। ভাগ্যিস ডাক্তারের চেম্বারে কাজ করছে। নইলে সেও এই উঠতি মাদকতার জৌলুসের পেছনে ছুটত। ঝুঁকে মধুসূদনের দিকে চা এগিয়ে বলল "ক চামচ চিনি দেব স্যার?"

"এক চামচ" গিন্নির ওয়ার্নিঙে এখন একে।

ডাক্তারের রুচি আছে বটে। রিটায়ারমেন্টের বয়স হলেও মিতালির লো-কাট সালোয়ারের ফাঁকে খাঁজের ওপর চোখ পড়ল। এই নারী-পুরুষের আকর্ষণ যুগ-যুগান্তর ধরে চলে আসছে। স্বর্গে পিতামহ ব্রহ্মা রম্ভা-উর্বশী-মেনকাকে দেখে যদি আকৃষ্ট হতে পারে, মর্ত্যে মধুসূদন বা অনঙ্গ দত্ত কোন ছাড়?

চিনি নেড়ে বলল "মাধুরী মিত্তাল যখন নেই, দেখি আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি কি না। সাইকিয়াট্রি শুনলেই একটু বিশ্লেষণ করতে মন কেঁদে ওঠে" মিতালির নিতম্বের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলল "আমি প্রতি মুহূর্তে আমার সাবজেক্টের সঙ্গে প্রেম করছি। ভাববেন না, অন্য মহিলারা আমার জীবনে নেই"

সেই অন্য মহিলাদের মধ্যে এই রিসেপশনিস্ট মিতালিও আছে অনুমান করতে পারছে।

অনঙ্গ বলে চলেছে "সেসব সুন্দরীদের খবর তনুকাও জানে। আর এও জানে। সি ইজ দ্য আল্টিমেট লেডি ইন মাই লাইফ। ইজিপশিয়ান মিথলজির ভাষায় যাকে বলে কসমিক পার্টনার। যাক সে কথা। সাইকিয়াট্রির কিছু ডিটেলস না বললে ব্যাপারটা বুঝতেন না, তাই। এবার আপনার কাহিনি শুনি"

যতটা সংক্ষেপে সম্ভব মধুসূদন খুনের ঘটনার বিবরণ দিল, ছোটখাটো ঘটনাগুলো বাদ দিয়ে। শেষ হতে বলল "একটা অদ্ভুত সিমিলারিটি লক্ষ করছিলাম। যারা খুন হয়েছে সবাই ব্রিলিয়ান্ট ছেলে নয়ত সুন্দরী মেয়ে"

আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে বলল "যেই খুন করে থাকুক না কেন, প্রত্যেকটা খুনের মধ্যেই প্রখর বুদ্ধির ছাপ। দেয়ার ইজ এ কমপ্লেক্স ইন্টারপ্লে অফ অ্যান ইনটেন্সলি ফিলসফিক্যাল মাইন্ড। সিমিংলি আনফ্যাদমেবল। দ্য ক্রুডেস্ট ডিসপ্লেসমেন্ট অফ সাম ডিপ-সিটেড অ্যাঙ্গস্ট"

"বুঝলাম না। আধ্যাত্মিক কিছু?"

"হতেও পারে। কে জানে? মার্ডারগুলোর পেছনে কোনও স্থূল বা মেটিরিয়ালিস্টিক মোটিভ বোধহয় নেই। খুনির নিজস্ব একটা দৃষ্টিভঙ্গি আছে। সেটা যে কী তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। হয়ত গভীর কোনও দর্শন। নিজস্ব সুদৃঢ় চিন্তাধারা। সেই চিন্তাধারাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্যই এই প্রচেষ্টা"

"সে কি নর্ম্যাল?"

"নর্ম্যালিটি ইজ এ স্ট্যাটিস্টিক্যাল কনসেপ্ট। দেয়ার ইজ এ ভাস্ট গ্রে এরিয়া ইন ইট। হিটলার, স্ট্যালিন, চার্চিল, মুসোলিনির বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে মূল্যায়ন হয়েছে। যুগ-যুগান্তর ধরে তর্কের পর্যায় থেকে গেছে"

"তার মানে কি বলতে চান, খুন করা পাপ নয়?"

"রোজ তো হাজারও খুন হচ্ছে। আপনি আরও ভালো জানেন। কোনটা ন্যায় কোনটা অন্যায়, ঝট করে বিচার করতে বসে যাই। গানটা মনে পড়ে 'মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হল বলিদান লেখা আছে অশ্রুজলে'"

"সেটা তো দেশাত্মবোধক ব্যাপার"

"দেশ কালের মাপের পরিধি ছাড়ালে দেখবেন, বিশ্বাসই আসল। কী বিশ্বাসে এই তীক্ষ্ণবুদ্ধি খুনগুলো করছে সেটাই ভাবার। এটুকু বলতে পারি সে ডাক্তারি, ফরেনসিক, ফিজিক্স গুলে খেয়েছে। যে সে লোক নয়। তার আইকিউ আর ইকিউ অনেক বেশি"

"কে হতে পারে?"

"বলতে পারব না। তবে তার মধ্যে মাস লিডারশিপের কোয়ালিটি আছে। চেনা নিয়মের বাইরে গোটা জাতিকে জাগাবার। সঙ্গে অসম্ভব কম্পালশন। যাকে ডাক্তারি ভাষায় বলি 'অবসেসিভ কমপালসিভ পারসোনালিটি'...রেসিলিয়েন্ট। যা করবে ঠিক করেছে, করেই ছাড়বে। হোক না চেনাজানা অঙ্কের বাইরে"

মধুসূদন বুঝতে পারলেও ধরতে পারছে না, কোন সূত্রে এগোবে। একটু ভেবে বলল "ভওয়ানিশঙ্কর হতে পারে?"

"ওই ম্যাথেরনের সাধু? হ্যাঁ, হতে পারে। কিছুক্ষণ আগেই তো বললেন, এই লোকটি ম্যাথেরনের মতো ছোট্ট জায়গায় ভক্তদের নিয়ে বিরাট আশ্রম করে সাম্রাজ্য চালাচ্ছে। মুম্বাইকে হাতের মুঠোয় ধরে রেখেছে"

"মুম্বাইয়ের তাবড় তাবড় লোক ওর শিষ্য শুনেছি"

"এরা কেউ বোকা নয়। কী করে এদের বেষ্টনীতে ধরে রেখেছে? কী করে এদের মুগ্ধ করে, নিজের শিষ্যত্বে পরাধীন করেছে? ভেবে দেখুন তো। লোকটির আতীত খতিয়ে দেখুন। বলছি না এ-ই করেছে। এরকম একটা এগোসেন্ট্রিক লোকই এই ধরনের চিন্তা করতে পারে। কোনও সাধারণ লোক নয়"

মধুসূদন বুঝতে পারছে তার চিন্তাধারা ঠিক। কিন্তু এই ধরনের লোকের অন্তরে পৌঁছতে গেলে তাকে তো তার সাকরেদের সাহায্য নিতে হবে। কিন্তু সেই সাকরেদটাকে ধরবে কী করে? হাতে একটাই জলজ্যান্ত প্রমাণ - ওই ছবির লোকটি। ওটাই এখন এগবার একমাত্র সূত্র।

চল্লিশ

দ্য মার্ডর অফ পৌরভি আনভিল্ড বাই কাভিয়াঞ্জলি রঙ্গবাসম।

দ্য হেরল্ড অফ ইন্ডিয়ার হেডলাইনস সব মিডিয়াকে ছাড়িয়ে। রিলিসের দু-ঘণ্টার মধ্যে অল প্রিন্টেড কপিস সোল্ড আউট। দক্ষিণী ছবির নামকরা নায়িকার মৃত্যুরহস্য। এটা খাবে না, তো কী খাবে? ইলেক্ট্রিনিক মিডিয়া জানতে পারেনি। অন্য প্রেসও নয়। এডিটরকে ফ্রন্ট পেজের হাফ খালি রাখতে বলেছিল রামাসোয়ামি। এডিটর, রামাসোয়ামি আর কাভিয়া জানত। প্রিন্টে যাওয়ার আগে পর্যন্ত ডিটিপিরাও নয়। পাছে লিক হয়ে যায়। ইলেভেন্থ আওয়ারে কাভিয়ার চনমনে লেখাটা ঢুকে গেছে স্লটে। কালকের টিভির বাসি খবর নয়। সকালের টাটকা খবর। যা অন্য কোথাও বেরোয়েনি।

কাভিয়া সব কিছুই লিখেছে। খালি মধুস্করার অনুরোধে ওর নামটা বাদ দিয়ে গেছে। র্কপূরের মতো মিলিয়ে যাওয়া গোবিন্দকে দিয়ে কাহিনি শেষ করেছে।

কাভিয়া রামাসোয়ামির ঘরে বসে ছিল।

“ওয়েল ডান কাভিয়া”

মুচকি হাসল “আর ইউ সিওর আই ওন্ট লুজ মাই জব?”

রামাসোয়ামি কিছু বলতে যাচ্ছিল। ফোনটা বেজে উঠল। দ্য হেরাল্ড অফ ইনডিয়ার চেয়ারম্যান শ্রীনিবাসন দুজনকে ডাকছে। বিরাট ঘরের মাঝখানে বড় সেক্রেটারিয়েট টেবল। গোটা চারেক ফোন। চারদিকে সাজানো চেয়ার। টেবলের ডান দিকে এক্সটেনশনে কম্পিউটার রাখা। বাঁ পাশে দরজা। রামসোয়ামি জানে দরজার ওপাশে বিশাল কনফারেন্স রুম। পেছনের দেওয়ালে একটা ছবি। বোধহয় শ্রীনিবাসনের পিতা, পিতামহ কিংবা প্রপিতামহের হবে। অন্যান্য দেওয়ালে বিভিন্ন গুণিজনের সঙ্গে শ্রীনিবাসন।

ঢুকতেই বলল “কফি?”

রামাসোয়ামি মাথা নাড়ল। ফোনে সেক্রেটারিকে বলল “থ্রি কফিস প্লিজ”

ওপাশের টেবলে একজন প্রৌঢ়। সাদা সার্ট। সাদা ধুতি।

কাভিয়া শ্রীনিবাসনকে আগে কখনও দেখেনি । শুধু নাম শুনেছে। এই কাগজের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।

“ইউ আর কাভিয়াঞ্জলি রঙ্গবাসম?” মাথা নাড়ল।

“ওয়েল ডান মাই গার্ল। আই ওয়াজ ওয়ান্ডারিং হাউ ইউ ম্যানেজড ইট?”

“আই হ্যাড ভাওড টু স্যার, ইফ আই ফেল, হি ক্যান কিক মি আউট অফ দ্য জব। হ্যাড নো আদার চয়েস”

মুচকি হাসল শ্রীনিবাসন “আই হ্যাভ গন থ্রু ইওর সিভি। ইউ ওয়ার ফার্স্ট অ্যাট দ্য ইউনির্ভাসিটি। আই অ্যাম প্রাউড অফ ইউ। হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ?"

“প্লিজ স্যার, ডোন্ট কিক মি আউট অফ দ্য জব”

হেসে ফেলল শ্রীনিবাসন “আফটার সাচ এ মাস্টার স্কুপ? ডু ইউ নো, দিস ইজ এ হিস্ট্রি ইন আওয়ার মার্কেটিং অ্যারিনা। ইন দ্য লাস্ট টেন ইয়ার্স উই হ্যাভ নেভার সোল্ড অল আওয়ার লট অ্যাট ওয়ান গো। মে গড ব্লেস ইউ মাই গার্ল”

“স্যার, আই হ্যাভ নট ম্যানেজড টু রিচ দ্য এন্ড। ইট নিডস ফারদার ইনভেস্টিগেশন”

“দ্যাটজ হোয়াই আই কলড্ ইউ। দ্য হোম সেক্রেটারি রাং মি। ওয়ান অফ হিস এবল অফিসার্স দ্য অ্যাডিশনল কমিশনার অফ পুলিস উইল শর্টলি বি হিয়ার টু গেট দ্য ডিটেইলস”

বলতে না বলতেই ফোন "সেন্ড হিম ইন" হেসে বলল "টক অফ দ্য ডেভিল অ্যান্ড দ্য ডেভিল অ্যারাইভস... ওয়েলকাম মিঃ দিলওয়ান সিং। প্লিজ মেক ইওরসেলফ কমফর্টেবল" উলটো চেয়ারে ইঙ্গিত করে কাভিয়াকে দেখিয়ে বলল "হিয়ার ইজ দ্য ব্রাইট ইয়ং গার্ল হুস হার্ড ওয়ার্ক লেড টু দ্য স্টোরি... কফি?"

মাথা নাড়ল দিলওয়ান সিং "ক্যান আই টক টু হার হোয়াইল ইউ ক্যারি অন উইথ ইওর ওয়ার্ক?"

পাশের দরজা দেখিয়ে বলল "প্লিজ টেক হার টু দ্য বোর্ড রুম অ্যান্ড গেট অল দ্য ডিটেলস। রামাসোয়ামি ইউ ক্যান গেট ব্যাক টু ইওর ওয়ার্ক"

কফি শেষ করে যখন কাভিয়া দিলওয়ান সিং-এর সঙ্গে উঠে যাচ্ছে, তাকে বলল "প্লিজ মিট মি বিফোর ইউ গো"

মাথা নেড়ে দিলওয়ানের সঙ্গে বোর্ড রুমে "সো, হোয়ার শ্যাল উই স্টার্ট?"

"স্যার আই উইল টেল ইউ এভরিথিং। বাট ওয়ান রিকোয়েস্ট। আই উইল কিপ অ্যালুফ দ্য মেইন সোর্স অফ ইনফরমেশন। দ্যাট উইল বি এ ব্রিচ অফ ট্রাস্ট" মধুস্করার ভালোবাসাকে পাবলিক করতে চায় না। ওর ব্যাবসা ও ফিউচার কেরিয়ারের ক্ষতি হতে পারে।

"ফাইন। অ্যাজ ইউ লাইক"

একে একে কাভিয়া বলে গেল দ্রক্সার মিউজিক অ্যারেঞ্জমেন্টে রুক্সার গান থেকে চন্দ্র নাইডুর হাতে এমপিথ্রি প্লেয়ার যাওয়ার কথা। রামোজি ফিল্ম সিটিতে কেষ্টকে খুঁজে বার করা। কেষ্ট গোবিন্দকে প্লেয়ার শুনতে দিয়ে হিরোকে চা দিতে গেছিল। গোবিন্দর ইন্ডাস্ট্রি থেকে ভ্যানিস হওয়া। সব-ই। শেষ হতে বলল "গোবিন্দ গট দ্য জব ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি বাই রেকমেন্ডশন অফ এ ডক্টর ফ্রম ক্যালকাটা নেমড আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। আই থিংক, ইনটারোগেটিং হিম মাইট থ্রো মোর লাইট অন দ্য ম্যাটার"

নীলকান্থ মার্ডার কেসেও নামটা উঠে এসেছিল। এই ডাক্তারই তো কলকাতা থেকে ইনসুলিনের প্রেসক্রিপশন দিয়েছিল। ওই ডাক্তারকে সিরিয়সলি ক্লোজ-ইন করতে হবে। মনে হচ্ছে দুটো খুন আলাদা ইনসিডেন্ট নয়। এর মধ্যে এক বিরাট চক্র জড়িয়ে। দিলওয়ান সিং শ্রীনিবাসন ও কাভিয়াকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

কাভিয়াও বেরিয়ে যাচ্ছিল। শ্রীনিবাসন ডাকল "ওয়ান মিনিট কাভিয়া" ড্রয়ার থেকে খাম বার করে বলল "দ্য হেরাল্ড অফ ইন্ডিয়া ইজ গ্রেটফুল ফর ইওর সার্ভিস। হিয়ার ইজ এ স্মল টোকেন অফ অ্যাপ্রিসিয়েশন ফর ইউ। আই উড অলসো সি ইউ গেট এ কুইক প্রমোশন। কিপ আপ দ্য গুড ওয়ার্ক" মুচকি হেসে চোখ টিপল।

বেরিয়ে খামটা খুলে দেখল দশ হাজারের চেক। আনন্দে চোখে জল এসে গেল। এমন আনন্দে কাঁদেনি আগে। কুন্নুরের ছোট্ট মেয়ে আজ বড় শহরে রাতারাতি স্টার। আব্বা অ্যান্ড আম্মা উইল বি প্রাউড অফ হার।

ঘুরেফিরে বারবার ডাঃ অশিস বন্দ্যোপাধ্যয়ের দিকে মন চলে যাচ্ছে দিলওয়ানের। গোবিন্দর চাকরি ব্যাপারটা খুবই তুচ্ছ। তবুও গোবিন্দর হদিস পেতে গেলে ডাঃ বন্দ্যোপাধায়কে প্রশ্ন করতে হবে। একটা জিনিস অদ্ভুত। কী ভাবে বারবার আশিসের নাম জড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কোনওভাবে ওর ওপর আঙুল তোলা যাচ্ছে না। ইন্দ্রজিৎকে একটু চাঙ্গা হতে বলতে হবে।

ফোন শুনে ইন্দ্রজিৎ বলল "লাস্ট টাইম আই ডিডন্ট ইন্টারোগেট দ্যাট ডক্টর বিকস আই ওয়াজ ট্রাইং টু ফাইন্ড দ্য পার্সন হু ডেলিভারড দ্য প্রেসক্রিপশন ইন ব্যাঙ্গালুরু। হি উড হ্যাভ প্লেনলি সেড হি কান্ট রিমেম্বার। অর দ্য লেডি ওয়াজ ইন ক্যালকাটা। হি ইজ নট সাপোসড টু কিপ এ ট্র্যাক অফ অল দ্য পেসেন্টস হু হ্যাভ ভিজিটেড হিম। সামথিং অফ দ্যাট সর্ট"

"দিস টাইম ইউ হ্যাভ টু"

"ইজ দেয়ার অ্যান এভিডেন্স টু দ্য ফ্যাক্ট হি রেকমেন্ডেড?"

“দেয়ার ইস। দ্য জার্নালিস্ট হু ক্যারেড দ্য ইনভেস্টিগেশন হ্যাস সেড সি উডন্ট রিভিল দ্য সোর্স”

“ইট মাইট বি দ্য সোর্স ইজ আলসো ইনভলভড ইন দ্য গেম?”

“ডোন্ট থিংক সো। সি উডন্ট হ্যাভ কনফাইডেড। আই সাপোস, দ্য পার্সন ইজ এ নোন পারসন্যালিটি হুস ক্রেডিবিলিটি উড হ্যাভ বিন পুট টু কোয়েশ্চেন”

“মে বি। লেট মি চেক হিম আউট”

ডাঃ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় পেশাদারি কায়দায় ইন্দ্রজিৎকে বলল “বসুন”

“গোবিন্দ বলে কাউকে আপনি চাকরি দিয়েছেন?”

“কে গোবিন্দ?”

“সাউথ ইন্ডিয়ান ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে একজন বেল-বয়”

“ঠিক মনে করতে পারছি না”

“ভেবে দেখুন। আমাদের কাছে এনাফ এভিডেন্স আছে আপনি ওকে রেকমেন্ড করেছিলেন”

“করে থাকতে পারি। অনেককেই তো করি”

“গোবিন্দর হদিস বলতে পারবেন?”

“এসব প্রশ্ন আমায় করছেন কেন?”

“সাউথ ইন্ডিয়ান ফিল্মস্টার পৌরভির মার্ডারের পেছনে গোবিন্দর হাত আছে। ওকে দিয়ে কেউ কাজটা করিয়েছে। আপনি যদি ঠিক কথা না বলেন ফেঁসে যাবেন। আমাদের কাছে এও এভিডেন্স আছে আপনি শঙ্খমালা মুখার্জিকে কলকাতা থেকে একটা ইনসুলিনের প্রেসক্রিপশন লিখেছিলেন, যা দিয়ে তামিলনাড়ুর চিফ সেক্রেটারির ছেলেকে খুন করা হয়”

বুঝতে পারছে এরপর সত্যি না বললে খুনের দায় তার ঘাড়ে পড়বে। খুনের দায় না হলেও কনসিলমেন্ট অফ এভিডেন্সে আদালতের চক্কর ঘুরিয়ে ছাড়বে। ডাক্তারি রেজিস্ট্রেশন নিয়ে টানাটানি। এখন খুনের চক্র থেকে নিজেকে মুক্ত করার সময় “হ্যাঁ, মনে পড়েছে। অতীন ওকে নিয়ে এসছিল। গ্রামের ছেলে। যদি কোনও হিল্লে করে দিতে পারি। প্লাস্টিক সার্জন হওয়ার জন্য ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক যোগাযোগ আছে। তাই ওকে চাকরির বন্দোবস্ত করে দিই। বাকিটা আমি জানি না”

“অতীনের হদিস দিতে পারবেন?”

রিসেপসনিস্টকে নেম-এড্রেস ডিরেক্টরি নিয়ে আসতে বলল। পাতা উল্টিয়ে বলল “লিখে নিন, অতীন রায়” বলে কাঁথির ঠিকানা দিল।

“ফোন নম্বর?”

“নেই। নিজেই ফোন করে দরকার হলে”

ঠিকানাটা লিখে বেরিয়ে যাচ্ছিল। পেছন ফিরে বলল “অতীনের সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক?”

“অতীন মেদিনীপুর কাঁথি এরিয়ার অনেক পেশেন্ট পাঠায়”

চেম্বার থেকে বেরিয়ে মনে হল, হয়ত গোবিন্দ এ-কাজ করেছে। কারও ইন্সট্রাকশনে। অতীন রায়? এই কী সেই অজ্ঞাত পুরুষ, যাকে ইনসুলিনের জন্য খুঁজে বেড়াচ্ছে? যদি তাই হয়, ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় ধোয়া তুলসিপাতা নয়। এরা কি নিছক বাহক বা কারক? না কি, এদের পেছনে কোনও বিশাল চক্র আছে?

দিলওয়ান সিং নিজস্ব ভঙ্গিমায় আগেই কিছুটা ছানবিন করে ফেলেছে। আগে তো শুধু একটা, এখন দু-দুটো মৃত্যু কাঁধে ঝুলছে। একজন চিফ সেক্রেটারির ছেলে। অন্যজন সাউথ ইন্ডিয়ার নামী-দামি নায়িকা। খবর নিয়ে জেনেছে, পৌরভি অবনিরতনমের সিনেমায় জাতীয় পুরস্কার পাওয়ার আগে অভাবের তাড়নায় ব্লু-ফিল্ম করেছিল। পৌরভির আদি পাড়ায় খোঁজ নিয়ে জানল একসময়কার পাড়ার বখাটে ছেলে মুনিয়া, এখন ওই

চত্বরে বিরাট প্রোমোটার। পৌরভিরা যে অঞ্চলে থাকত সেটা এখন আর বস্তি নয়। মুনিয়ার কৃপায় এখন ওখানে অনেক মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং। মুনিয়া এখন কোটিপতি।

মুনিয়ার সঙ্গে একবার কথা বলে দেখা যাক।

মুনিয়ার বাড়িটা ছোটখাটো প্রাসাদ। সামনে লনের পাশে ড্রাইভ-ইন। ড্রাইভ-ইনের পাশ দিয়ে শ্বেতপাথরের সিঁড়ি বেয়ে উঠে ড্রয়িং রুমে। দামি সোফা, আসবাবে ছেয়ে আছে বিশাল হলঘর। ঈশ্বর সমস্ত জাগতিক ঐশ্বর্য লুটিয়ে দিয়েছে মুনিয়ার পাদদেশে। রুচির সামঞ্জস্য না থাকলেও আসবাবগুলো যে খুব দামি বুঝতে একটুও অসুবিধা হল না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘরে ঢুকল ধুতি-গিলে করা পাঞ্জাবি পরা বছর চল্লিশের একজন "বৈঠিয়ে সাব। কেয়া পিয়েঙ্গে, কফি ইয়া লস্যি?"

"জো আপকি মর্জি"

বেয়ারাকে ইঙ্গিতে বলল "কমিশনার সাবকো লস্যি। নারিয়েল মিলাকর। আপকে লিয়ে কেয়া কর সকু?"

"আপকা নাম মুনিয়া?"

গলার কয়েক ভরি সোনার চেনে হাত বুলিয়ে বলল "থা। অব সব হমে পহেচানতা মনিশঙ্কর আইয়ার নাম সে"

"আপ পৌরভিকো পেহচানতে থে?"

"হাঁ। উসকে সারে পরিবারকো। ইহাকে রেহনেওয়ালা"

"কিতনে করিব সে জানতে থে?"

"ঐসে হি। এক জগা মেঁ রহনে সে জিতনা"

"শুনা আপ পহলে কুছ নেহি করতে থে। অব বড়ে ধনওয়ান হো গয়ে"

"সব হি ইশ্বরকে মেহেরবানি"

"প্রোমোটারি বিজনেস কিতনে দিনকে?"

"করিব দশ-বারা বরস। রেজিস্টার্ড কোম্পানি। আপ চেক কর সকতে হো"

"জরুরত নেহি"

"পহেলে আপ জব ইধর রহতে থে তো ইয়ে জগাহ বস্তি থা। অব ইধর বহত সারি মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং"

"ইয়ে তো সব হামনে কিয়া। আপলোগকে মাফিক উতনা পড়েলিখে নেহি। ফির ভি তমান্না থা জিন্দেগি মে কুছ করনা"

"আপ হি নে কহা আপকে পয়েসে নেহি থে। ফির ইয়ে প্রোমোটারি বিজনেস শুরু কে লিয়ে রূপয়ে কাঁহা সে মিলা?"

"মেরা পুরানি দুখভরি জিন্দেগিকে বারে মে পুছা। আচ্ছা কিয়া। ইয়াদ তো হর ওয়াক্ত দিল মে আতা হ্যায়। কৈসে ভুলু ওহ দিন?"

"বোলনে মে ইতরাজ হ্যায়?"

"নেহি। কাহানি পৌরভি সে শুরু। পৌরভি হিরোইন বন গয়ি। বহত কামানে লাগি। একদিন পৌরভি সে মুলাকাত করনে গয়া, পুরানে পরোসিকে রিস্তেকে খাতির একঠো নোকরি দে। উসে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি মে কই জান-পেহচান হো চুকি। নোকরি নেহি দিয়া, মুঝে পহেচানে ভি নেহি। ভগা দিয়া। ঔর ম্যায় হি উসে ফিল্ম মে পহেলা কাম দিয়া"

"কেয়া কাম?"

"কোই বড়া কাম নেহি। উসকা পিতাজি গুজরনে কে বাদ দো ওয়াক্ত কে রোটি ভি উসে ভারি পড় যাতা থা। ম্যায় নে উসে এক জগহ লে কর ব্লু ফিল্ম খিচোয়াই। ওহি উসকা পহেলা ফিল্ম। উসদিন উসে ইয়ে কামকে লিয়ে দশ হাজার রূপয়ে মিলা। উস দিন মে কাফি রকম। মুঝে ভি আচ্ছা কমিশন মিলা। হো সকতা

ব্লু ফিল্ম। পরন্তু রকম তো ভারি। পহেচাননে মে ইনকার কর দেনে পর মুঝে বহত গুসসা আয়া। খবর লে কর জানা রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পানে কে বাদ ওহ্ মুম্বাই মে কুছ ফিল্ম কে চক্কর মে চতুর্বেদী নামকা আদমিকে এজেন্সিকে সাথ বাতচিত কর রহি থি। সয়েদ উসকে সুপারিশ মে এক-দো হিন্দি ফিল্ম ভি কর চুকি থি। পরন্তু মুম্বাই মে উসকা নসিব নেহি লগা। ওহ চেন্নাই লৌট আয়ি ঔর বহত নাম কামায়ে”

“চতুর্বেদী কৌন?”

“মুম্বাই মে শো-বিজ দুনিয়াকে অসলি বাদশা। দুখ কে মারে ম্যায় মুম্বাই গয়া উসে ভেট করনে। ইয়াদি মেরা তকদির উধর খুলে। সাথ মে পৌরভিকে ব্লু ফিল্মকে ভিডিও। ইয়াদি কুছ কাম মে আয়ে”

মুনিয়াকে থামিয়ে বলল “ব্লু ফিল্ম কাঁহা বিকতা?”

“স্যার ইঁহা নেহি। ইধর বিকনে কোর্ট কেস মে ফস জায়েগা। ইন্ডিয়াকে বাহার। আমেরিকা, দুবাই, বাহারেন, ইনলোগকে অপনা চেন হ্যায়। তভি তো ইতনা মালুম নেহি থা। সিরিফ দালালিকে কামাই কে লিয়ে পৌরভিকো লে গয়া থা উনলোগকে পাস”

“উনলোগ কৌন?”

“সব ছোটেমোটে ফটোগ্রাফার। জিসকা দুসরা কোই কামাই নেহি। ইনলোগ বস্তি সে লড়কি লাকর ভিডিও খিঁচতে। ফির উনসে কোই বড়ে আদমি খরিদ কর সারে দুনিয়া মে ধন্দে করতে”

“উসে পহেচানতে?”

“নেহি। ইয়ে তো দশ-বারা বরস কি পুরানি কাহানি। উনলোগ সে হমে কুছ তালুক নেহি। মালুম ভি নেহি কাঁহা হ্যায়। ম্যায় তো সিরিফ দালালি কে কাম কিয়া। লেকিন ইয়ে দালালি মেরা নসিব ঘুমা দিয়া। পৌরভি হমে পেহচাননে মে ইনকার কিয়া। লেকিন চতুর্বেদী হমে বড়ি মেহেরবানি সে বৈঠায়া, বাতচিত কিয়া। হামে কেয়া মালুম থা চতুর্বেদী পৌরভিকে ব্লু ফিল্মকে লিয়ে মু মাঙ্গে কিমত দেগা? উসকো ফিল্ম দিয়া, পৈসে লিয়া, চেন্নাই চলা আয়া। উস রূপয়ে সে প্রোমোটারি বিজনেস শুরু” দিলওয়ানকে বলল “ঔর একঠো লস্যি?”

“নেহি কাফি হ্যায়। আপ বোলিয়ে”

“তভি জানা ব্লু ফিল্মকে ধন্দেকে বারে। পৌরভি না সহি, পৌরভিকে ইয়ে ফিল্ম হি মেরে নসিব খুল দিয়া। ইশ্বর জব দে, কিসিকো কৈসে দে, কৌন জানে?”

“পৌরভিকা মর চুকি হ্যায় আপ জানতে?”

“হাঁ, টিভি মে দেখা। বড়ে লোগকে মামলা। হমে কেয়া লেনা-দেনা?”

মনে হচ্ছে কাভিয়া যে কাহিনিটা এত কষ্ট করে হেডলাইনস করেছে, সেটা আসল সূত্র নাও হতে পারে। আসল সূত্র হয়ত চতুর্বেদী। ডাক্তারের থেকে এসব লোক-ই বেশি সন্দেহজনক। এই ব্লু ফিল্ম নিয়ে চতুর্বেদীর সঙ্গে পৌরভির কিছু হয়ে থাকতে পারে? তার থেকেই মৃত্যু। অন্য অজ্ঞাত কারণে নীলকান্তের মৃত্যুর পেছনেও চতুর্বেদীর হাত থাকতে পারে। এই ধোঁয়াশা পৃথিবীর লোকগুলোকে অতটা সহজে উড়িয়ে দিতে পারে না। চতুর্বেদীর সঙ্গে ডাক্তারের যোগাযোগ থাকলেও থাকতে পারে। কে জানে? চতুর্বেদীর এজেন্সি বাইরের পৃথিবীটারও ঠিকানা লাগাতে হবে।

মনিশঙ্কর আইয়ারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে হোম সেক্রেটারিকে দিয়ে ফোন করাল মহারাষ্ট্রের পুলিস হেড-কোয়াটার্সে। চতুর্বেদীর নাড়ি-নক্ষত্র জানতে হবে। জানতে হবে পৌরভির সঙ্গে তার কী সম্পর্ক? মনে হচ্ছে চক্রের উৎস বাঙ্গালে নয়, মহারাষ্ট্রে।

গন্তব্য যেখানেই হোক না কেন, সব খুঁটিয়ে দেখতে হবে। চিফ সেক্রেটারির ছেলে আর দক্ষিণের নামকরা হিরোইন বলে কথা।

একচল্লিশ

মহাদেবের জটা থেকে গোমুখের কোল বেয়ে নেমে আসা সুরধুনী গঙ্গা ক্রমশ আছড়ে পড়েছে হরিদ্বারে। স্রোতস্বিনীর তরঙ্গায়িত প্রাবল্য তখনও বাঁধ ভাঙেনি দক্ষযজ্ঞের পটে। দেবী দুর্গার চরণ পড়েনি শিবের শায়িত দেহে, পরিবর্তিত হয়নি কালীরূপে।

মন অনেকদিন ধরেই চাইছিল জলের ধারে প্রদীপের মেলা দেখতে। অতীন রায় যখন লোকেশ চাচাকে বলল "চলিয়ে দো দিনকে লিয়ে হরদোয়ার ঘুম আয়ে" মন জেগে উঠল নতুন আনন্দে।

নীতাকে নিয়ে একলা বেরনো যায় না দেহেরাদুন থেকে। বাবা-মা সায় দেবে না, নীতাও না। তবুও মন চাইছিল পাহাড়ের কোল থেকে জলের ছোঁয়া উপভোগ করতে। তাই দুম করে চলে আসা।

গোধূলির অস্তরাগ তখনও মুছে যায়নি। ওঠেনি তারা পশ্চিম দিগন্তে। হর-কি-পৌরির হাজার লোকের ভিড়ে ওরা উপভোগ করছিল দিনান্তের অস্তরাগ। যদিও কুম্ভমেলা নয়, তবু ভিড়ের শেষ নেই। পীঠস্থান তো বটেই। সন্ধ্যারতি দেখতে দূরদূরান্ত থেকে লোক এসেছে। গঙ্গার ফুরফুরে হাওয়ার স্নিগ্ধ স্পর্শ, মন্দ কীসের? আঁশগন্ধি জীবনের আবদ্ধতায় টুকরো আনন্দ খুঁজে নেওয়া। নৈসর্গিক ঘাটতি থাকলেও পুণ্যিতে পুষিয়ে যাবে।

লাল-সাদা মন্দিরের পাশের ঘাটে বসে ছিল দুজনে। বিভিন্ন রঙের হোর্ডিংগুলো দিনের শেষে রঙের বাহার ছড়িয়ে চলেছে। গৈরিক আর লোহিতের অলিখিত সঙ্গম। মিশেছে উইকেন্ডের আনন্দে। নীতাকে নিয়ে এলে কত ভালো লাগত। বিয়ের আগে সম্ভব নয়। বছর কয়েক আগে নীতার পরিবারের সঙ্গে এসেছিল। নীতা, বাবা, মা, ভাই আর লোকেশ। এমনই সন্ধ্যায় সকলে উপভোগ করেছিল গঙ্গার ভাসানো ভেলার লীলা। তখন অবশ্য জীবনে এত জটিলতা আসেনি। নীতাকে ঘিরে নয়। অন্য জায়গা থেকে। কেন তা ঠিক এখনও বুঝেতে পারছে না লোকেশ। বারবার চাপ আসছে, নীতাকে ছাড়ার জন্য। বিয়ে করতে হবে দিল্লির মডেল আন্দ্রেয়াকে। কেন করতে হবে তাও পরিষ্কার নয়। আঁচ করতে পারছে যারা চাপ দিচ্ছে খুব শক্তিশালী।

নীতা শুনে বলেছিল "কেঁও? উনহে হামারে রিস্তে সে কেয়া তালুক?"

"মালুম নেহি। লেকিন উনলোগ জিনা হারাম কর দিয়া"

"উসে বোলো সটক জানে। ইয়ে আপনা মামলা হ্যায়"

"বোলা থা। শুননেওয়ালা নেহি। পিছে পড়া। ধমকি দিয়া বাত নেহি শুননে মে ছোড়েঙ্গে নেহি"

"কাঁহা সে ফোন আয়া?"

"মহারাষ্ট্র সে। মুম্বাই নেহি"

"তুমহে পহেচানা কৈসে?"

"মালুম নেহি। হম দোনো কে রিস্তে কে বারে জানকারি হ্যায়। দোনোকে পরিবারকে বারে মে ভি"

"কেয়া চাহতে হ্যায়? হম দোনোকে সাদি মে উনকো কেও ইতরাজ? আন্দ্রেয়া কৌন?"

"দিল্লিকে খুবসুরত মডেল"

নীতা হাসল "কর লো। মেরে সে জাদা খুবসুরত"

লোকেশ কঠোরভাবে ওর দিকে তাকাল। হাসলে ওর গালে টোল পড়ে। মিষ্টি লাগে। এই মিষ্টি মেয়েকে ছেড়ে অন্য কাউকে কেন বিয়ে করবে? যতই সুন্দরী হোক, নীতার মতো শিক্ষিত তো নয়। নীতার মতো তাকে তো ভালোবাসে না। ভালোলাগা, ভালোবাসা কী অন্য কারও ইচ্ছের মধ্যে বন্দি করা যায়?

কিছুক্ষণ পরেই সন্ধ্যারতি শুরু হবে। দেখার জন্য ওপরে রাস্তার কালভার্ট ভরে গেছে জনস্রোতে। সন্ধ্যারতির শেষে প্রদীপ জ্বলা কলাপাতার ভেলাগুলো ভেসে যাবে ভারত সেবাশ্রমের দিকে। আরতির

বন্দনায়, সূর্য বিদায় নেবে পীঠস্থান থেকে।

অতীন লোকেশকে বলল "আরতি দেখেগা?"

"কেঁও নেহি?"

"উসকে বাদ নিরালে মে বৈঠেঙ্গে"

লোকেশ বহুদিন দেহরাদুনের বাসিন্দা। কিছুদিন হল অতীনের সঙ্গে আলাপ। ছোট্ট কম্পিউটার কোম্পানিতে চাকরি নিয়ে এসেছে। বিকেলে যতই নীতার সঙ্গে ঘুরুক ওর ওপর সময়ের পরোয়ানা। সন্ধের আগেই বাড়ি ফিরতে হবে। বিয়েটা তাড়াতাড়ি করে ফেলতে হবে। না হলে নীতার সংসর্গের সময় ক্রমশ কমে আসছে। এরাও যে পিছু ছাড়ে না। করেই ফেলতে পারত। অপেক্ষা করছে এমএ পরীক্ষা শেষ হওয়া পর্যন্ত। আর তো কটা মাস, দেখতে দেখতেই পার হয়ে যাবে। নতুন ফ্ল্যাটও বুক করেছে। বিয়ের পর সেখানেই উঠবে। দুই বাড়িই বিয়ের সম্মতি দিয়েছে। দেবে নাই বা কেন? লোকেশের মতো ভালো ছেলে দেহরাদুনে কটা পাবে?

স্কুলে-কলেজের বন্ধুরা কেউ দিল্লি, কেউ মুম্বাই কেউ বা অ্যামেরিকা চলে গেছে। সন্ধ্যারতির দিকে তাকিয়ে ভাবছিল, ফিরে গিয়েই নীতার বাবার সঙ্গে বিয়েটা পাকা করে নেবে। পড়ে থাক নীতার পরীক্ষা। বিয়ের পরেও হতে পারে। এখন যদি বিয়ে না করে, ওরা ছাড়বে না। আর দেরি করা ঠিক নয়। এই অযাচিত যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণের একটাই উপায়, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিয়ে।

ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কৃতী স্নাতক লোকেশ যে কম্পিউটার ফার্মে চাকরি করে, সেখানেই মুম্বাই থেকে সদ্য জয়েন করেছে অতীন। নিজেই আলাপ করেছে "হু তো বাঙ্গাল কা, লেকিন নোকরিকে সিলসিলে মে ইধর-উধর কাম মে রহনে কে ওয়াক্ত ভুলনে বৈঠা ম্যায় বঙ্গালি"

"এক হি দেশ, ভারত। চাহে ওহ বাঙ্গাল দিল্লি, দেহরাদুন ইয়া চেন্নাই। হম সব এক দেশকেই হ্যায়"

আলাপ ঘনীভূত হতে সময় লাগেনি। সামনে নীতার পরীক্ষা, বেশি বিরক্তও করা যাবে না। তাই অতীনের সঙ্গে অবসর কাটাতে মন্দ লাগে না।

সূর্য বিদায় নেওয়ার সঙ্গে প্রদীপের ভেলা ভেসে উঠেছে গঙ্গার বুকে। নতুন সাজে সাজছে চিরপরিচিত সাঁঝের গঙ্গা। মহাদেবের জটা থেকে মাটির ছোঁয়ায় নতুন দেওয়ালি উৎসবে মেতে উঠেছে। প্রদীপের সন্ধ্যারতিতে নতুন অভিষেক।

অতীন বলল "ইতনে ভিড় মে দম ঘুট রহা"

"কেয়া করে?"

"চলো মেরে সাথ। নিরালে মে বৈঠেঙ্গে"

"ইধর নিরালা কাঁহা?"

"আও তো"

হর-কি-পৌরি থেকে ৩০০ মিটার হাঁটতেই কালভার্টে পার হয়ে ব্রিজে পড়ল। নীল ধারার ওপর ব্রিজ পড়েছে হর-কি-পৌরির উলটো দিকে। ২০ ফিট কালভার্ট গঙ্গার পাশ দিয়ে চলে গেছে উত্তরের পথে। হোটেল-দোকান ছাড়িয়ে হাঁটতে লাগল কালভার্ট ধরে। এগোতেই ফাঁকা অন্ধকার, নীরবতা। যুগলেরা গভীর প্রেমে মগ্ন। কেউ বা গঙ্গার মৃদুমন্দ বাতাস উপভোগ করছে। কেউ জড়িয়ে ধরে অধরের রসটুকু নিরালায় নিংড়াচ্ছে। দূরে কয়েকটা ভিখিরি পা ছড়িয়ে শুয়ে। ভিড়ের বাইরে বিশ্রামের অবকাশ। ভিক্ষে করতেও তো পরিশ্রম হয়। আরেকটু এগোতেই চোখে পড়ল, একজন কলকেতে মশলা গুঁজছে। মর্ত্যলোকেই ভাসতে চাইছে গঞ্জিকার স্বর্গে। ওপাশে ভক্তের হাট। এপাশে ও থেকে মুক্তির আরেক রূপ, জমজমাট।

সত্য বটে সেলুকাস কী বিচিত্র এ দেশ। বিচিত্র তার আত্মপ্রকাশ। নানা রূপে নানা রঙে। লোকেশ আগে বেশ কয়েকবার হরিদ্বার এসেছে। কিন্তু উলটো দিকের চিত্র আগে কখনও দেখেনি। অতীনকে বলল "ইয়ে ভি হরদোয়ার। পহলে ইয়ে কভি নেহি দেখা"

"মালুম হোনা চাহিয়ে। ইসলিয়ে তো ইশ্বর তুমহে মেরে সাথ ইঁহা লায়া"

সাঁঝের স্রোতস্বিনী অন্ধকারের আঁচলে ঢাকা নিভৃত গঙ্গা। ফুরফুরে হাওয়া ভেসে আসছে জলের ছোঁয়া নিয়ে। ভালোই লাগছে লোকেশের।

"আচ্ছা লাগতা?" অতীন প্রশ্ন করল।

"বড়িয়া। কিতনেবার হরদোয়ার আয়া। ইস তরফ কভি নেহি"

"অভি ভি বহত কুছ দেখনা বাকি হ্যায়"

হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে গাছের তলায় বসে পড়ল।

"থক গয়া। থোড়া সা আরাম কর লে" লোকেশ গাছের তলায় পা ছড়িয়ে।

"তুমহারা সাদি হো চুকা?"

"নেহি। নীতা সে বহতদিনকে ইশক হ্যায়। এমএ দে রহি। উসকে বাদ সাদি। একঠো ফ্ল্যাট ভি বুক কিয়া। তুমহারে?"

"নেহি করুঙ্গা। এক লড়কি সে মোহাব্বত হুয়া। ধোকা দে কর চলি গয়ি। ফির কসম খায়া লড়কিকে চক্কর মে ঔর কভি নেহি"

লোকেশ পকেট হাতড়াচ্ছিল দেখে অতীন বলল "সিগারেট? লে মেরে পাস হ্যায়" লোকেশকে সিগারেট দিল। নিজেও ধরাল। দুটো টান দিতে লোকেশ বুঝল স্বাদটা অন্যরকম। ঠিক সিগারেটের মতো নয়। সিগারেটটা হাতে নেড়ে বলল "টেস্ট কুছ আলগ?"

"সিগারেট পাঁচ মিনিট। ফির হাওয়া মে খতম। ইয়ে সিগারেট পাঁচ ঘন্টে"

"কেয়া হ্যায় ইসমে?"

"মারিজুয়ানা। পি, মস্ত সে। ফির দেখ কেয়া মস্তি। গঙ্গেকে হাওয়া, নিরালে মে তন্দুরুস্তি"

বিয়ে নিয়ে ঝামেলা থেকে মুক্তি খুঁজছিল। আগে কখনও খায়নি। নামটা শুনেছে। একবার নয় পরখ করেই দেখা যাক। স্বাদটা অন্য হলেও মস্তি লাগছে। আরও কয়েকটা টান, আরও ভালো, আরও টান, আরও ভালো। মন ভাসছে গাঙচিলের মতো গঙ্গার বাতাসে। সন্ধ্যার মৃদুমন্দ গঙ্গার হাওয়ায় নতুন আবেশ। দূরের পৃথিবী... নীতা... বিয়ে... উটকো ঝামেলা সব দূর। কোনও কিছুই সমস্যা নয়। দূর নিকটে চলে এসেছে, নিশ্চিত সমাধানে। অতীনকে দেখে মনে হল সে আর গাছের তলায় নেই। ভাসছে অনন্ত মহাশূন্যে।

রুদ্ধ মনটা দেহরাদুন ছেড়ে হরিদ্বারে, গঙ্গার তীরে, পাখনা মেলে নতুন আনন্দের সুর পেয়েছে। বেঁচে থাকার সুর। কাব্যহীন সমস্যাভরা জীবনে নতুন স্বপ্নের দেশ। যেখানে জল, স্থল, অন্তরীক্ষ এক।

অতীন বলল "চল, নহায়ে"

"হম তো পানি মে বৈঠে"

অতীন বেশ বুঝতে পারছে লোকেশের নেশা লেগেছে "তু পানিকে উপর কভি পয়দল চলা?"

"নেহি তো"

"ফির চল। আজ দো কদম পানি পর চলে"

অতীনের হাত ধরে উঠে পড়ল। চলতে শুরু করল ঘাটের দিকে। আহা, কী আনন্দ! জলেও চলতে পারছে। আরও দু-পা। কে বলে জলে হাঁটা যায় না? সে তো দিব্যি হেঁটে চলেছে। আরেকটু... আরেকটু... আরেকটু... পায়ের তলায় ঠান্ডা ঠান্ডা... ভালোই লাগছে। ক্রমশ দেহটা নীচে নেমে যাচ্ছে। সে যাক। সিগারেটটা শূন্যে ছুড়ে দিল। অনন্ত আকাশ, সীমাহীন মাটি, অবারিত জল, মিলে একাকার। বুঝতে পারছে না তফাত কোথায়? সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মিলেমিশে এক অনন্ত আনন্দে। এই বিপুল পৃথিবীর কোন স্তরে সে বিচরণ করে, ভাবার মানেই হয় না। লোকেশ এখন একমেবাদ্বিতীয়ম।

বাঁ দিক থেকে জলের প্রচণ্ড ধাক্কা আছড়ে পড়ল দেহে। ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। শূন্যে বিহঙ্গের মতো। জল... আরও জল... আরও আরও জল। এক সময় গঙ্গা সম্পুর্ণভাবে গ্রাস করে নিল উন্মুক্ত গহ্বরে। অন্য

এক স্বর্গরাজ্যে, চিরশান্তির কোলে।

অতীন ঘাটে দাঁড়িয়ে সিগারেটটা ফেলে দিল। কালকে একবার দিনের আলোয় ফিরতে হবে। বডিটা পাওয়া গেছে কি না, জানতে।

বেয়াল্লিশ

ইন্দ্রজিৎ কর পুরকায়স্থকে মধুসূদন ফোনে বলল "একটা কথা বলব স্যার। যদি দয়া করে চেন্নাই আর ব্যাঙ্গালুরু-মহাবালিপুরমের খুনের ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট রেকর্ড সেকশনে পাঠিয়ে দেন, আমি সাহায্য করতে পারি"

ইন্দ্রজিৎ ভাবল দিলওয়ানকে বললে, নিশ্চয়ই আপত্তি করবে না। নিজের ইনভেস্টিগেশনেও প্রয়োজন "পরশুর মধ্যে পেয়ে যাবেন"

মধুসূদনের নিরুত্তাপ জীবনে পুঞ্জিভূত মেঘ আসন্ন ঝড়ের আভাস দিচ্ছে। ঝড়টা কোনদিক থেকে আসবে সেটাই বোঝা বাকি। মন বলছে, উত্তাল তরঙ্গে।

স্নেহাশিস বাড়িতে রিপোর্ট পড়ছিল। মেহুলির বুড়ি পিসিমাকে ট্যাপ করেছিল, সেটুকুই রিপোর্টে। কথোপকথনের তথ্য ভিত্তিহীন বলেই বাদ দিয়েছে। এখন মনে হচ্ছে, সবটা ভিত্তিহীন নয়। গাড়ি নিয়ে ছুটল কাঁথির নিউ বাস স্ট্যান্ড এলাকায় বুড়ির বাড়ি।

ঘরে ঢুকে বলল "আবার আপনাকে একটু জ্বালাতন করলাম"

বৃদ্ধা বসার ইঙ্গিত করল "বসো বাবা। বিরক্ত হব কেন? তোমরা পুলিসের লোক। তোমাদের সাহায্য করা আমাদের ধর্ম"

কথা না বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল "আপনি সেদিন বলছিলেন অতীনের কথা। শেষ কবে আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল?"

"বহুকাল আগে। ঠিক মনে পড়ছে না। আমার ওকে কিছু দেওয়ার নেই। দেখা করবে কেন? এখন শুধু বসে আছে কবে স্বর্গে যাই। বাড়িটা দখল করতে পারবে"

"অতীনের সঙ্গে কী মেহুলি মানে কেল্টুসের যোগাযোগ ছিল?"

"তা তো বলতে পারব না বাবা। অতীন যা লোভী। থাকলেও আশ্চর্য হব না। ওদের তো অনেক টাকা। থাকতেও পারে। এসব প্রশ্ন আমায় কেন?"

একটা ছবি বৃদ্ধার দিকে এগিয়ে বলল "একে চিনতে পারেন?"

বৃদ্ধা ছবিটা নিয়ে চৌকিতে রাখল "দাঁড়াও বাবা। চশমাটা নিয়ে আসি। বুড়ো হয়েছি, ছানি পড়েছে, ঝাপসা দেখি। ডাক্তার বলেছিল অপারেশন করিয়ে নিতে। একা থাকি। এই বয়সে কে দেখবে? কে নিয়ে যাবে?" চশমার খোঁজে গেল।

প্রহর গুনছে স্নেহাশিস বৃদ্ধার চশমার অপেক্ষায়। পাঁচ মিনিট পর ঘরে ঢুকে বলল "খুঁজে পাচ্ছিলাম না। খাটে, টেবিলে নেই। শেষে দেখলাম গীতার পাতায়" চৌকি থেকে ছবিটা তুলে দেখল "এই তো অতীন। তুমি পেলে কোত্থেকে?"

উত্তরটা আশাই করেছিল। বৃদ্ধার কনফার্মেশনে হিসেব মিলল। দাঁড়িয়ে বলল "সে লম্বা কাহিনি। একদিন বলব। পিসিমা, আপনাকে পিসিমা বলতে পারি? আপনার চশমাটা প্রায় ভেঙে গেছে। কালকেই লোক পাঠিয়ে দেব। আপনাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে। চোখ পরীক্ষা করিয়ে নতুন চশমা করিয়ে দেবে। তারপর যদি ছানি কাটাবার ইচ্ছে হয়, বলবেন। বন্দোবস্ত করে দেব"

"তুমি আমার জন্য কেন এত করবে বাবা?"

"ছেলে কী মায়ের জন্য এটুকুও করতে পারে না?"

ছবিটা ফেরত দিয়ে আঁচলে চোখের জল মুছল। এতদিন তো কেউ এমনভাবে বলেনি। ব্যথার প্লাবন আছড়ে পড়ছে, অনেক বছরের জমানো। স্বামী চলে যাওয়ার পর কারও কাছে এতটুকুও সান্ত্বনা পায়নি। তবুও বিপিন বেঁচে থাকতে খোঁজখবর নিত। এখন দিন গোনা ছাড়া আর তো কিছুই নেই। আজ মমতার ছোঁয়া নাড়িয়ে দিল। শেষ বয়সে এটুকুই বা কম কী!

স্নেহাশিস কার্ডটা এগিয়ে বলল "প্রয়োজন হলে ফোন করবেন। কালকে আমার লোক ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে"

বেরিয়ে যাচ্ছিল। পেছনে শুনতে পেল বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর "দুগগা দুগগা। ইশ্বর তোমার মঙ্গল করুন"

কাঁথিতে যখন এসেছে অতীনের খোঁজ নেওয়াটাই সমীচীন। ডায়রিতে অতীনের ঠিকানা, ফোন নম্বর, যা বৃদ্ধা আগে দিয়েছিলেন। ফ্ল্যাট বাড়িটায় তালা ঝুলছে। ফোন নম্বরটা ডায়াল করতে ভেসে এল বিএসএনএল-এর রেকর্ডেড ম্যাসেজ 'দ্য নম্বর ডাজন্ট একজিস্ট'। জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেল, অতীন চাকরি নিয়ে মুম্বাই চলে গেছে বছর দুয়েক আগে। সেই থেকে ফ্ল্যাটে তালা। এর মধ্যে এসেছে কি না কেউ বলতে পারল না। আন্দাজ করতে অসুবিধা হচ্ছে না মেহুলির সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল। নইলে, ওর ছবি মেহুলির ঘরে কী করে? ছবিটা ছেঁড়া কেন? তবে কী, মেহুলির মৃত্যুর দিন অতীন এসেছিল? টিকিটে সোহমের নম্বরটা নিশ্চয়ই কেউ দিয়েছিল। কে সে?

মোবাইলটা পকেটে রাখতে গিয়ে থমকাল। মানিব্যাগ থেকে মধুসূদনের চিরকূটটা বার করে নম্বর মেলাল। একই নম্বর, যা সোহমের পকেট থেকে এএসআই পেয়েছিল। অতীনেরই।

তাহলে কী অতীন শুধু মেহুলি নয়, সোহমের মৃত্যুর সঙ্গেও জড়িয়ে? সোহম কাগজে নম্বরটা লিখেছিল, মানে কেউ ওকে এই নম্বরে যোগাযোগ করতে বলেছিল। যেমন টিকিটে লেখা সোহমের নম্বর ৯৪৩২২ ৫১২৬০। নম্বরের শূন্যগুলো আঁকাবাঁকা। চলন্ত বাসে লিখলে যেমন হয়। তাহলে কী তৃতীয় কেউ অতীনের সঙ্গে সোহমের যোগাযোগ করিয়েছিল। কে বা কারা? তারাই কী এই চক্রের মণি? প্রত্যেকটা মৃত্যুর সঙ্গে অতীনের অস্তিত্ব জড়িয়ে, মানে সংযোগ আছে। সেটা কী? সেখানে অতীনের ভুমিকা কী? ধোঁয়াশা কেটেও কাটছে না। অতীন বাষ্পীভূত। দীঘাতে টুঁ মারলে হয়। যদি অঞ্জলি রিসর্ট থেকে নতুন কোনও তথ্য পাওয়া যায়।

ম্যানেজার ডিউটি রস্টার ঘেঁটে বলল "সেদিন পুলকিতা ছিল। আজও আছে। আসুন"

রিসেপশনের ছিপছিপে শ্যামলা মেয়েটি পুলকিতা। স্নেহাশিস জিজ্ঞেস করল "সেদিন চতুর্বেদী আর মেহুলির সঙ্গে কেউ দেখা করতে এসেছিল?"

"মনে পড়ছে না। কদ্দিন আগে" ওপাশের সোফায় বসা ছেলেটিকে বলল "এই পদা, বিশুকে ডেকে আন তো।... বিশুই ভালো বলতে পারবে। ওই তো সব ভিআইপিদের দেখাশোনা করে"

বিশু ভাবার চেষ্টা করল। কতদিন আগের কথা। মেমসাহেব নজর কেড়েছিল বলে এখনও ভোলেনি। যাবার আগে চতুর্বেদী সাহেব এক হাজার টাকা বকশিসও দিয়েছিল। সারা জীবনে যা পায়নি। তাই ওদের মনে আছে। কত ভিআইপি-ই আসে। সবার কথা কী মনে থাকে?

"হ্যাঁ, মনে পড়ছে। একজন প্রৌঢ় এসেছিল"

অতীনের ছবি দেখিয়ে বলল "এ কী?"

"হ্যাঁ, এই তো"

মানে মেহুলির মৃত্যুর সময় অতীনও চত্বরে ছিল। চতুর্বেদীর সঙ্গে অতীনের যোগাযোগ, এখানে কেন? তাহলে কী, চতুর্বেদী মেহুলিকে মুম্বাই থেকে এনেছিল, অতীনকে দিয়ে খুন করাতে? চতুর্বেদীর মতো ডাকসাইটে, দ্য হেভেনে না উঠে এই থ্রি-স্টার রিসর্টে কেন?

"ওরা কী একসঙ্গে বেরিয়ে গেছিল?"

ফোটোয় ইঙ্গিত করে বলল “না। উনি আগের দিন দেখা করে চলে যান। সাহেব আর মেমসাহেব একসঙ্গেই টাটা ইন্ডিকা করে বেরিয়ে গেলেন। কাগজে মোড়া কিছু একটা সঙ্গে এনেছিলেন। বোধহয় মদের বোতল”

চিত্রটা আরও পরিষ্কার। এই কী সেই বোতল যা মেহুলি সে রাতে পান করছিল? বোতলটা পাওয়া যায়নি। গ্লাসে টলবিউটামাইড, গ্লেনেসারাইড আর অ্যালজোলামের ট্রেস পাওয়া গেলেও বোতলটা পাওয়া যায়নি। হিসেবটা মিলতে শুরু করেছে। নিশ্চয়ই ওষুধ মেশানো ওয়াইনের বোতলটা অতীন মেহুলির জন্য উপহার এনেছিল। অসিতের কথামতো ধুতি-ফতুয়া পরা মাঝবয়সি লোক এসেছিল। সে নিশ্চয়ই অতীন। কিন্তু মেহুলি কাকার সঙ্গে দেখা করেনি, অসিতের বয়ানে স্পষ্ট। পরে হয়ত এসেছিল মেহুলির মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার জন্য। বোতলটাও সরিয়ে ফেলা দরকার ছিল। বুঝতে পারেনি, ওয়াইনের গ্লাসে কেমিক্যালের ট্রেস থেকে যেতে পারে। ইংরেজিতে একটা কথা আছে ‘ক্রাইম অলওয়েজ লিভস ইটস ট্রেসেস বিহাইন্ড’

এখনও যেটা ধোঁয়াশা, চতুর্বেদী কোথায় হাওয়া হল এই রিসর্ট থেকে টাটা ইন্ডিকায়? কেনই বা? তবে কী এটা চতুর্বেদীর পূর্বপরিকল্পিত? অতীনকে দিয়ে খুন, যা মেহুলি জানত না। সে-ই বা একা কেন দ্য হেভেনে থেকে গেল চতুর্বেদীর যাওয়ার পর? অনেক প্রশ্নের উত্তর মিলছে না। এখন অতীন ছাড়া গতি নেই।

চতুর্বেদীকে প্রশ্ন করলে একটা বানানো গল্প বলবে। বৃথাই চেষ্টা। এই চতুর্বেদী-অতীন-মেহুলির কাহিনিতে ডাঃ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় কোথায়? একমাত্র ড্রাগের কম্বিনেশন ছাড়া। অথবা ইনসুলিন দিয়ে মারা যায় জানানো ছাড়া। তাহলে কী ডাক্তারও এই চক্রে? এখন তো মনে হচ্ছে চতুর্বেদী-অতীন-মেহুলির সঙ্গে ডাক্তারও জড়িয়ে। থাকতেই পারে। প্লাস্টিক সার্জেনের সঙ্গে মুম্বাইয়ের শো-বিজ ডন চতুর্বেদীর যোগসাজস আশ্চর্য নয়। অতীন ছাড়া আর যে সঠিক জবাব দিতে পারে, সে এখন পরলোকে, কাঁথির কেল্টুস, মুম্বাইয়ের নামি মডেল মেহুলি।

লোকেশের অ্যাক্সিডেন্টের পর হরিদ্বার পুলিসে অতীন এফআইআর করেছিল। জলের স্রোতে ভেসে গেছে। তখন বডিটা পাওয়া যায়নি। পরের দিন পাওয়া গেছিল লকগেটে। দেহারাদুনে ফিরেছিল লোকেশের দেহ নিয়ে। বাকি কটা দিন কেটে গেছে লোকেশের বাবা-মা আর নীতাকে সান্ত্বনা দিতে।

বিনোদ রাঠোডকে খবর দিয়েছিল হরিদ্বার থানার ওসি।

“বডি পোস্ট-মর্টেম মে ভেজা?”

“হাঁ সাব। ইধর ইনভেস্টিগেশন কে লিয়ে। ইটজ এ প্লেন কেস অফ অ্যাকসিডেন্ট। সিন অফ ক্রাইম মে গয়া থা এফআইআরকে বাদ। এভিডেন্স কুছ নেহি মিলা। সিরিফ কই সিগারেট বাটস। উসে ভি ফরেনসিক এক্সামিনেশন মে ভেজা। ফাইল ক্লোজ করনেকে পহলে দেহরাদুন মে ছানবিন কর লে তো বড়ি মেহেরবানি হোগি”

মানে অতীনকে জেরা।

অতীন খুব স্বাভাবিকভাবে বলল “উইকেন্ড থা। লোকেশ ভি কই দিন সে বোল রহা থা কহি ঘুম আয়। ম্যায় ভি সোচা ঘুম আউ। ঐসে তো নীতাকে সাথ উসকে সাদি হোনেওয়ালা থা। পরন্তু উসকে সাথ সাদিকে পহলে দেহরাদুনকে বাহার আকেলে নেহি যা সকতা। ইসলিয়ে”

“কেয়া হুয়া থা?”

হরিদ্বার যাওয়া থেকে হর-কি-পৌরিতে বসা, ব্রিজ ক্রস করে উলটো দিকের কালভার্ট দিয়ে হাঁটার কথা হুবহু বলে গেল অতীন।

“দোনো পেড়কে নিচে বৈঠে থে। বড়িয়া হাওয়া দে রহা থা। লোকেশ বোলা পানি মে পায়ের ভিগা লে। দোনো পানি মে উতরে। ও মেরে আগে চলা গয়া। নদীকে কারেন্ট উসে ভসা লিয়া। উস তরফ জাদা আদমি নেহি থে। ফির ভি কই আদমিকো বুলায়া। বডি ইস সময় পর পানি মে বহত দূর চল গয়া”

“দুসরা দিন বডি লকগেট সে মিলা”

“ফির পুলিস চৌকি মে এফআইআর কিয়া”

কথায় কোথাও অসমাঞ্জস্য নেই। বিনোদ রাঠোড, হরিদ্বারের ওসির এফআইআর-এর রিপোর্টের কপি পড়েছে। ন্যাচারাল অ্যাকসিডেন্ট। জলে নেমে স্রোতের টানে ভেসে যেতেই পারে।

“গয়া থা দোনো ঘুমনে, লৌট আয়া আকেলে। নেহি যাতা, তো ইয়ে কঠিনাই কা মোকাবিলা নেহি করনা পড়তা” অতীন দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

“ম্যায় আপ ঔর উনকে পরিবারকে দুখ কো সমঝতা হুঁ। আপনে তরফ সে আপ সবকো মেরা সিম্প্যাথি”

অতীন বেরিয়ে গেল। বিনোদ কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। পরের দিন দুপুরে পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট দেখে সমবেদনাটা ধোঁয়াশার রূপ নিল। লোকটা এফআইআরে আর বয়ানে যা বলেছে সবটা কী সত্যি?

তেতাল্লিশ

মালাটা গাঁথা হয়েও যেন সম্পূর্ণ হচ্ছে না।

বিয়ের সময় রজনীগন্ধার মালা কোলে মার্কেট থেকে কেনা হয়েছিল। গাঁথা হয়নি। শুধু বদল করেছে। সাজানো রজনীগন্ধার ফুলের বিছানায় গিন্নিকে নিয়ে সোহাগ রাত। একটু ভালোবাসা। একটু আবেগ। উষ্ণতার ছোঁয়ায় যৌবনের রেশ। মন জুড়িয়েছিল তরুণীর লম্বা খোলা কেশ। একটু মাদকতা, প্রাপ্তির আনন্দ। তরুণীর নীরবতা জাগিয়েছিল নতুন ছন্দ। কোথায় সেই লাজুক হাসি প্রথম প্রেমের পাওয়া। কোথায় সেই তরুণীর চোখে চোখ রেখে নতুন সুরে গাওয়া। সেই কবে টেপি এসেছিল ঘর আলো করে। সেও আজ পরের ঘরে। তারপর কত বছর পার হয়ে গেছে। সেই অনুভূতি আর কখনও আসেনি।

এই দ্বিতীয়বার আবার মধুসূদন ফেলে আসা ছন্দের তরঙ্গে ভাসছে। কেরানির লাল সুতোর ফাঁসে আবার অস্তিত্ব খুঁজে পাচ্ছে। নিজের কাছে। এবার আর ওদের রিপোর্ট নয়। নিজের অঙ্কের উত্তর নিজেই খুঁজতে হবে। বেরিয়ে আসতে হবে ফাইলের বাইরে।

এয়ারপোর্টে সব এয়ারলাইনসের বোর্ডিং লিস্ট চেক করতে লাগল। যদি নামটা পাওয়া যায়। মনোরথ বিফল করলেন না ইশ্বর। চতুর্বেদী ১১ নভেম্বর স্পাইসজেটের বিকেলের কলকাতা-মুম্বাই ফ্লাইটে বোর্ড করেছিল। যেদিন সে আর মেহুলি অঞ্জলি রিসর্ট থেকে টাটা ইন্ডিকা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। সেদিনই মেহুলি চেক-ইন করেছিল দ্য হেভেনে। মানে মেহুলি চতুর্বেদীর সঙ্গে ফেরেনি। কেন? কী আছিলায় থেকে গেছিল চতুর্বেদী চলে যাওয়ার পর? এমন কিছু স্বপ্ন দুদিনের মধুরাতে চতুর্বেদীকে বিক্রি করতে সক্ষম হয়েছিল। কী সেই স্বপ্ন? উত্তর দিতে পারে দুজন - মেহুলি, যাকে স্বর্গ থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে জানার জন্যে। নয়ত চতুর্বেদী যে পৃথিবী উলটে গেলেও সত্যি বলবে না। তাহলে?

কী মোহে মুম্বাইয়ের উজ্জ্বল মডেল মেদিনীপুরের রিসর্টে পড়ে থাকবে? ডাঃ অনঙ্গ দত্তই ঠিক। মুম্বাইয়ের কুচক্র থেকে পালাতে চাইছিল একাকী শান্তির আশায়, দ্য হেভেনের সবুজে। তাই মেদিনীপুর। মেদিনীপুরেই এর জবাব মিলবে।

ওই চত্বরে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গেলে স্নেহাশিসকে না জানিয়ে করা ঠিক নয়। স্নেহাশিসকে ফোন "বলুন মুখুজ্জেবাবু, কী করতে পারি?"

"কেস ফাইল ঘেঁটে মনে হচ্ছে খুনগুলো বিভিন্ন প্রান্তে হলেও সূত্র মেদিনীপুরে। আমার জুরিসডিক্সনের বাইরে হলেও সাহায্য করতে পারি"

স্নেহাশিস জানত মধুসূদন করিতকর্মা পুলিস নয় বলেই ওকে ফাইলিং সেকশনে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। গেলবার যখন লালবাজারে দেখে, মনে হয়েছিল, অনুসন্ধিৎসু।

"কীভাবে?"

"যদি আপনার ওখানে চলে যাই, দুজনে মিলে এনকয়ারি করলে সুবিধে"

"বেশ তো। চলে আসুন। এই মফসসলে তো কেউ আসে না"

"কাল সকালে"

দ্য হেভেনে গিয়ে কথাবার্তা বলতে হবে। মিসিং পয়েন্ট আবার খুঁটিয়ে দেখতে হবে। নাম, টাকা সত্ত্বেও এমন কিছু, যা বিলাসবহুল তারকাখচিত মুম্বাই দিতে পারে না। দিতে পারে, বনছায়া ঢাকা একটা নির্জন

প্রান্তর। একান্ত নিরালায়। মেহুলি নিশ্চয়ই দ্য হেভেনে ছুটে গিয়েছিল, নিজেকে দেখতে, চিনতে, একাকী নিভৃতে। কেন চতুর্বেদীর সঙ্গে মধুরাত্রির পর?

ডাঃ অনঙ্গ দত্তই ঠিক। সাব্লিমেশনে নিজের রিঅ্যাকশন খুঁজতে অন্য পরিপ্রেক্ষিতে, আত্মিক উন্নতির জন্য। সেখানেই এই চক্রের অধিপতির সঙ্গে টক্কর। বোঝাপড়ার অঙ্কটাও নিজস্ব চেতনায় একাকী আবিষ্কার করতে চেয়েছিল।

সাত সকালের বাসে রওনা হল মেদিনীপুরের পথে। একমাস পরেই পুজো। কলকাতায় তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে। কে বলে কলকাতা মৃত নগরী? এখানে লোকেদের মধ্যে এর হৃদস্পন্দন হাড়েমাসে জড়িয়ে। সবাই আহুত, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে। খারাপ ভালো উভয়েরই সমন্বয়। প্যান্ডেল তৈরি, ব্যানার, হই হট্টগোল ছেড়ে বাস মেদিনীপুরের পথে। নেহাত মধুর দুনিয়া খারাপদের নিয়ে। তাই খারাপের উৎস খোঁজাই এখন মূল।

"কোথায় শুরু করি?" স্নেহাশিস মধুকে জিজ্ঞেস করল।

"ওই কাজের ছেলেটা, অসিতের সঙ্গে রিসর্টের বাইরে খোলাখুলি কথা বলতে চাই। ম্যানেজারের ছত্রছায়ার বাইরে"

"বেশ তো। আমারও কিছু জিজ্ঞাস্য আছে" স্নেহাশিসের গাড়ি রিসর্টের পথে।

মধু বলল "ফ্লাইট রেকর্ডস চেক করতে গিয়ে দেখলাম, যেদিন মেহুলি রিসর্টে চেক-ইন করে, সেদিনই চতুর্বেদী মুম্বাইয়ে ফেরত যায়। রিসর্টে ছিল না"

"এক কাজ করলে হয়। যতক্ষণ আপনি অসিতের সঙ্গে বাইরে কথা বলছেন, আমি ম্যানেজার সত্যসুন্দর মাইতিকে আরেকবার ঝালিয়ে নিই"

কাজের বাইরে অসিতকে পাকড়াও করে বলল "তুই যা চাস, তাই খাওয়াব। বকশিসও"

এতদিন দ্য হেভেনে কাজ করেছে। কেউ বকশিস দেওয়া ছাড়া, খাওয়ায়নি। পুলিস খাওয়াচ্ছে। স্বপ্নেও ভাবা যায় না।

একটা ভালো হোটেলে বসে মধুসূদন বলল "কী খেতে ভালোবাসিস?"

"কষা মাংস। বেশ ঝাল ঝাল"

কষা মাংস, রুই মাছের ঝাল, ভাতের অর্ডার দিয়ে বলল "মেমসাহেব যেদিন মারা গেছিলেন মানে ১২ নভেম্বর রাতে, সেদিন কী উনি সারাদিন ঘরেই ছিলেন? না কি, গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিলেন?"

অসিত মনে করার চেষ্টা করল "উনি কোথাও বেরোননি। স্পষ্ট মনে আছে। টাটা ইন্ডিকার ড্রাইভার আমাকে বলল 'হম থোড়া বাহার ঘুম আতা। মেমসাহেব পুছে তো বোলনা নজদিক মে হ্যায়। আধে ঘন্টে মে চলা আউঙ্গা"

"কেউ ওনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল?"

"শুধু ধুতি-ফতুয়া পরা লোকটা। উনি দেখা করেননি। বলেছিলেন 'আমি এখন কারও সঙ্গে দেখা করব না' সারাক্ষণ ঘরেই ছিলেন। যখন প্রয়োজন হত বেল বাজিয়ে ডেকে নিতেন"

"ঘরে কী করছিলেন?"

"যতবার গেছি, দেখেছি উনি ঘরের বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসে মাঠের দিকে তাকিয়ে আছেন। মাঝে মাঝে সিগারেটও খেতে দেখেছি। দু-একবার আরও কয়েকটা ক্লাসিকের প্যাকেট এনে দিতেও বলেছিলেন"

"মেমসাহেবকে দেখে কী মনে হচ্ছিল?"

"কেমন যেন উদাসীন। কিছু ভাবছিলেন"

"কী পরেছিলেন?"

"বেশিরভাগ সময় নাইটি"

অসিত লক্ষ করেছিল ফিনফিনে নাইটির তলায় কিছু পরেননি। এক ঝলক না দেখে পারেনি। আধা বিবস্ত্র অবয়বটা এখনও চোখে ভাসছে। দেখেই মনে পড়ে গেছিল পুটির টেপস্কার্টে কলতলায় স্নান। সেকথা তো মধুসূদন মুখুজ্জেকে বলা যাবে না।

এই উত্তরটাই খুঁজতে এসেছিল মধুসূদন। এখন ছবিটা স্পষ্ট। মেহুলি দ্য হেভেনে কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে যায়নি। গেছিল, মুম্বাই তারকা জীবনের বাইরে নিশ্চিন্তে একা কাটাতে। যে কোনও তারকা কী চায়, নাম, টাকা, যশ, ঔজ্জ্বল্য যখন হাতের মুঠোয়? মধুসূদন ভাবার চেষ্টা করল। আর পাঁচজনের মতো শান্তির নীড়, সুখী সংসার। মেহুলিও এর বাইরে বেরিয়ে সেটাই খুঁজছিল - মুম্বাইয়ের ঝলমলে আলো থেকে দূরে। উদাসীন কেন? প্রেমে প্রত্যাখ্যান বা প্রেম নিয়ে সমস্যা? মধুসূদন ভাবল। সমস্যাটা দুদিক থেকে আসতে পারে। এক প্রেমিকের কাছ থেকে নয়ত বাইরের কারও থেকে, যে শান্তিকে বিঘ্নিত করতে চাইছে। সেটা কী চতুর্বেদী? না চতুর্বেদী মারফত ভওয়ানিশঙ্কর?

“কারও সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিল?”

অসিত রুই মাছের ঝোল দিয়ে ভাত মেখে মনে করার চেষ্টা করল। ঝোলটা দারুণ খেতে “হ্যাঁ, বেশ কয়েকবার ফোনে কথা বলতে দেখেছি”

“কী মনে হয়েছিল? কার সঙ্গে কথা বলছে?”

“ঠিক বলতে পারব না। মনে হল, ওনার ভালোবাসার কারও সঙ্গে। বোধহয় ওদের মধ্যে কেউ ঝামেলা পাকাবার চেষ্টা করছিল”

“কী করে বুঝলে?”

“ওনার কথায়। কথাগুলো ঠিক মনে নেই। তবে কেউ ঝামেলা পাকাচ্ছে বুঝতে পারছিলাম কথার স্বরে। সবটা বুঝিনি। ইংরেজিতে বলছিলেন। আমি তো ওখানে বেশিক্ষণ থাকিনি”

মাছের মাথাটা শেষ করে প্রিয় কষা মাংসে হাত দিয়েছে। মধুসূদন বুঝতে পারছে এর থেকে বেশি অসিতের কাছ থেকে কিছু জানতে পারবে না। সন্দেহের সদুত্তর পেয়ে গেছে। এই চক্রাকার খুনের মালায় ভালোবাসার অঙ্কও জড়িয়ে। তবে বিঘ্ন হয়ত মালার সুতোটা। যা বারবার মধুসূদন ছুঁতে চাইছে।

অসিত বেরিয়ে যাচ্ছিল। কী মনে হতে মধুসূদন ডাকল “রিসর্টে আর কেউ এসেছিল?”

“কত লোকই তো রোজ আসছে যাচ্ছে। মেমসাহেব থাকতে যারা ছিল পুলিসবাবু জেরা করেছে”

“মেমসাহেব আসার আগে বা মারা যাওয়ার পর?”

“অনেকেই। মনে থাকে?”

“বিশেষ কাউকে?” মধুসূদন অন্ধকারে ঢিল ছুড়ল।

অসিত ভাবার চেষ্টা করল “মেমসাহেব আসার আগে, ওই ঘরেই তো এক সাধুবাবা ছিল”

চমকে উঠল মধুসূদন। দ্য হেভেনে সাধুবাবা কেন? এটা তো ছুটি কাটানো, মৌজ ফুর্তির জায়গা “সাধুবাবা এখানে কেন?”

“কী করে বলব? মেমসাহেব আসার দিনই সকালে চলে যান। লম্বা, সুন্দর দেখতে। এমন সাধুকে আগে এত কাছ থেকে দেখিনি”

“সঙ্গে আর কেউ?”

“অনেকেই। অনেক চেলাচামুণ্ডাও দেখা করতে এসেছিল”

“ক’দিন ছিলেন?”

“দু-রাত। যদিও আমাকে খুব ডাকেননি। ওনার খুচরো ফরমাসের প্রয়োজন হয়নি। ভক্তরাই দেখভাল করতেন”

“ধুতি-ফতুয়ার লোকটা দেখা করতে এসছিল?”

“না” তারপর কী মনে হতে বলল “একবার। তবে একা নয়, সঙ্গে আরেকজন ছিল”

“কে? চেন তাকে?”

“তা তো বলতে পারব না। আগে দেখিনি। পরেও নয়”

অসিত বেরিয়ে যেতে মনে হল, ভওয়ানিশঙ্কর নয়ত? মৃত্যুর সময় যারা উপস্থিত ছিল, স্নেহাশিস তাদেরই জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। আগে কিংবা পরের লোকেদের করার কথা মাথায় আসেনি। যদি ভওয়ানিশঙ্কর এসেই থাকে, সুদূর মুম্বাই থেকে এখানে কেন? মেহুলির মৃত্যুর ছক কাটতে? না কি চক্রের পাণ্ডা হিসেবে সব তদারকি করতে?

ওরা ওই লোকটিকে খুঁজছে। যাকে কখনও দেখা গেছে ধুতি ফতুয়া পরা মাঝবয়সি রূপে। কখনও বা স্যানট্রো নিয়ে বেরিয়ে যেতে। কখনও ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন নিয়ে ব্যাঙ্গালুরু ছুটতে। কখনও গোবিন্দ নামক বেল বয়কে দিয়ে দক্ষিণী নায়িকার হাতে এমপিথ্রি প্লেয়ার পৌঁছতে। সে নিমিত্ত মাত্র। এই চক্রের বিশ্বস্ত কর্মী। আসল নায়ক অন্য কেউ, দাবার মাথা, এই চক্রের আসল পরিচালক। তার আবছা কায়া আন্দাজ করতে পারছে।

হোটেল থেকে হেঁটে রিসর্টে ফিরতে গিয়ে মনে পড়ে গেল ডাঃ অনঙ্গ দত্তর কথাগুলো “অবসেসিভ কম্পালসিভ পারসোন্যালিটি। টাইপ আর, মানে রেসিলিয়েন্ট। সাব্লিমেশন, র‍্যাসেনালাইজেশন, রিঅ্যাকশন ফর্মেশন”। চক্রের সুরটা এই তারেই বাঁধা। এই ছন্দেই গাঁথা। এর পেছনে কাজ করছে তুখোড় বুদ্ধি। এই খুনগুলো কিছু পাওয়ার আশায় নয়। চাওয়া-পাওয়ার বাইরে, এক মানসিক বিশেষ অবস্থার ইঙ্গিত। নিজস্ব চিন্তা দিয়ে গড়া মন ইশ্বরের কাছে নৈবেদ্য নিবেদন করছে নিজের মতো করে। জাগতিক প্রাপ্তির বাইরে সেই মনটা খ্যাপার মতোই কোন এক পরশপাথর খুঁজছে। তাকেই শানিয়ে সর্বেশ্বরকে নিবেদন করছে আপন পূজার অর্ঘ। সেই অর্ঘের বিস্তারে যেখানেই বাধা, সেখানেই অন্তিম। মৃত্যুকে সে গ্র্যামারের বাইরে বিচ্যুত সত্ত্বা হিসেবেই বিচার করছে। এটাই র‍্যাসেনালাইজেশন অফ থট। কে সেই ভিনমার্গীয় চিন্তাধারায় পরিচালিত? যে একই সঙ্গে আপন মহিমায় ভালোবাসার পূজারি, রসিক।

আত্মিক চেতনা, ভালোবাসা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি মিশিয়ে যে অবয়ব তার চোখের সামনে, সে চতুর্বেদী নয়। চতুর্বেদী তো জাগতিক বলয়ে বদ্ধ। তার ক্ষমতা নেই ওই মানসিক স্তরে পৌছনোর। ভওয়ানিশঙ্কর ছাড়া আর কে হতে পারে? এর আধ্যত্মিক চিন্তাধারা, সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি দুটোই আছে। দৈহিক ভালোবাসায় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কিন্তু এই চক্রের খুনের পেছনে উদ্দেশ্য কী? কোনও কমপালশন? ঐহিক চাওয়া-পাওয়ার বাইরে অন্য কোনও তাড়না।

সত্যসুন্দরকে স্নেহাশিস জিজ্ঞেস করল “ছবিটা দেখে বলুন তো, মেহুলির মৃত্যুর সময় একে এখানে দেখেছেন?” চতুর্বেদীর ছবি দেখাল, যেটা দুদিন আগে রোশন ফ্যাক্স করেছে।

“আমাদের রিসর্টে থাকেনি। স্টাফরা কেউ দেখেছে কি না জিজ্ঞেস করি” ছবি নিয়ে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর ফিরে এল এক ছোকড়ার সঙ্গে “এ, ঘর পরিষ্কার, লাগেজ বওয়া, ফাই ফরমাস খাটে। দেখেছিস?”

“হ্যাঁ সাহেব” লাজুকভাবে বলল।

“ভয় পাস না। কবে দেখেছিস?” স্নেহাশিস অভয় দিল।

“ঠিক মনে করতে পারছি না। মেমসাহেব আসার আগে”

“কার সঙ্গে দেখা করতে?”

“সাধুবাবার সঙ্গে। যিনি মেমসাহেব আসার আগে ও ঘরে ছিলেন”

মাইতির দিকে ফিরে বলল “রস্টারটা দেখুন তো”

ভুলেই গেছিল। প্রথম দিন রস্টার চেক করার সময় ম্যাথেরনের এক বাবার নামটা চোখে পড়লেও, মেহুলি আসার আগে এসেছিল বলে গুরুত্ব দেয়নি। সন্তর্পণে রস্টার দেখল। বাবা ভওয়ানিশঙ্কর, সুট ছাড়া আরও তিনটে ঘর ৯ মার্চে ওনার নামে বুক করা হয়েছিল। ১১ মার্চ মেহুলি আসার দিন ভোরে চেক-আউট করে।

চতুর্বেদী অঞ্জলি রিসর্টে থাকাকালীন বাবার সঙ্গে দেখা করে। ওখানকার স্টাফ বলেছিল, চতুর্বেদী এর মধ্যে একদিন একাই ইন্ডিকা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যায়। মেহুলি যায়নি।

স্নেহাশিস জিজ্ঞেস করল "অন্য তিনটে ঘরে বাবার সঙ্গে কারা ছিল?"

"বলতে পারব না। বাবা বলেছিলেন ওনার ভক্ত"

রেকর্ড দেখে মাইতি বলল "রচয়িতা বলে এক মহিলা, কলকাতা থেকে। এই তার নম্বর"

স্নেহাশিস নম্বরটা লিখে ছেলেটিকে বলল "এ বাবার সঙ্গে কতক্ষণ ছিল?"

"সারাদিন। চা খেয়ে চলে যায়। আমিই চা দিই"

"অন্য কোনও ঘরে গেছিল?"

"না। আরও এক-দুজন ছিল বাবার সঙ্গে ওই ঘরে যেদিন এই বাবু আসেন দেখা করতে। বোধহয় মিটিং করছিলেন"

স্নেহাশিস মাইতিকে জিজ্ঞেস করল "অন্য ঘরে কারা ছিল?"

"তাদের নাম জানি না। সব ঘর-ই তো বাবার নামে বুকড ছিল। নিশ্চয়ই ভক্ত হবে"

মধুসূদন ততক্ষণে পৌঁছে গেছে। স্নেহাশিস অসিতকে ডেকে পাঠাল। অতীনের ছবি দেখিয়ে বলল "চেন একে?"

"এই তো ধুতি-কুর্তা পরা লোকটি"

স্নেহাশিস হাসল। অতীন এখানেও। যা আশা করেছিল।

মধুসূদন নিজের ঘরে রিপোর্টগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। এমন সময় ফোন "ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিস"

এই দ্বিতীয়বার ডিজি তাকে ফোন করল।

"ইয়েস স্যার"

"এখুনি আমার ঘরে আসতে পারবেন?"

রিপোর্টগুলো লকারে ঢুকিয়ে উঠে পড়ল।

চুয়াল্লিশ

পোস্ট-মর্টেম ও ফরেনসিক রিপোর্ট দুটো বেশ কয়েকবার পড়ল বিনোদ রাঠোড। পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট সোজাসাপটা। ‘ড্রাউনিং ডেথ ডিউ টু অ্যাসফেক্সিয়া। ওয়াটার এন্টারিং লাংস’। বৈশিষ্ট্যহীন। ফরেনসিকটা পড়ে নড়েচড়ে বসল। সিগারেটের টুকরোগুলোর মধ্যে মাত্র একটাতে মারিজুয়ানা। ও অঞ্চলটা গঞ্জিকাসক্তদের পীঠস্থান। এতগুলো টুকরোর মধ্যে শুধু একটাতেই কেন মারিজুয়ানা পাওয়া গেল!

অতীন সম্বন্ধে আরও খোঁজখবর নেওয়া দরকার। দেহরাদুন থেকে জেনেছে অতীন মুম্বাইতে চাকরি করত। কিছুদন হল নতুন চাকরি নিয়ে দেহারাদুনে। এত জায়গা থাকতে মুম্বাই ছেড়ে দেহরাদুনে কেন? মাইনে বেশি? অরিজিন্যালি পশ্চিমবঙ্গের লোক। ওর সম্বন্ধে বেঙ্গল থেকে আরও তথ্য প্রয়োজন। আইজিডিডি বেঙ্গলকে ফোন। তথ্য চাই অতীন রায় সম্বন্ধে। আইজি মুম্বাইকে ওর চাকরির ইতিহাস জানতে ফোন করল।

মধুসূদন ফাইলগুলো সাজিয়ে চা খাচ্ছিল। হঠাৎ আইজিডিডির কাছ থেকে ফোন পেয়ে সন্দিহান। অতীন রায় সম্বন্ধে তথ্য জানাতে হবে। তাহলে কী এই ছবির ব্যক্তি? দেহরাদুন পুলিসও একটা মৃত্যু নিয়ে অতীনকেই ক্লোজ-ইন করেছে। পল্টুর দোকানে জোর গলায় বলেছিল নেক্সট মার্ডার নর্থ ইন্ডিয়ায়। তাহলে কী এই মৃত্যুও অ্যাকসিডেন্ট নয়, মার্ডার? কেউ বিশ্বাস না করলেও মধুসূদনের মন বলছিল, হতেই হবে। না হলে অঙ্ক মেলে না।

এর মধ্যে স্নেহাশিসের রিপোর্ট এসে গেছে। মেহুলির ঘরে আধছেঁড়া ছবি আর সুনেত্রার কম্পিউটারের ছবি এই অতীন রায়ের। মেহুলির পিসিমা কনফার্ম করেছে। এটাও স্নেহাশিস লিখেছে দীঘার অঞ্জলি রিসর্টে ৯ নভেম্বর মেহুলি চতুর্বেদীর সঙ্গে চেক-ইন করেছিল। ওখানেই অতীন ওদের সঙ্গে দেখা করতে আসে। যাওয়ার আগে হয়ত ওয়াইনের বোতল উপহার দিয়েছিল মেহুলিকে। রোশনও পরবর্তী রিপোর্টে জানিয়েছে, যে লোকটা ওদিন লোখান্ডওয়ালার ফ্ল্যাটে এসেছিল সে অতীন। অতীন সর্বত্রই। অতীন এই চক্রের অংশীদার। মধুসূদনের মতে কর্মী মাত্র। কিন্তু কতগুলো ক্লু এখনও ধোঁয়াশায়।

অতীনের ছবি, রিপোর্টগুলো স্ক্যান করে ই-মেলে পাঠিয়ে দিল দেহরাদুনে। বিনোদ রাঠোড ওগুলো পেয়ে মুচকি হাসল। নয় পুলিসে চাকরি করে। এক সময় ভালো ছাত্র ছিল, একবারেই আইপিএস পাশ করেছিল। সরকারি কাজের একঘেঁয়েমিতে কেবলই মনে হত বুদ্ধিটা ভোঁতা হয়ে গেছে। এখন বুঝছে, বুদ্ধি জন্মগত। অব্যাবহারে মরচে পড়তে পারে, লোপ পায় না। না হলে, সিগারেটের বাটে মারিজুয়ানার ট্রেস পেয়ে কী করে ব্রেন ওয়েভ খেলে গেল? মুম্বাই থেকেও তথ্য ইঙ্গিত করছে ওখানকার খুনের সময় অতীন ছিল। ডিরেক্ট এভিডেন্স ছাড়া অতীনকে গ্রেপ্তার করবে কী করে? ছক কষে নিল। আপাতত তিনদিনের জন্য অতীনকে অ্যারেস্ট করে পুলিসি ঢঙে কথা বার করতে হবে। এতক্ষণ ছিল বুদ্ধির খেলা। এবার শুরু পুলিসি খেল।

যেহেতু ডিটেলসটা কলকাতা থেকে বেশি, তাই কলকাতার ডিজিকে ফোন “ক্যান ইউ সেন্ড সামওয়ান ফ্রম ইওর প্লেস টু হেল্প মি উইথ দ্য ইনভেস্টিগেশন?”

“সিওর। হাউ কুইকলি?”

“বাই টুমরো। ডিরেক্ট ফ্লাইট টু ডেলহি অ্যান্ড দেন বাই পুলিস কার। আই উইল ইনফর্ম দ্য ডেলহি পুলিস”

“অ্যাজ ইউ উইশ”

ফোনটা কেটে ডিজি ভাবল, যদি তদন্তে সাহায্য করতে হয়, যে এ সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি ওয়াকিবহাল, তাকে পাঠানোই ভালো। সেজন্যই তো সেদিন মধুসূদনকে ডেকে পাঠিয়েছিল। চেন্নাইয়ের হোম সেক্রেটারিয়েট থেকেও বারবার চাপ আসছে। অতএব মধুসূদন মুখুজ্জে।

রাত আটটা। অতীন কাজের পর দেহরাদুনের ফ্ল্যাটে সিঙ্গল মল্ট খাচ্ছিল। বয়স পঁয়তাল্লিশ হলেও সারাজীবন ভেরেন্ডাবাজি করেই কেটেছে। নেহাত পৈতৃক সম্পত্তির একাংশ নিয়ে কাঁথির নিউ বাস স্ট্যান্ডের ফ্ল্যাটটা কিনেছিল। না হলে তো রাস্তায় দাঁড়াতে হত। অর্কমণ্য ছেলে। বিয়ে-থা স্বপ্নেরও অতীত। দিদিকে কতবার বলেছে, কাঁথির বাড়িটা তার নামে লিখে দিতে। টাকাও চেয়েছিল। দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে বুড়িটা। কেন যে মরণ হয় না। ভাসা জীবন আরও ভেসে যেত, যদি না দাদার মেয়ে কেল্টুস সাথ দিত। মুম্বাইতে পাড়ি দিয়েছিল মডেল হবে বলে। কেল্টুস মডেল দুনিয়ায় মেহুলি নামে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

বিপিনদা যখন শেষবারের মতো কাঁথি এসেছিল, দেখা করতে গেছিল।

“কী করছিস?”

“কিছু না”

“তোকে দিয়ে কিসসু হবে না। মায়ের পেটের ভাই, ফেলি কী করে? মুম্বাইতে কাজ করবি?”

“তুমি কাজ দেবে?”

“কেল্টুস একজন বিশ্বস্ত সেক্রেটারি খুঁজছে। তুই ওর কাকা। তোর থেকে বিশ্বস্ত পাবে কোথায়?”

“কবে যেতে হবে?”

“কেল্টুসকে জিজ্ঞেস করে জানাব। একটা কথা মাথায় রাখিস। কেল্টুসের জীবনযাত্রা নিয়ে কাউকে কিছু বলতে পারবি না”

“বলতে যাবই বা কেন?”

“ওদের জীবন তো ঠিক আমাদের মতো নয়। মুম্বাইয়ের তারকা হতে গেলে অনেক কিছু করতে হয়। সেটাকে তেমন গুরুত্ব দিস না। কোথায় কর্নফিল্ড রোডের দু-কামরার ভাড়া বাড়ি। কেল্টুসের সাকসেসে কীভাবে আছি। ভাবাই যায় না”

গ্লাসে চুমুক দিয়ে মনে হল, সেই বা কী কম সাকসেসফুল? টাকা থাকলেই সাকসেস। ফ্ল্যাটের বেল বাজতে দরজা খুলে চমকে উঠল। পুলিস!

“সাহাব আপকো ইয়াদ কিয়া”

“কৌন সাহাব?”

“বিনোদ রাঠোড”

“কাল জানে সে নেহি হোগা? দারু পি রহা থা”

“নেহি। অভি, ইস ওয়াক্ত”

পুলিসের জিপে সোজা রাঠোডের দপ্তরে।

উলটো দিকের চেয়ারে বসা রাঠোডের প্রশ্ন “আপ হমসে এক বাত ছুপায়া। আপলোগ উধর বৈঠ কর মারিজুয়ানা পি রহে থে”

জিভ কাটল অতীন। বিরাট অন্যায় হয়ে গেছে। বলল “ভুল গয়া থা। ঐসে ভি ইয়ে সব বাত বোলনে কা হ্যায় কেয়া?”

“ফির ভি। বাত সহি হ্যায় ইয়া নেহি?”

মাথা নাড়ল “হাঁ”

“ঠিক হ্যায়, যাইয়ে। দারু পি রহে থে। পিজিয়ে”

পুলিসের গাড়িতে ফ্ল্যাটে ফেরত এসে ভাবছিল, শুধু এটুকু কথা জিজ্ঞেস করার জন্যই কী বিনোদ রাঠোড থানায় ডেকেছিল? ফোনেই করতে পারত। তবে? আধা শেষ করা গ্লাসে চুমুক দিয়ে মনে হল, বিনোদ রাঠোডের তার ওপর সন্দেহ হয়েছে। আর নয়। এবার এখান থেকে পালাতে হবে। এবার বড় শহরগুলোয় নয়। ফিরতে হবে ভিটেমাটিতে। নিজের ছোট্ট নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে। যেখানে একলা নিরালায় ভাবতে পারবে পুলিস-চক্ষুর আড়ালে।

রাত আটটা। ডুন এক্সপ্রেসে উঠে বসল। পরনে সেই আগের বেশ। ধুতি-ফতুয়া। চলনে-বলনে পালিশ করা হঠাৎ বড়লোকি আভরণ মুছে সেকেন্ড ক্লাসের থ্রি-টায়ারে। লোকে গিজগিজ। এসি নেই। এই ক'টা বছরে অভ্যাস কত পালটে গেছে। চল্লিশের ওপর বসন্ত কাটিয়েছে অনাড়ম্বর। এখন মনে হচ্ছে সেকেন্ড ক্লাসের পাখার গরম অসহ্য। কেল্টুসের দেখানো আড়ম্বর হাড়ে-মাসে জড়িয়ে। কষ্ট হলেও কিছু করার নেই। এখন এটাই একমাত্র বাঁচার পথ।

ভিড়ের মধ্যে একটা জায়গা দখল করল। উইদাউট রিজার্ভেশন এই কষ্ট পোয়াতেই হবে। দেখা যাক, পরে টিটিকে খাইয়ে একটা বার্থ যদি ম্যানেজ করা যায়। ছত্রিশ ঘণ্টা, মানে দু-রাতের জার্নি। প্লেনে ঘোরফেরা করা অতীনের আনরিজার্ভড সেকেন্ড ক্লাসে ধাতস্থ হতে সময় লাগছে।

এখন তো বাঁচার সমস্যা। পুলিস যখন সন্দেহ করছে, জল কোথায় দাঁড়ায়, কে জানে? জানলার বাইরে অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়েছিল। ন'টা বেজে গেছে। ট্রেনের ছোটা দেখে মনে হয় সেও অন্ধকার থেকে আলোর দিশা খুঁজছে।

"মুড়ি খাবেন?" পাশে বসা লোকটির দিকে তাকাল। লক্ষ করেনি। পরনে আধ-ময়লা ধুতি, সস্তা সুতির পাঞ্জাবি। সামনে-পেছনে টাক। বয়েসে তার থেকে একটু বড় হবে। সাদা কাপড়ের বোঁচকা থেকে ঠোঙা বার করে আবার বলল "মুড়ি খাবেন?"

তাড়াহুড়োয় স্টেশন থেকে খাবার কেনার কথা ভুলেই গেছিল। খিদেও পেয়েছে। ঠোঙা থেকে একমুঠো মুড়ি নিয়ে বলল "ধন্যবাদ"

"ধন্যবাদ কেন? বিরিয়ানি পোলাও তো নয়"

"কোথায় যাচ্ছেন?"

লোকটি মুড়ি চিবিয়ে বলল "জানি না। এমনি ট্রেনে উঠে বসি। যখন ইচ্ছে হয় নেমে পড়ি। আপনি?"

"কলকাতা। আপনি কী এভাবেই ভবঘুরে হয়ে বেড়ান?"

"গন্তব্য থাকলে তো। ঘর, সংসার, ছেলেপুলে, চাকরি নেই। কোথায় যাব?"

"বিয়ে-থা করেননি?"

"করেছিলাম। বাচ্চাও ছিল। গাঁইশালের ট্রেন দুর্ঘটনায় দুজনেই... তখন অবশ্য দোকানে খাতা দেখার কাজ করতাম। ভীষণ ভেঙে পড়েছিলাম। ঠিকমত কাজে মন দিতে পারিনি। মালিক ছাড়িয়ে দিল"

মায়া হল। পেয়ে হারানোর ব্যথা মর্মান্তিক। বোঁচকার কাপড়ে চোখ মুছল। কামরার ক্ষীণ আলোয় অতীনের মনে হল, জল আড়াল করতে চাইছে।

"আপনি?"

"তেমন কিছু নয়। বিয়ে-থা করিনি। তবে একটা পৈতৃক ভিটে আছে। কাঁথিতে ছোট্ট ফ্ল্যাট"

"দেহরাদুনে কাজে এসেছিলেন?"

"বিশেষ কাজে। হয়ে গেছে। ফেরত যাচ্ছি"

বেঞ্চির ওপরই ঘুমে ঢলে পড়েছিল ওরা। সকালে লখনউ পৌঁছে স্টেশনের স্টল থেকে নিমের দাঁতন কিনে আনল। ব্যাগে টুথব্রাশ থাকতেও পাছে ধরা পড়ে যায়, ভয়ে বার করতে সাহস করল না। লোকটির দাঁতন নিয়ে বলল "কালকে আপনার নামটা জানা হয়নি?"

"সনাতন মুখুজ্জে। আপনি?"

"অতীন রায়"

দাঁত মাজা, প্রাতঃকৃত্য শেষ করে, অতীন চা কিনে আনল।

"যা গরম পড়েছে। ছত্রিশ ঘণ্টা এভাবে" রুমালে ঘাম মুছল।

"আমি তো একা ঘুরেই অভ্যস্ত। আপনাকে পেয়ে গেলাম। গল্প করেই কেটে যাবে"

"থাকেন কোথায়?" চায়ে চুমুক।

"প্ল্যাটফর্মে কী বেঞ্চির অভাব না বাসস্ট্যান্ডে সরকারি শৌচালয়ের?"

এরকম ভাবেও কেউ জীবন-যাপন করে। যেমন আশ্চর্য লাগছে, তেমন করুণাও হচ্ছে। আগের জীবনের সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজে পাচ্ছে। এ মুহূর্তে কোনও পরিচিতকে পাশে চায় না। চায়, আগের জীবনের মতোই কাউকে, যে মানসিক সহায় হতে পারবে।

বিনোদ রাঠোডের তলবে চিন্তিত। খটকা লাগছে। নিশ্চয়ই ওরা লোকেশের মৃত্যু নিয়ে খোঁজ শুরু করেছে। অ্যাকসিডেন্ট মানতে পারছে না। তার কাহিনিটা বিশ্বাস করতে পারছে না। এখন ওদের স্ক্যানারে। এ কোথা থেকে কোথায় যাবে কে বলতে পারে? ওদের নেটওয়ার্ক দ্রুত কাজ করে। ওদের চোখের আড়ালে হারিয়ে যেতে হবে। ট্রেনে ওঠার আগে মোবাইল সুইচ অফ করে দিয়েছে। পুরনো মোবাইলের সিম এখনও মানিব্যাগে। হাওড়ায় নেমে ওটাকে রিচার্জ করলেই নতুন অস্তিত্বকে মুছে ফেলতে পারবে। মাস চারেক আগে করেছিল। এখনও নিশ্চয়ই নম্বরটা আছে। বিএসএনএল নম্বর। কাঁথিতে আগে ব্যবহার করত।

সনাতন মুখুজ্জে বলেছিল "এখন যদি কারও উপকারে লাগতে পারি, ঝাঁপিয়ে পড়ি। ওতেই আত্মার শান্তি। সংসার তো আর ফিরে পাব না। এই ছন্নছাড়া জীবনে আশ্রমেও ভক্তির গান গাইতে পারব না। নিজের মূল্যহীন জীবনটাকে যদি বা মূল্যবান করা যায়। এই আর কী"

সেও তো এই মুহূর্তে আশ্রয় খুঁজছে। সনাতন মুখুজ্জের থেকে আর ভালো কে হতে পারে? হাওড়ায় নেমে প্রশ্ন করল "কোথায় যাবেন?"

"জানি না। আগেই বলেছি নিজেই জানি না এরপর কী করব"

"যদি ইচ্ছে হয়, আমার সঙ্গে কাঁথিতে আসতে পারেন"

কয়েক মুহূর্ত। একগাল হেসে বলল "বেশ চলুন আপনার সঙ্গে কাঁথিতেই যাই। অন্তত প্ল্যাটফর্মে শোয়ার চেয়ে ঘরের মেঝেতে শোয়া যাবে"

অতীনের যখন ঘুম ভাঙল তখন অন্ধকার। আলো জ্বালিয়ে ঘড়ি দেখল, সন্ধে ৬টা। পাশের ঘরে উঁকি মেরে দেখল সনাতন মেঝেতে পা গুটিয়ে ঘুমোচ্ছে। ছত্রিশ ঘণ্টা ট্রেনের বেঞ্চিতে, সকাল সাড়ে-সাতটায় হাওড়ায় নেমে এসপ্ল্যনেডের বাসে পাঁচঘণ্টা। ধকল তো গেছেই। বাসস্ট্যান্ডে নেমে, রুটি তরকা খেয়ে, ফ্ল্যাটে পৌঁছে, সটান ঘুম। যতক্ষণ সনাতন ঘুমোচ্ছে, রাতের খাবার কিনে আনি। মোড়ে হেঁদুর দোকানে কুড়ি টাকায় দুটো থালি। মাল কিনলে কেমন হয়? রয়েল স্ট্যাগ, শঙ্করের দোকানের চ্যানাচুর কিনে ফেরত। সনাতন উঠে পড়েছে। কলঘরে হাতমুখ ধুয়ে পা-ছড়িয়ে মেঝেতে বসে।

"কোথায় গেছিলে?"

"রাতের খাবার আনতে। বাড়িতে কিছুই নেই। তুমি সম্মানিত অতিথি। সেলিব্রেট করার জন্য মালও কিনলাম। মাল খাও তো?"

মাথা নাড়ল "পেলে খাই। অত টাকা কই?"

"তাহলে স্নান সেরে গ্লাস নিয়ে বসি"

এই সুদূর কাঁথির ফ্ল্যাটে সে অনেক সুরক্ষিত। খোচররা টেরও পাবে না। সারা রাস্তা ভয়ে কাটিয়েছে। সনাতনকে কাছে পেয়ে ভয়টা এখন কমেছে। চাপা উৎকণ্ঠা থেকে মুক্তি খুঁজছে।

“রয়েল স্ট্যাগ। কদ্দিন এসব দামি জিনিস খাইনি। আজ তোমার আতিথিয়তায় সেলিব্রেশন করে নিই”

এক চুমুক দিয়ে চ্যানাচুর এগিয়ে অতীন বলল “নাও। আসল কথা কী জান? অনেকদিন টাকা আসেনি রয়েল স্ট্যাগ খাওয়ার”

সনাতন চুমুক দিল “বেশ খেতে তো। যারা খাওয়ায়, তারা কালিমার্কা ছাড়া কিছুই পারে না। তোমার মতো বন্ধু পেলাম বলে একটু ভালোমন্দ খেয়ে নিচ্ছি”

“আমারও তেমন টাকা নেই। দেহরাদুনে কিছু টাকা পেয়ে গেলাম। অতিথি বলে কথা। আজ নয় একটু হয়েই যাক”

কয়েক পেগ পেটে পড়তে সনাতনের মুখ খুলল “এক সময়, আমিও বেশ কামিয়েছিলাম। সে এক চক্করে। আমায় বলেছিল একটা প্যাকেট পৌঁছে দিলে বেশ কিছু টাকা দেবে। হাতে কিছু নেই। রাজি হয়ে গেলাম। অনেক টাকা দিয়েছিল। ইচ্ছে হল দামি মাল খাই। সেবারই রয়েল চ্যালেঞ্জ শেষ খেয়েছিলাম”

অতীনের হাসি পেল। রয়েল চ্যালেঞ্জও দামি মদ? মেহুলির দৌলতে টিচার্স থেকে গ্লেনফেডিচ কত খেয়েছে। এই লোকটা বলছে রয়েল চ্যালেঞ্জ দামি মদ।

সনাতন বলে চলেছে “তখন কি ছাই জানতাম স্মাগলিং চক্করে পড়েছি”

“স্মাগলিং!”

“যখন বুঝলাম বেরোতে গিয়ে সে কী বিপত্তি...”

অতীনের ভেতরটা আঁকিবুকি করছিল নিজেকে হাল্কা করার। নেশা লেগেছে। মনটা পেখম মেলতে চাইছে। বলল “আমিও এমন এক চক্করে জড়িয়ে পড়েছি”

সনাতন চুপ। বোঁচকাতে হাত। দেখে অতীন বলল “কিছু খুঁজছ?”

“দেখলাম মুড়ির ঠোঙাটা ঢুকিয়েছি কি না। নাঃ... ঠিক আছে”

অতীন বলে চলেছে “আমার দাদা বিপিনের মেয়ে মুম্বাইয়ের নামকরা মডেল। তার জন্য বিশ্বস্ত সেক্রেটারির কাজ করতে আমায় মুম্বাই নিয়ে গেল। ভাড়ার ফ্ল্যাটও দিয়েছিল। মাইনে যদিও বেশি দিত না, চলে যেত। কিছুদিন পর দেখলাম ভাইঝির সে কী জীবন! আজ এর সঙ্গে তো কাল ওর সঙ্গে। বেশ্যারও অধম। কী আর বলব, শুধু বেশ্যাবৃত্তি করে তারকা হওয়াই নয়, চতুর্বেদী বলে এক ডনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল। পরে জানলাম, শো-বিজ লাইন শুধু দিখাওয়া। তার সঙ্গে এক সাধুবাবা ভওয়ানিশঙ্কর, স্মাগলিং থেকে মেয়ে পাচারে জড়িয়ে”

একটু থামল। সনাতন শুনে যাচ্ছে। গল্প শুনতে ভালোবাসে।

“ওর সেক্রেটারি থাকাকালীন গ্ল্যামার, সো-বিজ অনেকের সঙ্গেই পরিচয়। ওদের ছোটখাটো কাজও করে দিতাম। এক্সট্রা টাকা দিত। ভাইঝি এমনিতেই বদমেজাজি। মেহুলির মুখঝামটা কত সহ্য করব? কাকা বলে কথা। মানসম্মান আছে তো। আমিও হাঁপিয়ে উঠছিলাম ওর সাঙ্গপাঙ্গদের দেখে। ধোঁয়াটে লোকেদের সঙ্গে বড় বড় কারবার। দুজনের কাছাকাছি এসে পড়ি। অনেক টাকা দিত। বেশি টাকা পেলে করবে না কেন? কী কাজ করছি, বয়েই গেল”

নেশার ঘোরে সনাতনের হুঁশ নেই “বিপিনদা যদ্দিন বেঁচেছিল চাকরিটা ছাড়িনি কেবলমাত্র বিপিনদার মুখ চেয়ে। বছর দুয়েকে আগে, বিপিনদা মারা যাওয়ার পর আর নিতে পারলাম না। চাকরিটা ছেড়ে ওদের সঙ্গে ভিড়লাম”

“তাহলে বল শেষ পর্যন্ত ভালোই হল?”

“ভালো! তখন কি ছাই জানতাম গরম তাওয়া থেকে জ্বলন্ত উনুনে ঝাঁপ দিয়েছি”

সনাতন শুনছে। বোঁচকায় হাত “জ্বলন্ত আগুন কেন?”

“সব তো বলতে পারব না। ওরা দেখলাম খুনের চক্রে জড়িয়ে। খুন! কারণে-অকারণে খুন করছে। আমাকে জড়িয়ে ফেলল”

"এর মধ্যে জড়ালে কেন?"

"কী করব। ডেঞ্জারাস লোক। না করলে, ওদের মতো আমাকেও হাপিস করে দেবে। প্রচুর টাকাও দিত ভওয়ানিশঙ্কর, চতুর্বেদী। তবে সাংঘাতিক লোক"

"পালাবার চেষ্টা করোনি?"

"ওদের ব্যাবসার ফাঁদ সর্বত্র। সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি। আমাকে মুছে ফেলতে বেশি সময় লাগবে না" বুকটা মুচড়ে কেঁদে উঠছে "মেহুলির মুখঝামটা খেয়ে ওর চাকরিতে থেকে গেলেই ভালো ছিল। লোভ সামলাতে পারিনি"

"পুলিসকে খবর দাওনি?"

"অনেকবার ভেবেছিলাম জানাব। একেই বলে বরাত। একদিকে প্রচুর টাকা। অন্যদিকে পুলিস তো আমার মতো ছাপোষা লোকের কথা বিশ্বাস করবে না। ওরা টাকা খাইয়ে কেস ঘুরিয়ে আমাকেই জেলে পুরে দিতে পারে। সব-ই কপাল। এসব নানা সাতপাঁচ ভেবে মেনে নিলাম। আমি কাজটা করলেও খুন তো ওরাই করছে। সব সময় আমাকে দিয়ে নয়। তোমার মতো, অনেক জায়গায় পার্সেল পৌছনোর কাজ করেছি মাত্র। খুন করেছে অন্য কেউ"

"এরকম কটা জায়গায় করিয়েছে?"

"জানি না। আমি সাত-আটটায়। ম্যাথেরনের অ্যাকসিডেন্ট, আমিই সব বন্দোবস্ত করেছিলাম। শেষটা দেরাদুনে"

হর-কি-পৌড়ি, লোকেশ চাডার কাহিনি শোনাল।

"এর মাথা কে?"

"বলতে পারব না। ওরা আমায় শেষ করে দেবে"

সনাতন রয়্যাল স্ট্যাগে চুমুক দিয়ে বলল "থাক। বলতে হবে না। প্রত্যেকেরই গোপন কিছু থাকে। আমাকে বলতে গিয়ে প্রাণ হারাও, সেটা আমি চাই না। আমার কিছু যায়-আসে না"

"এখন বলোত ভায়া বেরোই কী করে?"

"ভাবতে হবে। নেশায় মাথা কাজ করছে না। রাতটা ভাবতে দাও। আমি যখন এর থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছি, তুমিও পারবে"

সনাতনের কথায় মনটা জুড়ল। হয়ত কাল একটা উপায় বাতলাতে পারবে। নিজেও তো এরকম খপ্পর থেকে বেরিয়েছে। অনেক জমানো ব্যথা মুক্তি পেল।

সনাতন বলল "বড্ড খিদে পেয়েছে। খেতে দাও। এই কদিন যা ধকল গেছে। ঘুম না হলে মাথা কাজ করবে না। কালকের মধ্যে উপায় একটা বার করবই"

খেয়ে বেসিনে থালা রেখে চৌকিতে শুয়ে পড়ল "তুমি এখানে শুতে পার"

"না ভাই, পাশের ঘরের মেঝেটাই ভালো। একদিনে অভ্যাস খারাপ করে দিও না"

তখনও ভোরের আলো ভালো করে ফোটেনি। আধো-অন্ধকারের বুক চিড়ে সূর্যের ফিকে আলো ঢেকে দিয়েছে কাঁথি শহর। ভোর হলে মুখর হবে বাংলার শহরতলি। কলিং বেলটা বেজে উঠল। শোনেনি অতীন। আবার বাজল। ভোর রাতের ঘুম কী সহজে ভাঙে? তার ওপর, কালকের মালের নেশা।

ক্রিইং... ক্রিইং... ক্রিইং...

এত সকালে কে? পাশের ঘরে এসে দেখল, সনাতন পা গুটিয়ে ঘুমোচ্ছে। দরজা খুলতেই অবাক। সামনেই পুলিসবাহিনী! ওদের মধ্যে একজন সুপুরুষ আইডি কার্ড দেখিয়ে বলল "স্নেহাশিস চ্যাটার্জি। সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পুলিস। ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট"

"কেন? কী হয়েছে? আমি কী করলাম?" তোতলাচ্ছে।

“আই অ্যারেস্ট ইউ অন চার্জেস অফ মার্ডার। সেকশন ৩০২/৩০৪ আইপিসি। যা বলার থানায় বলবেন”

পুলিসেরা যখন অতীনকে হাতকড়া পড়াচ্ছে, সনাতনের ঘুম ভেঙে গেছে। উঠে এসেছে এত লোকের শব্দে। তার দিকে তাকিয়ে স্নেহাশিস বলল “থ্যাংক ইউ মিঃ মধুসূদন মুখার্জি”

হাতকড়া পরা অবস্থাতেই অতীন ফিরে তাকাল সনাতনের দিকে। মুচকি হেসে সনাতন বলল “সনাতন নয়, মধুসূদন মুখুজ্জে। অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ পুলিস”

পঁয়তাল্লিশ

"বৈঁঠিয়ে চতুর্বেদী সাব" রোশন চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করল।

"হাঁ বলিয়ে শেঠজি" চতুর্বেদী দৃঢ় অবিচল।

"রেকর্ডিং শুনিয়ে..." রোশন টেবেলের টেপরেকর্ডার চালিয়ে দিল।

শুনতেই চতুর্বেদীর রং ও ভঙ্গিমার পরিবর্তন। চালাক চতুর্বেদীর বুঝতে অসুবিধা হল না, রোশন তাকে ফাঁসাতে চাইছে। এমনি শূন্য থেকে ক্রিমিন্যাল জগতে বড় হয়ে আজ মুম্বাইয়ের সো-বিজ সাম্রাজ্যের অলিখিত ডন হয়নি।

"কিসকা আওয়াজ হ্যায়" সরল প্রশ্ন।

"পহেচান নেহি রহে? অতীন রায়"

"ইয়াদ আয়া। ইয়ে আদমি মেহুলিকা সেক্রেটারি থা"

"ইয়ে আদমি খুনকে চক্কর মে ফসা। টেপ মে আপকা নাম লে রহা হ্যায়"

"সাহাব, ইয়ে বকয়াস আদমি। রূপয়ে বিনা কুছ নেহি জানতা। মেহুলি উসে ভগায়া। ম্যায় ছোটামোটা কাম দিয়া" চতুর্বেদী হাল ছাড়তে নারাজ।

"খুন ভি?" রোশন অধৈর্য হয়ে পড়ছে।

"সাব, আপকো ইজ্জত করতা হু। মুঝে দোষ কেও দে রহে? ইয়া আদমিকে সাথ মেরা কোই তালুক নেহি"

"ঔর ফিরসে সোচ লিজিয়ে"

"কিসিকে বোলনে মে তো ম্যায় ক্রিমিন্যাল নেহি হো জায়ুঙ্গা। সবুদ চাহিয়ে"

রোশন বুঝতে পারছে, এ গভীর জলের মাছ, সহজে বাগে আসবে না। কোথাও এগোচ্ছে না। বরং অ্যারেস্ট করে চিরায়িত পুলিসি দাওয়াই দিলে, ঝেড়ে কাশত। তাতে ঝামেলায় পড়ার আশংকা ষোলো আনা। মিডিয়া ওত পেতে বসে আছে পুলিস কাস্টডিতে অত্যাচার নিয়ে স্টোরি করতে। অনেক পুলিসই ফেঁসেছে।

"ঠিক হ্যায়। মুম্বাই সে বাহার মত যাইয়ে। জরুরত পড়ে তো বুলা লুঙ্গা" রোশন নরম অথচ দৃঢ়ভাবে বলল।

চতুর্বেদী ভাবছে পুলিসের যখন একবার সন্দেহ হয়েছে, ছাড়বে না। ভওয়ানিশঙ্করের সঙ্গে কথা বলতে হবে। চিন্তায় রোশনের অফিস থেকে বেরিয়ে এল। কী করা যায়? বানচোত অতীন রায় হাটে হাড়ি ভেঙে দিয়েছে। বারবার না করা সত্ত্বেও শোনেনি। রাজেন্দ্র চতুর্বেদী সোজা বাড়ি। অফিসে যাওয়ার মুড নেই। ভডকা-লাইমে চুমুক দিয়ে ভাবতে বসল।

তারপর মোবাইলে ফোন "চতুর্বেদী বোল রহা হু"

"সমঝ গেয়া। বাত কেয়া?" ভওয়ানিশঙ্করের গলা ভেসে এল সুদূর ম্যাথেরন থেকে।

ডিসকোর্সের পর, সবে এক কচি মেয়েকে 'আতিথিয়তার' জন্য ঠিক করেছে প্রতিদিনের মতো বাহারি কামসূত্রের আশায়, এই সময় চতুর্বেদীর ফোন অবাঞ্ছিত।

"মহারাজ, মুসিবত হো গেয়া। রোশন শেঠ উসকে অফিস মে মুঝে বুলায়া ঔর এক টেপ শুনায়া" ওদের কথোপকথন আওড়ে গেল। ভওয়ানিশঙ্কর বাধা না দিয়ে শুনল।

"দেখো চতুর্বেদী, ইয়ে চিন্তা কা বিষয়। তুমহে হি ইসে মিটানা হোগা। মেরে নাম কাহি না আয়ে। ইন দিনও মে ধরম লে কর জাদা হি ব্যস্ত হু" ঠান্ডা স্বরে জবাব।

কমবক্ত কাহি কা। অচ্ছা সে জানতা হু, তেরা ধরম কা চক্কর। চতুর্বেদী খেপে বোম।

"মহারাজ, আপ তো পুরা কাহানি জানতে" চতুর্বেদীর অনুনয়।

"ওহ তো সহি। ইস মে ম্যায় কাঁহা সে? ম্যায় তুমহে কুছ নেহি বোলা, সামঝা" ভওয়ানিশঙ্করের চিৎকার।

যন্ত্রণায় চতুর্বেদীর মাথা দপদপ করছে। ধূর্ত বাবা সময়মতো হাত গুটিয়ে নিয়েছে। মারমুখি রাগে মাথা ঘুরছে। বাবা চতুর্বেদীকে এখনও চেনে না। এবার হিসেব চোকাতে হবে। আগের বার ছেড়ে দিলেও, এবার আর নয়...

"বাবা, ম্যায় আপকা সেবক হু। মেরে পাস আপ নেহি ঠহেরে তো বরবাদ হো জায়ুঙ্গা" অনুনয় করল।

"ম্যায় হর ওয়াক্ত তুমহারে পাস হু। দুনিয়াদারি কা হিসাব তো তুমহে হি চুকানা পড়েগা। ম্যায় সাধাসিধা ঈশ্বরভক্ত হু। ম্যায় কেয়া করু?"

রাগে অজ্ঞান হওয়ার জোগাড়। বনবন করে মাথা ঘুরছে। আরকেটা ভডকা ঢেলে এক চুমুকে শেষ। কোনও মতেই বরদাস্ত করবে। ভগবানের চেলা! দেখিয়ে দেবে কে আগে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছয়।

মোবাইলে ফোন।

"নমস্কার সাহাব... বোলা... কায়ে পাইজে"দিলীপ'ধমাকা' কাম্বলে অন্যদিকে।

সকাল এগারোটা। রাজু চতুর্বেদী ইচ্ছে ব্যক্ত করল।

দুটি অবয়ব, রাতের অন্ধকারে শিথিল পায়ে ঝরা পাতা মাড়িয়ে দস্তুরি নাকা থেকে ম্যাথেরনের আশ্রমের পথে এগোল হুকুম তামিল করতে। ভালো সুপারি। ম্যাথেরনের বাইরে আশ্রমের নির্জন পরিবেশও উপযোগী। যখন আশ্রমের গেটে, আশ্রমের সারাদিনের ডিসকোর্সের পর মহিলা ভক্তবৃন্দ গভীর ঘুমে। অমাবস্যার অন্ধকারে তাদের কালো স্কার্ফে মুখ ঢাকা অবয়ব চেনার উপায় নেই। একমাত্র গার্ডকে কাবু করে অজ্ঞান করতে সময় লাগল না। আশ্রমের মানচিত্র তাদের অজানা নয়। সোজা শয়নকক্ষে। লাথি মেরে দরজা ভাঙল।

চার পোস্টার অলংকৃত শয্যা জেগে উঠল ক্লান্ত ভওয়ানিশঙ্করের ঘুমের ব্যাঘাতে। পাশে সকালের সেই বিবস্ত্র তরুণী, বাবার ফুলের আশীর্বাদে ধন্য রাতের রাসলীলায়। ভয় কেঁপে উঠে স্যাটিন চাদর দিয়ে নগ্নতাকে আড়াল করার চেষ্টা। মুখ ঢাকা লোক দুটি ইঙ্গিতে মেয়েটিকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলল। প্রফেসান্যাল সুপারি কিলার। কারণ ছাড়া তরুণীদের আক্রমণ করে না। সাইলেন্সার লাগানো দোনলা অস্ট্রিয়ান জি-লক ২২ এর দিকে বাবা ভওয়ানিশঙ্কর ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে। সব থেকে খতরনাখ অস্ত্র - হাল্কা, ছোট, শব্দ বিহীন। আতঙ্কিত তরুণী ঘর থেকে ছুটে পালাল। একজন মুখোশধারী টেলিফোনের তার ছিঁড়ে ভারী জুতো দিয়ে গুঁড়িয়ে দিল। অন্যজন পিস্তল দিয়ে বাবাকে খাটে দাঁড়াতে নিঃশব্দে ইঙ্গিত করল।

"তুমলোগ কৌন? কাঁহা সে আয়ে?" বাবা নগ্নতা আড়াল করে দাঁড়াল।

শেষ কথা। সামনের মুখোশধারী জি-লকের ট্রিগারে চাপ দিল। বুলেট ছিটকে লাগল বাবার অণ্ডকোষে। অবাক, কিংকর্তব্যবিমূঢ় শরীর খাটে ছিটকে পড়ল। সারাজীবন ধরে কুকর্মের পৈতৃক অলংকার রক্তাক্ত মাংসপিণ্ড। গণ্ডগোল আঁচ করে, অনুস্কা আর রম্ভা বেডরুমে ঢুকল। দ্বিতীয় জন তাদের ঠেলে বাইরে পাঠিয়ে সঙ্গের ব্যাকপ্যাক থেকে দড়ি বার করল। বাবা আধা ঘোরে তাকাল তার ওপর দাঁড়ানো আততায়ীর দিকে। দ্বিতীয় বুলেট কপালের মাঝে। মৃত্যু যাতে কষ্টকর না হয়, এতটা মনুষ্যত্বহীন নয়। ঠিক যেমন মানিকতলার খালধারে সোহমের মৃত্যু।

মিশন শেষে মেয়েগুলোর মুখে রুমাল গুঁজে বাঁধল। ম্যাথেরন থেকে বেরবার আগে যাতে পুলিসকে খবর দিতে না পারে। আশ্রম থেকে যাওয়ার আগে যতটা সম্ভব সব টেলিফোন লাইন ছিঁড়ে ফেলল। কেউ মোবাইল ব্যাবহার করতেই পারে। এটুকু রিস্ক তো নিতেই হয়। দশ মিনিটে কাম খতম।

দিলিপ ‘ধমাকা’ কাম্বলের সাগরেদরা ম্যাথেরনের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল, দস্তুরি নাকার পথে। হাউস খাসে ঘুমন্ত ইন্দ্রাক্ষি জানতেও পারল না, সুদূর ম্যাথেরনে, তার প্রধান সেনাপতি শেষবারের মতো, জিলক ২২-এর নলের সামনে দাঁড়িয়ে, শেষবারের মতো প্রাণভিক্ষা করেছে।

“সাহেব, কাম ঝলেল আহে” ফোনে আততায়ীরা জানিয়ে, দস্তুরি নাকা থেকে মুম্বাইয়ের পথে রওনা হয়ে গেল।

ছেচল্লিশ

অ্যারেস্টের পর, প্রাইজড ক্যাচ অতীনকে নিয়ে আসা হল লালবাজারে। পুলিসি দাওয়া ছাড়াই বিধ্বস্ত লালবাজারে লকআপে। ভয় মেশানো সংশয়। বুঝতে পারছে মধুসূদন চালাকি করে বোঁচকায় থাকা রেকর্ডারে বয়ান রেকর্ড করে নিয়েছে। পালাবার পথ নেই। নিজেকে দুষছে বিচারহীন বোকামির জন্য। সারা রাত ঘুমোতে পারেনি।

জিজ্ঞাসাবাদের জন্য যখন নিয়ে আসা হল, মুখে বিধ্বস্ত উদ্বেগ প্রকট। এসি নেই। প্যাচপ্যাচে গরম। চেয়ারের চারদিকে আরও খালি চারটে চেয়ার অভিমুন্যর মতো ঘিরে নিংড়ে ক্ষতবিক্ষত করছে। পুলিস হেফাজতে থার্ড ডিগ্রি অত্যাচারের কথা শুনেছে। চারদিকে চোখ বোলাল। বইয়ে পড়া, ছবিতে দেখা, তেমন কোনও মারাত্মক অস্ত্র নজরে এল না। বসতে বলে বেরিয়ে গেল। যত সময় পার হচ্ছে, উৎকণ্ঠা বাড়ছে। ঘণ্টাখানেক পরে চারজন ঢুকল। এদের মধ্যে দু-জন পূর্ব পরিচিত। স্নেহাশিস চ্যাটার্জি, মধুসূদন মুখুজ্জে ছাড়া বাকি দুজনকে চিনতে পারল না। এরা যেন ইউক্রেনিয়ান আন্ডারগ্রাউন্ডের মৃত্যুদূত। মধুসূদনের হাতে ফাইল।

"আশা করি কাল রাতে ভালো ঘুম হয়েছে" স্নেহাশিসের কথা শূলের মতো বিঁধছে।

মাথা নাড়াল। টেবিলের ওপর টেপ রেকর্ডার, যেটা মধুসূদনের বোঁচকায় ছিল।

"প্রথমেই তোমার রেকর্ড করা কথোপকথন চালিয়ে শোনাই"

কথোপকথন না স্বীকারোক্তি। উদ্বেগে শুনছে নিজের কথাগুলো। ভাবতেও পারছে না মালের ঘোরে সে এগুলো বলেছে।

"আমাদের দুজনকে তো চেন। এ মানিকতলার এএসআই পরিতোষ সেন। আর উনি ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টের সনাতন মিত্র। সত্যি সত্যিই সনাতন মুখুজ্জে। মুখুজ্জেবাবু ডুন এক্সপ্রেসে ওনার নামটাই ধার করেছিল" স্নেহাশিস হাসল। অন্যরা ভাবলেশহীন "কিছু প্রশ্ন করব। সঠিক উত্তর দিলে তোমারই মঙ্গল। ইনভেস্টিগেশনের স্বার্থে আশা করব সহযোগিতা করবে। তোমায় অসুবিধায় ফেলা উদ্দেশ্য নয়। বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই"

অতীন স্বস্তির শ্বাস ফেলল। তাহলে পুলিসি দাওয়াই হজম করতে হবে না। নিমেষেই স্বস্তিতে ঘি ঢালল পরিতোষ সেন "চালাকি করার চেষ্টা করলে অন্য উপায়"

আগেরদিন চারজনেই নিজেদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছে। যেমন করেই হোক কেসটা ঠিকভাবে সাজাতে হবে। যথাযথ প্রমাণের অভাবে যাতে ছাড়া না পেয়ে যায়। ডিজি স্বয়ং ব্যক্তিগতভাবে কেসটা নিয়ে ইন্টারেস্টেড। পুলিসের ট্রেনিং-এ অভিনব এ কেসের জিজ্ঞাসাবাদ লিপিবদ্ধ থাকবে। 'মাট অ্যান্ড জেফ' পদ্ধতিতেই প্রশ্নোত্তর পর্বে এগোতে হবে। থাকবে। 'মাট অ্যান্ড জেফ' দুজন হাইপথেটিক্যাল চরিত্র। মাট নরম, ক্রিমিন্যালের সঙ্গে সহানুভূতিশীল। জেফ ঠিক উলটো। কঠোর জিজ্ঞাসবাদে ক্রিমিন্যালকে নারকীয় পরিস্থিতিতে ফেলতে খড়গহস্ত। অল্টারেনেট প্রসেসে দীর্ঘক্ষণ প্রশ্নোত্তরে ক্রিমিন্যাল মাটকে বিশ্বাস করে তার কাহিনি বলে দেয়। অ্যামেরিকায় হাসির প্রোগ্রাম থাকলেও, ব্যাবহারিক জীবনে এ জিজ্ঞাসাবাদ অন্য। দাগি আসামির ক্ষেত্রে অবশ্য এ পদ্ধতি অকার্যকর। অতীন যেহেতু দাগি আসামি নয়, তাই ওর জন্যে 'মাট অ্যান্ড জেফ'-ই কাফি। স্নেহাশিস মাট। পরিতোষ জেফ। ভালো-খারাপ পুলিস।

টেপ রেকর্ডার অন রেখে প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু "কোয়েশ্চেনিং অফ অতীন রায় ২১ সেপ্টেম্বর সকাল ১১ ২০" পরিতোষ রেকর্ড করল। স্নেহাশিসের দিকে ইঙ্গিত।

"তুমিই শুরু কর অতীন" স্নেহাশিস বলল।

“স্যার, আমি নির্দোষ। ওরা আমায় এ কাজে বাধ্য করেছে”

নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি। নটা খুন, তাও বলছে নির্দোষ!

“কারা?”

“স্যার, ওরা আমায় শেষ করে দেবে”

“আবার প্রথম থেকে শুরু করা যাক। আমরা জানি তুমি মেহুলি রায়, সোহম সান্যাল, অঙ্কুর জয়সওয়াল, সফি চৌধুরী, শিবানী করঞ্জওয়ালা, সুনেত্রা আগারওয়াল, নীলকান্থ রঙ্গনাথন, পৌরভি কান্নান আর লোকেশ চাচার মৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়ে” স্নেহাশিস লিস্টটা পড়ে তাকাল “মেহুলির মৃত্যুতে তোমার কী ভূমিকা”

“স্যার মেহুলি আমার ভাইঝি। আমার একটুও ইচ্ছে ছিল না। ওরা শুধু আমায় ওয়াইনের বোতল দিঘায় পৌঁছে দিতে বলেছিল।

“কে দিয়েছিল?”

“চতুর্বেদী”

মধুসূদন বাধা দিয়ে বলল “বাবা ভওয়ানিশঙ্করও রিসর্টে এসেছিল। নিজের নামেই অনেকগুলো রুম বুক করেছিল। কারা ওখানে ছিল?”

“সবার নাম জানি না। ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা থেকে একদিনের জন্য এসেছিল”

“চতুর্বেদীও ছিল?”

“না। সকালে বাবার সঙ্গে মিটিং করতে গেছিল”

“কারা মিটিঙে ছিল?”

“জানি না”

“কথা ঘুরিও না। অত ধৈর্য নেই” পরিতোষ খেঁকিয়ে উঠল। অতীন ভয়ে জড়সড়। পুলিসটাকে একেবারেই পছন্দ নয়।

“আন্দাজ করতে পারি চতুর্বেদী আর ডাক্তার ছিল”

“তুমি কী করে বোতলটা সরালে?” পরিতোষের সোজা প্রশ্ন। জেনে গেছে ওই সরিয়েছে।

সত্যি বলাই ভালো। খাজা পুলিসটা প্রশ্ন করছে “পরের দিন সকালে রিসর্টে ঢুকে ডামাডোলের ফাঁকে পুলিস আসার আগে সরিয়েছিলাম”

“সোহমের কেসে কী হয়েছিল?” স্নেহাশিসের প্রশ্ন।

“কী হয়েছিল বলতে পারব না, কারণ আমি ওখানে ছিলাম না। আমাকে চতুর্বেদীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছিল। মুম্বাইয়ের আন্ডারওয়ার্ল্ডে এরকম অনেক সুপারি কিলার চেনা”

স্নেহাশিস পরিতোষের দিকে তাকাল। প্রফেশন্যাল কিলার সম্বন্ধে আগেই আলোচনা হয়ে গেছে। অতীন হতে পারে না। দক্ষতার সঙ্গে এক কোপে গলার আর্টারি কেটে খুনের পরেই বুঝতে পারে প্রফেশন্যাল লোকের কাজ। অতীন বিশাল চক্রে চুনোপুঁটি। মাস্টারমাইন্ড নিয়েই সন্দেহ, দাঁড়িপাল্লার ভার কোন দিকে হেলে।

“ম্যাথেরনের অ্যাকসিডেন্ট প্ল্যান্ড?”

“আমিই করিয়েছি। আমায় বাধ্য করা হয়েছিল। শাসানো হয়েছিল, না করলে শেষ করে দেওয়া হবে। মুম্বাই থেকে লরি ভাড়া করি ম্যাথেরনে সিফটের আছিলায়।

“লরি কিংবা ড্রাইভারের ইতিবৃত্ত আছে?” স্নেহাশিস প্রশ্ন করল।

“মনে নেই। নির্দিষ্ট জায়গায় দেখা করে কী করতে হবে বলি”

“কে ধমকেছিল?”

“ভওয়ানিশঙ্কর বাবা। সাংঘাতিক লোক”

সবাইয়ের ভোল ফাঁস করে দেবে। কী আসে যায়? ওরাই ঘোল খাইয়ে ওকে ফাঁসিয়েছে। থোরাই আসে যায়। মনে মনে অতীনের প্রতিজ্ঞা।

"কী করে ম্যাথেরনে রাতে ওদের গতিবিধি জানলে?" পরিতোষ কঠোর।

"স্যার, চতুর্বেদীর মুম্বাইয়ের মৌসিকে আগে থেকেই চিনত। ওর কাছ থেকেই খবর পেয়েছিল। বাবাও জানত" রোশনের রিপোর্টেও এর উল্লেখ আছে "অঙ্কুরকে মারার জন্য অন্য তিনজনকে মারা ওদের কাছে কোনও বড় ব্যাপার নয়। খালি সন্নিধি বেঁচে গেল, একটুর জন্য"

"মৌসির নাম কী শিবানী করঞ্জওয়ালা?"

"হ্যাঁ"

"লরিতে কারা ছিল? কোথায় থাকে?"

"জানি না। চতুর্বেদী বলেছিল আগের দিন ওদের সঙ্গে দেখা করে বুঝিয়ে দিতে"

"আমরা জানি তুমি ম্যাগনাম টাওয়ার্সে গেছিলে যেদিন সুনেত্রা ঝাঁপ দেয়"

অতীন ঘামছে। এটাও!

"ভিজিটার্স রসটারে শিরিনের নাম নিয়ে ঢুকেছিলে কেন? ওকে চিনতে?"

"চিনতাম না। চতুর্বেদী বলেছিল। হয়ত ওকে চেনে"

"ওখানে কী হয়েছিল?"

অতীন চুপ। ইতস্তত করছে। পরিতোষকে উঠে এগিয়ে আসতে দেখে অতীনের হার্টবিট বেড়ে গেল। যদিও ভয় দেখানো ছাড়া কোনও অভিপ্রায় ছিল না।

"বলছি। সব বলছি। উনি যেন হাত না দেন" পরিতোষের দিকে ইঙ্গিত।

স্নেহাশিস ওর দিকে ফিরে বলল "ঠিক আছে। অতীন বলবে বলেছে। তাই না?" পরিতোষ বসে পড়ল।

"গাড়ি করে গেলাম..."

"কালো স্যানট্রো?" মধুসূদন বাধা দিয়ে প্রশ্ন করল।

"হ্যাঁ। গাড়ি পার্ক করে সুনেত্রার ফ্ল্যাটের বেল বাজাই। বাবা আগেই বলে রেখছিল। সুনেত্রার জন্য বাবার পাঠানো প্রসাদ আর বই নিয়ে ঢুকি। কোকাকোলা খেতে চাই। দুটো গ্লাস আর বোতল নিয়ে আসে। খাওয়ার সময় চতুর্বেদীর দেওয়া পাউডার ওর গ্লাসে মিশিয়ে দিই"

"কীসের পাউডার? নাম জানো?" এএসআই ফরেনসিক সনাতন মিত্রের প্রশ্ন।

"না স্যার" জানার কথা নয়। নিশ্চয়ই ওকে বলেনি।

"তারপর?"

"কিছুক্ষণ পরেই সুনেত্রা অদ্ভুত ব্যবহার করতে লাগল। ঘরে ছোটাছুটি থেকে বারান্দায়..."

"তারপর?" পরিতোষ জিজ্ঞেস করল।

কেঁপে উঠে দুহাত দিয়ে মুখ ঢাকল। কাঁদছে "আমি করতে চাইনি স্যার"

"একটা ব্রেক নেওয়া যাক" স্নেহাশিস মাইকে রেকর্ড করল "কোয়েশ্চেনিং ইন্টারাপ্টেড ফর লাঞ্চ ব্রেক"

লাঞ্চে স্নেহাশিস রোশনকে ফোন করল "চতুর্বেদী কো অন্দর করো। বড়ি মছলি"

"অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট বিনা কেইসে?"

"অ্যারেস্ট কেও? অফিস মে বুলা লো। মিঠে সে বাতচিত করো। ম্যায় অভি তক অতীনকে কোয়েশ্চেনিং ডিটেলস ভেজতা হু"

"মুঝে পহেলে টেপ শুননা হ্যায়। ফির চতুর্বেদী সে বাত"

"চলো সহি। আজকে কোয়েশ্চেনিংকে কপি সামকে ব্লু ডার্ট মে ভেজ রহা হু। চতুর্বেদীকো অন্দর করনে কে লিয়ে কাফি। সময় বহত কম" সনাতন মিত্রকে কোয়েশ্চেনিং-এর কপি কুরিয়ার করতে বলল।

"কোয়েশ্চেনিং অফ অতীন রায় ২১ সেপ্টেম্বর দুপুর ৩ ৩০" পরিতোষ রেকর্ড করল।

“নীলকান্তর মৃত্যু। শঙ্খমালা মুখার্জির কাছে ব্যঙ্গালুরুতে প্রেসক্রিপশন কে নিয়েছিল?” স্নেহাশিস প্রশ্ন করল।

“শঙ্খমালা মুখার্জি! আমি তো ঐত্রেয়ী মুখার্জির কাছে নিয়েছিলাম। কে শঙ্খমালা মুখার্জি?”

তাহলে ঐত্রেয়ী মুখার্জিই শঙ্খমালা মুখার্জি সেজে চেন্নাইতে ইনসুলিন নিয়ে গেছিল।

“ঐত্রেয়ী কেন নেবে?” মধুসূদনের হিসেব মিলছে না।

“আমরা ওকে ব্ল্যাকমেল করেছি। শহরের বাইরে বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে ইন্টারকোর্সের ভিডিও তুলে”

“গুডনেস!” স্নেহাশিস আঁতকে উঠল। নিশ্চয় কম্পালসিভ কারণ আছে।

“ঐত্রেয়ী কোথায়?”

“বিয়ে করে অ্যামেরিকায়” অতীনের জবাব। মধুসূদন স্নেহাশিসকে পাশে নিয়ে বলল “জানলাম ইউএস সিটিজেনকে বিয়ে করে দেশের বাইরে। ওকে ধরা মুস্কিল”

স্নেহাশিস মাথা নাড়ল, বুঝেছে। কে ইনসুলিন পুশ করেছিল জানা যাবে না। ঐত্রেয়ীও হতে পারে, কিংবা অন্য কেউ। কাল্পেবিলিটি থেকেই যায়।

“কে প্রেসক্রিপশন দিয়েছিল?”

“ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়” অতীনের তো হারাবার আর কিছু নেই।

“ভওয়ানিশঙ্কর আর চতুর্বেদী কী করে?”

“একে অপরের বহুদিনের চেনা। স্মাগলিং, ড্রাগস, প্রস্টিটিউশন সব কিছুর প্রমোটার। ম্যাথেরনের আশ্রম দিখাওয়া”

“খুন?”

“তাও”

“তুমি এদের সঙ্গে কী করে জড়ালে? তুমি তো মেহুলির সঙ্গে কাজ করতে”

“যদ্দিন বিপিনদা বেঁচে ছিল মেহুলির থ্রু দিয়ে মডেলিং এজেন্সি দ্য নিউ এজের সঙ্গে পরিচয়। ও তো সামান্য মাইনে দিত। কদ্দিন ওর খিদমত করব? আমার তো ইজ্জত আছে”

অতীনের ইজ্জত! স্নেহাশিস হাসল।

“তারপর?”

“যদ্দিন বিপিনদা বেঁচে ছিল, ওই ছত্রছায়া থেকে বেরোইনি। মারা যাওয়ার পর ভওয়ানিশঙ্কর ভালো চাকরির অফার দেয়। তখন দ্য নিউ এজে জয়েন করি। ভাবিওনি কোনও অসামাজিক কিছু করছি। তারপর ওরা হুমকি দিয়ে কাজ করাতে শুরু করে। অনেক টাকা। যদিও ওদের সঙ্গে লিখিতপড়িত কিছু হয়নি”

“ভওয়ানিশঙ্কর আর চতুর্বেদী কী ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়কে চেনে?”

“অবশ্যই। দ্য হেভেনে তো ওদের মিটিং হয় সেদিন”

“তাদের কী কোম্পানির সঙ্গে কোনও চুক্তি আছে?”

“বলতে পারব না”

“আজকের দিনের মতো এখানেই। কালকে আবার। আশা করি সদুত্তর দেবেন” সেদিনের মতো স্নেহাশিস যবনিকা টানল।

“আরও প্রশ্ন?”

পরিতোষ রক্তচক্ষু “হাজারটা। যতক্ষণ না সব সত্যি বেরয়। বুঝলে?”

অতীন চুপ।

“কোয়েশ্চেনিং অফ অতীন রায় ক্লোজড ফর ২১ সেপ্টেম্বর ৬ ৩০ পিএম” পরিতোষ রেকর্ড করল।

নেক্সট সকাল ১০-৩০ আবার চারজনের সঙ্গে সেশন।

“একটাও মিথ্যে নয়, বুঝলে” স্নেহাশিস মনে করিয়ে দিল। অতীন মাথা নাড়ল।

“পৌরভির খুন কী করে?”

“আমার ওখান থেকে গোবিন্দকে ডাক্তারবাবুর কাছে আনি। একদিন ডাক্তার সাহেব আমায় এমপিথ্রি প্লেয়ার দিয়ে বললেন চেন্নাইয়ের কাছে একজন অ্যাকট্রেসকে দিয়ে আসতে। সিল্ড প্যাকেজ, খোলা বারণ। ডাক্তারই মহাবালিপুরমের ওই ফিল্ম ইউনিটে গোবিন্দর চাকরির ব্যবস্থা করে দেয়। ওকে দিয়েই ওটা পাঠিয়ে দিই। আমাকে শুধু গোবিন্দর বন্ধু কেষ্টর দিকে নজর রাখতে বলা হয়েছিল”

“তুমি কী জানতে ওতে বোমা আছে, যা পৌরভির মৃত্যুর কারণ?” মধুসূদন জিজ্ঞেস করল।

“তখন জানতাম না। পৌরভির মৃত্যুর পর জানলাম”

“কোত্থেকে এক্সপ্লসিভ পেয়েছিল?”

“চতুর্বেদী। ওদের কথায় জানতে পারি, চতুর্বেদী মুম্বাইয়ের বম্ব এক্সপার্ট দিলীপ কাম্বলের কাছ থেকে, ওরা ডাকত ধমাকা”

“ধমাকা মুম্বাইতে কোথায় থাকে?”

“জানি না। চতুর্বেদী নিশ্চয়ই জানে”

লোকেশ চাডার মৃত্যু নিয়ে প্রশ্ন করার দরকার নেই। মধুসূদনের কাছে নেশার ঘোরে নিজেই সব আওড়ে দিয়েছে। যদিও রেকর্ডের জন্য অতীনকে আবার বলতে বলল। তাও রেকর্ড করা হল।

সকাল ১১-৩০ । স্নেহাশিস বাইরে বেরিয়ে রোশনকে ফোন করল “কুরিয়ার মিলা?”

“ফোন কিয়া। ভেজ রহে হ্যায়”

ফিরতে বলল “সব তো রেকর্ড করা হল”

আনন্দিত অতীন। এবার ওরা ফাঁসুক। ভেবেছে ওকে ফাঁসিয়ে পার পেয়ে যাবে? দেখিয়ে দিয়েছে কী করতে পারে।

“কতক্ষণ থাকতে হবে স্যার?”

“যাবে কোথায়? এখনও আমার শেষ হয়নি। আমাদের আতিথিয়তা পুরো হজম না করে মুক্তি নেই। ভেবে দেখ, সাহায্য করবে” পরিতোষের ধমকানিতে অতীন উঠতে গিয়ে বসে পড়ল “মাস্টার ব্রেন কার?” অতীনকে চুপ করে থাকতে দেখে হুংকার “উত্তর দেবে, না দাওয়াই শুরু করব?”

“বলে দেওয়াই ভালো” স্নেহাশিস মাটের ভূমিকায়।

“আর বললে ওরা খতম করে দেবে”

“খতম তো হয়েই গেছ। তবে আর কেন?” পরিতোষ রণমূর্তি।

“এতসব যখন বললে, বাঁচার একটাই উপায়। অ্যাপ্রুভার হয়ে যাও। শাস্তি কম হবে” স্নেহাশিস বোঝাবার চেষ্টা করল।

“অ্যাপ্রুভার কী?”

স্নেহাশিস বোঝাল। অতীনের চোখ চকচক করছে। ওরা ফাঁসিকাঠে ঝুলবে। নিজে বেরিয়ে যাবে “ছেড়ে দেবে?”

“বলতে পারব না। শাস্তি কম হবে। বিবেকের থেকেও মুক্তি পাবে”

“কী জানতে চান?” স্নেহাশিসকে জিজ্ঞেস করল।

“মাস্টারমাইন্ড কে? ভওয়ানিশঙ্কর?”

অনেকক্ষণ মেঝেতে তাকিয়ে চুপ। ভেতরে উথাল পাথাল ভৌতিক সাম্ভা নাচছে। তাকিয়ে গভীর শ্বাস নিল।

“ভওয়ানিশঙ্কর তো চতুর্বেদীর মতো এই চক্রের...” নামটা শোনার জন্য উদগ্রীব। সব উপখ্যানের গানা যখন শুরু করেছে, শেষটাও করবে। আর লুকাবার কী আছে? তার তো কিছু হারাবার নেই।

নাম শুনে সবাই স্তম্ভিত, নির্বাক। ভাবতেও পারছে না। একমাত্র মধুসূদন ছাড়া।

“ফাইন্যাল কোয়েশ্চেনিং অফ অতীন রায় ক্লোজড ফর ২২ সেপ্টেম্বর ২ পিএম” স্নেহাশিস ফিসফিস করে মাইকে...

রোশন বাড়িতে রবিবার সকালে বসে স্নেহাশিসের পাঠানো টেপটা শুনছিল। কাল পাওয়ার পর থেকেই বেশ কয়েকবার শুনেছে। হতবাক বিস্ময়ে।

ফোনে স্নেহাশিসকে প্রশ্ন “ঔর কেয়া ইনফরমেশন অতীন রায় দিয়া?”

“জো ভেজা ওহ শুনা?”

“বহতবার”

“ইয়ে তো সিরফ এক ঝলক। পুরা কাহানি শুন” অতীনের বয়ান যতটা সম্ভব বলে গেল “পুরা রেকর্ডিং ভেজতা হু”

“বিসওয়াস নেহি হোতা”

টেপের কপি রোশন ছাড়া দিলওয়ান সিং, বিনোদ রাঠোডকে পাঠিয়ে দিল।

রোশন চতুর্বেদীকে ফোন করল “রোশন শেঠ”

আধা চিকেন তন্দুরি আর দু-বোতল বিয়ার খেয়ে ঝিমুনি এসে গেছিল। বিরক্ত হল। ইয়ে কমবক্ত পোলিসওয়ালেকো কেয়া হুয়া। ইতবার কে দিন ভি শোনে নেহি দেগা।

“হাঁ সাহাব। কেয়া কর সকু?”

“সহায়তা চাহিয়ে”

“আপকে সেবা মে ইয়ে বন্দা হর ওয়াক্ত মজুত”

“ফোন মে সব বাত হো নেহি সকতা। কল মেরে অফিস মে আয়েঙ্গে?”

চমকে উঠল! কী হতে পারে, ডেকে পাঠাচ্ছে “তকলিফ কেয়া সাব?”

“জাদা নেহি। ভওয়ানিশঙ্করকে বারে মে কুছ পুছতাছ”

অসুবিধে নেই। আগের গল্পটাই আবার আওড়াবে।

“কব?”

“দশ বজে”

“ঠিক হ্যায়”

সাতচল্লিশ

তখন সবে ভোরের আলো ফুটেছে। মর্নিং ওয়াক করতে হাউস খাস এনক্লেভের টিকোনিয়া পার্কে চারবার চক্কর দিয়ে ফেলেছে ইন্দ্রাক্ষি। রোজকার অভ্যেস। বডি ফিট রাখতে গেলে কম খাওয়া, রোজ এক্সারসাইজ অত্যন্ত জরুরি। ফিরেই বারান্দার সোফায় পা ছড়িয়ে বসবে। চায়ে চুমুক দিয়ে রবীন্দ্রসংগীত, খবরের কাগজে চোখ বোলাবার সময় দিনের কর্মসূচি ঠিক করা।

শনিবার বিকেলের ফ্লাইটে আশিস আসবে। আশিস এ বাড়িতে ওঠে না। এখানে সে দ্য নিউ এজ গ্রুপের সাম্রাজ্ঞী, মহীয়সী নারী, সাম্রাজ্যের কর্ণধার। দেখাশোনা করছে বিশ বছর ধরে পুত্র পরিত্যক্ত প্রৌঢ় বঙ্কিম বাউরিয়া। বাড়ি দেখাশোনা, বাজার, রান্না করা থেকে গাছেও জল দেয়। সঙ্গে তদারকি করে ওর প্রিয় কুকুর জয়কে। তার এখানে পরিচয় সুপ্রসিদ্ধ প্রগতিশীল ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট।

গাছের ফাঁক দিয়ে সূর্য মিটিমিটি হাসছে। হাসছে ইন্দ্রাক্ষিও। চেন্নাই প্রজেক্টকে অনেক দিনের স্বপ্নে সাজাতে হবে। তার উর্বর চিন্তা, ছন্নছাড়া কয়েকটা সাজানো চরিত্রে সীমাবদ্ধ থাকবে না। তাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে অতীনের মতো মাইনের চাকরের প্রয়োজন নেই। চিন্তাধারার বিচ্ছিন্ন প্রয়োগেও আটকে থাকতে হবে না। চিন্তাকে ব্যাকরণে ফেলে ফসলটুকু তুলে দিতে হবে আগামী প্রজন্মকে। আগামী প্রজন্মের বিন্যাস।

এতদিনের স্বপ্ন বাস্তবের দোরগোড়ায় - 'দ্য নিউ এজ ইনস্টিটিউট অফ ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড হিউম্যন পোটেনশিয়াল'। দ্য ইনটেলেকচুয়াল বন্ডেজ অফ হিউম্যান রিলেশনস। এই প্রগতির স্বপ্নই তো এতকাল দেখছে। কোথাও জিতেছে, কোথাও বা হেরেছে। যা ছিল চিন্তার মায়াজালে সীমাবদ্ধ, আজ ইনস্টিটিউটের মোহর লাগিয়ে পরিবেশনা বিশ্বের দরবারে। উর্বর মস্তিষ্কের ফসল আগামীর বুনিয়াদ। অধরা স্বপ্ন কালজয়ী স্বাক্ষর রাখবে ইতিহাসে।

ভুলতে চায় অতীতকে, না-পাওয়া নির্মল ছোটবেলাকে। সেই স্বপ্নের বুনিয়াদ দ্য নিউ এজের বিশাল সাম্রাজ্য। অর্থ, যশ, প্রতিপত্তি, সব-ই জাগতিক চাওয়া। এবার তার থেকে মুক্ত হয়ে স্বাক্ষর রাখতে হবে কালের দরবারে, যাবতীয় কামনা-বাসনার বাইরে। মোহ ছেড়ে সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্ন। যেখানে শিশুরা খেলবে মায়ের আঁচলে, প্রস্ফুটিত হবে ন্যূনতম ভালোবাসার বলয়ে। সংসার-রথের আবর্তে নতুন সৃষ্টি। পেছনে বলিদান, ইতিহাসেই লেখা। ধুয়ে যাক কলঙ্কিত জীবনের বলিরেখা। একটা জীবনেই থাকুক আগামীর রেশ। সময় হয়েছে স্বপ্নটা পৌঁছতে বিশ্বের দরবারে। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে এই ইনস্টিটিউট আগামী প্রজন্মের রূপকার।

আনন্দে আচ্ছন্ন। আত্মতৃপ্তিটা ভাবার নয়, করে দেখানোয়। পরশু স্বপ্নের প্রথম পদক্ষেপ, তার নতুন ইন্সটিটিউটের ভিত স্থাপন - দ্য নিউ এজ ইনস্টিটিউট অফ ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড হিউম্যন পোটেনশিয়াল।

আশিসকে এ সপ্তাহের অপারেশন ক্যানসেল করেতে বলেছে। কাল রাতের ফ্লাইটে চেন্নাই যাবে ওরা। দ্য নিউ এজের সব শাখার কর্ণধারও পৌঁছে যাবে কালকের মধ্যে। বলজিৎ কৌর এক সপ্তাহ আগেই গেছে বন্দোবস্ত করতে। অসুবিধা হলে ফোনে জানাচ্ছে। পৌঁছেছে মিঃ খাশনবিশও, গণ্যমান্যদের নিমন্ত্রণ করতে, মিডিয়াকে বলতে। উদ্বোধন করছেন স্বয়ং চেন্নাইয়ের মুখ্যমন্ত্রী। প্রধান অতিথি ইউনিয়ন এডুকেশন মিনিস্টার। কাগজে পুরো পাতার অ্যাড। মঙ্গলবার সকালে, উদ্বোধনের দিন বেরবে।

মোবাইলে খাশনবিশকে "সব কম্পপ্লিট?'

"মোটামুটি। লিস্ট ওয়াইজ সবাইকে বলা হয়ে গেছে"

"দেখো কেউ যেন বাদ না যায়"

“নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন ম্যাডাম”
“সিএমের সেক্রেটারির সঙ্গে ডবল কনফার্ম করেছ?”
“হ্যাঁ। উনি সেদিন সকালে ব্যাঙ্গালুরু থেকে ফিরবেন। কনফার্মড”
“মিডিয়া?”
“কার্ড তো আগেই পাঠানো হয়েছে। আপনার তৈরি প্রেস রিলিজ রেডি করছি। ফোন করে রিমাইন্ড করছি চিফ অফ ব্যুরোকে”
“দেখো কেউ বাদ না যায়”
“নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন”
বেশ কয়েকদিন অতীনের ফোন নেই। ইউজুয়ালি পারসোনাল ফোনেই করে। ফোন করলে উত্তর ‘দ্য মোবাইল ইজ সুইচড্ অফ’। কোথায় হাওয়া হয়ে গেল? মনে আশঙ্কা। খবর পেয়েছে দেহরাদুনের কাজ কমপ্লিট। হরিদ্বার থেকে ফোন করেছিল। দেহরাদুনে ফিরে আবার “সব ঠিক আছে ম্যাডাম” ব্যস। তারপরই বেপাত্তা। ভিত স্থাপনের অনুষ্ঠান হয়ে যাক। পরে খোঁজ নেওয়া যাবে। লোভী লোকটাকে খাইয়ে-পরিয়ে ভরিয়ে রেখেছে। পালাবে কোথায়? চিন্তার কারণ নেই।
আশিসকে ফোন। দুটো মোবাইলই সুইচড অফ। রিসেপশনে কোনওদিন ফোন করে না। ঘনিষ্ঠতার কথা জানাতে চায় না। দ্য নিউ এজে জড়িত কাউকেই নয়। হাউজ খাসের বাড়িরও নয়। তার নিভৃত পৃথিবীর সাক্ষী এই পুরুষ। দেহে নয়, প্রতি মুহূর্তে তার পাশে।
শুচিস্মিতা, মেখলার পর আশিসের জীবনে শুধু একটাই নারী। বৈবাহিক বন্ধনের বাইরে, চাওয়ার ভিতে, দেহ-মনের যুগলবন্দিতে, সর্বসত্তায়। লাখের মধ্যে সত্যি প্রেমের স্বাদ কজন পেয়েছে? তার রূপ, রস, ছন্দে প্রোজ্জ্বল একজনই, অতি কাছের ইন্দ্রাক্ষি। সামাজিক আখ্যা না থাক, বাঁধুনিও নয়। নিভৃতেই থাক তার কসমিক সহচর। তোমার মধ্যেই অন্তরের প্রকাশ। তোমার কিরণেই অন্তরের বিকাশ। তোমার শান্তির অন্তরালে মিশে থাক সর্বনাশ। জীবনের প্রতিটা কণাতেই ‘তুমি’।

খবরের কাগজটা তুলতে যাবে, দেখল চারটে পুলিসের গাড়ি বাড়ির গেটের সামনে। কী ব্যাপার? ইন্দ্রাক্ষি বারান্দার গদি থেকে উঠে দাঁড়াল। ততক্ষণে ছোটখাটো পুলিস বাহিনী নেমে পড়েছে। ডোর বেল।
বঙ্কিম এসে বলল “দিদিমণি অনেক পুলিস এসেছে”
ঠান্ডা স্বরে ইন্দ্রাক্ষি বলল “মেন গেট খুলে দাও”
পুলিসেরা নীচের ড্রাইভ-ইনে। দোতালায় এল দুজন। একজন আইডি কার্ড দেখাল “দেবাংশ ভর্মা। অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিস”
ড্রয়িং রুমের সোফার দিকে ইঙ্গিত করল “প্লিজ সিট ডাউন”
দাঁড়িয়েই বলল “ম্যাডাম, আর ইউ ইন্দ্রাক্ষি রায়চৌধুরী? দ্য ওনার অফ দ্য নিউ এজ গ্রুপ অফ কোম্পানিজ?”
“ইয়েস” মাথা নাড়ল।
“ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট” ওয়ারেন্টটা ওর হাতে দিল।
“অন হোয়াট গ্রাউন্ডস?”
“চার্জেস অফ সিরিজ অফ মার্ডারস সেকশন ৩০২ অ্যান্ড ৩০৮ আইপিসি”
“মার্ডার?” বিকারহীন মার্জিত স্বরে বলল “আর ইউ সিওর, ইউ আর নট মেকিং এ মিস্টেক?”
“উই হ্যাভ এনাফ এভিডেন্সেস এগেন্সট ইউ”
মুহূর্তগুলো যেন বছর। গলায় ঝোলানো চশমা দিয়ে ওয়ারেন্টটা পড়ছে। বঙ্কিম বুঝতে পারছে না ব্যাপারটা কী। দিদিমণি, মার্ডার! অদ্ভুত ঠেকছে। জয় অপরিচিত পুরুষদের দেখে ঘেউঘেউ চিৎকার করছে। বঙ্কিম

জয়ের গলা জড়িয়ে বেডরুমে নিয়ে বন্ধ করে দিল। পুলিস কেন দিদিমণির এখানে?

ওয়ারেন্ট পড়ে ইন্দ্রাক্ষি বলল “ক্যান আই রিং মাই ল্যইয়ার”

“বাই অল মিনস”

"হোয়ার ডু ইউ ওয়ান্ট টু টেক মি ফর ইন্টারোগেশন?”

“আওয়ার হেড কোয়াটার্স ইন আইটিও অফিস অ্যাট বাহাদুর শাহ জফর মার্গ”

“আই উইল আস্ক হিম টু কাম ওভার দেয়ার। বাট মাইন্ড ইউ, আই অ্যাম নট গোয়িং টু গিভ এনি স্টেটমেন্ট ইন হিস অ্যাবসেন্স”

“অ্যাজ ইউ প্লিজ”

ওয়ারেন্ট ফেরত দিয়ে চশমা নামিয়ে বলল “উড ইউ গিভ মি টু মিনিটস টু চেঞ্জ?”

“সিওর” দেবাংশ ভর্মা সোফায় বসল।

বেডরুমে ঢুকে ওয়ার্ডরোব থেকে বুটিকের কাজের সালোয়ার-কামিজ পরল। প্রসাধন লাগাতেও ভুলল না। আদরের জয়কে আদর করে বলল “ভালো থাকিস যতক্ষণ না ফিরে আসি”

বিহ্বল বঙ্কিমকে বলল “চিন্তা করো না। ওদের কোথাও ভুল হয়েছে। গিয়ে দেখি, কোথায়। ফেরত না আসা পর্যন্ত সব দেখে রেখো” পার্স থেকে এক বান্ডেল নোট দিয়ে বলল “ফেরত না আসা পর্যন্ত বোধহয় চলে যাবে”

বঙ্কিমের চোখ ছলছল। জয় চিৎকার থামিয়ে দিয়েছে। মালকিন অসুবিধায় বুঝতে পারছে। লেজ নাড়া বন্ধ করে গা ঘেঁসে দাঁড়াল। যাবার আগে ভালোবাসার শেষ ঘ্রাণটুকু নিতে। জন্তু-জানোয়ারের ভাষা তো বুঝি না, অনুভূতি বুঝতে পারি। তফাত সেখানেই। মানুষের ভাষা বোঝার চেষ্টা করি, মনকে নয়।

“ইয়েস মিঃ ভার্মা, লেটস গো”

ডিজি সুরেশ গুপ্তর ঘরে দেবাংশ বলল “ক্যান আই সি ইওর আইডেন্টিটি প্লিজ?”

ড্রাইভিং লাইসেন্স, প্যান কার্ড, ক্রেডিট-ডেবিট কার্ড বার করে দিল। দেবাংশ দেখা শেষ করতেই, ল্যইয়ার অঞ্জন মিত্র ঢুকল। ভয়েস রেকর্ডিং মেশিন চালিয়ে দিয়েছে সুরেশ গুপ্তে। বয়ান রেকর্ড করা হবে।

সুরেশ গুপ্তে শুরু করল “আই অ্যাম সুরেশ গুপ্তে, ডিজি অফ পুলিস। ইউ আর ইন্দ্রাক্ষি রায়চৌধুরী?”

“ইয়েস”

“ইউ ওন দ্য নিউ এজ অ্যান্ড অ্যাসোশিয়েটেড কোম্পানিজ?”

“ইয়েস”

“উই ব্রিং চার্জেস এগেন্সট ইউ ফর দ্য মার্ডারস অফ মেহুলি রায়, সোহম সান্যাল, সোফি চৌধুরী, অঙ্কুর জয়সওয়াল, শিবানী করঞ্জওয়ালা, সুনেত্রা আগারওয়াল, নীলকান্থ রঙ্গনাথন, পৌরভি কান্নান অ্যান্ড লোকেশ চাচা। হোয়াট হ্যাভ ইউ গট টু সে টু দ্যাট?”

“ডোন্ট হ্যাভ দ্য ফেইন্টেস্ট ক্লু অ্যাস হোয়াট ইউ আর টকিং অ্যাবাউট?”

“হ্যাভ ইউ বিন ইনভলভড উইথ দিস মারডার্স?”

“নো”

“হাউ উড ইউ ডেফাইন ইওরসেলফ? গিল্টি অর নট গিল্টি?”

“অবভিয়াসলি নট গিলটি। আই ডোন্ট ইভেন নো হোয়াট ইউ আর টকিং অ্যাবাউট” নিরুত্তাপ ইন্দ্রাক্ষি।

“উই হ্যাভ এনাফ এভিডেন্সেস টু প্রুভ ইউ আর ইনভলভ উইথ দিস মারডার্স”

পাশ থেকে অঞ্জন মিত্র বলল “স্যার ইওর এভিডেন্সেস মে কাইন্ডলি বি প্রডিউসড ইন কোর্ট”

“বাই অল মিনস। বাট বিফোর উই গো অ্যাহেড, আই ওয়ান্ট হার কনফেশন”

“আই হ্যাভ অলরেডি টোল্ড ইউ আই অ্যাম ইনোসেন্ট”

“হ্যাভ ইউ এনি জাস্টিফিকেশন ইন ইওর ফেভার?”

“হোয়েন আই হ্যাভ ক্লেমড আই অ্যাম ইনসেন্ট, দেয়ার ইজ নো নিড ফর জাস্টিফিকেশন”

“দ্য ওনাস লায়েস অন আস টু প্রুভ আওয়ার চার্জেস। সিন্স টুমরো ইজ সানডে, উই উইল হ্যাভ টু ডিটেন ইউ ইন কাস্টডি আনটিল মানডে টু প্রুভ ইট”

ইন্দ্রাক্ষি প্রতিবাদ করল “টিউসডে উই আর সেডুল্ড টু লে দ্য ফাউন্ডেশন স্টোন অফ আওয়ার নিউ ইনস্টিটিউট ইন চেন্নাই। অল অ্যারেঞ্জমেন্টস হ্যাভ বিন মেইড। ইট ইজ টু বি ওপেনড বাই দ্য চিফ মিনস্টার অ্যান্ড ইউনিয়ন মিনিস্টার ফর হায়ার এডুকেশন। অল দ্য ডিগনিটারিস হ্যাভ বিন ইনভাইটেড। আই হ্যাভ টু বি দেয়ার”

“ইট ক্যান হ্যাপেন ইন ইওর অ্যাবসেন্স” অঞ্জন মিত্রকে বলল “ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ফর বেল। আই অ্যাম সিওর ইট ওন্ট বি গ্র্যান্টেড”

বয়ান লিপিবদ্ধ করে প্রাইমা ফেসি কেস স্টার্ট করল। নিয়ে যাওয়ার আগে ইন্দ্রাক্ষি বলল “ক্যান আই টক টু মাই ল্যইয়ার অ্যালোন?”

“বাই আল মিনস” সম্মতি দিল ডিজি।

অঞ্জন বলল “ম্যাডাম, উনি ঠিকই বলেছেন। বেলের অ্যাপ্লাই করতে পারি। ফলপ্রসু হবে না। এটা ৩০২ ধারা”

“মিসেস কাউরকে জানিয়ে দেবেন। ওদের অ্যারেস্টের কথা বলবেন না। শুধু বলবেন, বিশেষ কাজের জন্য থাকতে পারছি না। এটা আমার জীবনের স্বপ্ন। ওরা আমাকে নিয়ে কী করে, সেটা পরের ব্যাপার। আমার স্বপ্ন যাতে থেমে যায়, সেটা দেখবেন। ওই ইনস্টিটিউটের মধ্যে লুকিয়ে আছে আগামীর ভবিষ্যৎ”

আটচল্লিশ

ইন্দ্রাক্ষি আশা করেনি ভোরটা এভাবে আসবে। ইতিহাস বলে, এভাবেই নতুন ভোর হয়। নতুন চেতনাকে চাপতে চায় গড্ডালিকা প্রবাহে রুদ্ধ সমাজ। যুগ যুগ ধরেই সেটাই হয়ে এসেছে। নতুন কী? গতের বাইরে ভাবলেই তুমি সমাজ শত্রু। একদিন তো কাঠগড়ায় দাঁড়াতেই হয়। সামাজিক বা মানসিক। ইন্দ্রাক্ষি কোন ছার? আগামীর স্বপ্নদ্রষ্টাকে বলিদান দিতে হবে, এটাই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, কালচক্রের নিয়ম। নিজেকে নিয়ে ভাবছে না। ভাবছে স্বপ্নের পরিণতি নিয়ে।

পরের দিন রবিবার পুলিস হেড-কোয়াটার্সের বোর্ডরুমে আনা হলে লক্ষ করল বাইরে অসংখ্য পুলিস। ঢুকতেই দেখল বোর্ডরুম ভর্তি। বেশিরভাগই পুলিসের লোক। সুরেশ গুপ্তে, দেবাংশ ভার্মা ছাড়াও বহু অফিসার। কাউকে চিনতে পারল না টেবলের অপর প্রান্তে বসা ডাঃ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া। মনে হল আশিস ভীষণ বিচলিত। এসি ঘরেও ঘনঘন রুমালে ঘাম মুছছে। সাদা ক্যানভাসের মতো ফ্যাকাশে মুখ। শ্যামলা রং খালি চিত্রপটের আকার ধারণ করেছে।

ইন্দ্রাক্ষি অবিচলিত। ধীর পদক্ষেপে প্রবেশ করল। ভাবলেশহীন অবয়ব, নির্বিকার। দু-দিন হাজতে কাটিয়ে বিচলিত মনকে নিরালায় শান্ত করেছে।

কে সারা সারা

হার মানা হার গলায় না পরেও সে মনের সাম্রাজ্ঞী। আশিসের মতো বিখ্যাত প্লাস্টিক সার্জেন তার সব কাজেই জেনে-বুঝে সহায়তা করেছে। যোনিসুখের বাইরে, অন্তরের পূর্ণ নিবেদনে। প্রতি পদক্ষেপে থেকে গেছে অন্তরালে। নতজানু পুরুষের কামনার মার্গ থেকে জীবনের এক্কাদোক্কায়, রানির আসনে। তুচ্ছ শৃঙ্খলার বন্ধনে নয়, সুদূরপ্রসারী নতুন চিন্তার আসরে। পথের কাঁটা সরাতেও প্রথা ভেঙে বেরতে পেরেছে তীক্ষ্ণ চিন্তাধারার ব্যবহারিক প্রয়োগে। ইনটেলিজেন্ট কোসেন্ট ও ইমোশনাল কোসেন্টে এরা শিশু। মানসিক সাম্রাজ্ঞীর যুগান্তকারী আসনে বসে বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। নতজানু হয়ে বেরিয়ে আসাও নয়। যেখানে ছিল, সেখানেই আছে, থাকবেও।

ব্যারিস্টার অঞ্জন মিত্রকে এলাউ করেছে লিগ্যাল গ্রাউন্ডসসে। কোর্টে যখন কেস উঠবে তাকেও সবকিছু জানতে হবে।

সুরেশ গুপ্তে চেয়ারে ইঙ্গিত করল "প্লিজ মেক ইওরসেলফ কমফার্টেবল"

বসতে গিয়ে লক্ষ করল, পেছনে দুজন সশস্ত্র পুলিস। ভাবলেশহীনভাবে চেয়ার টেনে বসল। বোঝাও যায় না সে চরমতম মুহূর্তে। এতটাই নির্বিকার। ছাপোষা মানুষের আক্রমণের স্পৃহাতে করুণা হচ্ছে।

যুগে যুগে এটাই হয়েছে। কে না বাদ গিয়েছে প্রকোপ থেকে? মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল সোক্রেটিসকে। পারসিক ধর্মের প্রবর্তক জরথ্রুস্টকে খুন করা হয়েছিল। দেশদ্রোহিতার জন্য যিশু খ্রিস্টও দেশ থেকে বহিষ্কৃত। গৌতম বুদ্ধও বিতাড়িত গোঁড়াদের পলিটিক্সে। গ্যালেলিওকে ফাঁসির মঞ্চে। জোয়ান অফ আর্ককে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। শিখ ধর্মের রঞ্জিৎ সিংও বাদ পরেননি। চার্লস ডারউইনকে বিতাড়িত করেছিল চার্চ অফ ইংল্যান্ড। কাহিনি আদি অনন্ত কালের। ইন্দ্রাক্ষি কোন ছাড়।

আজ নয় কাল হওয়ারই ছিল। যারা নতুনের প্রবক্তা, নতুন কথা বলেছে, নতুন সুরে ভেবেছে, নতুন চিন্তা এনেছে, সকলেরই এক পরিণতি। সবার মতো ইন্দ্রাক্ষিকেও ইতিহাসের হাত ধরে এ পথেই হাঁটতে হবে। নতুন চিন্তার অবশ্যম্ভাবী পাথেয়। আজকের কাঁটা কাল ফুল হয়ে ফুটবে বরণযজ্ঞে। যারা শাস্তি দেয় বা শোনায় তারা কালের বলয়ে সীমাবদ্ধ। যারা শাস্তিকে বরণ করে, যুগ-যুগান্ত ধরে তারাই অমর ইতিহাসের

পাতায়। এই নতুন প্রবর্তনের ধর্মযুদ্ধে কত প্রাণ গিয়েছে। সেও তো নতুনের প্রবর্তক। রূপায়ণের বিঘ্নে কয়েকটা বলিদান আশ্চর্য কিছু নয়।

সুরেশ গুপ্তে ইন্দ্রাক্ষিকে বলল "দ্য পিপল অ্যাসেম্বল্ড হিয়ার আর অল চিফস অফ পোলিশ ডিপার্টমেন্টস অফ ডিফারেন্ট স্টেটস। উই হিয়ারবাই চার্জ ইউ উইথ কনস্পিরেসি অ্যান্ড মার্ডার ইন ডিফারেন্ট পার্টস অফ ইন্ডিয়া। ইন বেঙ্গল ইট ইস মেহুলি রায় অ্যান্ড সোহম সান্যাল" সামনের কাগজটা দেখে পড়ে যাচ্ছে "ইন মহারাষ্ট্রা সোফি চৌধুরী, অঙ্কুর জয়েসোয়াল, শিবানী করঞ্জওয়ালা অ্যান্ড সুনেত্রা আগারওয়াল। ইন দ্য সাউথ নীলকান্থ অ্যান্ড পৌরভি। অ্যান্ড ইন দেহরাদুন লোকেশ চাচা। উই হ্যাভ ফুললি ইনভেস্টিগেটেড দ্য মেথডলজি বাই হুইচ ইচ অফ দিস মার্ডাস ওয়ার কমিটেড। উই উইল প্রডিউস ইট উইথ এভিডেন্সেস ইন দ্য কোর্ট অফ ল্য ইন ডিউ টাইম। উই হ্যাভ অলসো অ্যারেস্টেড টু অফ ইওর অ্যাকমপ্লিসেস নেমলি অতীন রায় হু ওয়াজ ডিরেক্টলি ইন সাম কেসেস, ইনডিরেক্টলি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দিস ওয়েল-থট হিনিয়াস ক্রাইমস অফ ইনোসেন্ট ভিক্টিমস। অ্যান্ড ইওর গুড ফ্রেন্ড ডাঃ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় হুম ইউ ক্যান সি সিটিং অ্যাট দ্য আদার এন্ড" আশিসের দিকে ইঙ্গিত করল।

ইন্দ্রাক্ষি নির্বিকার। শুনে যাচ্ছে। হাতে হাতকড়া নেই, তবে ব্যাগটি বাজেয়াপ্ত করেছে। হাত দুটো কোলে রাখা।

গুপ্তে বলে চলেছে "হিয়ার উই উইল নট গেট ইনটু দ্য নিটি গ্রিটিস অফ ইচ মার্ডার, হুইচ উইল বি প্রডিউসড অ্যাট দ্য কোর্ট অফ ল্য উইথ দ্য এভিডেন্স। দ্য অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ কলকাতা উইল হাইলাইট দ্য মোটিভ বিহাইন্ড দ্য মারডার্স, অ্যাজ হি হ্যাস বিন দ্য মেন ব্রেন টু সাম দেম আপ। হি হ্যাজ ডিরেক্ট এভিডেন্সেস লিডিং টু ইওর অ্যারেস্ট"

ডিজির পাশে বসা মধুসূদনের জীবনে এত গণ্যমান্য পুলিস অফিসারদের মধ্যে বসার সৌভাগ্য দূরে থাক, দাঁড়িয়ে দু-কথা বলার সুযোগ কখনও হয়েছে কি না সন্দেহ। বলাটা বড় নয়। ইংরেজিতে বলতে হবে বলেই চিন্তা। ইংরেজি পড়তে লিখতেও পারে। স্পিচ! কশ্মিনকালেও ভাবেনি। জীবনে যা করেনি, আজকে তাই করতে হবে। পল্টুর দোকানের শনিবারের আড্ডার কথা মনে পড়ল। কত তক্কের ঝড় বইয়েছে। এ পল্টুর আড্ডা নয়, দিল্লির মসনদ। পুলিসের উর্দিতে বিশ্লেষণ। স্নেহাশিসের দিকে তাকাল। কনভেন্টে পড়া স্নেহাশিস বুঝতে পারছে ওর সংশয়। এই চক্রের অনেক তদন্তের কান্ডারি হলেও, শেষ খেলাটা মধুসূদনের। ওর হয়ে বলা মানে ওর যোগ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত করা।

ওর হাতে চাপ দিয়ে বলল "ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আপনি বলুন। আজকে আপনার দিন। ভাষা নিয়ে ভাববেন না। ইংরেজি আমাদের মাতৃভাষা নয়"

স্নেহাশিসের আশ্বাসে ভরসা পেল। ছোটবেলায় পড়েছিল এভরি ডগ হ্যাস ইটস ডে, আজ তার দিন। ভুলে গেল দিল্লির হেডকোয়ার্টসের বোর্ডরুমে কারা বসে।

গুছিয়ে বাংলামেশা ইংরেজিতে বলল "বিফোর আই সাম আপ দ্য কেস আই থ্যাংক দ্য পুলিস অফ ডিফারেন্ট স্টেটস লাইক স্নেহাশিস চ্যাটার্জি, রোশান, দিলওয়ান সিং অ্যান্ড আদার্স। দেয়ার ডাইভার্জেন্ট ইনভেস্টিগেশনস ফাইন্যালি গেভ মি দ্য আইডিয়া অফ লিঙ্কিং দিস কমপ্লেক্স কেস টুগেদার। টু সাম আপ, দ্য ভিক্টিম অ্যাস পার সাইকিয়াট্রিক গাইডলাইনস ইজ অ্যান অবসেসিভ কম্পালসিভ পারসোন্যালিটি, টাইপ আর, এ রেসিলিয়েন্ট ভ্যারাইটি। সি হ্যাস বিটার চায়েল্ডহুড হুইচ সি ওয়ান্টস টু ফরগেট। ইন সাইকিয়াট্রিক টার্মস ইজ কলড সাব্লিমেশন। দিস লেড টু হার অ্যাচিভমেন্টস মেটিরিয়ালি, অ্যান্ড অ্যাট এ লেটার স্টেজ টু এ নন-মেটিরিয়ালিস্টিক আপলিফমেন্ট। টু পারসিউ হার নন-মেটিরিয়ালিস্টিক আপলিফটমেন্ট, সি ওয়ান্টেড টু ক্রিয়েট এ প্রোজেনি অফ আইডিয়াল চায়েল্ডহুড ব্লসমিং আন্ডার অপটিমাল কেয়ার। ... ইন এ রিঅ্যাকশন টু দিস, সি ওয়ান্টেড টু ইকুয়েট এ ব্রিলিয়েন্ট মেল অ্যান্ড এ বিউটিফুল ফিমেল ফোর্সিবলি, টু ম্যাচ হার নোন ডিসায়ার্ড গোলস। দিস সাব্লিমেশন অ্যাটিচুড অফ হার, ম্যানিফেস্টেড ইন হার মাইন্ড, ইন দ্য ফর্ম অফ

প্রডিউসিং অ্যান আইডিয়াল প্রোজেনি হু উড রুল দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়ান ডে। হুসোএভার রিফিউজড টু কাম ইন টার্মস উইথ হার ওন ভিশন অফ দ্য ফিউচার। সি এলিমিনেটেড দেম ইন হার ওন ওয়ে, উইথ দ্য মেডিক্যাল হেল্প অফ ডক্টর আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, হার ফ্রেন্ড অ্যান্ড ফিয়াসে। দেয়ার সিমস টু বি এ কসমিক বন্ডেজ বিটুইন দ্য টু। গোয়িং ব্যাক টু হিস্ট্রি ইট রিসেম্বলস দ্য ইজিপশিয়ান মিথলজি। ইন দিস, কসমিক পার্টনারশিপ উইথ হার, ডক্টর আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় হেল্পড হার কমিট দোস হিনিয়াস ক্রাইমস উইদাউট ইভেন কোয়েশ্চেনিং হার অ্যাকশনস"

মনে মনে ধন্যবাদ দিচ্ছে ডাঃ অনঙ্গ দত্তকে মোটিভ বোঝানোর জন্য।

"দেয়ার ওয়াজ এ কনফ্লিক্ট ইন হার সোল, উইদাউট হার নলেজ। দিস মে বি রিলেটেড টু হার আপ-ব্রিঙ্গিং অর হার ইন্টার‍্যাকশন উইথ দ্য সোসাইটি ইন চায়েল্ডহুড। দ্য কনফ্লিক্ট অফ মোটিভস উইদাউট কন্ট্রাডিকশন ফর্মস ফ্রম থ্রি ফ্যাক্টরস। দ্য লেডি হিয়ার ক্যালকুলেটেড অ্যান্ড ডিসাইডেড, হুইচ ফলোড দ্য ডিসায়ার অর অ্যাপেটাইট, অফ এ সেন্স অফ বেয়ার ফিজিক্যাল অ্যান্ড ইনস্ট্যান্টিভ ক্রেভিং। দিস লেড হার টু অ্যাম্বিশন, ইনডিগনেশন অ্যান্ড এন্টারপ্রাইজ ক্রিয়েশন, হুইচ রেজাল্টেড ইন এ কনফ্লিক্ট উইথ হার আনথিংকিং ইম্পালস। লিডিং টু দ্য মারডার্স। দো সি ভিশনালাইজড দ্য মারডার্স ইন হার ওন স্কিলফুল মাইন্ড, সি ওয়ান্টেড টু গ্র্যামারটাইজ হার ভিশন ইন দ্য ফর্ম অফ অ্যান ইনস্টিটিউশন হুইচ আই অ্যাম টোল্ড ইজ ওপেনিং ইন চেন্নাই টুমরো। দ্য নিউ এজ ইনস্টিটিউট অফ ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড হিউম্যান পোটেনশিয়াল। দিস ইজ নাথিং বাট হার অবসেসিভ কম্পালসিভ থিংকিং, সো দ্যাট নো ফার্দার মারডার্স উইল বি কমিটেড, ওয়ান্স হার থট প্রসেস ইজ বিইং পুট ইনটু প্র্যাকটিস ইন দ্য ফর্ম অফ অ্যান ইনস্টিটিউট"

সুরেশ গুপ্তে বাধা দিল "উই হ্যাভ টু স্টপ দিস ইমিডিয়েটলি"

মধুসূদন সুরেশ গুপ্তেকে বলল "স্যার, ইউ ক্যান স্টপ অ্যান ইনস্টিটিউট, বাট ইউ কান্ট স্টপ হার থট প্রসেস। অন দ্য আদার হ্যান্ড দিস ইনস্টিটিউট মাইট স্টপ ফার্দার কিলিংস"

সুরেশ গুপ্তে বলল "উই কান্ট হ্যাভ এ মার্ডারেস ফর্মিং অ্যান ইনস্টিটিউট। ইট উইল সেন্ড রং সিগন্যালস টু দ্য সোসাইটি। ভওয়ানিশঙ্কর অ্যান্ড চতুর্বেদী হ্যাভ টু বি পুট আন্ডার স্ক্যানার টু, ফর ফার্দার ইনভেস্টিগেশনস"

মধুসূদন বসে পড়ল। যা বলার বলে দিয়েছে। যা করার ওরা করবে। ইন্দ্রাক্ষি চুপ করে ছিল। নিরুত্তাপ মুখ থেকে জ্যোতি ঠিকরে বেরচ্ছে। কোলে রাখা বাঁ হাতটা, ডান হাতের ঘড়ির বোতামে রেখে দৃঢ় স্বরে বলল "ইউ কান্ট। ইউ ক্যান অ্যারেস্ট মি, ডু হোয়াটেভার ইউ লাইক উইথ মি, বাট ইউ কান্ট স্টপ মাই ভিশন অফ দ্য ফিউচার। ... মিস্টার গুপ্তে ইফ ইউ ট্রাই টু ডু সাচ এ থিং, ইউ উইল হ্যাভ টু পে দ্য প্রাইস অফ ইন্টারফিয়ারিং উইথ মাই ভিশন অফ দ্য ফিউচার"

ইন্দ্রাক্ষির রক্তচক্ষুতে পেছনের পুলিস সজাগ। বাইরের সশস্ত্র পুলিস বাহিনী ঘরে ঢুকছে। ঘিরে ফেলেছে ইন্দ্রাক্ষিকে।

সুরেশ গুপ্তে শান্ত দৃঢ়ভাবে বলল "ইউ আর ইন আওয়ার কাস্টডি। ইউ ক্যান ড্যু নাথিং নাউ"

ইন্দ্রাক্ষি ওর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল "ইফ দ্য নিউ এজ ইনস্টিটিউট অফ ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড হিউম্যান পোটেনশিয়াল ডস নট সি দ্য ডে লাইট, মাই ফিলসফি উইল। ইভেন ইফ, আই অ্যাম ইন ইওর কাস্টডি। ইউ ওয়ান্ট টু সি? আই উইল সো ইউ" বলে ডান হাতের ঘড়ির বোতামে টান মারল। কেউ দেখেনি ওর কোলের হাত কী করছে। হেসে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল "জাস্ট দিস মোমেন্ট। এ মার্ডার হ্যাস বিন কমিটেড সামহোয়ার ইন ইন্ডিয়া। ইফ ইউ হ্যাভ অল দ্য পাওয়ার, ট্রাই টু প্রিভেন্ট ইট। আই অ্যাম সিটিং হিয়ার। আই উইল ডু নো হার্ম টু মাইসেলফ অর এনি অফ ইউ। গো অ্যাহেড। স্টপ ইট। দিস ইজ মাই চ্যালেঞ্জ"

ভাবলেশহীন সাম্রাজ্ঞীর মতো বসে। যদিও মন অট্টহাস্যে মুখরিত এই ভেবে, ওরা যাই করুক না কেন, দ্য নিউ এজকে বন্ধ করে দিলেও, ওর স্বপ্ন যে তলেতলে বহু ইচ্ছুক যুবক-যুবতীর মিলনে থেকে গেছে

আগামীর সাজোয়া বাহিনী হয়ে। তুমি নামে মধুসূদন হতে পারো, তুমি তো সত্যিই অন্তর্যামী নও। ঠোঁটের কোণে এক মোনালিসার হাসি।

দেবাংশ ভার্মা বেরিয়ে গেছে সেন্ট্রাল কন্ট্রোল সেন্টারে রেড এলার্ট দিতে, গোটা দেশজুড়ে। সুরেশ গুপ্তে বিশ্বাস করতে পারছে না। ইন্দ্রাক্ষি হয়ত শেষ আস্ফালন করে নিচ্ছে। মধুসূদন ভাবছে, ওরা যাই ভাবুক, এই মহিলার পক্ষে চ্যালেঞ্জ দিয়ে করে দেখানো বড় কথা নয়।

কারণ ইন্দ্রাক্ষি যে সে নয়। অবসেসিভ কম্পালসিভ পারসোনালিটি - টাইপ আর।

ঊনপঞ্চাশ

মধুসূদন মুখুজ্জে পুবের জানলটা খুলে দিল। দক্ষিণের জানলাটা তো রোজই খোলা হয়। দক্ষিণা বাতাস, আলো আসে। জানলার পাশে বেতের আরাম কেদারা রাখা বলে পুবের জানলা খোলার প্রয়োজন হয়নি। সকালে, গিন্নি হেঁসেলের কাজে ব্যস্ত থাকে বলে, সেও গা করে না। কাল রাতে দিল্লির ফ্লাইট পৌঁছেছে। উদগ্রীব গিন্নির সঙ্গে গল্প করে শুতে রাতই হয়ে গেছিল। সকালে উঠতেও দেরি হয়েছে। অনেকদিন না খোলাতে জানলাটা খুলতে অসুবিধে হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত ধাক্কা দিয়ে কসরত করতে খুলে গেল। ভেসে এল দিনের প্রথম মার্জিত সূর্যকিরণ।

প্রতিদিন ভোরে রিটায়ারমেন্টের কথা ভেবে, জীবনের পশ্চিমই ভেসে উঠত এতকাল। বহুবছর পর পুবের আলোর আমেজ সুখদায়ক। কেন যে এতদিন জানলাটা খোলেনি? খুললে বুঝতে পারত, জীবনের পুবটা বন্ধ জানলার মতো নিজেই রুদ্ধ করে রেখেছিল। সারা জীবনের ব্যর্থতার নাগপাশ, শিথিল আকাঙ্ক্ষায় অজান্তে সূর্যগ্রহণ ঘটিয়েছে। ক্রমশ গ্রাস করছিল চাওয়া-পাওয়া, দেখা-অদেখার সূক্ষ্ম কণাগুলোকে। রিপোর্ট সাজাতে গিয়ে নিজেও পুরনো পাণ্ডুলিপি।

শনিবারে পল্টুর দোকানের আড্ডা বৈচিত্র্যহীনতায় একফালি আকাশ। সেখানে সন্তর্পণে মেঘের ছায়া ঘনীভূত হচ্ছিল। মুক্তিহীন নিস্পৃহ জীবন। অর্থহীন জীবনে মন রসদ খুঁজছিল। জানত না, এই অর্থহীনতার মধ্যেই সার্থকতা। কার জীবন অর্থহীন, কারটা অর্থপূর্ণ, বোকার মতো হিসেব কষার চেষ্টা। চোখ চাই দেখার। দৃষ্টিটা ঈশ্বরেরই দান। কাকে, কখন, কীভাবে, কীরূপে দেখায়। অজান্তে আগুনের ফুলকিটা ইশ্বরই জ্বালিয়ে দেন। কখন তার প্রকাশ একমাত্র জীবনের স্ক্রিপ্ট রাইটারই জানেন।

গিন্নিকে হাঁক দিল "চা হবে?"

"দিচ্ছি" হেঁসেল থেকে উত্তর।

শুধু চা নয়, বহুদিন পর বিস্কুটও। অবাক, আজ এক্সট্রা খাতির। অনেকদিন পায়নি। কিছু বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ মোবাইল "আমার নাম তমোনাশ দাশগুপ্ত। ইউরো টিভি থেকে বলছি। যদি দয়া করে আজ বিকেলে টিভিতে লাইভ ইন্টারভিউত দেন"

"ক'টায়?"

"সন্ধে সাতটায়। সাড়ে ছটার মধ্যে স্টুডিওতে চলে আসবেন। গাড়ি পাঠিয়ে দেব"

"ঠিক আছে" ফোন কেটে দিল।

গিন্নি জিজ্ঞেস করল "কে গা?"

"টিভি থেকে ফোন। সাতটায় লাইভ ইন্টারভিউ"

ক্রমশ বর্ধিত গিন্নির উজ্জ্বল মুখে হাসি। স্বামীর জন্য গর্ব হচ্ছে। পাড়ার ক'টা বউ-এর স্বামীকে টিভিতে দেখা গেছে? তার গর্ব হবে না, তো কার হবে? তার স্বামী এখন যে সে লোক নয়। রীতিমতো সেলিব্রিটি।

শাড়িটা ঠিক করে বলল "সত্যি!" বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না। সারাজীবন দেখল না লোকটাকে কিছু করতে। শেষে ওস্তাদের মতো সবাইকে ছাপিয়ে বাজিমাত। ওকে আরামে চা-বিস্কুট খেতে দিয়ে বেরবার আগে একগাল হেসে বলল "এখন থেকে আর সিরিয়াল দেখব না গো। তোমাকেই দেখব"

হাওয়াহীন পুরনো পাখার ক্যাঁচক্যাঁচে আওয়াজে ঘামও লুঙ্গি দিয়ে মুছতে হচ্ছে না। সকালের মিস্টি রোদ উপভোগ করছে। সঙ্গে বউ-এর হাতের চা-বিস্কুট। যেমন আদর করে বিয়ের পর চা এনে দিত। স্বাদ যাই

হোক, গিন্নির স্পর্শে অমৃত হয়ে উঠত। আজও একই অমৃতের স্বাদ। পালটে গেছে অস্তিত্বের স্বীকৃতি। সেখানেই শান্তি, পরিতৃপ্তি।

আশ্চর্য লাগছে, কাল বোর্ডরুমে একটানা ইংরেজি গণ্যমান্যদের সামনে কীভাবে বলল। ভয় থাকলেও ইশ্বর স্নেহাশিসের হাত ধরে তরী পার করিয়ে দিল। চা শেষ করে বেতের টেবল থেকে খবরের কাগজ দেখল। প্রথম পাতায় ইন্দ্রাক্ষি আর আশিসের ছবির সঙ্গে ক্যাপশন 'অভিনব খুন চক্র ধরিয়ে দিল কলকাতার পুলিস'। পরে সব ঘটনার বিবরণ। মধুসূদন মুখুজ্জের নামও, কান্ডারি হিসেবে। কখনও ভেবেছিল, পল্টুর দোকানের শনিবারের আড্ডা একদিন পৌঁছবে দিল্লির মসনদে? তার নাম কাগজের প্রথম পাতায় জ্বলজ্বল করবে। খুঁটিয়ে দুবার নিজের কীর্তির বিবরণ পড়ল।

টিভি খুলতেই 'ব্রেকিং নিউজ', রাতে দিল্লির মিন্টু রোড অঞ্চলে উঠতি মডেলের বোমা ফেটে মৃত্যু। চ্যানেলে সার্ফ করছে। সব চ্যানেলের ওবি ভ্যান মিন্টু রোডের বাড়িতে। বীভৎস ছিন্নভিন্ন হওয়া তরুণী। গা ঘিনঘিন করে উঠল। পুলিসে কত মৃত্যু দেখেছে। তবুও এই মৃত্যু ভয়াবহ, বীভৎস, মর্মস্পর্শী।

কাল যখন ইন্দ্রাক্ষির মানসিকতা উন্মোচন করছে, তখন ও দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিল 'ইফ দ্য নিউ এজ ইনস্টিটিউট অফ ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড হিউম্যান পোটেনশিয়াল ডস নট সি দ্য ডে লাইট, মাই ফিলসফি উইল। ইভেন ইফ, আই অ্যাম ইন ইওর কাস্টডি। ইউ ওয়ান্ট টু সি? আই উইল সো ইউ'। চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেছিল 'জাস্ট দিস মোমেন্ট। এ মার্ডার হ্যাস বিন কমিটেড সামহোয়ার ইন ইন্ডিয়া। ইফ ইউ হ্যাভ অল দ্য পাওয়ার, ট্রাই টু প্রিভেন্ট ইট। আই অ্যাম সিটিং হিয়ার। আই উইল ডু নো হার্ম টু মাইসেলফ অর এনি অফ ইউ। গো অ্যাহেড। স্টপ ইট। দিস ইজ মাই চ্যালেঞ্জ'

ওরা বিশ্বাস করেনি। যদিও রেড অ্যালার্ট দিয়ে ভারতের পুলিসকে সতর্ক করেছিল। মন বলছিল ও পারে। কীভাবে কেউ কী করে জানবে? জানলেই বা কতটুকু করতে পারত? বলবার চেষ্টাও করেছিল, ইন্দ্রাক্ষিকে চেনে। তোমরা আমায় ধরতে পার। আমার দর্শন, ভাবনাকে রুখতে পারবে না। যা আগামীর ছবি আঁকবে। ভারতের এক শহরে খুন হবে। আমি এখানে বসে খুনটা করব। ক্ষমতা থাকে তো রোকো। পারেনি। মধুসূদনের আন্দাজ তাহলে সত্য প্রমাণ হল। ওরা রুখতে পারবে না জানত। কীভাবে হবে, অনুমান করতে পারেনি। পুলিস হেফাজতে ইন্দ্রাক্ষির বেপরোয়া দৃঢ়তা, বলিষ্ঠতা, নিরুদ্বিগ্ন প্রত্যয়। হেরেও হার না মানা। টিভির খবর তারই পরিণাম।

মাথা ধর থেকে আলাদা হয়ে আলমারির কোণে। অঙ্গের অংশ খাটের ওপর। আরেকটা জানলার কাঁচ ভেঙে বাইরে। অন্যাটা বাথরুমের বেসিনের নীচে। ধড়টা ঝাঁঝরা হওয়া পোড়া মাংসপিণ্ড। এও দেখাতে হয় টিভিতে? সত্যি খবরের চাক্ষুষ দৃশ্যায়ন? না বাড়তি মাইলেজের বিকারগ্রস্ত বিবরণ? নীচের পর্দায় 'লাইভ' কথাটা। পৃথিবী কোন দিকে এগোচ্ছে। খুন যে করে, সেই কি উর্বর বিকৃতির আদর্শ উদাহরণ? না যারা সে খুন দেখায়? তারা একই মানসিকতার অন্য নিদর্শন।

একটা চ্যানেলে রিপোর্টার বলছে "আমরা জানতে পেরেছি, যে মেয়েটির ক্ষতবিক্ষত দেহটা আপনারা দেখছেন তার নাম আন্দ্রেয়া। মডেলিং দুনিয়ার নতুন মুখ। সে আর নেই। কী করে যে এমন তরতাজা প্রাণের মৃত্যু ঘটল, সবার মনে একটাই জিজ্ঞাসা। এ কি কালকের চক্রের নায়িকার নতুন প্রলয়?"

আরেকটা চ্যানেলে "যদি এই মৃত্যু ওই চক্রের অংশ হয়ে থাকে, তার কান্ডারিরা পুলিস হেফাজতে থাকা সত্ত্বেও কী করে ঘটল এই মৃত্যু? আমাদের পুলিসি ব্যবস্থা কী কোনও সুরক্ষা দিতে পারল না এই সুন্দরীকে? কার ওপর আমরা ভরসা করব?"

টিভি বন্ধ করে দিল। এরপর অনেক গল্প জুড়ে চ্যানেল স্লট ভরবে। অনেক তত্ত্ববিদ, জ্ঞানীগুণী টিভিতে বসে পড়বে। লাইভ চ্যাটে স্পেকুলেশন চলবে। কারও বা শ্রাদ্ধ, নীতি-দুর্নীতির গালভরা তত্ত্ব। দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য। সারাদিনের চ্যানেল চালাতে মশলা না থাকলেও, ঢালতে হবে। রঙিন করে বিক্রি করতে হবে চাঞ্চল্যকর নতুন খবরের পশরা। পেছনে স্পন্সরসিপের বিজ্ঞাপনী বাহার। অনেক প্রশ্ন নিয়ে জল্পনা-

কল্পনা হবে। আসলটা চাপা পড়ে যাবে স্বল্পজ্ঞানীদের জ্ঞানগম্ভীর স্পেকুলেটিভ প্রলাপে। আজকের চাঞ্চল্য মুছে যাবে। যদি কখনও আসল উন্মোচিত হয়, আবার শুশুকের মতো উঁকি মারবে টিভির পর্দায় আরেকটা ব্রেকিং নিউজ হয়ে। অ্যাডের লক্ষ্মী চ্যানেলে ঢুকবে সেনসেশনকে কেন্দ্র করে। কোটি কোটি টাকা খেলবে আরও সুন্দরীর মৃত্যুর হাটে। মারা গেছে আন্দ্রেয়া। আর ফিরবে না এই বিকিকিনির হাটে। তার হতভাগ্য পরিবার তামাশার ক্লান্তিতে, টিভি বন্ধ করে, নিঃশব্দ চোখের জল ফেলবে। ফিরবে না তাদের ফুটফুটে মেয়েটা, হারানো স্বপ্নের পৃথিবীটা।

মধুসূদন ফোন করল ডাঃ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের রিসেপশনে "মধুসূদন মুখুজ্জে, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ পুলিস"

"বলুন স্যার" রোজগারহীন মেয়েটির করুণ কণ্ঠস্বর।

"আন্দ্রেয়া গুলাটি কী কখনও ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে অপারেশন করিয়েছিল?"

"এক মিনিট স্যার। কম্পিউটার দেখে বলছি"

কয়েক মিনিটের স্তব্ধতা। মনের চিত্রপটের সায়েনটিফিক ব্যাখ্যার শেষ ভেরিফিকেশন করছে।

"হ্যাঁ স্যার। গত বছর আগস্ট মাসে"

"কী অপারেশন?"

"বাইল্যাটারাল ব্রেস্ট অগমেন্টেশন উইথ লাইপোসাকশন। পরে চেম্বারে লিপ অগমেন্টেশনও করিয়েছিল"

"ধন্যবাদ" ফোন কেটে দিল।

ধূসর চিত্রপটে আন্দ্রেয়ার মৃত্যুর ছবি আঁকা হয়ে গেছে। ওরা আন্দ্রেয়ার মৃত্যুর কথা বলছে। ও দেখতে পাচ্ছে কী করে মৃত্যু হল।

এতদিন পুবের জানলাটা খোলা হয়নি। আজই প্রথম। অঙ্কটা সোনালি সূর্যের মতো ঝরঝরে পরিষ্কার। বাইল্যাটারাল ব্রেস্ট অগমেনটেশন করার সময় একটি রিমোট কনট্রোল বোমা ব্রেস্টে ইমপ্ল্যান্ট করে দিয়েছিল। ইন্দ্রাক্ষির শেষ তুরুপের তাশ। বোর্ডরুমে ওর সঙ্গে কিছুই ছিল না। তাসটা খেলল কী করে? ওর পরনে সালোয়ার-কামিজ, গলায় সোনার লকেট, হাতঘড়ি। এ বিস্ফোরণ সম্ভব রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে। সব বাদ দিলে যে ইলেকট্রনিক ডেভাইস ওর কাছে ছিল তা হাতঘড়ি। এই ঘড়ির মধ্যে দিয়ে সে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। ওই ঘড়িতেই ছিল রিমোটটা।

ঠিক সাতটায় ইউরো টিভির লাইভ ইন্টারভিউ শুরু হল। অনেকদিন পর আবার ইউনিফর্মে। দেখছে বহু দর্শক। শুনছে অজস্র। গিন্নি পাড়ার অন্যান্য মহিলাদের নিয়ে টিভির সামনে। আজ শুধু মধুসূদনই তারকা নয়। গিন্নিও নিজের গণ্ডিতে।

কম্পেয়ারার জিজ্ঞেস করল "আপনি এসব করলেন কী করে?"

কথাটা এড়িয়ে মধুসূদন উলটো প্রশ্ন করল "পুরনো কথাই বলাবেন? না নতুন কিছু শুনতে চান?"

মেয়েটি বলল "আপনার কথা বলুন। দর্শক আপনার কথা শুনতে চায়"

"যে খুন নিয়ে আপনারা পর্যবেক্ষণ করছেন, তার বীজ পোঁতা অনেক আগে"

"কী করে?"

"মেয়েটি ব্রেস্ট অগমেন্টেশন করায় ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে। সেই সময় রিমোট কন্ট্রোল বোমা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল ওর বুকে"

"বিস্ফোরণটা কী করে হল?"

"কালকে দিল্লিতে যখন আমি বিশ্লেষণ করছিলাম, ইন্দ্রাক্ষি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল একটা মৃত্যু হবে ভারতের কোথাও। খবর দেখে মনে হল ওর হাতের ঘড়ির বোতাম ছাড়া আর কীভাবে হতে পারে?"

"বোতামে রিমোট কন্ট্রোল!"

"ঠিক তাই। স্বপ্নেও ভেবেছেন আততায়ীর সূক্ষ্মবুদ্ধির কথা?"

গর্বে গিন্নির বুক ভরে যাচ্ছে। স্বামী যে এত চিন্তাশীল এত বছরের বিবাহিত জীবনেও জানেনি। আজ বহু বছর পর স্বামীকে নতুন করে চিনছে। নিজেরই লজ্জা লাগছে। এত বছর পার করে দিল হাতে হাত ধরে। তবুও তাকে চেনা বাকি ছিল।

বাপিকে টিভিতে দেখে মধুসূদনের মেয়ে টেপি বারোডায় হাততালিতে মুখরিত। অবশেষে বাবা তার যোগ্য সম্মান পেয়েছে। ওর দু-বছরের ছেলে, না বুঝে, অবাক চেয়ে মার দিকে। ভাবছে মার আবার হঠাৎ কী হল?

উপকথন

দু-বছর পর...

ইন্দ্রাক্ষি রায়চৌধুরীকে কারাদণ্ড দিল দিল্লি হাই কোর্ট আন্দ্রেয়া গুলাটিকে ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডারের জন্য এবং সাত মাস ধরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অন্য বিরলের থেকেও বিরলতম খুনের পরিকল্পনা কার্যকরী করায়। ইন্দ্রাক্ষি ওর উকিল অঞ্জন মিত্রকে সুপ্রিম কোর্টে অ্যাপিল করতে বলল। সে এখনও বিশ্বাস করে, তার চিন্তা, দর্শনের ব্যাবহারিক প্রয়োগে।

ডাঃ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে দশখানা খুনের পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য ১০ বছরের ক্ষমাহীন রিগারাস ইমপ্রিজনমেন্ট। ওর ক্লিনিক বন্ধ করে রেজিস্ট্রেশন নিয়ে নেওয়া হল। ক্লিনিক থাকলেও পেশেন্ট তো আসত না।

অতীন রায়ের ইন্দ্রাক্ষি রায়চৌধুরী ও ডাঃ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাহায্য করার জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। যেহেতু সে অ্যাবেটার, তার ভবিষ্যৎ কার্যকলাপের কথা মাথায় রেখে মহামান্য জজ সাহেব ক্ষমার প্রভিশন রাখলেন।

তার জন্মভিটে মথুরার কাছে গণ্ডগ্রামে লুকিয়ে থাকা রাজু চতুর্বেদীকে পাঁচ মাস পর গ্রেপ্তার করা গেল। ওকেও ভওয়ানিশঙ্করকে খুনের দায় ও অন্যান্য ন-খানা খুনের পরিকল্পনার জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হল, শাস্তিতে কোনও ছাড়ের প্রভিশন না রেখে।

রাজু চতুর্বেদীর বয়ানের ভিত্তিতে দিলীপ ‘ধমাকা’ কাম্বলের কেস এখনও চলছে।

রিপাবলিক ডেতে পুলিসদের এক্সেমপ্লারি সার্ভিসের জন্য সম্মানিত করে মেডেল দেওয়া হলঃ

- মধুসূদন মুখুজ্জে
- স্নেহাশিস চ্যাটার্জি
- রোশন শেঠ
- দিলওয়ান সিং
- বিনোদ রাঠোড

মধুসূদন এখন তৃপ্ত রিটায়ার্ড পুলিস। চিনি আর বিস্কুটে গিন্নির কোনও কার্পণ্য নেই।

ইন্দ্রাক্ষির ‘দ্য নিউ এজ ইনস্টিটিউট অফ ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড হিউম্যান পোটেনশিয়াল’ তামিলনড়ুর চিফ মিনিস্টারের হস্তক্ষেপে আর বাস্তবের আলো দেখল না। নেগেটিভ পাবলিসিটি পলিটিক্সের পক্ষে ক্ষতিকারক।

দ্য নিউ এজের রেজিস্টার অফ কোম্পানিজ থেকে নাম কেটে, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে, তার বিভিন্ন শাখা বন্ধ করে দেওয়া হল। কর্মীদের পরিবার দুঃখ পেলেও আইনকে সম্মান দিয়ে মেনে নিল। ন্যায়বিচার শেষ পর্যন্ত হয়েছে।

সন্নিধি সুস্থ। ভুলতে চায় অতীতকে।

শিরিন এখনও মডেলিং করে যাচ্ছে, স্নেহাশিসের প্রতি ফল্গু প্রেম নিয়ে।

অ্যামেরিকাতে ঐত্রেয়ী এক বছরের ফুটফুটে মেয়ে নিয়ে ঘর-সংসার করছে।

শেষে...

মেহুলি রায়, সোহম সান্যাল, সোফি চৌধুরী, অঙ্কুর জয়েসোয়াল, শিবানী করঞ্জওয়ালা, সুনেত্রা আগারওয়াল, নীলকান্থ রঙ্গনাথন, পৌরভি কান্নান, লোকেশ চাঢার অতৃপ্ত আত্মা হয়ত ঘুরে বেড়াচ্ছে স্বপ্নের আঁধারে।

মজফফরনগরের দীপা আর মির্জাপুরের ঝিমলির আত্মা বোধহয় শান্তি পেয়েছে।

এই গল্পের সব সব চরিত্রই লেখকের কল্পনা।
জীবিত কিংবা মৃত কারও সঙ্গে সাদৃশ্য থাকলে তা অনিচ্ছাকৃত।

পাঠকের কাছে অনুরোধঃ
উপন্যাসটি পড়ে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করার চেষ্টা কোনওদিনও করবেন না।